

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ইসলামী আকীদা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ.ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম, এম, (চাকা)

অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

বিনাইদহ, বাংলাদেশ

মুসলিম ও ইসলামের জগত
www.bolimafe.com

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহানীর

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (চাকা)

সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন
খিলাইদহ, বাংলাদেশ

العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة
تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
لكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
وأستاذ مشارك بجامعة الإسلامية، كوشتبور، بنغلاديش.

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক

উসামা খন্দকার

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন

জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)

বি. বি. রোড. বিনাইদহ-৭৩০০

ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রতিষ্ঠান:

১. দারুলশ শরীয়াহ ধানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা

২. ইশায়াতে ইসলাম কৃতৃব্ধানা, ২/২ দারুলস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

৩. আল-ফারক একাডেমী, খোগাঘাটা-গোবিন্দপুর, বিনাইদহ-৭৩০০

প্রকাশ কাল : মুলহাজ্জা ১৪২৮ হিঁ ডিসেম্বর ২০০৭ ঈসায়ী

হাদিয়া

৩৬০ (তিনিশত ষাট) টাকা মাত্র।

Qur'an-Sunnaher Aloke Islami Aqida (The Islamic Creed in the Light of the Qur'an and Sunnah) by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Publications, Jaman Supur Market, B. B. Road. Jhenidah-7300. December 2007.

Price : Taka 360.00 Only.

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيْئَاتِ أَعْمَالنَا فَمَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا يُضْلَلُ هٰذِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا
إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيْتِهِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ.

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয় এবং তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ।

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমানই ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যত ইবাদত ও সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট করুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ঈমান।

বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের মুসলিমদের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে:

প্রথমত, বাংলার মুসলিমগণ ভক্তিপ্রবণ। তাঁরা তাঁদের ধর্ম ইসলামকে খুবই ভালবাসেন। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ) প্রতি তাঁদের ভক্তি খুবই বেশী। তাঁরা সাধারণত ইসলামী আচরণকে মেনে চলতে আগ্রহী।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা সরলপ্রাণ। সাধারণত ইসলামের নামে বা ধর্মের নামে যা বলা হয় তাঁরা সহজেই তা মেনে নেন।

তৃতীয়ত, তারা অদ্র ও বিনয়ী। কোন বিষয়ে সত্য অবগত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা তা মেনে নেন এবং নিজের ভুল ঝীকার করেন। অন্যান্য অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মতে নিজের ভুল বুঝার পরেও তা আকড়ে ধরার বা তার পক্ষে ওকালতি করার চেষ্টা করেন না।

বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে দাও'আতী কর্মে লিঙ্গ বিদেশী সমাজকর্মীরা বাংলার মুসলমানদের এসকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলিমদের মধ্যে সাধারণতাবে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানের বিধিবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন না। অনেক ধর্মভীকৃ মুসলিমকে ঈমানের

আরকান সমক্ষে প্রশ্ন করা হয় তিনি ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। রিয়াদে অবস্থানকালে আমি একটি ইসলামী কেন্দ্রে কর্মরত ছিলাম। এ কেন্দ্রে ফরাসী, আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফিলিপিনো, ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান, কানাডিয়ান ও অন্যান্য দেশের অনেক অমুসলিম পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা খুবই আগ্রহ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন। আমরা প্রথমেই তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, তারা কেন ইসলাম গ্রহণ করতে চান? ইসলাম সম্পর্কে তাঁরা কি জেনেছেন? আমরা তাঁদেরকে ইসলামী ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। “লা-ইলাহা ইল্লাহ” অর্থ কী? খ্স্টানদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস, পৌত্রিকদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস এবং মুসলিমদের এক আল্লাহয় বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কি? ঈমানের আরকান কি কি? কিসে ঈমান বাতিল হয়? শিরুক কাকে বলে? কুফ্র কাকে বলে? ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য কি? ইত্যাদি।

তাঁদের মধ্য থেকে অনেকেই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন। কারণ সাধারণত তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে পড়াল্লো করার পরেই ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন। যারা এসকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না তাঁদের আমরা আগে এসকল বিষয় শিক্ষা দিতাম, এরপর তাঁদের কালিমা পড়ানো হতো। কারণ এ সকল বিষয় না জেনে কালিমা পড়া অস্থিহীন হয়ে পড়ে। হয়ত কালিমা পাঠের পরেও এমন কিছু বিশ্বাস তাঁর মধ্যে থেকে যাবে যা এ কালেমার পরিপন্থী অথবা হয়ত কালিমা পাঠের পরেই এমন কিছু কাজ তিনি করবেন যাতে তাঁর ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। নতুন মুসলিমদের যখন এসকল বিষয় শেখানো হতো তখন ভাবতাম বাংলাদেশের অনেক ধার্মিক মুসলিমও এসকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না। এর দুর্ঘজনক পরিণতি হলো তাঁরা প্রতিনিয়ত এমন সব ধারণা, বিশ্বাস বা কর্মে লিখ হচ্ছেন যা তাঁদের ঈমানকে নষ্ট বা দুর্বল করে দিচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? যেখানে ঈমানই মূল সেখানে ঈমান সম্পর্কে না জেনে বা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে কিভাবে আমরা মুসলমান হতে পারি?

আমার মনে হয়, যে কোন বিবেকবান পাঠক অনুধাবন করবেন যে, আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের উচিত আমাদের দীনের মূল কি তা ভালভাবে জানা। কিসে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে, কিসে ঈমান নষ্ট হবে তা আমাদের জানা উচিত।

আমরা আমাদের নিজেদের এবং সন্তান সন্ততির দৈহিক সুস্থতার জন্য সচেষ্ট। এক্ষেত্রে কোন বৃক্ষিয়ান ব্যক্তি লোকাচারের উপর নির্ভর করবেন না। বরং কোন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে অথবা এ বিষয়ে সুপরিচিত বিশেষজ্ঞদের লেখা ভাল ও তথ্য নির্ভর বই-পুস্তক-পত্রিকা পড়ে তাঁর স্বাস্থ্রের জন্য সর্বোত্তম

নিয়ম জানার ও পালন করার চেষ্টা করবেন। কখনই তিনি অল্প শিক্ষিত বা হাতুড়ে কবিরাজের কথামত নিজেকে পরিচালিত করবেন না।

অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই না জেনে বুঝে কোন কাজ করবেন না। তিনি কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের আগে সার্বিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবেন যে, তার মূলধন সেখানে নিরাপদ থাকবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে। কারো সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কখনই তিনি কারো হাতে তার অর্থসম্পদ তুলে দেবেন না, যত লাভের লোভই সে দেখাক না কেন। উপরন্তু একুশ সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষও কোনোভাবে যেন সম্পদ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের শর্ত তিনি আরোপ করবেন এবং যাকে মাঝেই সম্পদের হিসাব নিবেন।

নিঃসন্দেহে আমাদের সুস্থিতা, আমাদের সন্তান-সন্ততির সুস্থিতা এবং আমাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উন্নয়ন আমাদের বড় দায়িত্ব এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের ঈমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার উন্নয়ন আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ঈমান আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, যার উপর আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর করছে। ঈমানের ক্ষতি হলে আমরা চূড়ান্ত ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপত্তি হব। এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি আমাদের কিছু চেষ্টা করা উচিত নয়? এজন্য কি সামান্য কিছু সময় ব্যয় করা উচিত নয়?

সম্ভবত আমরা অনুভব করছি যে, ঈমানের জ্ঞান অর্জন করতে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ অনুভবের ভিত্তিতেই এ বই লেখা। বাংলার সরলপ্রাণ ভক্তিপ্রবণ মুসলিম সমাজের কেউই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা ঈমান সম্পর্কে জানতে অনিচ্ছুক নন। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাদের অনেকের অভ্যন্তর বা জানার ক্ষমতির কারণ সম্ভবত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বই এর অভাব। বিভিন্ন বইয়ে ঈমানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের জন্য কর্মজীবনের বাস্তবতার মাঝে বিভিন্ন বইপত্র বিস্তারিত পড়ার সময় হয়ে ওঠে না। ফলে এমন একটি বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করলাম যাতে ইসলামী ঈমান-আকীদার সকল দিক খুঁটিনাটি আলোচনা করা হবে। এ গ্রন্থে এ প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছি।

১৯৯৮ সালে সৌদি আরবের লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফেরার পরে আমার মুহাতারাম শুল্কের ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আবুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ) আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাওহীদ, শিরক, জাল হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ-আলোচনা করতে এবং বই-পুস্তক রচনা করতে।

তাঁরই উৎসাহে ২০০০ সালে ‘কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ নামে বইটি প্রকাশ করি। তখন তাড়াহড়া করে ‘প্রথম খণ্ড’ হিসেবে শুধু তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমান বিষয়ক অধ্যায়গুলি লিখেছিলাম। তখন চিন্তা ছিল ‘দ্বিতীয় খণ্ড’ শিরক, কুফর, নিফাক, ফিরকা ইত্যাদি বিষয়ে লিখব। পরবর্তীতে আর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হয় নি। এখন পুরো বইটি পুনরায় নতুন করে লিখে সকল বিষয় একত্রে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বইটির আলোচ্য বিষয় ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষাগুলির পরিচিতি, ইসলামী আকীদার গুরুত্ব, উৎস, ভিত্তি ও এ বিষয়ক বিভাগে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের অর্থ, প্রকৃতি, শর্ত ও দায়িত্ববালি আলোচনা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে আরকানুল ঈমানের অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শিরক, কুফর, নিফাক, এগুলির প্রকারভেদ, কারণ, প্রেক্ষাপট, মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী আকীদার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উদ্ধাবিত বিদ‘আত ও বিদ‘আত ভিত্তিক ফিরকা, দল, উপদল ও আহলুস সুন্নাত ও জামা‘আতের পরিচিত ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছি।

উম্মাতের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসগুলি মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন এবং প্রথম তিন শতাব্দীর আলিমদের লেখা বইপত্র, বিশেষত প্রসিদ্ধ চার ইমামের লেখা পুস্তকাদি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদা এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে- হিজরী ৭ম শতকের পরের- আলিমদের লেখালেখি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। আবার এক্ষেত্রে ৭ম শতকের আকীদার সাথে ১৩শ শতকের আকীদার অনেক পার্থক্য, বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সকলেই কুরআন ও হাদীসের ‘দলীল’ প্রদান করেন। তবে প্রথম ব্যক্তি কুরআন, হাদীস ও প্রথম যুগের আলিমদের কথাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলির অতিরিক্ত কথা বা মতামত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলত পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের কথা গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন।

পুরাতন ও নতুনের এ মতভেদে পুরাতনের প্রতি আমার আকর্ষণ ও দুর্বলতা কথনোই গোপন করি না। মানবতার মুক্তির নূর বিছুরিত হয়েছে মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে। তাঁর এ নূরে পরিপূর্ণ আলোকিত হয়েছেন সাহাবীগণ। পরবর্তী দু শতাব্দীর মানুষেরা তাঁদের নূর ভালভাবে পেয়েছিলেন। সত্য ও মুক্তি তো পুরাতন সে যুগের পুরাতন মানুষদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। মতভেদীয় বিষয়ে সকল পক্ষের মতই পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে পড়তে চেষ্টা করেছি। তবে যারা মূলতই পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা, তাফসীর বা মতামতের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যুর্থহীন বক্তব্য বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের কোনো সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেন নি তাঁদের মতামত গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও।

আমাদের বিশ্বাস যে, আকীদার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হৃবছ অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামতের বাইরে না যাওয়াই মুঘ্লিনের নাজাত ও প্রশান্তির পথ। প্রথম তিন মুবারক যুগে বা প্রসিদ্ধ চার ইমামের যুগে যে সকল হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন সেগুলির উপরেই নির্ভর করতে হবে। পরবর্তী যুগে সংকলিত অপ্রসিদ্ধ, গরীব, যয়ীক ইত্যাদি হাদীসের উপর নির্ভরতা বর্জন করতে হবে। এগুলিকে ফয়লাতের বিষয়ে কেউ বর্ণনা করলেও কোনো অবস্থাতেই এগুলি আকীদার উৎস নয়। কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা ও আকীদা বিষয়ক অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রেও একই কথা। সহীহ সনদে তাঁদের থেকে এ সকল বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এ সকল বিষয়ে তাঁরা যা বলেন নি তা বর্জন করতে হবে।

এজন্য এ বইয়ের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য সাহাবী, তাবিয়ী ও ইমামগণের মতামতের উপরে নির্ভর করেছি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য মূলত সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের আলিমগণের প্রমাণিত বিশুদ্ধ মতামত এবং চার ইমামের লিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর করেছি। বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর লেখা 'আল-ফিকহুল আকবার' এবং ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবী (রাহ)-এর লেখা 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামক পুস্তকের উপর নির্ভর করেছি।

মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফিকই আমাদের একমাত্র সম্ভল। এ বই লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বদা আল্লাহর দরবারে কাতর আকৃতি জানিয়েছি, যেন তিনি দয়া করে সঠিকভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বুঝার ও বুঝানোর তাওফিক দান করেন। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সঠিক ও সজহবোধ্য আলোচনার। কিন্তু যে কোন মানবীয় কর্মে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আর আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির ভুল ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক।

রাসূলপ্পাহ (ﷺ) বলেছেন: “পরম্পরে নসীহতই ধীন।” তাই আমরা একান্ত ভাবে আশা করব যে, কোনো পাঠক এ বইয়ে কোনো প্রকার ভাষাগত, তথ্যগত বা মতামতের ভুল দেখতে পেলে যেন অনুগ্রহ পূর্বক তা লেখককে বা প্রকাশককে জানান। আমরা আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন এবং ভুল সংশোধনে আগ্রহী। এ বইয়ের কোনো বিষয়ে আপনি দ্বিতীয় পোষণ করলে আমাদেরকে জানান। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের মতের ভুল ধরা পড়লে আমরা তা তৎক্ষণিক ভাবে স্বীকার করে নেব। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভুল করা স্বাভাবিক, তবে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকা অন্যায়। আমরা এরূপ অন্যায়ের মধ্যে লিঙ্গ হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আগেই বলেছি, আমার শুশ্রাব ফুরফুরার পীর আবুল আনসার সিদ্দীকী (রাহ)-এর উৎসাহে ও প্রেরণায় এ বই লিখতে শুরু করেছিলাম। আমার সকল লেখালেখির জন্য প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন তিনি। কোনো মানুষের দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে সত্যকে গ্রহণ ও বলার ক্ষেত্রে আপোষণীয় হতে প্রেরণা দিয়েছেন তিনি। তাঁর মহান রক্বের ডাকে সাড়া দিয়ে গত বছর এ সময়ে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন, রহমত করেন, আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন, ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে তাঁকে কবুল করেন এবং তাঁর সত্তানগণসহ আমাদের সকলকে তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন।

দু'আ করি, মহান আল্লাহ দয়া করে এ বইটি কবুল করেন, একে লেখকের, তাঁর পিতামাতা ও পরিবারের, পাঠকদের এবং সকল শুভাকাঞ্চীর নাজাতের ওসিলা করে দেন। সকল প্রশংসা তাঁরই। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল (ﷺ), তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও অনুসারীগণের জন্য।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব /২১-৭৮

১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা /২১
 ১. ১. ১. ঈমান ও ইসলাম /২২
 ১. ১. ২. আল-ফিকহুল আকবার /২৬
 ১. ১. ৩. ইলমুত তাওহীদ /২৬
 ১. ১. ৪. আস-সুন্নাহ /২৬
 ১. ১. ৫. আশ-শারী'আহ /২৮
 ১. ১. ৬. উস্লুদ্দীন বা উস্লুদ্দিয়ানাহ /২৮
 ১. ১. ৭. আকীদা /২৮
 ১. ১. ৮. ইলমুল কালাম /৩০
১. ২. ইসলামী আকীদার উৎস /৩২
 ১. ২. ১. বিশ্বাস বনাম জ্ঞান /৩২
 ১. ২. ২. ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী /৩৩
 ১. ২. ৩. তথ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও জ্ঞানের প্রকারভেদ /৮০
 ১. ২. ৪. ওহীর প্রকারভেদ: কুরআন ও হাদীস /৮৮
 ১. ২. ৪. ১. কুরআন মাজীদ /৮৮
 ১. ২. ৪. ২. হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) /৮৬
 ১. ২. ৪. ২. ১. পরিচয় ও সংজ্ঞা /৮৬
 ১. ২. ৪. ২. ২. সহীহ হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস /৮৮
 ১. ২. ৪. ২. ৩. মৃতাওয়াতির বনাম আহাদ হাদীস /৫১
 ১. ২. ৪. ২. ৪. সহীহ হাদীসের উৎস /৫৫
 ১. ২. ৫. সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত /৫৮
 ১. ২. ৬. উৎসের বিভিন্ন বনাম বিশ্বাসের বিচ্ছিন্নতা /৬২
 ১. ২. ৬. ১. ওহী অশ্বীকার করা /৬২
 ১. ২. ৬. ২. ওহীকে অকার্যকর করা /৬৩
 ১. ২. ৬. ৩. লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা ব্যক্তিগত পছন্দ /৬৩
 ১. ২. ৬. ৪. ওহীর তাফসীর ও ওহী ভিত্তিক মুক্তি /৬৪
 ১. ২. ৬. ৫. ধর্মগুরুগণ বা আলিমগণের মতামত /৬৮
 ১. ২. ৬. ৬. মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-কিয়াস /৭০
 ১. ৩. ইসলামী আকীদার গুরুত্ব /৭৩
 ১. ৩. ১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব /৭৩
 ১. ৩. ২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের গুরুত্ব /৭৫
 ১. ৩. ৩. বিভিন্নিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব /৭৬
 ১. ৪. আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি /৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: তাওহীদের ইমান /৭৯-১১৪

২. ১. আরকানুল ইমান /৭৯
২. ২. আল্লাহর প্রতি ইমান /৮১
২. ৩. তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা /৮২
২. ৪. তাওহীদের প্রকারভেদ /৮৪
২. ৪. ১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ /৮৬
২. ৪. ১. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব /৮৬
২. ৪. ১. ২. অধিকাংশ কাফির এ পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত /৮৭
২. ৪. ১. ৩. নাম ও শুনাবলির একত্ব /৯১
২. ৪. ১. ৪. এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফিরদের কিছু আপত্তি ছিল /৯১
২. ৪. ১. ৫. নাম ও শুনাবলির তাওহীদের বিভিন্ন ফিরকার বিভাগি /৯৩
২. ৪. ২. কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদতের একত্ব /৯৩
২. ৪. ২. ১. ইবাদতের পরিচয় ও সংজ্ঞা /৯৩
২. ৪. ২. ২. ইবাদতের প্রকারভেদ /৯৫
২. ৪. ২. ৩. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ /৯৫
২. ৪. ৩. উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য /৯৮
২. ৪. ৪. তাওহীদুর রূবুবিয়াহের দাবি তাওহীদুল ইবাদাত /৯৮
২. ৪. ৫. তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের আপত্তি /১০২
২. ৪. ৬. কাফিরদের আপত্তির কারণ /১০৭
২. ৪. ৭. ইবাদতের তাওহীদই সকল নবী-রাসূলের দাও'আত /১১২
২. ৪. ৮. তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচনা /১১৩

তৃতীয় অধ্যায় : রিসালাতের ইমান /১১৫-২৪০

৩. ১. রিসালাতের সাক্ষ্য /১১৫
৩. ১. ১. শাহাদাতের তিনটি শব্দ /১১৫
৩. ১. ২. মুহাম্মাদ (ﷺ) /১১৫
৩. ১. ২. ১. দেশ ও বংশ /১১৬
৩. ১. ২. ২. জন্ম /১১৬
৩. ১. ২. ৩. শৈশব ও কৈশর /১১৮
৩. ১. ২. ৪. বিবাহ ও নুরুওয়াত-পূর্ব জীবন /১১৯
৩. ১. ২. ৫. নুরুওয়াত ও মাঙ্কী জীবন /১২০
৩. ১. ২. ৬. মদীনায় হিজরত ও মাদানী জীবন /১২৩
৩. ১. ২. ৭. সর্বশেষ ওসীয়ত ও ওফাত /১২৪
৩. ১. ২. ৮. আয়াত ও মুজিয়া /১২৯
৩. ১. ২. ৯. আকৃতি ও প্রকৃতি /১৩৩

- ৩. ১. ৩. আব্দুহ /১৩৫
- ৩. ১. ৪. রাসূলুহ /১৩৭
- ৩. ২. রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ /১৩৮**
 - ৩. ২. ১. তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাত /১৩৯
 - ৩. ২. ২. তাঁর নুবুওয়াতের সর্বজনীনতা /১৩৯
 - ৩. ২. ৩. খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তি /১৪২
 - ৩. ২. ৪. তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতা /১৪৭
 - ৩. ২. ৫. তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা /১৪৯
 - ৩. ২. ৬. তাঁর আনুগত্য /১৫২
 - ৩. ২. ৭. তাঁর অনুকরণ /১৫৪
 - ৩. ২. ৮. অনুকরণের ব্যক্তিগত ঈমান বিধ্বংসী /১৫৫
 - ৩. ২. ৯. তাঁর ভালবাসা /১৬৪
 - ৩. ২. ১০. তাঁর আহলু বাইত ও সাহাবীগণ /১৬৬
 - ৩. ২. ১০. ১. আহলু বাইত /১৬৬
 - ৩. ২. ১০. ২. সাহাবীগণ /১৬৭
 - ৩. ২. ১১. তাঁর মর্যাদা ও সম্মান /১৭১
 - ৩. ২. ১২. তাঁর মর্যাদার বিষয়ে ওইর অনুসরণ /১৭৭
 - ৩. ২. ১২. ১. তাঁর মানবত্ব বনাম অলোকিকভু বিষয়ক বিতর্ক /১৮৩
 - ৩. ২. ১২. ২. তাঁর ইলম বিষয়ক বিতর্ক /১৯৬
 - ৩. ২. ১২. ৩. হাযির-নাযির প্রসঙ্গ /২০৭
 - ৩. ২. ১২. ৪. তাঁর ওফাত বিষয়ক বিতর্ক /২২০
 - ৩. ২. ১২. ৫. তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক /২২৫

চতুর্থ অধ্যায়: আরকানুল ঈমান /২৪১-৩৫২

- ৪. ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান /২৪১**
- ৪. ২. মালাইকার প্রতি ঈমান /২৪১**
 - ৪. ২. ১. মালাক: অর্থ ও পরিচয় /২৪১
 - ৪. ২. ২. মালাকগণের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা /২৪২
 - ৪. ২. ৩. মালাকগণের প্রতি ঈমানের মূলনীতি /২৪২
 - ৪. ২. ৪. মালাকগণের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থ /২৪৩
 - ৪. ২. ৫. মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস /২৪৩
 - ৪. ২. ৬. মালাকগণের নামে বিশ্বাস /২৪৩
 - ৪. ২. ৭. মালাকগণের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস /২৪৬
 - ৪. ২. ৭. ১. মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্টি /২৪৬

সূচীপত্র

8. ২. ৭. ২. মালাকগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা /২৪৭
8. ২. ৭. ৩. মালাকগণ নূরের তৈরি /২৪৭
8. ২. ৭. ৪. মালাকগণের আকৃতি /২৪৮
8. ২. ৭. ৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ /২৫০
8. ২. ৮. মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস /২৫১
 8. ২. ৮. ১. আল্লাহর সার্বব্রহ্মিক ইবাদত ও তাসবীহ /২৫১
 8. ২. ৮. ২. কর্মনির্বাহ ও কর্মবটন /২৫২
 8. ২. ৮. ৩. ওহী পৌছানো /২৫২
 8. ২. ৮. ৪. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ /২৫৩
 8. ২. ৮. ৫. মানুষকে কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান /২৫৩
 8. ২. ৮. ৬. মুমিনদের জন্য দু'আ করা /২৫৩
 8. ২. ৮. ৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা /২৫৪
 8. ২. ৮. ৮. মৃত্যুর সময় আত্মাঘৃণ /২৫৫
 8. ২. ৮. ৯. আরশ বহন করা /২৫৫
 8. ২. ৮. ১০. অন্যান্য কর্ম /২৫৬
8. ২. ৯. মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি /২৫৬
 8. ২. ৯. ১. দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা /২৫৭
 8. ২. ৯. ২. সম্পর্ক ও সুপারিশ /২৫৮
 8. ২. ১০. মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ /২৬০
8. ৩. আল্লাহর গ্রহসমূহে বিশ্বাস /২৬১
 8. ৩. ১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন /২৬১
 8. ৩. ২. জানা ও অজানা কিতাব /২৬৩
 8. ৩. ৩. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব /২৬৩
 8. ৩. ৪. মহাত্ম্য আল-কুরআন /২৭০
 8. ৩. ৪. ১. অলৌকিকত্ব /২৭১
 8. ৩. ৪. ২. সংরক্ষণ /২৭২
 8. ৩. ৪. ৩. সার্বজীবীনতা /২৭৭
 8. ৩. ৪. ৪. পূর্ববর্তী গ্রহসমূহের রাহিতকরণ /২৭৯
 8. ৩. ৪. ৫. মুক্তির একমাত্র দিশারী /২৭৯
 8. ৩. ৫. আল্লাহর প্রেরিত গ্রহসমূহে বিশ্বাসের কল্যাণ /২৮৪
8. ৪. রাসূলগণের প্রতি ইমান /২৮৫
 8. ৪. ১. আল্লাহর অপার করণ /২৮৫
 8. ৪. ২. নবী ও রাসূল /২৮৫
 8. ৪. ৩. নবী রাসূলগণের সংখ্যা /২৮৮
 8. ৪. ৪. নবী-রাসূলগণের নাম /২৯০

8. ৮. ৫. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত /২৯১
8. ৮. ৬. নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন /২৯২
8. ৮. ৭. সকল নবী-রাসূলের দাও'আত এক /২৯৪
8. ৮. ৮. ইসমাতুল আমিয়া /২৯৫
8. ৮. ৯. মুজিয়া, কারামাত ও ইসতিদরাজ /২৯৯
 8. ৮. ৯. ১. আয়াত ও মুজিয়া /২৯৯
 8. ৮. ৯. ২. কারামাতুল আওলিয়া /৩০৩
 8. ৮. ৯. ৩. ইসতিদরাজ /৩০৭
8. ৮. ১০. বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য /৩০৯
8. ৫. আধিরাতের প্রতি দ্বিমান /৩১০
 8. ৫. ১. আধিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব /৩১০
 8. ৫. ২. আধিরাতে বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস /৩১১
 8. ৫. ৩. কবরের আযাব /৩১২
 8. ৫. ৪. ধৰ্ম ও পুনরুত্থান ও হাশ্র /৩১৪
 8. ৫. ৫. হিসাব ও প্রতিফল /৩১৫
 8. ৫. ৬. মীয়ান /৩১৬
 8. ৫. ৭. সিরাত /৩১৭
 8. ৫. ৮. হাউয় /৩১৯
 8. ৫. ৯. শাফা'আত /৩২১
 8. ৫. ৯. ১. কুরআন কারীমে শাফা'আত /৩২২
 8. ৫. ৯. ২. হাদীস শরীফে শাফা'আত /৩২৭
 8. ৫. ১০. জাগ্রাত ও জাহান্নম /৩২৮
 8. ৫. ১১. আধিরাতে আল্লাহর দর্শন /৩৩০
 8. ৫. ১২. কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ /৩৩৪
 8. ৫. ১২. ১. কিয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন /৩৩৪
 8. ৫. ১২. ২. কিয়ামতের আলামাত বা পূর্বাভাস /৩৩৫
 8. ৫. ১২. ৩. আলামাত সুগরা /৩৩৬
 8. ৫. ১২. ৪. আলামাত কুবরা /৩৩৭
8. ৬. তাকদীরের বিশ্বাস /৩৩৯
 8. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ /৩৩৯
 8. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি /৩৪০
 8. ৬. ২. ১. আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস /৩৪০
 8. ৬. ২. ২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস /৩৪০
 8. ৬. ২. ৩. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস /৩৪২

৮. ৬. ২. ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস /৩৪৩
৮. ৬. ২. ৫. মানুষের শারীন ইচ্ছা ও কর্মকলে বিশ্বাস /৩৪৪
৮. ৬. ৩. তাকদীরের বিশ্বাসের বিকৃতি /৩৪৫
৮. ৬. ৪. ইসলামী তাকদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা /৩৪৭

পঞ্চম অধ্যায়: অবিশ্বাস ও বিজ্ঞানি /৩৫৩-৫২২

৫. ১. কুফ্র /৩৫৩

৫. ১. ১. অর্থ ও পরিচিতি /৩৫৩
৫. ১. ২. কুফ্র আক্বার ও কুফ্র আস্গার /৩৫৪
৫. ১. ৩. কুফ্র আকবার-এর প্রকারভেদ /৩৫৪
৫. ১. ৩. ১. 'প্রতিপালনের একত্ব' অবিশ্বাস /৩৫৫
৫. ১. ৩. ২. নাম ও গুণাবলির একত্বে অবিশ্বাস /৩৫৫
৫. ১. ৩. ৩. ইবাদতের একত্বে অবিশ্বাস /৩৫৫
৫. ১. ৩. ৪. মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতে অবিশ্বাস/৩৫৬
৫. ১. ৩. ৫. সম্ভূষ্টি ও অসম্ভূষ্টির কুফ্র /৩৫৭
৫. ১. ৪. কুফ্র আকবার-এর বিভিন্ন প্রকাশ /৩৬০
৫. ১. ৪. ১. কুফ্র তাকবীব বা মিথ্যা বলার কুফ্র /৩৬০
৫. ১. ৪. ২. কুফ্র ইসতিকবার বা অহঙ্কারের অবিশ্বাস /৩৬১
৫. ১. ৪. ৩. কুফ্র শাক্ত বা সন্দেহের অবিশ্বাস /৩৬১
৫. ১. ৪. ৪. কুফ্র ই'রায বা অবজ্ঞার কুফ্র /৩৬২
৫. ১. ৪. ৫. কুফ্র নিষ্ফাক বা মুনফিকীর কুফ্র /৩৬২
৫. ১. ৫. নিষ্ফাক: পরিচিতি ও প্রকারভেদ /৩৬২
৫. ১. ৫. ১. বিশ্বাসের নিষ্ফাক /৩৬৩
৫. ১. ৫. ২. কর্মের নিষ্ফাক /৩৬৩
৫. ১. ৬. কুফ্র আস্গার বা ক্ষুদ্রতর অবিশ্বাস /৩৬৪

৫. ২. শিরক /৩৬৬

৫. ২. ১. অর্থ ও পরিচিতি /৩৬৬
৫. ২. ২. শিরকের হাকীকত /৩৬৮
৫. ২. ৩. শিরকের প্রকারভেদ /৩৭১
৫. ২. ৩. ১. তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ /৩৭১
৫. ২. ৩. ১. ১. প্রতিপালনের শিরক /৩৭১
৫. ২. ৩. ১. ২. নাম ও গুণাবলির শিরক /৩৭১
৫. ২. ৩. ১. ৩. ইবাদতের শিরক /৩৭২
৫. ২. ৩. ২. শিরক আস্গার /৩৭২
৫. ২. ৩. ২. ১. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা /৩৭২
৫. ২. ৩. ২. ২. ওসমালা-উপকরণ বিষয়ক শিরক /৩৭৪

- ৫. ২. ৩. ২. ৩. আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা /৩৭৬
 - ৫. ২. ৩. ২. ৪. 'গাইরুল্লাহ'র নামে শপথ করা /৩৮১
 - ৫. ২. ৩. ২. ৫. অন্তভু, অয়ত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা /৩৮২
 - ৫. ২. ৩. ২. ৬. ভবিষ্যত্বাণী বা তাগ্যবজ্ঞার কথায় বিশ্বাস করা /৩৮৩
 - ৫. ২. ৩. ২. ৭. রশি, তাবিয় ইত্যাদি ব্যবহার করা /৩৮৪
 - ৫. ২. ৩. ২. ৮. কাউকে 'শাহনশাহ' বলা /৩৮৭
 - ৫. ২. ৩. ২. ৯. কাউকে রাব্ব বা আব্দ বলা /৩৮৮
- ৫. ৩. শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ /৩৮৯**
- ৫. ৩. ১. মুশরিকগণের পরিচিতি /৩৯০
 - ৫. ৩. ১. ১. জ্যোতিষি, প্রকৃতিপজ্ঞারী বা নক্ষত্র পূজারিগণ /৩৯০
 - ৫. ৩. ১. ২. মুশরিকগণ /৩৯০
 - ৫. ৩. ১. ৩. খ্স্টানগণ /৩৯১
 - ৫. ৩. ১. ৪. কবর পূজারিগণ /৩৯৩
 - ৫. ৩. ২. শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ /৩৯৪
 - ৫. ৩. ২. ১. প্রতিপালনের শিরক /৩৯৪
 - ৫. ৩. ২. ১. ১. প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা /৩৯৪
 - ৫. ৩. ২. ১. ২. আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি /৩৯৫
 - ৫. ৩. ২. ১. ৩. আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক /৩৯৫
 - ৫. ৩. ২. ২. ইবাদতের শিরক /৩৯৭
 - ৫. ৩. ২. ২. ১. গাইরুল্লাহর সাজদা /৩৯৭
 - ৫. ৩. ২. ২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত /৩৯৮
 - ৫. ৩. ২. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা আশ প্রার্থনা /৪০০
 - ৫. ৩. ২. ২. ৪. গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা /৪০৮
 - ৫. ৩. ২. ২. ৫. ভয় ও আশার শিরক /৪০৬
 - ৫. ৩. ২. ২. ৬. ভালবাসার শিরক /৪০৮
 - ৫. ৩. ২. ২. ৭. আনুগত্যের শিরক /৪০৯
 - ৫. ৩. ২. ২. ৮. হজ্জ বা যিয়ারতের শিরক /৪১৫
 - ৫. ৩. ২. ২. ৯. তাবারকতের শিরক /৪১৫
 - ৫. ৩. ৩. শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা /৪১৭
 - ৫. ৩. ৩. ১. বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভাষি /৪১৮
 - ৫. ৩. ৩. ২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভাষি /৪১৯
 - ৫. ৩. ৩. ৩. শয়তানের প্রতারণা /৪২১
 - ৫. ৩. ৩. ৪. বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অঙ্ক-অনুসরণ /৪২৩
 - ৫. ৩. ৩. ৫. নেতৃবৃন্দের অঙ্ক আনুগত্য /৪২৪
 - ৫. ৩. ৩. ৬. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভাষি /৪২৫

৫. ৩. ৪. শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা /৮২৭
 ৫. ৩. ৪. ১. যিনি একমাত্র রাব্ব তিনিই একমাত্র ইলাহ /৮২৭
 ৫. ৩. ৪. ২. মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না /৮২৮
 ৫. ৩. ৪. ৩. ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন? /৮২৯
 ৫. ৩. ৪. ৪. আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি? /৮২৯
 ৫. ৩. ৪. ৫. আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন নি /৮৩০
 ৫. ৩. ৪. ৬. সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে /৮৩২
 ৫. ৩. ৪. ৭. এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না /৮৩৩
 ৫. ৩. ৪. ৮. মালিককে রেখে ঢাকরকে মাবুদ বানানো ছড়ান্ত বোকামি /৮৩৪
 ৫. ৩. ৪. ৯. মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না /৮৩৫
 ৫. ৩. ৪. ১০. আল্লাহর মাহবুব বান্দারা মুশারিকদের উপর অস্ত্রষ্ট /৮৩৫
 ৫. ৩. ৪. ১১. মুশারিকগণ নেককারগণের শাফা'আত পাবে না /৮৩৭
 ৫. ৩. ৪. ১২. অন্য আবেগে বিবেকের দাবি অঙ্গীকারের পরিণতি /৮৩৯
 ৫. ৩. ৫. শিরকের ভয়বহু পরিণতি ব্যাখ্যা করা /৮৪১
 ৫. ৩. ৫. ১. ভয়ঙ্করতম পাপ /৮৪১
 ৫. ৩. ৫. ২. কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না /৮৪১
 ৫. ৩. ৫. ৩. শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে /৮৪২
 ৫. ৩. ৫. ৪. শিরক-কুফর জাহানামের অনন্ত শাস্তির কারণ /৮৪৩
 ৫. ৩. ৬. শিরকের উৎস-সমূহ বঙ্গ করা /৮৪৮
 ৫. ৩. ৬. ১. মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা /৮৪৮
 ৫. ৩. ৬. ২. ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা /৮৪৫
 ৫. ৩. ৬. ৩. নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা /৮৪৫
 ৫. ৩. ৬. ৪. ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা /৮৪৫
 ৫. ৩. ৬. ৫. মৃত্তি, ছাবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য /৮৪৮
 ৫. ৪. মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের প্রেক্ষাপট /৮৫০
 ৫. ৪. ১. মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী /৮৫০
 ৫. ৪. ২. ইহুদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ /৮৫২
 ৫. ৪. ৩. ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি /৮৫৩
 ৫. ৪. ৪. একজন শীয়া আলিমের অভিব্যক্তি /৮৫৪
 ৫. ৪. ৫. শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা /৮৫৭
 ৫. ৪. ৬. সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিষ্ঠিত পথ /৮৬০
 ৫. ৪. ৭. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবীর অভিমত /৮৬০
 ৫. ৫. মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-কুফর /৮৬২
 ৫. ৫. ১. রূবুবিয়্যাতের শিরক /৮৬২
 ৫. ৫. ১. ১. ক্ষমতা বিষয়ক শিরক /৮৬৩

- ৫. ৫. ১. ২. ইলম বিষয়ক শিরক /৪৬৬
 - ৫. ৫. ১. ৩. ওসীলা বিষয়ক শিরক /৪৬৭
 - ৫. ৫. ১. ৩. ১. কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ওসীলা /৪৬৮
 - ৫. ৫. ১. ৩. ২. দু'আর মধ্যে ওসীলা /৪৭০
 - ৫. ৫. ১. ৩. ৩. পীর-মাশাইখের ওসীলা /৪৭৯
 - ৫. ৫. ১. ৪. আল্লাহর হৃকুম প্রদানের ক্ষমতায় শিরক /৪৮৪
 - ৫. ৫. ১. ৪. ১. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা /৪৮৪
 - ৫. ৫. ১. ৪. ২. আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা বা উপহাস /৪৮৪
 - ৫. ৫. ১. ৪. ৩. আল্লাহর নির্দেশ অযান্ত্রের বৈধতায় বিশ্বাস /৪৮৫
 - ৫. ৫. ২. ইবাদাতের শিরক /৪৮৭
 - ৫. ৫. ২. ১. গাইরল্লাহর জন্য সাজদা /৪৯১
 - ৫. ৫. ২. ২. গাইরল্লাহর জন্য তাওয়াফ /৪৯৭
 - ৫. ৫. ২. ৩. গাইরল্লাহকে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা /৪৯৮
 - ৫. ৫. ২. ৪. গাইরল্লাহর জন্য মানত-নয়র বা উৎসর্গ /৫০০
 - ৫. ৫. ২. ৫. তাবারুক বিষয়ক শিরক /৫০৮
 - ৫. ৫. ২. ৬. তাওয়াকুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক /৫১১
 - ৫. ৫. ৩. শিরকের সেকাল ও একাল /৫১৩
 - ৫. ৬. কুরুক বনাম তাকফীর /৫১৭
 - ৫. ৬. ১. তাকফীর বা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা /৫১৭
 - ৫. ৬. ২. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা /৫১৮
 - ৫. ৬. ৩. তাকফীরের মূলনীতি /৫২১
- ষষ্ঠ অধ্যাত্ম: বিদ'আত ও বিজক্তি /৫২৩-৬৩০**
- ৬. ১. বিদ'আতের পরিচয় /৫২৩
 - ৬. ১. ১. অভিধানে বিদ'আত /৫২৩
 - ৬. ১. ২. কুরআন কারীমে বিদ'আত /৫২৫
 - ৬. ১. ৩. হাদীসে নববীতে বিদ'আত /৫২৫
 - ৬. ১. ৪. সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে বিদ'আত /৫২৯
 - ৬. ১. ৫. বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ /৫৩৫
 - ৬. ১. ৬. সুন্নাত ও বিদ'আত: তুলনা ও পার্থক্য /৫৩৬
 - ৬. ২. ইফতিরাক ও ইখতিলাফ /৫৪১
 - ৬. ২. ১. ইফতিরাক /৫৪১
 - ৬. ২. ২. ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ /৫৪২
 - ৬. ৩. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইফতিরাক /৫৪৩
 - ৬. ৩. ১. পূর্ববর্তী উম্যাতদের মধ্যে ইফতিরাক /৫৪৩

৬. ৩. ২. মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক /৫৪৫
 ৬. ৩. ৩. ইফতিরাকের কারণ /৫৫১
 ৬. ৩. ৩. ১. ওহী ভূলে যাওয়া /৫৫১
 ৬. ৩. ৩. ২. হাওয়া বা মনগড়া মতের অনুসরণ /৫৫৩
 ৬. ৩. ৩. ৩. হিংসা-বিদ্রে /৫৫৪
 ৬. ৩. ৩. ৪. সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্নি /৫৫৬
 ৬. ৩. ৩. ৫. যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা করা /৫৫৭
 ৬. ৩. ৩. ৬. অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া /৫৫৮
 ৬. ৩. ৩. ৭. মুহকাম রেখে মুতাশাবিহ অনুসরণ /৫৫৮
 ৬. ৩. ৩. ৮. কমহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরীত্য সঙ্কান /৫৫৯
৬. ৪. বিভিন্ন বৰুণ ও বিভিন্ন বিষয়াদি /৫৬০
 ৬. ৪. ১. ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট /৫৬০
 ৬. ৪. ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের ভালবাসা ও মর্যাদা /৫৬২
 ৬. ৪. ৩. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান /৫৬৩
 ৬. ৪. ৪. রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইমামত /৫৬৪
 ৬. ৪. ৫. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা /৫৬৫
 ৬. ৪. ৬. আল্লাহর বিশেষণ: বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা /৫৬৫
 ৬. ৪. ৭. বিভাগ ফিরকাসমূহের বৈশিষ্ট্য /৫৬৭
৬. ৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় /৫৬৮
 ৬. ৫. ১. আহল /৫৬৯
 ৬. ৫. ২. সুন্নাত /৫৬৯
 ৬. ৫. ২. ১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয় /৫৬৯
 ৬. ৫. ২. ২. ইতিবায়ে সুন্নাতের শুরুত্ব /৫৬৯
 ৬. ৫. ২. ৩. সুন্নাতুস সাহাবা /৫৭০
 ৬. ৫. ২. ৪. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত /৫৭০
 ৬. ৫. ২. ৫. হ্বছ অনুকরণ /৫৭৫
 ৬. ৫. ৩. আল-জামা'আত /৫৭৬
 ৬. ৫. ৩. ১. অর্থ ও পরিচিতি /৫৭৬
 ৬. ৫. ৩. ২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এক্রে অর্থে আল-জামা'আত /৫৭৭
 ৬. ৫. ৩. ৩. সাহাবীগণই মূল জামা'আত /৫৮০
 ৬. ৫. ৪. মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি /৫৮২
 ৬. ৫. ৪. ১. ইফাতিরাক ও বিভিন্ন বিষয়াদি /৫৮২
 ৬. ৫. ৪. ২. আহলুস সুন্নাতের ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি /৫৮৫
 ৬. ৫. ৪. ২. ১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূলনীতি /৫৮৫

- ৬. ৫. ৪. ২. ২. আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ে মূলনীতি /৫৮৭
- ৬. ৫. ৪. ২. ৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূলনীতি /৫৯০
- ৬. ৫. ৪. ২. ৪. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি /৫৯৪
- ৬. ৫. ৪. ২. ৫. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মূলনীতি /৫৯৪
- ৬. ৫. ৪. ২. ৬. এক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূলনীতি /৫৯৭
- ৬. ৫. ৫. আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ /৫৯৯
- ৬. ৫. ৬. শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর নসীহত /৬০২
- ৬. ৬. বিআষ্ট দল-উপদলসমূহ /৬০৩**
- ৬. ৬. ১. ফিরকার সংখ্যা ও ৭৩ ফিরকা /৬০৪
- ৬. ৬. ২. প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ /৬০৫
- ৬. ৬. ৩. শীয়া ফিরকা /৬০৫
- ৬. ৬. ৩. ১. উৎপত্তি ও মূলনীতি /৬০৫
- ৬. ৬. ৩. ২. দাদশ-ইমামপঙ্খী শীয়াগণ /৬০৯
- ৬. ৬. ৩. ৩. ইসমাইলীয়া বাতিনীয়াহ শীয়াগণ /৬১১
- ৬. ৬. ৩. ৪. যাইদিয়াহ শীয়াগণ /৬১৪
- ৬. ৬. ৪. খারিজী ফিরকা /৬১৫
- ৬. ৬. ৪. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস /৬১৫
- ৬. ৬. ৪. ২. আকীদা ও মূলনীতি /৬১৯
- ৬. ৬. ৪. ৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ /৬২০
- ৬. ৬. ৫. অন্যান্য ফিরকা /৬২৩
- ৬. ৬. ৫. ১. মুরজিয়াহ /৬২৪
- ৬. ৬. ৫. ২. কাদারিয়াহ /৬২৫
- ৬. ৬. ৫. ৩. জাবারিয়াহ /৬২৬
- ৬. ৬. ৫. ৪. জাহমিয়াহ /৬২৬
- ৬. ৬. ৫. ৫. মু'তাযিলা /৬২৭
- ৬. ৬. ৫. ৬. মুশাকিহা /৬২৯

শেষ কথা /২৩০

এস্টপড়ি /২৩১

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

১. A Woman From Desert
২. এহইয়াউস সুনান : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ্যাতের বিসর্জন
৩. রাহে বেলায়াত : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিকর-ওয়ীফা
৪. মুসলমানী নেসাব : আরকানে ইসলাম ও ওয়ীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৫. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : শুরুত্ব ও প্রয়োগ
৬. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৭. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. হাদীসের নামে জালিয়াতি : প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
১০. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ : আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
১২. সহীহ মাসন্নূন ওয়ীফা
১৩. بحوث في علوم الحديث (বুহুসুন ফী উল্মিল হাদীস)
১৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৫. মুসলাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৬. ইয়হারুল হক (রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৭. ফিকহস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আয়ামুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৮. আল-ফিকহল আকবার (ইমাম আবু হানীফা রচিত): বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

১. মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন, জামান সুপার মার্কেট (ত্রি তলা), বি. বি. রোড (গোস্ট অফিসের মোড়). ফিনাইন্ড-৭৩০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪।
২. আলহাজ্জ মাওলানা মো. ইন্দ্রিস আলী, মুহতামিম, আমিরাতুল কুরআনিল কারীম, দারুল শারীয়াহ ধানকান্দে ফুরফুরা, পাকশী, ইখরদী, পাবনা।
মোবাইল নং ০১৭১৭১৫৩৯২৩।
৩. মাওলানা আ. স. ম. শোরাইব আহমদ, পেশ ইমাম ও খতীব, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-৭০০৩। ফোন ৬২২০১-এক্স: ২৪৩১; মোবাইল, ০১৯৩৯১৮৩২৮।
৪. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কৃত্তব্যালা, ২/২ দারুস সালাম,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ফোন নং ০২-১০০৯৭৩৮

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি, উৎস ও শুরুত্ব

১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: ‘ঈমান’ ও ‘আকীদা’। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সর্বদা ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ‘আকীদা’ বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের যুগে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে ‘ধর্ম-বিশ্বাস’ বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সহজ, সরল, যৌক্তিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা জানি যে, ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য বিষয়াদির উপর। স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, ফিরিশতা, সৃষ্টিজগতের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণে ও বিচারে স্রষ্টার কর্ম, পরকালীন জীবন, ইত্যাদি সবই মূলত অদৃশ্য বিষয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক এগুলির বাস্তবতা ও সাম্ভবতা অনুভব ও স্বীকার করে। কিন্তু এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। মানুষ বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু তাঁর সন্তার প্রকৃতি, পরিধি, গুণাবলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিতর্ক করা সম্ভব, তবে কোনো সুনির্ধারিত ঐকমত্যে পৌছানো যায় না। এজন্যই মূলত বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর উপরে নির্ভর করতে হয়।

ইসলামের বিশ্বাস বিষয়ক নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি ছিল যে, কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখে এ বিষয়ে যা কিছু তাঁরা শুনেছেন বা জেনেছেন, সেগুলিকে বিনা বাক্যে ও নির্দিষ্ট বিশ্বাস করেছেন। এগুলির বিষয়ে অকারণ যুক্তিতর্কের আরোপ করেন নি।

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন। এ সকল মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে এবং তাদের সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত

করেন। এদের বিতর্কের বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের ঝুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য ‘ঈমান’ ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে ‘আল-ফিকহুল আকবার’, ‘ইলমুত তাওহীদ’, ‘আস-সুন্নাহ’, ‘আশ-শরীয়াহ’, ‘আল-আকীদাহ’ ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে ‘আকীদাহ’ পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে প্রচলিত হলেও সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, ৪৬ হিজরী শতাব্দীর পূর্বে এ পরিভাষাটির তেমন কোনো প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি ৪৬ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত আরবী অভিধান গ্রন্থগুলিতেও ‘আকীদা’ (عَقْد) শব্দটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আকীদা শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। নিম্নে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা আলোচনা করব:

১. ১. ১. ঈমান ও ইসলাম

আরবী ‘আমান’ শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। আম্ন (أَمْن) অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমান শব্দের অভিধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪৬ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: “হাম্যা, মীয় ও নূন: এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি: প্রথম অর্থ: বিশ্বস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।”^১

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।^২

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বিশ্বাস অর্থে কুরআন ও হাদীসে সর্বদা ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ‘বিশ্বাস করল’ অর্থে ‘আ-মানা, আমানু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, ‘বিশ্বাস কর’ অর্থে তু’মিনু, নু’মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, আদেশ অর্থে ‘আ-মিন, আ-মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী অর্থে মুমিন, মুমিনুন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

^১ ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি), মু’জায় মাকায়সিল লুগাহ ১/১৩৩।

^২ প্রাঞ্জলি ১/১৩২-১৩৩।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ

“আর যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রদত্ত হয়েছে তারা বলল...”^৩
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে
এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”^৪

অন্যত্র বলা হয়েছে:

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ أَمْنُوا بِرِبِّكُمْ فَأَمَّا

“হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের
দিকে আহ্বান করতে শুনেছি: ‘তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন
কর’; সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।”^৫

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَإِذَا تُلِيهِمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادُوهُمْ إِيمَانًا

“যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের
ঈমান বৃদ্ধি করে।”^৬

আব্দু কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে ইবনু আরবাস (রা) বলেন,
أَمْرُهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَنذِرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে ‘একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানের’ নির্দেশ
প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জান যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান
কী? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিকতর অবগত আছেন। তিনি
বলেন (একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এই যে,) তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে,
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবৃদ (ইবাদত যোগ্য বা উপাস্য) কেউ নেই এবং
মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রাসূল...”^৭

^৩ সূরা (৩০) কুরুম : ৫৬ আয়াত।

^৪ সূরা (৫) মায়দাঃ ৫ আয়াত।

^৫ সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৯৩ আয়াত।

^৬ সূরা (৮) আনফাল: ২ আয়াত।

^৭ বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯, ৪৫, ৪/১৫৮৮, ৬/২৬৫২, ২৭৪৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৭।

হাদীস শরীফে সর্বদা ‘বিশ্বাস’ বা ধর্মবিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ (جِبْرِيلُ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْعِدْلِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنُ بِالقدرِ كُلِّهِ。 قَالَ: مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْدِيَ الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

“একদিন নবী (ﷺ) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি (জিবরাইল আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন: (ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর পুস্তকসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে। তিনি প্রশ্ন করেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক বানাবে না, সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাদানের সিয়াম পালন করবে।”^৮

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমান ও ইসলামের উভয়ের পরিচিত প্রদান করেছেন। ইসলাম শব্দটি আরবী ‘সালাম’ (سلم) শব্দ থেকে গ়হীত। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পন ইত্যাদি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। আভিধানিক ভাবে ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আমরা ঈমান আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وَالإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيقُ، وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ جَهَةِ الْمُؤْمِنِ بِهِ، وَيُزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جَهَةِ الْيَقِينِ وَالتَّصْدِيقِ。 وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوْنُونَ فِي الإِيمَانِ وَالْتَّوْحِيدِ مُنْقَاضِلُونَ بِالْأَعْمَالِ。 وَالإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِنْقِيادُ لِأَوْمَرِ اللَّهِ تَعَالَى。 فَمِنْ طَرِيقِ اللِّغَةِ فَرْقٌ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ。 وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ، وَلَا يَوْجِدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيمَانٍ، وَهُمَا كَالظَّهَرِ مَعَ الْبَطْنِ، وَالْدِينُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالشَّرَاعِنَ كُلَّهِ

“ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও

^৮ বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৮/১৭৩০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯, ৪০, ৪৭।

পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসম্পর্ণ করা এবং অনুগত হওয়া। আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায়। ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা হয়।”^৯

বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের আলোচনায় আমরা দেখব যে, ঈমান ও আমলের পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ছিল বিভক্তির কারণগুলির অন্যতম। খারিজীগণ ও তাদের সময়না ফিরকাগুলি আমল বা ইসলামের বিধান মত কর্ম করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেছে। ফলে বিধান পালনের বিচুতি তাদের মতে ঈমানের বিচুতি বা কুফর বলে গণ্য। অপরদিকে মুরজিয়াগণ ঈমানকে আল্লাহর নির্দেশ পালন বা ইসলামের বিধিবিধান পালন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। তাদের মতে কোনোরূপ ইসলাম পালন ছাড়াই ঈমানের চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌছানো সম্ভব। তারা পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য করেছে। উভয় মতের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, পাপী মুমিন কাফির নন, আবার ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেন নি। তবে এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাতের ঈমানগণের পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি মত রয়েছে।

(১) ঈমান আবৃ হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য কোনো কোনো ঈমানের মতে আমল বা বিধান পালন ঈমানের অংশ নয়, বরং ঈমানের দাবি ও সম্পূরক। তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। তাদের মতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বীকৃতি বেশি কর হয় না বা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক দিয়ে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

(২) অন্য তিনি ঈমান ও মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ, তবে মনের বিশ্বাস বা মুখের স্বীকৃতির মত অংশ নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ। এজন্য তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রয়াণিত হয় না, তবে দুর্বলতা ও ক্ষমতি প্রয়াণিত হয়। তাঁর বলেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম। এদের মতে

^৯ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৪১-১৫০।

কর্মের কারণে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

এ দু মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতের অনুসারিগণই একমত যে,

(১) ঈমান ও আমল দুটিই আল্লাহর নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন করতে হবে। ঈমান বিহীন ইসলাম বা ইসলাম বিহীন ঈমান অকল্পনীয়।

(২) কর্মের ফলের কারণে বা কবীরা গোনাহের কারণে বান্দা কাফির হয় না, তবে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে।

১. ১. ২. আল-ফিকহল আকবার

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন ‘আল-ফিকহল আকবার’। সম্ভবত ‘আকীদা’ বুঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা।

‘ফিকহ’ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ‘ফিকহ’ বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিশ্বাসের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের শুরুত্ব বুঝাতেই সম্ভবত তিনি এ বিষয়ক জ্ঞানকে ‘আকবার’ বা ‘শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান’ বা ‘মহোন্নত জ্ঞান’ বলে অভিহিত করেন।

১. ১. ৩. ইলমুত তাওহীদ

ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে অনেক সময় ‘তাওহীদ’ বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে ‘ইলমুত তাওহীদ’ বা তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) আল-ফিকহল আকবার গ্রন্থে ‘ইলমুল আকীদা’-কে ‘ইলমুত তাওহীদ’ নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বই ইসলামী ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ইলমুল আকীদা বুঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে। এ নামে আকীদা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদিস আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু খুয়াইমা (৩১১ হি) রচিত ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাব হাঘানী (৭৯৫ হি) রচিত ‘কিতাবুত তাওহীদ’।

১. ১. ৪. আস-সুন্নাহ

তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ

বুঝাতে ‘আস-সুন্নাহ’ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

‘সুন্নাহ’ বা ‘সুন্নাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি।^{১০} ইসলামী শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।^{১১} সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে। বিদ্রু পাঠককে গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলমান। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে ঢলে যেতেন। এদের বিভিন্ন প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলিম ‘আস-সুন্নাহ’ নামে ‘আকীদা’ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাস্বাল (২৪১ হি)। তিনি ‘আস-সুন্নাহ’ নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। একই নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর প্রসাদ্ধি ছাত্র ইমাম আবু বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হানি আল-আসরাম (২৭৩হি), ইমাম আবু আলী হাস্বাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাস্বাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি), ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস-আস আস-সিজিসতানী (২৭৫ হি), ইমাম আবু বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহহাক আশ-শাইবানী (২৮৭ হি), ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাস্বাল (২৯০ হি), ইমাম আবু বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারান আল-বাগদাদী আল-খাল্লাল (৩১১ হি), ইমাম আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১১ হি), ইমাম তাবারানী আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), ইমাম আবুশ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাফার ইবনু হাইয়ান আল-আসপাহানী (৩৬৯ হি), ইমাম ইবনু শাহীন আবু হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু উসমান আল-

^{১০} ইবনু যানযুর, লিসানুল আরব ১৩/২২৪-২২৫।

^{১১} সুন্নাতের ব্যবহারিক অর্থ দখন: আলউদ্দীন বুখারী, কাশফুল আসরার আলা উস্লিল বাযদাবী ২/৬৫৩, মুদ্রা আলী কারী, শরাহ শারহি নুখবাতিল ফিকর, পঃ: ১৫৩-১৫৬।

বাগদাদী (৩৮৫হি), ইমাম আবৃ আবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্দাহ আল-ইসপাহানী (৩৯৫ হি) ও আরো অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদিস ও ফকীহ।

১. ১. ৫. আশ-শারী'আহ

'শারীয়াত' বা 'শারী'আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শারী'আহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ "ধর্ম বিশ্বাস" বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ।^{১২} তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম "আশ-শারী'আহ'" নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন ইমাম আবৃ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুরী (৩৬০ হি) রচিত "আশ-শারী'আহ'" গ্রন্থ।

১. ১. ৬. উস্লুল্দীন বা উস্লুল্দিয়ানাহ

উস্লুল্দীন (أصول الدين) বা উস্লুল্দীয়ানাহ (أصول الدين) অর্থ দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলিম 'ইমান' বা আকীদা বুঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনু ইসমাঈল আল-আশ'আরী (৩২৪ হি)। 'আল-ইবানাতু 'আন উস্লুল্দিয়ানাহ' নামে এ বিষয়ক তাঁর গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ।

১. ১. ৭. আকীদা

ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা 'আকীদা'। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ তত প্রসিদ্ধ নয়। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

আকীদা ও ই'তিকাদ শব্দদ্বয় আরবী 'আক্দ' (عَهْد) ধাতু থেকে গৃহীত। এর অর্থ বস্তু করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন: "আইন, কাফ ও দাল: ধাতুটির মূল অর্থ একটিই: দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বস্তু, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত।"^{১৩}

'ধর্মবিশ্বাস' বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে 'আকীদা' ও 'ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে বা তাঁর পূর্বের যুগে আরবী ভাষায়

^{১২} আল-ফাইউমী, আল-মিসবাহুল মুনীর ১/৩১০; মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ১৬-১৭

^{১৩} ইবনু ফারিস, মু'জায় মাকায়িসিল লুগাহ ৪/৮৬।

‘বিশ্বাস’ অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে ‘আকীদা’ শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। তবে ‘দৃঢ় হওয়া’ বা ‘জমাট হওয়া’ অর্থে ‘ইতিকাদ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া অন্তরের বিশ্বাস অর্থেও ‘ইতিকাদ’ শব্দটির প্রচলন ছিল। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৩ ই) বলেন:

اعتقد ضيعة و مالا، أي افتتها، واعتقد الشيء: صلب واشد، واعتقد كذا
بقلبه، وليس له معقود، أي عقد رأي.

“সম্পত্তি বা সম্পদ ‘ইতিকাদ’ করেছে, অর্থাৎ তা অর্জন করেছে বা সম্পত্তি করেছে। কোনো কিছু ‘ইতিকাদ’ হয়েছে অর্থ তা শক্ত, কঠিন বা জমাটবন্ধ হয়েছে। অন্তর দিয়ে অযুক বিষয় ইতিকাদ করেছে। তার কোনো মা’কুদ নেই, অর্থাৎ তার মতামতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা নেই।”^{১৪}

কুরআন-হাদীসে কোথাও আকীদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। ‘ইতিকাদ’ শব্দটি দু একটি হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে ‘বিশ্বাস’ অর্থে নয়, বরং সম্পদ, পতাকা ইত্যাদি দ্রব্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, বঙ্গন করা বা গ্রহণ করা অর্থে। যেমন এক হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন,

لَفِيتْ عَمَّىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ اعْتَقَدَ رَأْيَةً

“আমার চাচার সাথে আমার যখন সাক্ষাত হলো তখন তিনি (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে) একটি ঝাঙ্গা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।”^{১৫}

দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইয়াম ও আলিমের কথায় ‘ইতিকাদ’ বা ‘আকীদা’ শব্দ সুদৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়।^{১৬} পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ‘আকীদা’ শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লিখিত প্রাচীন আরবী অভিধানগুলিতে ‘আকীদা’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখতে পাই নি। ‘আক্দ’ ধাতু থেকে গৃহীত আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনেক বিশেষ্য শব্দ এ সকল অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ‘ইক্দ’ (عَكْد), ‘উকদাহ’ (عَكْدَاه), ‘উকাইদাহ’ (عَكِيدَاه), ‘আকীদ’ (عَكِيدَة) ইত্যাদি। কিন্তু ‘আকীদাহ’ শব্দটি এ সকল অভিধানে দেখতে পাই নি।

^{১৪} আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ (৩৯৩ই.), আস সিহাহ ২/৫১০; ইবনু মানয়ুর, মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররম (৭১১ ই.) লিসানুর আরব ৩/২৯৯।

^{১৫} ইবনুল জারদ, আল-মুনতাকা ১/১৭১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/১৬২। আরো দেখুন: ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/৪৮৭; হাইসমী, যাজ্যাউয় যাওয়াইদ ৭/৯০।

^{১৬} ইয়াম আবু হানীফা, নু’মান ইবনু সাবিত (১৫০ই.), আল-ফিকহল আকবার (মুদ্রা আলী কারীর শারহ-সহ), পৃ. ১৮; ইয়াম তাহাবী, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ই.), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়াহ (মুহাম্মাদ আল-খামীসের শারহ-সহ) পৃ. ৯।

ইবনু দুরাইদের (৩৩১ হি) জামহারাতুল লুগাহ, জাওহারীর (৩৯৩হি) আস-সিহাহ, ইবনু ফারিসের (৩৯৫হি) মু'জামু মাকাসিল লুগাহ, ইবনু মানয়ুরের (৭১১ হি) লিসানুল আরব ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে 'আকীদাহ' শব্দটির উল্লেখ পাই নি। পরবর্তী সময়ের অভিধানবিদগণ এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ অভিধানবেঙ্গ আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাইউমী (৭৭০হি) তাঁর আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে লিখেছেন:

العقيدة ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة: سالمة من الشك

‘মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে ‘আকীদা’ বলা হয়। বলা হয় ‘তার ভাল আকীদা আছে’, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।’^{১৭}

আধুনিক ভাষাবিদ ড. ইবরাহীম আনীস ও তাঁর সঙ্গিগণ সম্পাদিত ‘আল-মু'জামুল ওয়াসীত’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: “

العقيدة: الحكم الذي لا يُقبلُ الشكُّ فيه لدى معتقده، و(في الدين) ما يقصد به

الاعتقاد دون العمل

“আকীদা অর্থ এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুসারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না ধর্মীয় বিশ্বাস যা কর্ম থেকে পৃথক...”^{১৮}

১. ১. ৮. ইলমুল কালাম

ইসলামী আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় ‘ইলমুল কালাম’ (علم الكلام) বলা হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয়।

‘আল-কালাম’ শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (كَلَامَ اللَّهِ) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উত্তর। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে যতটুকু বুঝা যায় গ্রীক লগস (logos) শব্দ থেকে ‘কালাম’ শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস (logos) শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি। এ লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা। সম্ভবত মূল গ্রীক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরবী পণ্ডিতগণ লজিক অর্থ ইলমুল কালাম বা ‘কথা-শাস্ত্র’ বলেছিলেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে ‘ইলমুল মানতিক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও ‘কথা-শাস্ত্র’।

^{১৭} ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর ২/৪২১।

^{১৮} ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গিগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত ২/৬১৪।

সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, scholastic theology) বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অভিভাবক বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তারা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌছাতে পারে না। কারণ আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অভিভুত সম্পর্কে অনুভব করতে পারে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অঙ্গের হাতি দেখার মতই হয়েছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্যাহর মধ্যে ত্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সাহাবীগণের অনুসারী মূলধারার তাবিয়াগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ ইমান বা আকীদার বিষয়ে বা গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপচন্দ করতেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ। প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম সহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।^{১৯} যেমন ইমাম আবু ইউসূফ রাহ. (১৮৯ হি) তাঁর ছাত্র ইলমুল কালামের পত্তি ও মু'তাফিলী আলিম বিশ্র আল-মারীসীকে বলেন:

العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا
في الكلام قبل: زنديق.

“কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যীনদীক বা অবিশাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে।”^{২০}

^{১৯} আবু হায়িদ গায়লী, ইহহীয়াউ উল্মুমদীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবনু আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০।

^{২০} ইবনু আবিল ইয়্য হানাফী, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭৫

ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) আরো বলেন:

من طلب العلم بالكلام تزندق

“যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিন্দীক পরিণত হবে।”^{২১}

ইমাম শাফিয়ী রাহ. (২০৪ হি) বলেন,

حکمی فی أهل الکلام أَن يضرِّبُوا بالجريدة والنعل ويطاف بهم في العشائر
والقبائل ويقال: هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.

“যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আগ্রাহ বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্যায় মহল্যায় ও কবীলাসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে: যারা কিতাব ও সুন্নাত ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি।”^{২২}

৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে আহলুস সুন্নাতের কোনোকোনো আলিম ইসলামী আকীদা বা আলহস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যাবহার করেছেন এবং আকীদা শাস্তিকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করেছেন। বিভাগ ফিরকাসমূহের বিভাগিত উন্নত প্রদানের একান্ত প্রয়োজনেই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।^{২৩}

১. ২. ইসলামী আকীদার উৎস

১. ২. ১. বিশ্বাস বনায় জ্ঞান

বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তি হলো জ্ঞান। কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তাকে জানতে হবে। বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাসই যেহেতু দুনিয়া ও আবিরাতে মানবীয় সফলতার মূল চাবিকাঠি সেহেতু ঈমান বিষক জ্ঞান অর্জন করাই মানব জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যর্তীত কোনো মারুদ বা উপাস্য নেই।”^{২৪}

^{২১} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহবীয়্যাহ, পৃ. ৭৫

^{২২} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহবীয়্যাহ, পৃ. ৭৫

^{২৩} আবু হায়িদ গায়ালী, ইহইয়াউ উল্মিনীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহবীয়্যাহ, পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০।

^{২৪} সূরা (৪৭) মুহম্মদ: ৯ আয়াত।

বিশুদ্ধ ঈমান বিষয়ক সঠিক জ্ঞানই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ঈমান-আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর পুস্তকটির নামকরণ করেন ‘আল-ফিকহুল আকবার’, অর্থাৎ “সর্বোত্তম বা মহোত্তম ফিকহ”।

১. ২. ২. ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী

মানবীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। লোকাচার, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, দর্শন, ল্যাবরেটরির গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। এখন প্রশ্ন হলো, ঈমান, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কী?

আমরা জানি যে, ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ। সকল যুগের মানব সমাজের ইতিহাস ও সভ্যতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকল যুগে সকল দেশে সকল জাতির ও সমাজের প্রায় সকল মানুষই এ বিশ্বাস করেছেন বা করেন যে, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান বিশ্বের শতশত কোটি মানুষের মধ্যেও অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষের সঙ্কান পাওয়া যাবে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন না। এর মূলত দুটো কারণ রয়েছে:

প্রথমত: স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্মগত ও প্রাক্তিক অনুভূতি। আত্মপ্রেম, পিতামাতা বা সত্তানের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদির মত স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের অস্থিমজ্জার সাথে মিশে আছে। মহান স্রষ্টা এই বিশ্বাসের অনুভূতি দিয়েই প্রতিটি মানব আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বাস বিকৃত হতে পারে, একে অবদমিত করা যায়, তবে একে একেবারে নির্মূল করা যায় না। তাই যারা নিজেদেকে স্রষ্টায় বিশ্বাসী নন বলে মনে করেন তাঁরাও মূলত মনের গভীরতম শ্রান থেকে বিশ্বাসকে মুছে ফেলতে পারেন নি, যদিও তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন অবিশ্বাস করার।

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও জানার নির্দর্শন ও প্রমাণ রয়েছে। তাই সৃষ্টির রহস্য ও সম্পত্তি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে, স্রষ্টার মহস্তের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ততই গভীর হচ্ছে। সৃষ্টির রহস্য, জটিলতা, মানবদেহ, জীবজগত, এই নক্ষত্র ইত্যাদি বিশাল সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব নিয়ে যারাই গবেষণা বা চিন্তাভাবনা করেছেন বা করছেন, তারাই স্রষ্টার মহস্তের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হচ্ছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সকল দেশের সকল মানুষ যখন স্রষ্টার বিশ্বাসে একমত, তাহলে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এত মতবিরোধ কেন?

এর কারণ, স্রষ্টার অস্তিত্বে মূলত মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হয়েছে স্রষ্টার প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব, তাঁকে ডাকার বা তাঁর উপাসনা করার নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে। প্রত্যেক মানুষই নিজের জন্মগত অনুভূতি দিয়ে এবং সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তবে কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর প্রতি মনের আকৃতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাহায্য, করণ বা সম্ভৃষ্টি অর্জন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় মানুষ যুক্তি, বিবেক বা গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে যখনই মানুষ নিজের ধারণা বা কঙ্গনার অনুসরণ করে, তখনই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তিতে নিপত্তি হয়।

এ জন্য মহান স্রষ্টা করণাময় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বৃদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সকল বিষয় সঠিক ও চূড়ান্ত সত্যে পৌছাতে সক্ষম হয় না সে সকল বিষয় তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশের (divine revelation/inspiration) মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।

কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী রসূলদের উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত-আরাধনা করতে হবে, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কিরণ হবে, মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হবে ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন। এ বিষয়গুলিই ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি।

- এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী (revelation)। এজন্য কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণা বা নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা, মতামত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির উপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন,

أَتَبْعَوْمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِنَاءِ

“তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবর্তীণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে অনুসরণ করো না।”^{২৫}

ওইর বিপরীতে ওহীকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানুষদের যুক্তি ও প্রমাণ ছিল সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ। এই প্রবণতাকে বিভিন্ন মানব সমাজের বিভিন্নির মূল কারণ হিসেবে কুরআন কারীমে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে যখন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সঠিক বিশ্বাস বা ইসলাম প্রচার করেন, তখন সেই জাতির অবিশাসীরা নবী-রাসূলদের আহবান এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তাদের প্রচারিত বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী, তারা যুগ যুগ ধরে যা জেনে আসছেন মেনে আসছেন তার বিরোধী। নৃহ (আ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন তার উম্যাতকে ইসলামের পথে আহবান করলেন তখন তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا الْأُولَئِينَ

“আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি।”^{২৬}

মূসা (আ) যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহবান করেন তখন তারাও একই যুক্তিতে তার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে বলে:

وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا الْأُولَئِينَ

“আমাদের পূর্ব পুরুষদের কালে কখনো আমরা এরূপ কথা শুনি নি।”^{২৭} সকল যুগে অবিশাসীরা এ যুক্তিতেই ওহী প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ বলেন:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْنَيْةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا
وَجَدْنَا أَبَائِنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثْارِهِمْ مُقْتَنِونَ

“এবং এভাবে আপনার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সে জনপদের সমৃদ্ধশালী (নেতৃপর্যায়ের)

^{২৫} সূরা (৭) আ'রাফ: ৩ আয়াত।

^{২৬} সূরা (২৩) মুমিনুন: ২৪ আয়াত।

^{২৭} সূরা (২৮) কাসাস: ৩৬ আয়াত।

লোকেরা বলত, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি’।”^{২৮}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা এই একই যুক্তিতে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার তাদের এই যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।^{২৯}

বস্তুত, তারা যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচারিত বিশ্বাস ও কর্ম ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তারা দাবি করতেন যে, ইবরাহীম (আ), ইসমাইল (আ) ও অন্যান্য নবী ও নেককার মানুষদের থেকে পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে পাওয়া তাদের বিশ্বাসই সঠিক। তাদের মতের বিরুদ্ধে ওহীর মতকে গ্রহণ করতে তারা রাজি ছিলেন না। আবার তাদের বিশ্বাসকে কোনো ওহীর সূত্র দ্বারা প্রমাণ করতেও রাজি ছিলেন না। বরং তাদের বিশ্বাস বা কর্ম ‘পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে নবী-রাসূল বা নেককার মানুষদের থেকে প্রাপ্ত’ একথাটিই ছিল তাদের চূড়ান্ত দলিল ও যুক্তি। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشَدُهُمْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَا هُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ
هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا
وَجَدْنَا أَبَا عَنَّا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ أَنَّارِهِمْ مُهَتَّدُونَ

‘তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিরিশতাগণকে নারী বলে গণ্য করেছে; তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উকি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা বলে, ‘দয়াময় আল্লাহ ইস্ত্বা করলে আমরা এদের পূজা-উপাসনা করতাম না।’ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো কেবল আন্দায়-অনুমান করে মিথ্যা বলছে। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? বরং তারা বলে, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুপরিপ্রাপ্ত হব।’^{৩০}

এখানে মক্কার মানুষদের দুটি বিশ্বাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত ফিরিশতাগণকে নারী বলে বিশ্বাস করা এবং দ্বিতীয়ত তাকদীরের

^{২৮} সূরা (৪৩) যুখরুফ: ২৩ আয়াত।

^{২৯} দেখুন, সূরা (৩১) লুকমান: ২১; সূরা (২৩) মুমিনুন: ৬৮; সূরা (৪৩) যুখরুফ: ২২ আয়াত।

^{৩০} সূরা (৪৩) যুখরুফ: ১৯-২২ আয়াত।

বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাস বিকৃত করে নিজেদের কর্মকে আল্লাহর পছন্দনীয় বলে দাবি করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হয় না; কাজেই আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা ফিরিশতাদের পূজা করতাম না। অথবা আল্লাহর পবিত্র নগরীতে পবিত্র ঘরের মধ্যে আমরা ফিরিশতাদের উপাসনা করে থাকি। এ কর্ম যদি আল্লাহর পছন্দনীয় না হতো তবে তিনি অবশ্যই আমাদের শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি যেহেতু আমাদেরকে শাস্তি দেন নি, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, এ কর্মে তিনি সম্পর্ক রয়েছেন।

তাদের এ বিশ্বাসের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। দেখে, প্রত্যক্ষ করে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। একমাত্র ওহী ছাড়া এ বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় তা আনন্দায়, মিথ্যা বা ওহীর বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। আর মক্কার মানুষদের এই বিশ্বাস দুটি প্রমাণের জন্য তারা পূর্বের কোনো আসমানী কিতাব বা ওহীর প্রমাণ দিতে অক্ষম ছিল। কারণ তাদের নিকট এরূপ কোনো গ্রন্থ ছিল না। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল দ্঵িবিধ: প্রথমত, ওহীর জ্ঞানের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ত, পূর্বপুরুষদের দোহাই দেওয়া।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তারা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কোনো ওহীর বাণী এক্ষেত্রে পেশ করতে পারে না; বরং আনন্দায়ে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

দ্বিতীয় বিষয়টি কুরআনে বিভিন্ন ভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। প্রথমত, পূর্বপুরুষদের অনেকেই সত্যিই নেককার ছিলেন বা নবী-রাসূল ছিলেন। তবে তাদের নামে যা প্রচলিত তা সঠিক কিনা তা যাচাই করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের দোহাই না দিয়ে সুস্পষ্ট ওহীর নির্দেশনা মত চলতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে ইবরাহীম (আ), ইসমাইল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

تَلْكَ أُمَّةٌ فَدَّ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا سُنَّاً لَوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“সে সকল মানুষ অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করা তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।”^{৩১}

অন্যান্য স্থানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত ছিলেন। কাজেই ওহীর বিপরীতে এদের

^{৩১} সূরা (২) বাকারা: ১৩৪ ও ১৪১ আয়াত।

দোহাই দেওয়া বিভাস্তি বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْتَنَا عَلَيْهِ أَبَا عَنَا أَوْ كَانَ
كَانَ أَبَاوْهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

‘যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবর্তীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, ‘না, না, বরং আমরা আমাদের পিতা-পিতামহাদেরকে যে কর্ম ও বিশ্বাসের উপরে পেয়েছি তারই অনুসরণ করে চলব। এমনকি তাদের পিতা-পিতামহগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তার সংপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?’^{১২}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন যে, পূর্বপুরুষগণ কেমন ছিলেন সে কথা নিয়ে বিতর্ক না করে মূল বিশ্বাস বা কর্ম নিয়ে চিন্তা কর। যদি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাণ ও হীর জ্ঞান প্রচলিত বিশ্বাস বা কর্মের চেয়ে উত্তম হয় তবে পিতৃপুরুষদের দোহায় দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করো না। মহান আল্লাহ বলেন:

قَالَ أَوْلُو جِنْنَتٍ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالُوا إِنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ

كَافِرُونَ

“(সে নবী) বলেন, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে পথে পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?” তারা বলে, ‘তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি’।”^{১৩}

ওহীর বিপরীতে অবিশ্বাসীদের একুপ বিশ্বাসকে ‘ধারণা’ ‘কল্পনা’ বা ‘আন্দায়’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبْأَوْنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ
شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هُنْ عِنْدُكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبَعُونَ إِلَّا الضَّلَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

‘যারা শিরক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না।’ এভাবে তাদের পূর্ববর্তিগণও অবিশ্বাস করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলুন, তোমাদের নিকট কোনো ‘ইলম’ (জ্ঞান)

^{১২} সূরা (২) বাকারা: ১৭০ আয়াত।

^{১৩} সূরা (৪৩) যুখরুফ: ২৪ আয়াত।

আছে কি? থাকলে আমাদের নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান নির্ভর মিথ্যা কথাই বল।”^{৭৪}

এখানেও তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাসকে বিকৃত করে তারা যা বলেছে তাকে ‘আন্দায়’, ‘ধারণা’ বা ‘কল্পনা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে তাদের নিকট তাদের বিশ্বাসের ও দাবির স্বপক্ষে ‘ইলম’ বা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ওইর বক্তব্য দাবি করা হয়েছে।

অন্য স্থানে বলা হয়েছে:

وَإِنْ تُطْعِنُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا
الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে; তারা কেবলমাত্র ধারণার অনুসরণ করে চলে এবং তার শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে।”^{৭৫}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا طَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“অধিকাংশ মানুষই কেবলমাত্র ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করে চলে। বস্তুত সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না।”^{৭৬}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمِّئُنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأَنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“যারা আবিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফিরিশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান (ইলম) নেই; তারা কেবল ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে; আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণা-অনুমানের কোনো মূল্য নেই।”^{৭৭}

এছাড়া একুশ বিশ্বাসকে ‘প্রবৃত্তির অনুসরণ’ বা নিজের মন-মর্জি বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ‘আমার কাছে পছন্দ কাজেই আমি এই মত গ্রহণ করলাম এবং আমার কাছে

^{৭৪} সূরা (৬) আন্আম: ১৪৮ আয়াত।

^{৭৫} সূরা (৬) আনআম : ১১৬ আয়াত।

^{৭৬} সূরা (১০) ইউনুস: ৬৬ আয়াত।

^{৭৭} সূরা (৫৩) নাজর: ২৭-২৮ আয়াত।

পছন্দ নয় কাজেই আমি এই মত প্রহণ করলাম না। আমার পছন্দ বা অপছন্দ আমি ‘ওহী’ দ্বারা প্রমাণ করতে বাধ্য নই।

নিঃসন্দেহে, গাইব বা অদ্যশ্য জগত সম্পর্কে ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় সবই ধারণা, অনুমান, আন্দায় বা কল্পনা হতে বাধ্য। আর সুস্পষ্ট দ্যুর্ঘটন বিবেক ও যুক্তিগ্রহ্য ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে এরূপ আন্দায় বা ধারণাকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে প্রহণ করা বা পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে ওহী অঙ্গীকার বা প্রত্যাখ্যান করা নিজের মর্জি বা ‘প্রবৃত্তি’ অনুসরণ বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ أَصْلَلَ مِنْ أَنْبَعَ هَوَاءً بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথনির্দেশনা ছাড়া নিজের ইচ্ছা বা মতামতের অনুসরণ করে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কেউ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।”^{৩৮}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন:

إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَى الظُّنُونِ وَمَا تَهْوِي الْأَنْفُسُ

“তারা তো শুধুমাত্র অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।”^{৩৯}
কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।^{৪০}

১. ২. ৩. তথ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও জ্ঞানের প্রকারভেদ

বন্ধুত্ব আমরা একথা বলতে পারি না অমুক কর্ম সবাই করছে বা আমাদের সমাজে যুগ ধরে চালু আছে, কাজেই তা ঠিক এবং আমরা তা করব। কারণ কোনো কর্ম বা বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকা বা পিতা পিতামহদের যুগ থেকে অর্চিত হওয়া তার সঠিক হওয়ার বা নির্ভুল হওয়ার প্রমাণ নয়। সমাজের প্রচলিত কর্ম বা বিশ্বাস ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। সঠিক বা ভুল প্রমাণিত হবে জ্ঞানের মাধ্যমে।

যেমন মনে করুন কোনো সমাজে প্রচলিত আছে যে কারো জ্বর হলে অমুক গাছের রস বা ফল খেলে সুস্থ হয়ে যাবে। সেখানে এ কথাও প্রচলিত যে অমুক কর্ম করলে আল্লাহ তাকে পুরক্ষার বা বরকত দান করবেন বা সে মৃত্যুর পরে শান্তি পাবে।

সমাজে প্রচলিত থাকা এই ধারণা দুইটির সঠিকত্বের প্রমাণ নয়। এগুলো

^{৩৮} সূরা (২৮) কাসাস: ৫০ আয়াত।

^{৩৯} সূরা (৫৩) নাজর: ২৩ আয়াত।

^{৪০} সূরা (৩০) রূম ২৯; সূরা আ'রাফ ১৭৬; সূরা কাহাফ ২৮; সূরা তাহা ৪৭ আয়াত।

ঠিক না ভুল তা জানতে হলে আমাদের জ্ঞানের সম্ভাবন করতে হবে। আমাদের জ্ঞান দু প্রকারের: প্রথমত, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি বা অভিজ্ঞতালক্ষ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীলক্ষ জ্ঞান।

প্রথম ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি গাছের রস বা ফল খেলে জুর সেরে যাবে এই বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমাদের ল্যাবরেটরীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এভাবে আমরা জানতে পারব যে, উপরোক্ত ধারণাটি সঠিক অথবা সঠিক নয়।

দ্বিতীয় ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি কর্মে আল্লাহ খুশি হবেন বা বরকত দান করবেন বা তাতে মুত্তুর পরে শাস্তি পাওয়া যাবে, এই বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে ওহীলক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে; কারণ এই বিষয়টি আমাদের মানবীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি। এজন্য আমরা এক্ষেত্রে দেখব আল্লাহ বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিনা।

এ জন্য আমরা দেখি যে, বিভিন্ন যুগে ও জাতিতে যখন কাফিররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও বিশ্বাসকে সঠিক বলে দাবি করেছে, তখন তিনি তাদেরকে ওহীর জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন এবং ঈমানের ব্যাপারে ওহীর উপর নির্ভর না করার নিম্না করেছেন^{৪১}

মুকার কাফিরদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তারা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করলো এবং তাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার আচরণকে সঠিক বলে দাবি করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের পক্ষে অহীলক্ষ জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করার আহ্বান জানান। আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَيْتُمْ شُرْكَأَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَبِنَاهُمْ كَتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بِلْ إِنْ
يَعْدُ الطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غَرُورٌ

“বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের

^{৪১} দেখুন সূরা বাকারা: ১১১; আল ইমরান: ১৫১; আনআম: ৮১; আরাফ ৩৩, ৭১; ইউনুস: ৬৮; ইউসুফ: ৪০; কাহাক: ১; হাজ্জ: ৭১; আমিয়া: ২৪; নামল ৬৪; রূম: ৩৫; মুমিন (গাফির) ৩৫; নাজর: ২৩ আয়াত।

কোনো অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রূতি দিয়ে থাকে।^{৪২}

এখানে কুরআন কারীমের প্রমাণপেশের পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। এরপর তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা বলা হয়েছে।

সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে। এখন পশ্চ হলো, ঈসা (আ), উয়াইর (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাইল (আ), অন্যান্য নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে ঘৌষ্ঠিকতা বা দলীল কি? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুশরিকগণ একবাকে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান আল্লাহই যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। তাদের এ বিবেক ও যুক্তিবিরুদ্ধ কর্মের পক্ষে তারা দাবি করত যে, যাদেরকে তারা ইবাদত করে বা বিপদে আপদে যাদেরকে ডাকে তারা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব বা আল্লাহর ‘স্তান’, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তাদের এ দাবি আংশিক সত্য ছিল। আমরা দেখেছি যে, এদের অনেকেই মূলত নবী, ফিরিশতা বা নেককার মানুষ ছিলেন। আর কিছু ছিল কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব। তবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া তো ইবাদত পাওয়ার বা ইলাহ হওয়ার কোনো প্রমাণ নয়। এজন্য মুশরিকগণ এক্ষেত্রে আরো দুটি দাবি করত। প্রথমত তারা দাবি করত যে, এদের ডাকলে বা এদের ইবাদত করলে এরা আল্লাহর নৈকট্য মিলিয়ে দেন।^{৪৩} দ্বিতীয়ত তারা দাবি করত যে, আল্লাহর দরবারে আমাদের

^{৪২} সূরা (৩৫) ফাতির: ৪০ আয়াত।

^{৪৩} সূরা (৩৯) যুমার: ৩ আয়াত।

জন্য সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন।^{৪৪}

তাদের এ সকল যুক্তি সবই ছিল কল্পনা, ধারণা, অনুমান এবং প্রকৃত ওহীর শিক্ষার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি। এজন্য আল্লাহ বারংবার তাদের কাছে 'কিতাব' বা ওহীর সুস্পষ্ট ও দ্যুর্ঘটীন নির্দেশনা দাবি করেছেন। যুক্তি ও বিবেক দাবি করে যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে। তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের ইবাদত করতে হবে, তাহলে তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট তোমাদের আন্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আমরা তার নির্দেশ পালন করতাম। এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি কখনোই দেন নি। কাজেই তোমাদের কর্ম যুক্তি ও বিবেক বিরুদ্ধ এবং ওহীর নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে যুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল।

মঙ্কার কাফিরো ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করত। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল কল্পনা ও সমাজের প্রচলিত কথা। কোনো ওহীলক জ্ঞানের উপর এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না। পবিত্র কুরআনে তাদের এই বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও বিভাসি বর্ণনা করার পরে তাদের কাছে তাদের বিশ্বাসের পক্ষে অহীলক জ্ঞান থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ চেয়ে বলা হয়েছে:

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَلَوْا بِكَاتِبَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“তোমাদের কাছে কি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তাহলে তোমাদের ওহীলক কিতাবটা নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।”^{৪৫}

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বাসের ভিত্তি অবশ্যই ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো জ্ঞানের উপর হতে হবে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ওহী পাঠিয়েছেন,

^{৪৪} সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত।

^{৪৫} সূরা (৩৭) সাফকাত: ১৫৬-১৫৭ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা যুখরুফ: ২১ আয়াত।

এসকল ওহীর কিতাব (Divine Scripture) সবই নষ্ট বা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, যে বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। এক মাত্র সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে পাঠানো ওহীই নির্ভূলভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, যার উপর আমরা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি।

১. ২. ৪. ওহীর প্রকারভেদ: কুরআন ও হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু ভাবে তা সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব ও হিকমাহ বা সন্নাত। এখানে আমরা এই দু প্রকারের ওহীর বিষয়ে আলোচনা করব। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে তাঁর সহচর-সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্বও আমরা আলোচনা করব।

১. ২. ৪. ১. কুরআন মাজীদ

কুরআন কারীম মানব জাতির কাছে প্রেরিত মহান আল্লাহর সর্বশেষ বাণী। এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর তখন থেকে আল্লাহ তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে কুরআন প্রেরণ করতে শুরু করেন। পরবর্তী ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মত কুরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ২৩ বৎসরে তা পরিপূর্ণরূপে অবতারিত হয়। আল্লাহর নিকট থেকে প্রধান ফিরিশতা (Archangel) জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা পরিপূর্ণভাবে মুখস্ত করে নিতেন। এরপর তিনি তার সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিতেন তা মুখস্ত করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য। এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় পৃথক পৃথক কাগজ, চামড়া, হাত্ত ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অসংখ্য সাহাবী তা মুখস্ত করে নেন। তাঁর সময় থেকেই তিনি ও সাহাবীগণ সাধারণ সালাতে এবং বিশেষত রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও খতম করতেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত পঠ করতেন। অনেক সাহাবীই ৩ থেকে ৭ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ একটু বেশি সময় ধরে কমবেশি এক মাসের মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাতে কুরআন খতম করতেন। এছাড়া নিজের কাছে সংরক্ষিত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখে দেখে দিবসে ও রাত্রিতে তা পাঠ করা ছিল সাহাবীগণের প্রিয়তম ইবাদত ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় তৃষ্ণি ও আনন্দের কর্ম।

এভাবে মূলত মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্ত রেখে ও নিয়মিত রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদে) খতমের মাধ্যমেই কুরআনকে অবিকল আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের

পরের বৎসর খলীফা আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে নিখিত পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে সংকলন করান। পরবর্তীকালে খলীফা উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে নতুন মুসলিম প্রজন্মের মানুষদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করণের সুবিধার্থে আবু বাকর (রা) কর্তৃক পুস্তকাকারে সংকলিত কুরআনটির বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন।

এভাবে সকল মুসলিমের প্রাত্যহিক পাঠের প্রিয়তম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন কারীম পরিপূর্ণ ও অবিকৃতভাবে অগণিত মানুষের হাদয়পটে এবং পুস্ত কাকারে সংরক্ষিত হয়। যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতারিত হয়েছে আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনিভাবে অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল যুগেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পরিপূর্ণ মুখস্থ করে রেখেছেন।

এ কুরআনই মানব জাতির পথের দিশারী এবং সকল কল্যাণের উৎস। এতে রয়েছে সকল উপদেশ, শিক্ষা ও সকল আত্মিক ও মানসিক অসুস্থিতার মহৌষধ। কুরআনের বৈশিষ্ট্য কুরআন কেন্দ্রিক ঈমান, আকীদা ও জীবন গঠন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে ‘আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান’ ও ‘কুরআনের প্রতি ঈমান’ পরিচেছে বিস্তারিত আলোচনা করব। কুরআনই প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস, ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা আক্ষরিকভাবে ও সরলভাবে বিশ্বাস করাই ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। কোন্ বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, কিভাবে বিশ্বাস করতে হবে, কিসে বিশ্বাস নষ্ট হবে, কিসে কুফরী হবে, কিসে শিরক হবে, কিভাবে ও কি কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ঈমান লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত হয়েছিল, কিভাবে বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, কিভাবে ঈমানদার ব্যক্তি জীবনযাপন করবেন, ইত্যাদি বিষয়ই হলো, কুরআন কারীমের মূল শিক্ষা। আল-কুরআনই ইসলামী আকীদার প্রধান ও মূল উৎস।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত থেকে আক্ষরিক, সরল ও স্বাভাবিক যে অর্থ বুঝা যায় তাই আকীদার মূল উৎস, কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা নামে পরিচিতি পরবর্তী যুগগুলির আলিমগণের মতামত আকীদার উৎস নয়। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সহজ ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাফিল করেছেন এবং তা বুঝা সহজ করেছেন বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে কুরআন কারীম নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে। এছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হলে তাও ওহীর ব্যাখ্যা বলে গণ্য। এছাড়া আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, কুরআন ও

হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়াগণের ব্যাখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তী যুগের আলিমগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে যা কিছু বলেছেন তা আলিমগণের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, রায় বা মতামত হিসেবে পর্যালোচনার গুরুত্ব লাভ করে, কিন্তু কখনোই তা ওহীর সমতুল্য বা সম্পূরক নয় এবং তা আকীদার ভিত্তি নয়। আমরা আকীদার উৎস বিষয়ে বিভ্রান্তি আলোচনাকালে বিষয়টি পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ২. ৪. ২. হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ)

১. ২. ৪. ২. ১. পরিচয় ও সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যে ওহী পাঠাতেন তা ছিল দু প্রকারের। প্রথম প্রকার ওহী কুরআন, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো শব্দ ও অর্থসহ আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করতেন, সাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন। দ্বিতীয় প্রকার ওহীর মূল অর্থ, ‘জ্ঞান’ বা ‘প্রজ্ঞা’ আল্লাহ তাঁর উপর নায়িল করতেন। তিনি নিজের ভাষায় তা সাহাবীদেরকে বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন এবং কখনো কখনো লিখাতেন। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রকার ওহীকে ‘কিতাব’ বা গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে ‘হিকমাহ’ বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَنْذِرُ عَلَيْهِمْ أَيَّاتِهِ وَيَزْكِيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল।”^{৪৬}

এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহী ‘হাদীস’ বা ‘সুন্নাত’ নামে পৃথক ভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

হাদীস: হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, কথা বা নতুন বিষয়।^{৪৭} ইসলামী পরিভাষায় হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাণ জ্ঞানের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে

^{৪৬} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৬৪ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা বাকারা: ১২৯, ১৫১, ২৩১

আয়াত; সূরা নিসা: ১১৩ আয়াত; সূরা আহ্�সাব ৩৪ আয়াত; সূরা জুমআহ ২ আয়াত।

^{৪৭} ইবনু মানয়ুর; লিসানুল আরব ২/১৩১-১৩৮; যাইনুদ্দীন রায়ী, মুখতারুস সিহাহ ১/৫৩।

হাদীস বলা হয়। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় “যে কথা, কর্ম, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলে প্রচার করা হয়েছে বা দাবী করা হয়েছে” তাই “হাদীস” বলে পরিচিত। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে “মারফু’ হাদীস” বলা হয়। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে “মাউকুফ হাদীস” বলা হয়। আর তাবেয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসে “মাকতু’ হাদীস” বলা হয়^{৪৮}

এখানে লক্ষণীয় যে, যে কথা, কাজ, অনুমোদন বা বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলে দাবী করা হয়েছে বা বলা হয়েছে তাকেই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ‘হাদীস’ বলে গণ্য করা হয়। তা সত্যই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

সুন্নাত শব্দের অর্থ ও ব্যবহার ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে সুন্নাত ও হাদীস অনেকটা সমার্থক।^{৪৯}

বক্তৃত কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগই হাদীস বা সুন্নাত। কুরআনের পাশাপাশি অতিরিক্ত যে ওহীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি কুরআনের বিভিন্ন বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। কুরআন ও হাদীসই আমাদের সকল জ্ঞানের ও কর্মের মূল উৎস। ইবনু আবাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্রের ভাষণে বলেন :

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضْلُلُوا أَبْدًا، كِتَابَ اللّٰهِ وَسَنَةَ نَبِيِّهِ.

“আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথঝষ্ট হবে না, তা হলো – আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।”^{৫০}

^{৪৮} ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহিম ইবনুল হসাইন (৮০৬হি), আত-তাকীয়দ ওয়াল ঝিদাহ, পঃ: ৬৬-৭০; ফাতহুল মুগীস, পঃ: ৫২-৬৩; সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি), ফাতহুল মুগীস ১/৮-৯, ১১৭-১৫৫; সুযৃতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বক্র (৯১১হি), তাদীবুর রাবী ১/১৮৩-১৯৪।

^{৪৯} বিস্তারিত দেখুন, ড. খোল্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এইইয়াউস সুনান, পঃ. ৩৩-১১০।

^{৫০} হাকিম, আল-মুত্তাদুরাক ১/১৭১, নং ৩১৮/৩১। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন। আরো দেখুন: আলবানী, সহীহত তারিখ ১/৯৩।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম জীবনের সকল বিশ্বাস এবং সকল কর্মের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা হাদীস। আমাদের ঈমান-আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় সঠিক কিনা তা জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে বিষয়টি কুরআন বা হাদীসে আছে কিনা এবং কিভাবে আছে।

১. ২. ৪. ২. সহীহ হাদীস বলাম যষ্টীক হাদীস

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের আয়াত নাখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লেখাতেন এবং মুখস্থ করাতেন। তিনি কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলতেন বা শেখাতেন সে সকল শিক্ষা অর্থাৎ হাদীস তিনি সাধারণত লিখতে নিষেধ করতেন। কারণ তাঁর জীবদ্ধশায় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা মুসলিমগণ মুখস্থ করতেন এবং বিক্ষিপ্ত চামড়ার টুকরো, মাটির পাত, পাথর, খেজুর গাছের বাকল ইত্যাদিতে লিখে নিতেন। এ অবস্থায় হাদীস লেখা হলে ভুলবশত একজন মুসলিম কোনো হাদীসকে কুরআনের লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিশিয়ে ফেলতে পারেন এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে কুরআন নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কুরআনের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি মুসলিমদেরকে কুরআন মুখস্থ করতে ও লিখতে বলতেন। আর তাঁর বাণী ও কর্ম, অর্থাৎ হাদীস শুধুমাত্র মুখস্থকরে বর্ণনা করতে ও মানুষদেরকে শেখাতে বলতেন। এক্ষেত্রে তিনি হাদীস মুখস্থ করা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কেউ তাঁর নামে মিথ্যা না বলে, বা এমন কথা তাঁর নামে না বলে যা তিনি বলেন নি। আবু সাউদ খুদরী (বা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرُ الْقُرْآنَ فَلَيْمَحْهُ وَحَذِّرُوا عَنِّي وَلَا
خَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ [مَتَعَمِّداً] فَلَيَبْتَوِأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লিখবে না। যদি কেউ কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেলবে। তোমরা আমার হাদীস মৌখিকভাবে বর্ণনা কর, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (ইচ্ছা করে) মিথ্যা কথা বলবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দ হবে।”^{১১}

মাদানী জীবনের শেষ দিকে তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন। বিশেষত বিদায় হজ্জের সময় তিনি হাদীস লেখার অনুমতি দেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে সাধারণভাবে হাদীস

^{১১} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৯৮।

লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কোনো কোনো সাহাবী কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। অধিকাংশ সাহাবী তাঁর শিক্ষা, বাণী, কর্ম অত্যন্ত যত্নের সাথে মুখস্থ করতেন, পরস্পরে তা আলোচনা করতেন এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করতেন।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলগ্লাহ ﷺ তাঁর হাদীস হ্রবহু মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।^{৫২} অপরদিকে কোনো মানবীয় কথা যেন তাঁর নামে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তিনি বারংবার সতর্ক করেছেন। উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি। ‘আশারায়ে মুবাশশারাহ’-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এই মর্মে রাসূলগ্লাহ ﷺ-এর সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।^{৫৩} উম্মাতের মধ্যে জালিয়াত ও জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন।^{৫৪} যাচাই না করে কোনো হাদীস গ্রহণ করতে রাসূলগ্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে।^{৫৫}

এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা সাধারণত হাদীস বলতেন না। কখনো হাদীস বললে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলতেন। অন্যের বলা হাদীস যাচাই বাচাই না করে গ্রহণ করতেন না। বর্ণনার নির্ভুলতা বা বিশুদ্ধতায় সন্দেহ হলে বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করে, অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে প্রশ্ন করে বা বর্ণনাকারীকে শপথ করিয়ে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। এরপরও সন্দেহ থাকলে তাঁরা হাদীস গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতেন। সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বললে সনদ ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে।

সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতির অনুসরণে তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাচাই করেছেন। যাচাই-

^{৫২} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৩৩-৩৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/৩২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৪-৮৬; ইবনু হিক্মান, আস-সহাইহ ১/২৬৮, ২৭১, ৪৫৫; হাকিম নাইসাপুরী, আল-মুসতাদারাক ১/১৬২, ১৬৪; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ১/১৩৮-১৩৯।

^{৫৩} নববী, ইয়াহিইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহ সাহীহ মুসলিম ১/৬৮, ইবনুল জাউফী, আল-মাউয়ু’আত ২৮-৫৬।

^{৫৪} মুসলিম, আস-সহাইহ ১/১২।

^{৫৫} মুসলিম, আস-সহাইহ ১/১০।

বাছাইয়ে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদীসকে তারা ‘সহীহ’ বা ‘হাসান’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর অশুদ্ধ হাদীসকে যয়ীফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। যয়ীফ হাদীসের মধ্যে রয়েছে বানোয়াট বা জাল হাদীস।

মুহাম্মদসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) ‘আদালত’: হাদীসের সকল রাবী (বর্গনাকারী) পরিপূর্ণ সং ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত, (২) ‘যাবত’: তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল রাবীর ‘নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা’ পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩) ‘ইন্সিলাল’: সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত, (৪) ‘শৃংযু মুক্তি’: হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) ‘ইল্লাত মুক্তি’: হাদীসটির মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত। প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় শর্তে সামান্য দুর্বলতা থাকলে হাদীসটি ‘হাসান’ বলে গণ্য হতে পারে।^{৫৬} এ সকল শর্তের অবর্তমানে হাদীসটি যয়ীফ বা দুর্বল অথবা বানোয়াট বা মাউয়ু হাদীস বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

আকীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেবলমাত্র সহীহ হাদীসের উপরেই নির্ভর করতে হবে। সকল যুগে সকল ইমাম ও আলিম এ বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন। তাঁরা সর্বদা সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেছেন:

إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيفُ الْإِسْنَادُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْذُنَا بِهِ وَلَمْ نَعْذُدْ

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে তাঁর উপরেই আমরা নির্ভর করব, তার বাইরে যাব না।’^{৫৭}

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তাঁর রচিত ‘আল ফিকহুল আকবার’ নামক গ্রন্থে বলেছেন:

وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيفَةُ حَقُّ كَائِنٍ

“কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত

^{৫৬} বিস্তারিত দেখুন: ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ: ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীস, পৃ: ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/২৫-৩১; সুজূতী, তাদরীবুর রাবী ১/৬৩-৭৪; মাহমুদ তাহহান, তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৪-৩৬, ড. খোদকার আব্দুল্লাহ জাহানীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৬-১২৩।

^{৫৭} ইবনু আব্দিল বার, আল ইনতিকা ফী ফায়াইলিল সালালাতিল আইম্যা, পৃ ১৪৪।

হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই।”^{৫৮}

ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রাহ) মায়াবাবের ভিত্তিতে আহলস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফার তাহাবী (৩২১ হি) বলেন:

وَجْمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْبَيْانِ حَقٌّ ... وَكُلُّ مَا جَاءَ

فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيفَعِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ...

“শরীয়ত এবং বিবরণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যাক কিছু সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে সবই হক। এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই বিশ্বাস করতে হবে।”^{৫৯}

১. ২. ৪. ২. ৩. মুতাওয়াতির বনাম আহাদ হাদীস

এক্ষেত্রে মুসলিম উম্যাহর ইমামগণ দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তা হলো, বর্ণনাকারীদের সংখ্যা। বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসকে ভাগ করেছেন: (১) মুতাওয়াতির ও (২) আহাদ।

(১) যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত সকল স্তরে অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির বা অতি-প্রসিদ্ধ হাদীস বলে। অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সাহাবী থেকে অনেক তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক তাবিয়ী থেকে অনেক তাবি-তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়। কোনো যুগেই এতগুলি মানুষের একত্রিত হয়ে মিথ্য কথা বানানোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যেমন সালাতের ওয়াক্ত ও রাকা'আত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়।

(২) যে হাদীসকে সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত কোনো যুগে অল্প কয়েকজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে ‘আহাদ’ বা খাবারুল ওয়াহিদ হাদীস বলা হয়।

খাবারুল ওয়াহিদ হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) গরীব: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

^{৫৮} মোল্লা আলী কারী, শরচ্ছল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯২ ও ৩২৭।

^{৫৯} আবু জাফার তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১০, ১৪।

(খ) আযীয়: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো পর্যায়ে মাত্র দুজন রাবী রয়েছেন সে হাদীসকে আযীয় হাদীস বলা হয়।

(গ) মুসতাফীয়: যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল পর্যায়ে দুজনের বেশি, তবে অনেক নয় সে হাদীসকে মুসতাফীয় হাদীস বলা হয়।

মুসতাফীয় হাদীসকে মাশহুর হাদীসও বলা হয়। অনেক মুহাদ্দিসের মতে যে হাদীস সাহাবীগণের যুগে দু-একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাবিয়ীগণের বা তাবি-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেছে তাকে মাশহুর হাদীস বলা হয়।^{৬০}

মুতাওয়াতির বা ‘অতি-প্রসিদ্ধ’ হাদীস দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান বা ‘ইলম কাত’য়ী’ (علم الظاهري) এবং ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ বা ‘ইয়াকীন’ (البُقْرَى) লাভ করা যায়। কুরআন কার্যমের পাশাপাশি এই প্রকারের হাদীসই মূলত ‘আকীদা’র ভিত্তি। এই প্রকারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্তীকার করলে তা ধর্মত্যাগ বা অবিশ্বাস (কুফরী) বলে বিবেচিত হয়।

মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান (علم المتأني) লাভ করা যায়। এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্তীকার করলে তা পাপ ও বিভাস্তি বলে গণ্য। খাবারুল ওয়াহিদ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসও আকীদার বিষয়ে গৃহীত। তবে সাধারণভাবে ফকীহগণের নিকট খাবারুল ওয়াহিদ সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। বরং তা কার্যকর ধারণা (الظن) প্রদান করে। কর্মের ক্ষেত্রে বা কর্ম বিষয়ক হালাল, হারাম ইত্যাদি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীসের উপরে নির্ভর করা হয়। আকীদার মূল বিষয় প্রমাণের জন্য সাধারণত এরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় না। তবে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যায় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার উপর নির্ভর করা হয়।^{৬১}

অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, সহীহ হাদীস যদি ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ হয় এবং তা তাবিয়ীগণের যুগে না হলেও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে ‘আকীদা’র ক্ষেত্রে তার নির্ভর করা যাবে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, বুখারী এবং মুসলিম উভয়ের সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ এগুলিকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু এগুলি দ্বারা সুনিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করা সম্ভব। তবে সাধারণভাবে অধিকাংশ আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ পর্যায়ের সহীহ হাদীস ‘ধারণা’ বা

^{৬০} সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ৩/২৮-৩৫; ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রাহমান আ’যামী, মু’জামু মুসতালাহাতিল হাদীস, পৃ. ১৪-১৬।

^{৬১} রাহমাতুল্লাহ কিরানবী, ইয়হারুল হক্ক ৩/৯২০।

‘কার্যকরী ধারণা’ প্রদান করে, সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রদান করে না।

এ বিষয়ে ইমাম নববী (৬৭৬ হি) বলেন: “সহীহ হাদীস বিভিন্ন প্রকারের। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম উভয়েই সহীহ বলে উদ্ধৃত করেছেন। এরপর যা শুধু বুখারী সংকলন করেছেন, এরপর যা কেবল মুসলিম সংকলন করেছেন, এরপর যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা অন্যদের বিচারে সহীহ বলে গণ্য। শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনুস সালাহ (৪৬৩ হি) উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী ও মুসলিম অথবা উভয়ের একজন যে হাদীসকে সহীহ হিসেবে সংকলন করেছেন সে হাদীসটি সুনিশ্চিতরূপেই সহীহ এবং তদ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। মুহাকিক বা সুপওতি গবেষকগণ এবং অধিকাংশ আলিয় তাঁর এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুতাওয়ারি পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত সকল প্রকারের সহীহ হাদীস দ্বারাই ‘ধারণা’ (ঠন) লাভ করা যায়।”^{৬২}

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কর্মধারা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে সকল হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং তাবিয়ী-তাবিতাবিয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা সবই আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। উপরে আমরা ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও ইমাম তাহাবী (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, আকীদার বিষয়েও তাঁরা সহীহ হাদীসের উপরে নির্ভর করতেন, এ বিষয়ক হাদীস মুতাওয়াতির হতে হবে তা শর্ত বরেন নি। পার্থক্য এই যে, কুরআনে উল্লেখিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কোনো বিষয় অস্থীকার করলে তা কুফ্রী বলে গণ্য হয়। আর খাবারক্ল ওয়াহিদের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত বিষয় অস্থীকার করলে তা বিভ্রান্তি বলে গণ্য হয়।

আকীদার ক্ষেত্রে ‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের উপর গুরুত্ব প্রদানের দ্বিবিধি কারণ রয়েছে:

(ক) হাদীসের এ শ্রেণীভাগ বুঝতে নিম্নের উদাহরণটি আলোচনা করা যায়। যে কোনো বিচারালয়ে উপস্থিত মামলায় প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারক একটি দৃঢ় ‘ধারণা’ (ঠন) লাভ করেন। তিনি মোটামুটি বুঝতে পারেন যে এ সম্পদ সত্যই এ লোকের বলেই মনে হয় অথবা এ লোকাটি সত্যই এ হত্যাকাণ্ডে জাড়িত ছিল বলে বুঝা যায়। তিনি এও জানেন যে, তাঁর এই ‘ধারণা’র মধ্যে ভুল হতে পারে। সকল বিচারকেরই কিছু রায় ভুল হয়। কিন্তু এ জন্য বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি বিচারের রায় প্রদান বন্ধ রাখা হয় না। অনুরূপভাবে সামগ্রিক সনদ বিচার ও অর্থ যাচাইয়ের পরে ‘খাবারক্ল ওয়াহিদ’

^{৬২} নববী, আত-তাকরীব, পৃ. ১।

বা 'এককভাবে বর্ণিত' সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ অনুরূপ 'কার্যকরী ধারণা' লাভ করেন যে, কথাটি সত্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। তবে বর্ণনার মধ্যে সামান্য হেরফের থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা তিনি অঙ্গীকার করেন না। তবে সম্ভাবনা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একে কার্যত নির্ভুল বলে গণ্য করা হয়। যখন এরূপ বর্ণনা 'অতি-প্রসিদ্ধ' (মুতাওয়াতির) বা 'প্রসিদ্ধ' (মাশহুর) পর্যায়ের হয় তখন ভুল-ভাস্তির সামান্য সম্ভাবনাও রহিত হয়।

কুরআন পুরোপুরিই 'মুতাওয়াতির'ভাবে বর্ণিত। যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল সেভাবেই শতশত সাহাবী তা লিখিত ও মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের থেকে হাজার হাজার তাবিয়ী তা সেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রচার করেছেন। কেউ একটি শব্দকে সমার্থক কোনো শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করেন নি। সহীহ হাদীস তদ্বপ নয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণ অর্থের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতেন। আরবী ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর বিষয়ে অভিজ্ঞ সাহাবী-তাবিয়ীগণ প্রয়োজনে একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। মূল হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল।^{৬০}

(খ) আকীদা বা বিশ্বাস মূলত প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হতে হয়। বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল শেখাতেই আল্লাহ নবী রাসূল প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। সব মুসলিমের উপর ফরয কিছু কাজ ব্যতীত বিভিন্ন ফরালত মূলক নেক কাজে একটি না করলে অন্যটি করা যায়। কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই। আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম ফরয। যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুম্মিনের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যুর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন এবং সাহাবীগণও এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, আকীদার বিষয়ে হয় কুরআনে স্পষ্ট আয়াত থাকবে, অথবা অগণিত সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত থাকবে।

এ ছাড়া কর্মের বিষয়ে 'ইজতিহাদ' বা কিয়াসের উপরে নির্ভর করা যায়। বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয় ওইর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ অচল। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওইর বিষয়কে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, তবে যুক্তি দিয়ে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা যায় না।

^{৬০} প্রাগুক্তি ৩/৯২০-৯২১।

১. ২. ৪. ২. ৪. সহীহ হাদীসের উৎস

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী আকীদা এবং সকল ইসলামী জ্ঞান ও কর্মের ভিত্তি ও উৎস। এজন্য সাহাবীগণের যুগ থেকেই আলিমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা দ্঵িবিধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন: সংকলন ও যাচাই-বাচাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের প্রায় ৯০ বৎসর পর থেকে পরবর্তী প্রায় ২০০ বৎসরের মধ্যে তাঁর নামে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস এবং সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবেয়ীগণের বক্তব্য, কর্ম ও মতামত বিভিন্ন ‘হাদীস’-গ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থেও কিছু হাদীস সনদ সহকারে সংকলন করা হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের লক্ষ্য ও পদ্ধতি ছিল সনদ সহকারে প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করা। এজন্য তাঁরা সনদসহ সহীহ, যায়ীক, মাউয়ূ ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস সংকলন করতেন। এছাড়া তাফসীর, ইতিহাস ও এ জাতীয় গ্রন্থগুলিতে প্রত্যক্ষকারণগণ মূলত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সনদ সহ জ্ঞা করতেন, সহীহ বা মাউয়ূ কোনো বিচার করতেন না বা উল্লেখও করতেন না। অন্য সংখ্যক মুহাদ্দিস কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও আলিম সনদ-সহ হাদীস উল্লেখ করলে আর তা সহীহ না বানোয়াট তা বলার প্রয়োজন মনে করতেন না। কারণ যেহেতু সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু সকলেই তা বিচার করতে পারবে।^{৫৪}

মুহাদ্দিসগণের সংকলন-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক মানুষ মনে করেন যে, হাদীসের নামে যা কিছু বলা হয় তা সবই সহীহ। অথবা বড় বড় আলিমগণ তাদের গ্রন্থে যা কিছু সংকলন করেছেন তা যাচাই-বাচাইয়ের পরেই করেছেন, কাজেই সংকলিত সব হাদীসই বোধহয় সহীহ। হাদীস সংকলন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতাই এক্সপ্রিজ্নেশন কারণ।

আল্লামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: “বুখারী ও মুসলিমের বাইরে সহীহ হাদীস খুজতে হবে মাশহুর হাদীসের বইগুলিতে, যেমন আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনু খুয়াইমা, দারাকুতনী ও অন্যান্যদের সংকলিত গ্রন্থ। তবে এ সকল গ্রন্থে যদি কোনো হাদীস উদ্বৃত্ত করে তাকে সুস্পষ্টভাবে ‘সহীহ’ বলে উল্লেখ করা হয় তবেই তা সহীহ বলে গণ্য হবে, শুধুমাত্র এ সকল গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে বলেই হাদীসটিকে সহীহ মনে করা যাবে না; কারণ এ সকল গ্রন্থে সহীহ এবং যায়ীক সব রকমের

^{৫৪} আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আজবিবাতুল ফাদিলাহ, পৃ. ৯১।

হাদীসই রয়েছে।”^{৬৫}

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন: “দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিসের রীতি ছিল যে, সহীহ, যয়ীফ, মাউয়, বাতিল সকল প্রকার হাদীস সনদ-সহ সংকলন করা। তাদের মূলনীতি ছিল যে, সনদ উল্লেখ করার অর্থেই হাদীসটি বর্ণনার দায়ভার রাখিদের উপর ছেড়ে দেওয়া, সংকলকের আর কোনো দায় থাকে না।”^{৬৬}

দাদশ হিজরী শতকের অন্যতম আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি/ ১৭৬২খ্রি) হাদীসের গ্রন্থগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এই তিনখানা গ্রন্থের সকল সনদসহ বর্ণিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সে সকল গ্রন্থ যেগুলির হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাই, সুনানে তিরমিয়ী। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এই পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সব ধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এই পর্যায়ে রয়েছে: মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসাল্লাফে আব্দুর রায্যাক, মুসাল্লাফে ইবন আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবন হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাহিহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নুরুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান,... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শারহ মায়ানীল আসার, শারহ মুশকিলিল আসার,... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের দিকে মন দেননি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি হলো ঐ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে

^{৬৫} ইরাকী, আত-তাকউদ ওয়াল ঈদাহ শারহ মুকাদ্দিমাতি ইবনুস সালাহ, পৃ. ৩১-৩২।

^{৬৬} ইবনু হাজার, লিসানুল মীয়ান ৩/৭৪।

সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন : (১). যে সকল 'হাদীস' পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২). যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েয়দের ওয়ায়ে প্রচারিত বিভিন্ন কথা, যা কোনো হাদীসের ঘন্টে স্থান পায়নি, (৪). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভাত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা, (৫). যে সকল 'হাদীস' মূলত সাহারী বা তাবেয়াদের কথা, ইহুদিদের গল্প বা পূর্ববর্তী যামানার জানী ব্যক্তিদের কথা, যেগুলিকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূর্বক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা (৮). বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হিবানের আদ-দুয়াফা, ইবনু আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, ইবনু আসাকির, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। ... এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা বানোয়াট।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐ সকল হাদীস রয়েছে যা ফকীহগণ, সূফীগণ বা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাঁদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যে সকল হাদীসের কোনো অন্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা কোনো ধর্মচূর্ণ ভাষাজানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ তৈরি করেছেন যার ক্রটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সনদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ক্রটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরেই শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইলমুর রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্যে থেকে মিথ্যা

হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগুলুসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেয়ী, মুতাফিলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলিল দেওয়া আলিমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য।^{৬৭}

চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগুলুসমূহে সংকলিত হাদীসসমূহের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ)-এর পুত্র শাহ আব্দুল আয়ীয় মুহাম্মদিস দেহলভী (১২৩৯ হি) বলেন: এই পর্যায়ের হাদীসগুলির অবস্থা এই যে, প্রথম যুগের (প্রথম তিন হিজরী শতাব্দীর) মুহাম্মদিসদের মধ্যে এগুলি পরিচিতি লাভ করে নি, অথচ পরবর্তী যুগের আলিমগণ তা বর্ণনা ও সংকলন করেছেন। এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে: প্রথম সম্ভাবনা এই যে, প্রথম যুগের মুহাম্মদিসগণ এগুলির বিষয়ে জেনেছিলেন এবং এগুলির সনদ বা সূত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা এগুলির কোনো সনদ বা ভিত্তি জানতে পারেন নি, এজন্য তাঁরা এ সকল হাদীস সংকলন করেন নি।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, তাঁরা এগুলির সনদ বা সূত্র জানতে পেরেছিলেন। তবে তাঁদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে এগুলির সনদে কঠিন আপত্তি ও ক্রটি জানতে পেরেছিলেন, যে ক্রটির কারণে হাদীসগুলি প্রত্যাখ্যান করা জরুরি ছিল। এজন্য তাঁরা হাদীসগুলি সংকলন করেন নি।

সর্বাবস্থায় এ সকল হাদীসের উপর কোনো অবস্থাতেই নির্ভর করা যায় না এবং এগুলি দ্বারা কোনো আকীদা বা কর্ম প্রমাণ করা যায় না। এই পর্যায়ের হাদীসগুলি অনেক মুহাম্মদিসকেই বিভ্রান্ত করেছে এবং তাঁদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। কারণ, এ সকল গ্রন্থে বিদ্যমান এ সকল হাদীসের অনেক সনদ দেখে প্রতারিত হয়ে তারা এগুলিকে ‘মুতাওয়াতির’ বলে গণ্য করেছেন এবং ‘সুনিশ্চিত জ্ঞান’ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রমাণের জন্য এগুলির উপর নির্ভর করেছেন। এভাবে তাঁরা প্রথম দুই পর্যায়ের বিপরীতে নতুন মতবাদের উন্নাবন ঘটিয়েছেন।”^{৬৮}

১. ২. ৫. সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওই বা

^{৬৭} শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/৩৮৫-৩৯১।

^{৬৮} সিদ্দীক হাসান কানুজী, আল-হিত্তাহ, পৃ. ৫৭-৫৮।

কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী বিশ্বাস বা ‘আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়্যাহ’-র ভিত্তি ও উৎস কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। পবিত্র কুরআনে ও সহীহ হাদীসে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করা এবং যেভাবে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি।

কুরআন ও হাদীসের বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, গোপনীয়তা, বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতা নেই। তারপরও কখনো জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কুরআনের বা হাদীসের বুঝার বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তীয় দুই প্রজন্ম ‘তাবিয়ী’ ও ‘তাবিয়াগণের’ ব্যাখ্যা ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়।

সাহাবীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে গড়া ছাত্র। তাঁরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার সাহচর্যে থেকেছেন, জীবনের সবকিছির উর্ধ্বে তাঁকে ভালবেসেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁরা সদা উদ্ধৃতি ছিলেন। তাঁরা তাঁর মুখের বাণী সরাসরি শুনেছেন কুরআন নাফিল হওয়ার পটভূমি তাঁরা জেনেছেন, কুরআনের ও হাদীসের শিক্ষা সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন ও জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন তাঁরাই। স্বভাবতই কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে।

কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের অতুলনীয় আদর্শস্থানীয় ইমান, আমল, তাকওয়া, জিহাদ, স্বার্থ ত্যাগ, তাঁদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।^{৬০} এ সকল আয়াতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমান, তাকওয়া, বেলায়াত ও কামালাতে তাঁরাই শীর্ষে। তারা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। আল্লাহর অফুরন্ত রহমত তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদেরককে ভালবাসা ও তাঁদের অনুকরণ- অনুসরণ পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহবীদের জীবন-পদ্ধতি বা কর্মপদ্ধার (সুন্নাতের) বিরেধিতাকারীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّٰ وَنَصِّلَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“যদি কেউ তার কাছে হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরেও রাসূলের

^{৬০} দেখনু: সূরা আল-ইমরান: ১০১, ১১০, ১৭২-১৭৪, সূরা আনকাল: ৬২, ৭৪, সূরা তাওবা: ৮৮-৮৯, ১০০, ১১৭, সূরা ফাতহ: ১৮-১৯, ২৬, ২৯, সূরা হজুরাত: ৭, সূরা হাদীদ ১০, সূরা হাশর: ৮-১০।

বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করব, যা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল।”^{১০}

এখানে ‘বিশ্বাসীদের পথ’ বলতে স্বভাবতই সাহাবীদের পথ বোঝান হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের বিশ্বাসীগণ তাঁরাই। তাঁদেরকে নাজাত ও মুক্তির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বলে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

‘মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অঞ্গামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।’^{১১}

এখানে সাহাবীগণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রথমত, প্রথম অঞ্গামী মুহাজিরগণ, দ্বিতীয়ত, প্রথম অঞ্গামী আনসারগণ এবং তৃতীয়ত তাঁদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন। প্রথম দুই পর্যায়ের সাহাবীগণকে সফলতার মাপকাঠি ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে অন্যান্য অনেক স্থানে সকল মুহাজির ও আনসারকে ‘প্রকৃত মুমিন’ ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১২}

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে তাঁর সাহাবীদের জীবন পদ্ধতি ও মতামতের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسْتِيَّ وَسُنْتِي
الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدِيُّونَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَأَيْسَاكِمْ
وَمَهْدَنَاتِ الْأَمْوَرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ

“তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর

^{১০} সূরা (৪) নিসা: ১১৫ আয়াত।

^{১১} সূরা (৯) তাওবা: ১০০ আয়াত।

^{১২} সূরা (৮) আনফাল: ৭২, ৭৪ আয়াত; সূরা (৫৯) হাশর: ৮, ৯, ১০ আয়াত।

তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভাসি ও পথপ্রস্তা।”^{৭৩}

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সর্তক করেন। সাহাবীদের প্রশ্ন করেন, এক্ষেত্রে কোন্দল সঠিক বলে গণ্য হবে? তিনি বলেন:

مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَأَصْنَابِي

‘আমি এবং আমার সাহাবী-সঙ্গীরা বর্তমানে যে মত ও পথের উপর আছি সেই মত ও পথের উপর যারা থাকবে তারাই সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত।’^{৭৪}

এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ ইসলামের সকল বিষয়ের মত আকীদার বিষয়েও সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যাকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ‘সুন্নাতে সাহাবা’ কথন কিভাবে এবং কোন পর্যায়ে দলীলরূপে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো বিষয়ে কুরআন বা সুন্নাতে রাসূলে (ﷺ) নির্দেশ না থাকলে সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে। তিনি বলেন

آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ، نظرت إلى أقوال أصحابه، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

‘আমি কুরআনের উপর নির্ভর করি। কুরআনে যা পাই না তার জন্য সুন্নাতে রাসূলে (ﷺ)-র উপর নির্ভর করি। যদি কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে (ﷺ) না পাই, তাহলে আমি সাহাবীদের মতামত ও শিক্ষার উপর নির্ভর করি, তাদের মতামত ও শিক্ষার বাইরে যাই না।’^{৭৫}

সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী- এ তিনি প্রজন্মের মানুষদের ধার্মিকতার প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। ইমরান ইবনু হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

خَيْرٌ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْعُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ .

^{৭৩} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৪৮; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২০০; ইবনু মাজাহ ১/১৫।
তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি সহীহ হাসান।

^{৭৪} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮; মাকদিসী, আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ ৭/২৭৮; আলবানী সহীহ সুনানিত তিরমিয়ী ৬/১৪১ নং ২৬৪।

^{৭৫} ইবনু আব্দুল বারর, আল ইত্তেকা, পৃ ১৪২, ১৪৩।

“আমার উন্মত্তের সবচেয়ে ভালো যুগ হলো আমার যুগ, যে যুগের মানুষের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবীগণ), আর তাদের পরেই সবচেয়ে ভালো তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবিয়ীগণ), আর এর পর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবি তাবিয়ীগণ)”।^{১৬}

এ অর্থে আবু হুসাইন (রা), বুরাইদা আসলামী (রা), নু'মান ইবনু বাশীর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে পৃথক পৃথক সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখার ন্যায়, আকীদার বিষয়েও কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ভালভাবে বুঝার জন্য ও সঠিক ব্যাখ্যা দান করার জন্য প্রথমত সাহাবীদের এবং এরপরে তাদের ছাত্রদের বা তাবেয়ীদের এবং তাদের ছাত্রদের বা তাবি- তাবেয়ীদের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রেও অবশ্যই সহীহ সনদে বর্ণিত বিশুদ্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যেমন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, তেমনি তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মামেও অনেক মনগড়া কথা রটনা করা হয়েছে। এজন্য হাদীস সংকলনের সময়ে মুহাদ্দিসগণ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেয়ীরে বাণী ও শিক্ষাও সনদ-সহ সংকলিত করেছেন, যেন সনদের মাধ্যমে তাঁদের সঠিক শিক্ষা ও মতামত জানা যায় এবং তাদের নামে রাচিত মিথ্যা কথা ধরা পড়ে।

১. ২. ৬. উৎসের বিভাস্তি বলাম বিশ্বাসের বিচ্যুতি

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঈমান, আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক যত প্রকারের বিচ্যুতি বা বিভাস্তি বিদ্যমান তার সব কিছুর মূল কারণ আকীদার উৎস নির্ধারণে বিভাস্তি। কুফর, শিরক, বিদ'আত, দলাদলি, বিভাস্তি ইত্যাদি সব কিছুর মূল কারণ বিশ্বাসের উৎস বা ভিত্তি নির্ধারণের বিষয়ে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা মতবিরোধিতা।

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়গুলি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য জগতকে কেন্দ্র করে। আর অদৃশ্য জগতের বিষয়ে কোনো কিছু সঠিকভাবে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ‘ওহী’। যখনই কোনো মানুষ ওহীর অস্তিত্ব বা গুরুত্ব অস্বীকার করে অথবা আকীদার বিষয়ে অহীর অতিরিক্ত কোনো সূত্র বা উৎসের উপর নির্ভর করে তখনই সে তার জন্য বিভাস্তির দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। এ জাতীয় বিভাস্তিকর উৎসের মধ্যে রয়েছে:

১. ২. ৬. ১. ওহী অস্বীকার করা

যুগে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ওহীর প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্ব

^{১৬} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৩৫।

অস্থীকার করেছে। যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে দাবি করেন তারা ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্থীকার করেন। এরূপ নাস্তিকতার দাবিদারগণও মনের গভীরে স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা অনুভব করেন। এ বিজ্ঞানময় বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার মধ্যে যাঁর অস্তি ত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান তাকে অস্থীকার করি বলে গায়ের জোরে দাবি করলেও বিবেক এরূপ দাবি পুরোপুরি মানতে পারে না। তবে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় মনের গভীরের বিশ্বাসের অনুভূতিকে তারা বাড়তে দেন না। বিবেকের বিশ্বাসের দাবি মুখে স্থীকার করলেই অনেক স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ কর্ম বাদ দিতে হয়, এজন্য তারা বিষয়টি মুখে স্থীকার করেন না বা এ বিষয়ে বিবেকের প্রেরণা নিয়ে চিন্তাগবেষণা করতে চান না।

দার্শনিক বা চিন্তাবিদ নামধারী অনেক মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্থীকার করেছেন। তারা কল্পনা করেছেন যে, স্রষ্টা এ জগত ও প্রাণীকুল সৃষ্টি করে এদেরকে নিজের মনমর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা আরো কল্পনা করেছেন যে, স্রষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য মানবীয় জ্ঞানই যথেষ্ট। তারা দাবি করেছেন যে, মহান স্রষ্টা মানুষকে তার ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অগম্য একটি বিষয় তার ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান দিয়ে পুরোপুরি বুঝে নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন। এভাবে তারা মহান স্রষ্টার প্রতি অবশ্যনক সাথে সাথে মানবীয় জ্ঞান ও বিবেককে অপমান করেছেন।

১. ২. ৬. ২. ওহীকে অকার্যকর করা

অনেক মানুষ ওহীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ওহীকে অকার্যকর করার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপত্তি হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুভাবে ওহীর কার্যকরিতা অস্থীকার করা হয়: (১) ওহীর শার্ভাবিক ও সরল অর্থ প্রত্যাখ্যান করে ‘রূপক’ অর্থ গ্রহণ করা, অথবা (২) ওহীর নির্দেশনার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অমুক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের জন্য তা প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করা। এ হলো মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

১. ২. ৬. ৩. লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা ব্যক্তিগত পছন্দ

বিশ্বাস বিষয়ক বিভ্রান্তির মূল কারণ বিশ্বাসের বিষয়ে ওহী ছাড়া অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করা। এ সকল ওহী-অতিরিক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে: লোকাচার, ব্যক্তিগত পছন্দ, ওহীর ব্যাখ্যা, ওহী-ভিত্তিক যুক্তি, ধর্মগুরুদের মতামত, ইলকা, ইলহাম বা কাশফ, আকল বা মানবীয় জ্ঞান ইত্যাদি।

আমরা দেখেছি যে আরবের কাফিরগণ মূলত ওহীর অস্তিত্ব অস্থীকার করত না। তবে তারা বিভিন্ন ওজুহাতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর ওহী নায়িল

হওয়ার বিষয়টি অস্মীকার করত। তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা তাদের নিজস্ব পছন্দ। এ সকল লোকাচারকে তারা পিতাপিতামহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর ধর্মবিশ্বাস বলে বিশ্বাস করত। এগুলির ভিত্তিতেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাও'আত অস্মীকার করে। তাদের নিকট ইবরাহীম (আ) ও ইসলামসৈল (আ)-এর প্রতি অবর্তীর্ণ কোনো ওহী তাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল না, বরং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা প্রচলনের উপরেই নির্ভর করত। বিভিন্ন মুসলিম সমাজের অধিকাংশ বিভ্রান্তিও এরূপ লোকাচারের ভিত্তিতে প্রসার লাভ করেছে। পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, বিশেষ কোনো ব্যক্তি মতামত, নিজের পছন্দ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো একটি 'আকীদা' বা বিশ্বাস গড়ে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রসার লাভ করে।

১. ২. ৬. ৪. ওহীর তাফসীর ও ওহী ভিত্তিক যুক্তি

কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের কাফিরগণ ও ইহুদী-খ্স্টানদের শিরক ও কুফরের একটি বিশেষ কারণ ছিল ওহীর ব্যাখ্যা ও ওহী-ভিত্তিক বিভিন্ন যুক্তিকে ওহীর সম্প্রৱেক বিষয় হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলি দেখব, সেগুলির মধ্যে রয়েছে (১) তাকদীর সম্পর্কে কাফিরদের বিশ্বাস এবং (২) ঈসা (আ) ও ত্রিতুবাদ সম্পর্কে খ্স্টানদের বিশ্বাস। ওহী এবং ওহীর তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করছি। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

"তোমাদের বক্সু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত।" ১১

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লাহ ইবনু আবুস (রা), আলী ইবনু আবী তালিব (রা), আম্বার ইবনু ইয়াসার (রা), মুজাহিদ ইবনু জাবর প্রমুখ সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি আলী (রা)-এর সম্পর্কে অবর্তীর্ণ। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলির অধিকাংশ সনদই অত্যন্ত দুর্বল। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির সার সংক্ষেপ এই যে, একজন ভিক্ষুক মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চান। কেউ তাকে কোনো ভিক্ষা প্রদান করেন না। আলী (রা) তখন মসজিদের মধ্যে নফল সালাত আদায়ে রত ছিলেন। তিনি

^{১১} সূরা (৫) মায়দা: ৫৫ আয়াত।

এ সময় রুকুরত অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থাতেই তিনি ইশারায় ভিক্ষুককে ডাকেন এবং নিজের হাতের আংটি খুলে ভিক্ষুককে প্রদান করেন। ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বিষয়টি জানান। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাফিল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, “আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, আলীকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শক্ততা করে আপনি তার সাথে শক্ততা করুন।”^{১৮}

উপরের তাফসীরকে শীয়াগণ তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তাঁর দলভুক্ত হওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই মু'আবিয়া (রা) ও অন্যান্য সকল সাহাবী (রা) যারা আলী (রা)-এর সাথে শক্ততা করেছেন, বা তাঁকে ক্ষমতা দেন নি এবং তাঁদের যারা অনুসরণ করেন বা তাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁরা সকলেই কুরআনের নির্দেশ অঙ্গীকার করার কারণে কাফির বা মুরতাদ বলে গণ্য (নাউয়ু বিল্লাহ!)।

এখানে কুরআন ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। কুরআনের নির্দেশ যা তার স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায়, তা হলো, মুমিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী মুমিনগণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আলী (রা) ও সকল সাহাবী ও অন্যান্য মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত। আলী (রা)-এর বিশেষত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং কোনো কোনো যয়ীফ বা খাবার ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসে বর্ণিত এবং কোনো কোনো মুফাস্সিরের মত। এ সকল মত দ্বারা আলী (রা)-এর মর্যাদা জানা যায়, তবে কখনোই বিষয়টিকে মুমিনের বিশ্বাস বা আকীদার অংশ বানানো যায় না। এজন্য যে কোনো ভাবে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা বা বিদ্রোহপোষণ ঈমান বিনষ্টকারী, কিন্তু জাগতিক বা ইজতিহাদী কারণে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা বা অন্য কোনো মুমিনের বিরোধিতা করা তদুপ নয়। কিন্তু শীয়াগণ তাফসীরকে বিশ্বাসের অংশ বানিয়েছেন।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“যখন তোমার প্রতিপালক মালাকগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে ‘স্ত্রাভিষিক্ত’ সৃষ্টি করছি।”^{১৯}

^{১৮} তাবারী, তাফসীর ৬/২৮৮-২৮৯; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৭২।

^{১৯} সূরা (২) বাকারা: ৩০ আয়াত।

খলীফা অর্থ ‘স্লাভিষ্ক’ বা ‘গদ্দিনশীন’, যিনি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার স্থলে অবস্থান বা কর্ম করেন। এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আদমকে পৃথিবীতে ‘খলীফা’ বা স্লাভিষ্ক হিসেবে প্রেরণ করবেন। কার স্লাভিষ্ক তা আল্লাহ বলেন নি। মুফাস্সিরগণ থেকে তিনটি মত প্রসিদ্ধঃ (১) ইবনু আবাস (রা), ইবনু মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মতে এখানে ‘স্লাভিষ্ক’ বলতে পূর্ববর্তী জিন্ন জাতির স্লাভিষ্ক বুঝানো হয়েছে। (২) ইবনু যাইদ ও অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে ‘খলীফা’ বা স্লাভিষ্ক বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তানগণ এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের স্লাভিষ্ক হবে। (৩) ইমাম তাবারী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন যে, এখানে খলীফা অর্থ আল্লাহর খলীফাও হতে পারে। অর্থাৎ আদম ও তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরই স্লাভিষ্ক।^{৮০}

খলীফা শব্দ, এর বহুবচন এবং এর ক্রিয়াপদ কুরআন কারীমে প্রায় ২০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল ব্যবহারের আলোকে সুস্পষ্ট যে, খলীফা বলতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্লাভিষ্ক বুঝানো হয়। এজন্য কুরআনের ব্যবহারের আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় মতটির বিষয়ে প্রথম যুগের অনেক আলিম আপনি করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। কারণ, কারো মৃত্যু, স্থানান্তর বা অবিদ্যমানতার কারণেই তার স্লাভিষ্ক, গদ্দিনশীন বা খলীফার প্রয়োজন হয়। আর মহান আল্লাহ তো এরপ কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে মহা পবিত্র। কুরআন বা হাদীসে মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা হয় নি, বরং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই মানুষের খলীফা বা স্লাভিষ্ক হন। যেমন সফরের দু'আয় রাসূলল্লাহ ﷺ বলতেন: “আপনিই সফরে (আমাদের) সাথী এবং পরিবারে (আমাদের) খলীফা বা স্লাভিষ্ক।”^{৮১} একব্যক্তি আবু বাকর (রা)-কে সম্মোধন করে বলেন, হে আল্লাহর খলীফা। তখন তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রাসূলল্লাহ ﷺ-এর খলীফা বা স্লাভিষ্ক।”^{৮২}

এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ আয়াতের তাফসীরে এই তৃতীয় মতটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। শীঘ্ৰাগণ এ তাফসীরকে ওহীর সমতুল্য এবং ওহীর

^{৮০} তাবারী, তাফসীর ১/১৯৯-২০০; কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ১/২৬৩-২৭৫; ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৭০-৭১।

^{৮১} মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৭৮।

^{৮২} আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১০; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৫/১৮৪, ১৯৮।

সম্পূরক বলে গণ্য করে একে তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা দাবি করেন যে, মানুষ আল্লাহর খলীফা এবং এ খিলাফাতের চৃড়ান্ত রূপ নবীগণ ও আলী বংশের ইমামগণের মধ্যে বিরাজমান। আর কারো খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হতে হলে অবশ্যই তাকে তার মত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতে হবে। এ যুক্তিতে তারা দাবি করেন যে, আলী বংশের ইমামগণ মহান আল্লাহর মতই অলৌকিক গাইবী জ্ঞান, ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তা না হলে তাঁরা আল্লাহর খিলাফত কিভাবে চালাবেন? এভাবে তারা একটি তাফসীরকে ওহী হিসেবে গণ্য করে তার উপরে কিছু যুক্তি তর্ক দিয়ে একটি আকীদা বা বিশ্বাস তৈরি করেছেন, যা কুরআন বা হাদীসে কখনো কোথাও এভাবে বলা হয় নি।

এখানে ওহী ও তাফসীরের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। ওহীর নির্দেশনা যে, আদমকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ‘খলীফা’ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এতটুকু বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কেউ যদি তা অস্থিকার করে তবে তা অবিশ্বাস বলে গণ্য। তবে কার খলীফা তা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কোথাও বলেন নি। এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণের মতামত ইলমী আলোচনা বটে, কিন্তু ওহীর সমতুল্য নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উপরের তাফসীরগুলি গ্রহণযোগ্য এবং সাহাবী, তাবিয়ী বা পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরগণ থেকে বর্ণিত হলেও এগুলি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার মত বিশ্বাসের ভিত্তি নয়। এগুলি ইলমী ও ফিকহী আলোচনার সূত্র হলেও আকীদার উৎস নয়। এক্ষেপ গ্রহণযোগ্য তাফসীরের পাশাপাশি তাফসীর নামে অনেক উদ্ভৃত ও আজগুবি কথাও পাঠক অনেক গ্রন্থে দেখবেন, যেগুলির সাথে কুরআনের বাণীর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি তাফসীরের নামে বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন “যারা ক্রোধে নিপত্তিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়”^{৮৩}। এর তাফসীরে কোনো কোনো শীয়া মুফাস্সির বলেছেন যে, ক্রোধে নিপত্তিত অর্থ যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং পথভ্রষ্ট অর্থ যারা নিরপেক্ষ থেকেছেন বা উভয়দলকে ভাল বলেছেন। সূরা রাহমানে মহান আল্লাহ বলেন: ‘দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে বর্ণনা।’^{৮৪} এর তাফসীরে (!) এক্ষেপ কেউ কেউ বলেছেন যে, মানুষ সৃষ্টি

^{৮৩} সূরা (১) ফাতিহা: ৭ আয়াত।

^{৮৪} সূরা (৫৫) রাহমান: ১-৪।

করেছেন অর্থ মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থ আল্লাহর সকল গাইবী জ্ঞান তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ জ্ঞান তাঁর থেকে আলী বংশের ইমামগণ লাভ করেছেন!!!

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভাগের পিছনে এ কারণটি বিদ্যমান। কুরআনের অমুক আয়াতের তাফসীরে অমুক মুফাস্সিরের বক্তব্য, অমুক হাদীসের ব্যাখ্যায় অমুক মুহাদ্দিসের বক্তব্য ইত্যাদিকে ‘আকীদা’র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বিভাগে জন্ম নিয়েছে। ওহীর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতামতের মূল্য রয়েছে, তবে তা অবশ্যই মানবীয় মতামত যাত্র। কখনোই তা ওহীর সমর্প্যায়ের বা ওহীর সম্পূরক নয়।

১. ২. ৬. ৫. ধর্মগুরুগণ বা আলিমগণের মতামত

সকল ধর্মেই আলিমগণ বা ধর্মগুরুগণ ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং ধর্মের বিধিবিধান ও ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা প্রদান করেন। তবে ইহুদী-খ্স্টোন সম্প্রদায়, বিশেষত খ্স্টোন সম্প্রদায় ধর্মগুরু বা বুজুর্গদের ইসমাত বা অভাস্ত তা ও পবিত্র-আত্মা থেকে প্রাপ্ত কাশফ-ইলহামে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকেই দীনের চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তাদের বুজুর্গি, কারামত, কাশফ ও বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাদের মতামতকে তারা ওহীর মতই মর্যাদা দান করেছে। বরং ওহীর আর বিশেষ কোনো মূল্য থাকে নি। এ সকল ধর্মগুরু ওহীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। তাদের বক্তব্যের সারকথা ছিল, ওহীর বক্তব্য আমরা বুঝব না, এগুলি সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে ধর্মগুরু, পাদরি বা পোপ যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটিই ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে এরূপ বিশ্বাসকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করব।

মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভক্তি ও বিভাগের অন্যতম কারণ পরবর্তী আলিমগণের বক্তব্যকে আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। মূলত শীয়া ফিরকার অনুসারীগণই প্রথমত ইমাম ও নেককারদের ইসমাত ও তাদের ইলমু লাদুনী, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির অভাস্তার বিশ্বাস প্রচার করে। পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতার দিনগুলিতে কারামিতা, ফাতিমিয়াহ, ইসামদিলিয়াহ, বাতিনিয়াহ, নুসাইরিয়াহ, দুরুয ইত্যাদি শীয়া ফিরক সকল মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। অনেক সাধারণ নেককার মানুষও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে আলিম-বুজুর্গগণের মতামতকেই আকীদার মূল ভিত্তি ধরা হয়। অমুক আলিম অমুক

কথা বলেছেন, তিনি কি কিছুই জানতেন না? কাজেই কথাটি ঠিক এবং শুধু ঠিকই নয়, এর বিপরতীত কথা বিভ্রান্তি।

নিঃসন্দেহে ইসলামে আলিম ও নেককারগণের মর্যাদা রয়েছে। তবে তাঁরা মাসূম নন, তাদের মতামত কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। ভুলের কারণে যেমন কোনো নেককার ব্যক্তি বিষয়ে কু-ধারণা পোষণ করা যায় না, তেমনি কোনো নেককার বলেছেন বলেই তা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমরা উপরে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসের পরে ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মকে কুরআন ও হাদীসে শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কথা কুরআনে বা প্রথম তিন যুগে প্রসিদ্ধ ইমামগণ কর্তৃক গৃহীত সহীহ হাদীসে নেই সে কথা আকীদার অংশ হতে পারে না, ইলমী আলোচনার বিষয় হতে পারে। আকীদা একমাত্র কুরআন ও হাদীস থেকেই শিখতে হবে। যদি কুরআন বা হাদীসের কোনো নির্দেশন সুস্পষ্টভাবে পরম্পর বিরোধী হয় অথবা সে বিষয়ে মতভেদের সঠি হয় এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যার অধিকার সাহাবীগণের। তাঁরা যদি কিছু না বলেন তবে আমাদের কিছু বলার আর প্রয়োজন নেই। যে বিষয়ে যতটুকু বলে অথবা কিছু না বলে সাহাবীগণের ঈমান সঠিক থেকেছে সে বিষয়ে ততটুকু বললে অথবা কিছু না বললে আমাদের ঈমানও সঠিক থাকবে।

পরবর্তী যুগের আলিমগণ অনেক কথাই বলেছেন। প্রথম তিন মুবারক শতাব্দীর পরে, এবং বিশেষত, ক্রুসেড যুদ্ধে আক্রান্ত এবং পরে তাতার আক্রমনে পরাজিত ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজগুলিতে অনেক আলিম, বুজুর্গ অনেক কথা বলেছেন, তাদের বিপরীতেও অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের দেখতে হবে, এ সকল কথা কি সাহাবীগণ বলেছেন? যদি তাঁরা কিছু না বলেন তবে আমাদের মুক্তির পথ হলো কিছু না বলা। কিছু বললে তা অলস ইলমী বিতর্ক হতে পারে, তবে আকীদার বিষয় হতে পারে না।

উম্মাতের সকল আলিম ও বুজুর্গই সম্মানিত। তাদের সম্মান করা মুমিনের দায়িত্ব। তাদের মাধ্যমেই দীন আমরা পেয়েছি। তবে সম্মান করা এবং অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করা এক নয়। উম্মাতের পরবর্তী যুগের আলিমগণ অনেক কথা বলেছেন, তাদের মতামতের সম্মান করতে হবে এবং কোনো মত বাহ্যিত সুন্নাতের বিপরীত হলে তার ভাল ব্যাখ্যা করতে হবে। তবে কখনোই তাকে আকীদার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না বা এরূপ মতের ভিত্তিতে কুরআন বা সুন্নাতের নির্দেশনার ব্যাখ্যা করা যায় না।

১. ২. ৬. ৬. মানবীয় জ্ঞান-বৃদ্ধি ও যুক্তি-কিশাস

‘আকীদা’ বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ‘আকল’ বা মানবীয় জ্ঞানবৃদ্ধির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দিঘুখি বিভাসি বিদ্যমান। কিছু মানুষ ‘ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে ‘আকল’-কে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন যে, অতিস্তীয় বা গাইবী বিষয়ে ওহাইর মাধ্যমে যা কিছু বলা হবে তাই বিশ্বাস করতে হবে, তা যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হোক। এ কারণে মানবীয় জ্ঞান ও বৃদ্ধি-বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক আজগুবি ও উন্নত বিষয়াদি ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা নামে প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের পরবর্তী ধর্মগুরুগণ। বিশেষত বিকৃত খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাস মানবীয় জ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহর একত্ব ও ত্রিতৃতীয় বিশ্বাস এমনই। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর সন্তা তিনজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এ তিন ব্যক্তি সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর, কিন্তু তারা তিন ঈশ্বর নন, বরং এক ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রকৃতই তিন এবং প্রকৃতই এক। এরূপ উন্নত কথাকে তারা বিভিন্নভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেন: বিষয়টি অযৌক্তিক ও অবাস্তব, তবে যেহেতু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তাই আমরা বিশ্বাস করি (an irrational truth found in revelation)

তাদের এ কথাটি প্রতারণা মাত্র। প্রথমত, কখনোই কোনো ধর্মগ্রন্থে ত্রিতৃবাদের এ কথাগুলি নেই। প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও কোথাও ত্রিতৃবাদ (Trinity) শব্দটিই নেই, এর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা তো অনেক দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো ধর্মগ্রন্থে এরূপ কথা থাকে তবে তা প্রমাণ করবে যে, তা মহান আল্লাহর দেওয়া ওহী নয়; কারণ ওহী ও মানবীয় জ্ঞান উভয়ই একই উৎস থেকে আগত, কাজেই উভয়ের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে সংঘর্ষ থাকতে পারে না।

প্রচলিত খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের আরেকটি মূল বিষয় প্রায়চিত্তবাদ। তারা বিশ্বাস করেন যে, আদমের ফল ভক্ষণের কারণে তার সকল সন্তানই পাপী ও চিরঙ্গায়ী জাহানার্মী। এ পাপ মোচনের জন্য একটি কুরবানী বা উৎসর্গ প্রয়োজন। আর এজন্য যীশু দ্রুশে মৃত্যুবরণ করে সকল আদম সন্তানের পাপের প্রায়চিত্ত করেন। নিঃসন্দেহে বিষয়টি মানবীয় জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। একের পাপে অন্যের জাহানার্মী পাওনা হওয়া যেমন উন্নত, তেমনি একের জাহানার্মুক্তির জন্য নিরপরাধ অন্য আরেকজনের শাস্তি দেওয়াও উন্নত। এ বিষয়ে মেজর ইয়েটেস ব্রাউন নামক জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিত বলেন:

"No heathen tribe has conceived so grotesque an idea, involving as it does the assumption, that man was born with a

hereditary stain upon him, and that this stain (for which he was not personally responsible) was to be atoned for, and that the creator of all things had to sacrifice His only begotten son to neutralise this mysterious curse.”⁸⁵

অন্য আরেক দল মানুষ ঠিক এর বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন। তারা ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আকলকেই প্রধান বলে গণ্য করেছেন। তাদের মতে ওহীর বিষয়টি সকলের জন্য বোধগম্য নয়, কাজেই ওহীর কোন্ বক্তব্য সঠিক এবং কোন্টি ভুল বা ঝুপক তা আকল দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। এ যুক্তিতে তারা মানবীয় আকলকে গাইবী জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিকগণ এবং মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ফিরকা। এরা ওহীর বিচারে মানবীয় আকলকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রদান করেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ আকলের নামে নিজ নিজ পছন্দ, অনুভূতি ও মতামত আকীদা বানিয়ে ফেলে।

ইসলামের নির্দেশনা এর মাঝামাঝি ও সময়স্থলক। ওহীর শিক্ষা জ্ঞানের সঠিকত্ব প্রমাণ করে এবং জ্ঞানের নির্দেশনা ওহীর সঠিকত্ব প্রমাণ করে। গাইবী বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহী বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে এবং মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্তাধীন বিষয়ে ওহী বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে না, বরং মৌলিক দিক নির্দেশনা দেয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়াধীন বিষয়ে মানবীয় জ্ঞান বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে এবং গাইবী বিষয়ে সাধারণ দিক নির্দেশনার মধ্যে সীমিত থাকে। মানবীয় জ্ঞান, বৃদ্ধি বা বিবেক ওহীর যৌক্তিকতা বিচার করবে। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার ‘আকল’ বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ‘আকল’-এর নামে মনমর্জি বা ‘হাওয়া’-(الهوى)-র অনুসরণ করার ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা বারংবার জানিয়েছেন।

মানবীয় জ্ঞান-বৃদ্ধি মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। মহান আল্লাহ মানুষকে এ নিয়ামত দিয়েই সর্বোচ্চ র্যাদা প্রদান করেছেন। যেহেতু আকল ও ওহী দুটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নেয়ামত সেহেতু এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। তবে এ দুয়ের বিচরণ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রথক।

একটি উদাহরণ থেকে আমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব। ওহীর নামে যদি বলা হয় স্রষ্টা নরমাংস ভক্ষণ পছন্দ করেন, অথবা নরববলিতে স্রষ্টা খুশি হন, অথবা স্রষ্টা মানুষের মনের কথা জানেন না, অথবা তিনি অনেক বিষয় দেখতে পান না, অথবা স্রষ্টাকে কোনোভাবে প্রতারণা করে

⁸⁵ Ahmed Deedat, The Choice, Volume 2, page 165.

তাঁর বরলাভ বা জান্মাত লাভ সম্ভব... তবে তা মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিক্ষা নয় বলেই প্রমাণিত হবে। কারণ এ সকল বিষয় মানবীয় বুদ্ধি বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক।

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল-করুণাময় এবং তিনি ন্যায়বিচারক ও শান্তিদাতা তবে উভয় বিষয়ই মানবীয় জ্ঞানে সম্ভব ও যৌক্তিক। যেহেতু বিষয়দুটিই যৌক্তিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেহেতু এ বিষয়ে ওহীর নির্দেশাবলি সরল অর্থে বিশ্বাস করাই মুমিনের দায়িত্ব। এখন যদি কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে উভয় বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করে তার সমাধানকল্পে বিভিন্ন মতামত তৈরি করেন এবং এরপ তৈরি করা মতামতের ভিত্তিতে ওহীর শিক্ষা বাতিল বা ব্যাখ্যা করেন তবে তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি। যেমন কেউ বলেন, যেহেতু আল্লাহ ন্যায় বিচারক সেহেতু তিনি কোনো পাপী মুসলিমকে শান্তি ছাড়া ক্ষমা করতে পারেন না, কাজেই যে সকল আয়াত বা হাদীসে পাপী মুমিনকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে তা বাতিল বা তার অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে। এর বিপরীতে অন্যরা বললেন, মহান আল্লাহ যেহেতু ক্ষমাশীল, সেহেতু তিনি কোনো মুমিনকে শান্তি দিতে পারেন না, অতএব পাপী মুমিনের শান্তি বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীস স্বাভাবিক সরল অর্থে গ্রহণ না করে ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে হবে। এরপ সকল মতামতই বিভ্রান্তিকর। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, আল্লাহর বিশেষণ ও কর্ম বিষয়ক সকল বিভ্রান্তির উৎস ছিল গাইবী বিষয়ের সকল কিছু জ্ঞান দিয়ে চূড়ান্তভাবে জেনে নেওয়ার অপচেষ্টা করা।

আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস-ইজতিহাদ ও যুক্তিনির্ভরতার বিষয়ে ইমাম আবু ইউসূফ (১৮২ হি) বলেন:

لِيْسَ التَّوْحِيدُ بِالْقِيَاسِ... . لَأْنَ الْقِيَاسَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ لَهُ شَبَهٌ وَمُثْلٌ، فَإِنَّهُ تَعَالَى وَتَقَسَّ لَا شَبَهٌ لَهُ وَلَا مُثْلٌ لَهُ... فَقَدْ أَمْرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَكُونَ تَابِعًا سَامِعًا مُطِبِّعًا وَلَوْ يُوَسِّعَ عَلَى الْأَمَّةِ النَّاسُ التَّوْحِيدَ وَابْتِغَاءَ الإِيمَانِ بِرَأْيِهِ وَقِيَاسِهِ وَهُوَاهُ إِذْنَ لِضَلْوَا، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ: لَوْ اتَّبَعُ الْحَقَّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) فَافْهَمْ مَا فَسَرَ بِهِ ذَلِكَ.

“তাওহীদ বা আকীদা কিয়াস দ্বারা শেখা যায় না। কারণ কিয়াস তো চলে এমন বিষয়ে যার তুলনা আছে ও নমুনা আছে। আর মহান মহাপরিত্ব আল্লাহর তো কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই। মহান আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তুমি অনুসরণ করবে, শুনবে ও আনুগত্য করবে। যদি উম্মাতকে তাওহীদ সঞ্চান ও ঈমান অর্জনের জন্য নিজস্ব মতামত, কিয়াস ও পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয় তবে সবাই বিভ্রান্ত

হয়ে যাবে। তুমি কি শুন নি? মহান আল্লাহ বলেছেন: 'সত্য যদি এদের মতামত-পছন্দের অনুগত হতো তবে বিশ্বজ্ঞল হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু।'^{৮৬} কাজেই এ আয়াতের তাফসীর ভাল করে হৃদয়ঙ্গম কর।"^{৮৭}

১. ও. ইসলামী আকীদার গুরুত্ব

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইসলামী আকীদার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

- (১) বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ
- (২) ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ
- (৩) বিভাস্তিকর আকীদাসমূহ, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ

মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলি বিষদভাবে অবগত হওয়া তার দুনিয়া ও আখ্যাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।

১. ও. ১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ। আর ভূল বিশ্বাস বা কুসংস্কার মানুষের মনকে সদাব্যস্ত, অস্থির ও হতাশ করে ফেলে।

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমষ্টিয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট করুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ শির্ক-কুফরমুক্ত ঈমান। কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لِهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُوا سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا

“এবং যে ব্যক্তি পরলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয় তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম করুল করা হবে।”^{৮৮}

^{৮৬} সূরা (২৩) মুমিনুন: ৭১ আয়াত।

^{৮৭} ইবনু মানদাহ, আত-তাওহীদ ও ইসবাতু সিফাতির রাব ৩/৩০৪-৩০৬; যাকারিয়া, আশ-শিরক ১/৮৬-৮৮।

^{৮৮} সূরা (১৭) বনী ইসরাইল (ইসরার): ১৯ আয়াত।

দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান। আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ نَكَرْ أُوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা সংকর্ষ করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব এবং (আবিরাতে) তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরক্ষার দান করব।”^{১৯}

দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে সৎ জীবন ধাপন করতে হবে। আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধর্ষণ ও ক্ষতি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى أَمْنُوا وَأَنْفَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“যদি জনপদ সমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করল, কাজেই আমি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দান করলাম।”^{২০}

আল্লাহর বস্তুত ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান। আল্লাহ বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَقُولُونَ

“জেনে রাখ! আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্ত ছান্ত ও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে।”^{২১}

এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়:

প্রথমত, আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান স্তুতির অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ওহীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য

^{১৯} সূরা (১৬) নাহল: ৯৭ আয়াত।

^{২০} সূরা (৭) আরাফ: ৯৬ আয়াত।

^{২১} সূরা (১০) ইউনূস: ৬২-৬৩ আয়াত।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়।

ধিতীয়ত, আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখব যে, ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে অনেক জাতিই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াত ও ঈমান লাভ করেছে। কিন্তু তারা তা সংরক্ষণ করতে পারে নি। বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

১. ৩. ২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানশালোভে শুরুত্ব

কুরআন কারীমের ইহুদী, খ্স্টান, আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই নিজদেরকে খাটি মুমিন বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত। তার মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনকেই বিদ্রোহ ও পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে প্রাণ খাটি ধর্মের ব্যতিক্রম বলে মনে করত। অথচ তারা সকলেই ঈমান বিনষ্টকারী শিরক, কুফর ইত্যাদির মধ্যে লিঙ্গ ছিল। তারা অনেক নেককর্ম করত এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করত। কিন্তু ঈমান-বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শিরুক-কুফরে লিঙ্গ থাকা অবস্থায় এ সকল কর্ম কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبِطَنَ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি এ ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিঙ্গ হও, তবে অবশ্যই তোমার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি নিশ্চিতকাপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”^{১২}

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”^{১৩}

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا

^{১২} সূরা (৩৯) যুমার: ৬৫ আয়াত।

^{১৩} সূরা (৫) মায়দা: ৫ আয়াত।

“আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।”^{১৪}

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখব। এজন্য ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলির কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির বিভাস্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। অন্যথায় শয়তানের প্ররোচনায় অর্জিত ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

১. ৩. ৩. বিভাস্তিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে জেনেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি থেকেও জানতে পারব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ। সকল বিষয়ের ন্যায় ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের পথ। তিনি যে কর্ম করেন নি সে কর্মকে বৃজুর্গি বা দীনদারি মনে করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অপূর্ণ বলে গণ্য করা এবং পাপ। অনুরূপভাবে বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেন নি তা বলা বা অনুরূপ কোনো বিষয়কে ইসলামী বিশ্বাসের অর্তভুক্ত বলে গণ্য করাও তাঁর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও অপূর্ণ মনে করা। এরূপ করা কঠিন পাপ। কর্মের ক্ষেত্রে নেককার হলেও বা কর্মের ক্ষেত্রে পাপী না হলেও বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নাত-বিরোধিতার কারণে এ ব্যক্তি পাপী হন। এরূপ ব্যক্তি বিশ্বাসের বিভাস্তির কারণে জাহান্নামী হবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এ বিষয়ক একটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। আরো অনেক হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, বিশেষত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করব। এখানে এ সকল ফিরকার জাহান্নামী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির। বরং আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের ব্যতিক্রম বিশ্বাস উত্তোলনের ফলে তারা আকীদাগত পাপে নিপত্তি হয় এবং এজন্য তারা জাহান্নামী হবে। আর সাধারণভাবে আকীদাগত বিদ্বাত কর্মগত বিদ্বাতের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এজন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ করতেন তা জানা মুমিনের অতীব প্রয়োজন। তাঁরা যা বলেছেন তা বলা, তাঁরা যা বলেন নি তা না বলা এবং সকল ক্ষেত্রে হবহ তাঁদের অনুসরণ করার জন্য ইলমুল আকীদার পঠন ও পাঠন মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব।

^{১৪} সূরা (৪) নিসা: ৪৮ আয়াত।

১. ৪. আকীদা বিশয়ক গ্রন্থাবলি

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ইসলামী বিশ্বাসের সকল মূল বিষয়ই কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেও তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূল ধারা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লিখতে শুরু করেন। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বইগুলি উল্লেখ করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন।

১. আল-ফিকহুল আকবার, ইমাম আবু হানীফাহ (১৫০ হি)।
২. আস-সুন্নাহ, ইমাম আহমদ ইবনু হাথাল (২৪১ হি)।
৩. আল-ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-আদ্দী (২৪৩ হি)
৪. আস-সুন্নাহ, আবু বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসরাম (২৭৩হি),
৫. আস-সুন্নাহ, হাথাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাথাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি)
৬. আস-সুন্নাহ, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস'আস (২৭৫ হি)
৭. আস-সুন্নাহ, আবু বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহ্হাক (২৮৭ হি)
৮. আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাথাল (২৯০ হি)
৯. আস-সুন্নাহ, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ায়ী (২৯৪ হি)
১০. সারীভুস সুন্নাহ, আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি)
১১. আস-সুন্নাহ আবু বাক্র আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (৩১১ হি)
১২. আস-সুন্নাহ, আবু বাক্র খাল্লাল আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি)।
১৩. আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবু জাফার তাহাবী (৩২১ হি)।
১৪. আল-ইবানাতু আন উস্লিদ দিয়ানাহ, আল-আশ'আরী (৩২৪ হি)।
১৫. আস-সুন্নাহ, আল-আস্মাল (৩৪৯ হি)।
১৬. আস-সুন্নাহ, সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০হি)
১৭. আশ-শরী'আহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইল আল-আজুরৱী (৩৬০ হি)
১৮. আস-সুন্নাহ, আবুশ শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়ান আল-

আসপাহানী (৩৬৯ হি)

১৯. আস-সুন্নাহ, ইবনু শাহীন আবৃ হাফস উমার ইবনু আহমদ ইবনু উসমান আল-বাগদাদী (৩৮৫হি)
২০. আর-রিসালাহ আল-কাইরোয়ানিয়্যাহ, আবৃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী যাইদ আল-কাইরোয়া মালিক-আস-সাগীর (৩৮৬হি)
২১. আস-সুন্নাহ, ইমাম আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্দাহ আল-ইসপাহানী (৩৯৫ হি)
২২. 'আল-ঈমান', ইবনু মান্দাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৯৫ হি)
২৩. ই'তিকাদ আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, আবুল কাসিম লালকাঙ্গি হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান (৪১৮ হি)।
২৪. আকীদাতুস সালাফি আহলিল হাদীস, ইসমাইল ইবনু আব্দুর রাহমান আস-সাবুনী (৪৪৯ হি),
২৫. আদ-দুর্রাতু ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুল, আবৃ মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমদ ইবনু সাঈদ ইবনু হায়ম আয-যাহিরী (৪৫৬ হি)।
২৬. আল-ই'তিকাদ, আহমদ ইবনু হসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮ হি)।
২৭. আল-ই'কতিসাদ ফিল ই'তিকাদ, আবৃ হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-গায়লী (৫০৫ হি)
২৮. 'আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ', উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.)
২৯. 'শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ', সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী (৭৯১হি.)
৩০. 'শারহুল আকীদাহ আত তাহবীয়্যাহ', মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি.)
৩১. কিতাবুত তাওয়ীদ, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাৰ হাম্বালী (৭৯৫ হি)
৩২. 'শারহুল ফিকহিল আকবার', মোল্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি)
আকীদার বিষয়ে যুগে যুগে আলিমগণ আরো অগণিত ধৰ্ম রচনা করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দল-উপদলের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্নিকর মতবাদের প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত সহীহ মতামত ব্যাখ্যা করেও ইমামগণ অগণিত বই-পুস্তক রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাওহীদের ঈমান

২. ১. আরকানুল ঈমান

একজন মানুষকে মুমিন বলে গণ্য হতে কি কি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তা কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসেও তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এগুলিকে ‘আরকানুল ঈমান’ বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন:

لَئِنَّ الْبَرَّ أَنْ تُؤْلِوَا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حِبَّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَّةَ وَالْمُؤْفَفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابَرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো পূর্ণ নেই। কিন্তু পুর্ণ তার যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহে, পরকালে, মালাকগণে (ফিরিশতাগণে), গ্রহসমূহে এবং নবীগণে, এবং ধন সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন-অনাথ, অভাবগ্রস্ত, পথিক, সাহায্যপ্রার্থনাকারিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করে, এবং সালাত কার্যেম করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিক্রিতি দিলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ ক্রেশে ও সংগ্রাম-সংকটে দৈর্ঘ্য ধারণ করে। এরাই প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুস্তাকী।”^১

এখানে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, শুধু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় কোনো পূর্ণ নেই। ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। এখানে আল্লাহ মুমিনের বিশ্বাসের মৌলিক পাঁচটি বিষয় এবং তার মৌলিক কর্ম ও চরিত্রের বর্ণনা দান করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

^১ সূরা (২) বাকারা: ১৭৭ আয়ত।

وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ

“রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবর্তীর্ণ করা হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুনিগণও। তারা সকলেই আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর গ্রন্থসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ইমান আনয়ন করেছেন। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।”^২

এখানে ঈমানের শক্তিগুলির মধ্য থেকে ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে ৫টি বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابُ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمَ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহে, তাঁর রাসূলে, তাঁর রাসূলের উপর যে গ্রন্থ অবর্তীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবর্তীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।”^৩

এভাবে কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে উপরের বিষয়গুলি একত্রে বা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসেও ঈমানের কুক্লগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকের শুরুতে আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, ঈমানের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “(ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর পুস্তকসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে।”^৪

এই ঘটনারই বর্ণনা করেছেন উমার ইবনুল খাতাব (রা) অন্য হাদীসে। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তথায় আসলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত ধৰ্বধরে সাদা এবং মাথার চুলগুলো অত্যন্ত পরিপাটি ও কাল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে বলেন: “ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলেন, ঈমান কী তা আমাকে বলুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

^২ সূরা (২) বাকারাঃ ২৮৫ আয়াত।

^৩ সূরা (৮) নিসা: ১৩৬ আয়াত।

^৪ বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৮/১৭৩০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯, ৪০, ৪১।

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ
خَيْرٌ وَشَرٌّ

“ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর গ্রন্থসমূহে, তাঁর রাসূলগণে এবং পরকালে, এবং বিশ্বাস করবে আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণে (ভাগ্যে), তাঁর ভাল এবং মন্দে।”^৫

এভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামী ঈমানের বা ‘আল-আকীদাহ আল ইসলামিয়াহ’-র ছয়টি মৌলিক সূত্র রয়েছে: (১) আল্লাহর উপর ঈমান, (২) আল্লাহর মালাকগণের (ফিরিশতাগণের) প্রতি ঈমান (৩) আল্লাহর গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান, (৪) আল্লাহর রাসূলগণের উপর ঈমান, (৫) পুনরুত্থান, কিয়ামত, পরকাল বা আখিরাতের উপর ঈমান, এবং (৬) তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের উপর ঈমান। এ বিষয়গুলোকে আরকানে ঈমান, অর্থাৎ ঈমানের সূত্রসমূহ, ভিত্তিসমূহ বা মূলনীতিসমূহ বলা হয়।

২. ২. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহর একত্বে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রতি ঈমানের বর্ণনা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بُنِيَّ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ -
وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، وفي رواية
ثلاثة: أن يُوحَّدَ اللَّهُ، وفي أخرى: أن يُعْبَدَ اللَّهُ وَيَكْفُرَ بِمَا دُونَهُ - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وفي رواية: صيام رمضان والحج

“ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হলো: বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাঝে বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বাদ্দা ও রাসূল, (অন্য বর্ণনায়: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু (উপাস্য) আছে সবকিছুকে অবিশ্বাস করা), সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদান মাসের সিয়াম (রোগ্য) পালন করা, বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করা।”^৬

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

^৫ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫-৩৬।

^৬ খুখারী, আস-সহীহ, ১/১২, ৪/১৬৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৫।

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَمَةُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ

“যে কোনো ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাঝুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তবে তাঁর জন্য আল্লাহ জাহানামের আগুন হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবেন।”^৭

২. ৩. তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা

‘তাওহীদ’ শব্দটি আরবী ‘ওয়াহাদা’ (وَحْدَة) ক্রিয়ামূল থেকে গঢ়ীত, যার অর্থ ‘এক হওয়া’, ‘একক হওয়া’ বা ‘অতুলনীয় হওয়া’ (to be alone, unique, singular, unmatched, without equal, incomparable)। তাওহীদ অর্থ ‘এক করা’, ‘এক বানানে’, ‘একত্রিত করা’, ‘একত্রের ঘোষণা দেওয়া’ বা ‘একত্রে বিশ্বাস করা’। তাওহীদের ব্যবহারিক অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলি আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লিখিত তাওহীদের পরিচিতি আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি যে, উপরের হাদীসগুলিতে তাওহীদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: ﴿إِلَّا هُوَ لَهُ وَحْدَهُ﴾ “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।” বিভিন্ন বর্ণনায় এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে: ﴿لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ “তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।” আমরা প্রথমে এ বাক্যটির বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝার চেষ্টা করব।

আরবীতে (إِلَّا) শব্দের অর্থ হলো নেই, মোটেও নেই বা একেবারে নেই। এই বাক্যে শব্দটি (نفي الجنس) বা মোটেও নেই বা একেবারেই নেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(إِلَّا) শব্দের অর্থ হলো “মাঝুদ”, অর্থাৎ উপাস্য বা পূজ্য, যার কাছে মনের আকৃতি পেশ করা হয়, প্রয়োজন যেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ৪৮ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিধ ও অভিধান-প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন:

اللهمة واللام وللهاء أصل واحد، وهو التعبد. فالإله الله تعالى، وسمى بذلك لأنَّه معبد

“হাম্যা, লাম ও হা=ইলাহ: ধাতুটির একটিই মূল অর্থ, তা হলো ইবাদত করা। আল্লাহ ইলাহ কারণ তিনি মাঝুদ বা ইবাদতকৃত।”^৮

^৭ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬১।

^৮ ইবনু ফারিস, মুজাম মাকাইসুল্লাগাহ ১/১২৭।

আরবী ভাষায় সকল প্রজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই ‘ইলাহ’ বলা হয়। এজন্য সূর্যের আরেক নাম ‘ইলাহাহ’ (هـلـاـهـ) ; কারণ কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্যের উপাসনা বা পূজা করত।^{১০} মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَّذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيُدْرِكُوا أَهْلَهُنَّكَ

“ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে রাজ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে দিবেন?”^{১১}

ইবনু আবুস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এখানে ‘আলিহাতাকা (أَلْهَاتْكَ) স্থলে ‘ইলাহাতাকা’ (إِلَهَاتْكَ) পড়তেন। ‘ইলাহাত’ অর্থ ইবাদত, অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে আপনাকে এবং আপনার ইবাদত করা বর্জন করতে দিবেন?”^{১২}

এভাবে আমরা দেখছি যে, (ইলাহাত) শব্দটি আরবীতে (ইবাদাহ) শব্দের সমার্থক^{১৩}। এই ‘ইবাদাত’ বা ‘ইবাদাহ’ (الْعِبَادَة) শব্দের অর্থ আমরা বাংলায় সাধারণভাবে উপাসনা বা পূজা বলতে পারি। তবে ইসলামের পরিভাষায় ‘ইবাদাত’ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ এবং এর বিভিন্ন প্রকার ও স্তর রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। আমরা আমাদের আলোচনায় সাধারণভাবে উপাসনা, পূজা, ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে ‘ইবাদাত’ ব্যবহার করব, যেন আমরা এই ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির সকল অর্থ ও ব্যবহার ভালভাবে বুঝতে পারি।

(৪) শব্দের অর্থ : ব্যক্তিত ছাড়া বা ভিন্ন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, (اللَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) বাক্যটির অর্থ: “আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই”। অর্থাৎ যদিও আল্লাহ ছাড়া অন্য অনেক কিছুকেই ইবাদত, উপাসনা, পূজা বা আরাধনা করা হয়, তবে সত্যিকারভাবে ইবাদত করার যোগ্য বা মানুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। আল্লাহই সকল প্রকার ইবাদাতের তিনিই একমাত্র অধিকারী। ইসলামের পরিভাষায় ইবাদাত বলা হয় এমন সব কিছুই একমাত্র তাঁর জন্য।

^{১০} ইবনু ফারিস, মুজামু মাকাহিসিলুগাহ ১/১২৭; রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ২১।

^{১১} সূরা (৭) আ'রাফ: ১২৭ আয়াত।

^{১২} তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১/৫৪।

^{১৩} ইবনু মানয়ুর, লিসানুল আরব ১৩/৪৬৮-৪৬৯।

বিভিন্ন হাদীসে এই বাক্যের সাথে যোগ করা হয়েছে: (لَا شَرِيكَ) ^{الله}। আমরা দেখেছি যে, আরবীতে (وَ) ক্রিয়াপদটির অর্থ: এক হওয়া বা অতুলনীয় হওয়া।

(৪) শব্দটি মোটেও নেই বা কিছুই নেই অর্থ প্রকাশ করছে।

(شَرِيكَ) অর্থ অংশীদার বা সহযোগী। শব্দটি আরবী থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে এবং ‘অংশীদার’ অর্থে ‘শরিক’ এখন বাংলা ভাষায় অতি পরিচিত শব্দ। আরবীতে শিরক (شِرِيكَ) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate)। ইশরাক (إِشْرَاكَ) ও তাশ্রীক (تَشْرِيكَ) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে ‘শিরক’ শব্দটিকেও আরবীতে ‘অংশীদার করা’ বা ‘সহযোগী বানানো’ অর্থে ব্যবহার করা হয়।^{১৩}

(৫) অর্থ ‘তাঁর’ বা ‘তাঁর জন্য’।

এভাবে দেখেছি যে, তাওহীদের ঘোষণা বা সাক্ষ্যের এই অংশের অর্থ: মহান আল্লাহ একক ও অতুলনীয়, তাঁর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই।

২. ৪. তাওহীদের প্রকারভেদ

আকীদার উৎসের বিচ্ছিন্নির কারণে, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের গভীর অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে, আভিধানিক অর্থ, নিজের বৃদ্ধি-বিবেক, দর্শন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাওহীদের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে অনেক পণ্ডিত মনে করেছেন যে, ‘তাওহীদ’ অর্থ মহান আল্লাহকে একমাত্র অনাদি সন্তা বা একামাত্র সৃষ্টি ও সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করা। তাদের এ চিন্তা কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনের অগণিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের ও অন্যান্য জাতির কাফিরগণ আল্লাহর অস্তিত্বের একত্বে বিশ্বাস করত এবং তাঁকেই একমাত্র সৃষ্টি ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালন হিসেবে বিশ্বাস করত। এতটুকুতেই যদি তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়, তবে তো আর তাদেরকে কাফির বলার বা তাদের হেদোয়াতের জন্য নবী-রাসূলগণের আগমনের প্রয়োজন থাকত না।

কুরআন ও হাদীসের অগণিত বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের একাধিক পর্যায় বা ত্রুটি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

“তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।”^{১৪}

^{১৩} আল-ফাইয়ুমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, পৃ. ৩১০।

^{১৪} সূরা (১২) ইউসুফ: ১০৬ আয়াত।

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর্যায় রয়েছে, যে কারণে ঈমানের সাথে সাথে শিরক একত্রিত হতে পারে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী ইবনু আবুস (রা) বলেন,

من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وهم مع ذلك يشركون به وبعدهون غيره ويستجدون للأئداد دونه

“তাদের ঈমান হলো, যদি তাদের বলা হয়, আকাশ কে সৃষ্টি করেছে? পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? পাহাড় কে সৃষ্টি করেছে? তারা বলে: আল্লাহ, অথচ তারা শিরক করে ... এরপরও তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, আল্লাহ ব্যতীরেকে অন্যদের সাজদা করে।”^{১৫}

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির মুজাহিদ ইবনু জাবর (১০৪ হি) বলেন:

إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره

“তাদের ঈমান হলো তারা বলে, (একমাত্র) আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের রিয়ক দেন এবং তিনিই আমাদের মৃত্যুদেন। এ হলো তাদের ঈমান, এর সাথে তারা তাদের ইবাদতে গাইরুল্লাহর ইবাদত করে শিরক করে।”^{১৬}

অনুরূপভাবে সাইদ ইবনু জুবাইর (৯৫হি), আমির ইবনু শারাহীল শা'বী (১০৪ হি), ইকরিমাহ মাওলা ইবনু আবুস (১০৫ হি), আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৫ হি), কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ (১১৭ হি), আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৭০ হি) ও অন্যান্য তাবিয়ী ও তাবিতাবিয়ী মুফাস্সির বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, সকল কাফিরই আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, রিয়্কদাতা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতো।^{১৭}

এ ভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের অন্তত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং কাফিরগণ একটি বিশ্বাস করতো এবং একটি অস্বীকার করত। কুরআন কারীমের এজাতীয় অগণিত নির্দেশনা ও সাহাবী-তাবিয়গণের এ সকল তাফসীরের আলোকে পরবর্তী যুগের আলিমগণ ‘তাওহীদ’-কে দুভাগে ভাগ করেছেন। কেউ কেউ দুটি পর্যায়কে আরো বিস্তারিতভাবে তিনটি বা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

^{১৫} তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১৩/৭৭-৭৮।

^{১৬} তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১৩/৭৮।

^{১৭} তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১৩/৭৭-৭৯।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুন্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয়্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) তাঁর রচিত ‘শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ’ পুস্তকে তাওহীদকে প্রথমত দু পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মারিফাহ (توحيد الإثبات والمعرفة) বা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ এবং (২) তাওহীদুত তালাবি ওয়াল কাসদি (توحيد الطلب والقصد) বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।^{১৮} অন্যত্র তিনি উক্ত প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তাওহীদকে তিনি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত, (২) তাওহীদুর রূবুবিয়্যাত ও (৩) তাওহীদুল ইলাহিয়্যাহ।^{১৯}

প্রসিদ্ধ আলিম ও সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলজী (১১৭৬হি) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে তিনি পর্যায়ে বিভক্ত করেন এবং এভাবে তিনি তাওহীদকে চার পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন:

- (১) আল্লাহকে একমাত্র অনন্ত সন্তা বলে বিশ্বাস করা
- (২) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র স্বষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা
- (৩) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা।
- (৪) আল্লাহকে একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা।^{২০}

এভাবে আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের মূলত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম পর্যায়টির একাধিক পর্যায় রয়েছে। এখানে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাওহীদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করব।

২. ৪. ১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ

আমরা দেখেছি যে, এ পর্যায়ের তাওহীদকে তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মারিফাহ বা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ বলা হয়। কখনো বা (التوحد العلمي) (الخبرى) অর্থাৎ ‘জ্ঞান ও সংবাদের একত্ব’ বলা হয়।^{২১} জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের দুইটি মূল বিষয় রয়েছে: ১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব, ও ২) নাম ও গুণাবলীর একত্ব।

২. ৪. ১. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব

আরবীতে একে ‘তাওহীদুর রূবুবিয়্যাহ’ (توحيد الربوبية) এবং ‘প্রতিপালনের একত্ব’ বলা হয়।^{২২} এর অর্থ বিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি,

^{১৮} ইবনু আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৮৯।

^{১৯} ইবনু আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭৮।

^{২০} শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলজী, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৬।

^{২১} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫।

^{২২} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫।

প্রতিপালন, সংহার ইত্যাদির বিষয়ে আল্লাহর একত্র। তাওহীদুর রূব্বিয়াহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্রে বিশ্বাস করার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

কুরআন কারীমে বিভিন্ন আয়াতে ‘তাওহীদুর রূব্বিয়াহ’ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।”^{২৩}

তিনি আরো বলেছেন:

أَلَا لِلَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“জেনে রাখ! সৃষ্টি ও নির্দেশনা (পরিচালনা) একমাত্র তাঁরই, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ মহিমাময়।”^{২৪}

তিনি আরো বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ نُوْفُ القُوَّةِ الْمُتَّيْنِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহই মহাশক্তিময় রিয্ক-দাতা।”^{২৫}

অন্যত্র তিনি বলেছেন :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَةً تَقْدِيرًا

“তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।”^{২৬}

এভাবে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্রের কথা বলা হয়েছে।

২. ৪. ১. ২. অধিকাখণ কাফির এ পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ পর্যায়ের তাওহীদের বিষয়ে কাফির-মুশরিকদের মধ্যে তেমন কোনো আপত্তি বা মতভেদ ছিল না। সাধারণভাবে কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা, প্রতিপালক, রিয্কদাতা, জীবনদাতা, একক

^{২৩} সূরা (১) ফাতিহা: ১ আয়াত।

^{২৪} সূরা (৭) আরাফ: ৫৪ আয়াত।

^{২৫} সূরা (৫) যারিয়াত: ৫৮ আয়াত।

^{২৬} সূরা (২৫) ফুরকান: ২ আয়াত।

সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ বিশ্বসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ইবাদত করত। তারা আল্লাহর ইবাদাত করার সাথে সাথে ফিরিশতাগণ, কোনো কোনো নবী-রাসূল, সত্য বা কল্পিত আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁদের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা পাথরের 'ভক্তি' করত। 'ভক্তি'-র প্রকাশ হিসেবে তারা এ সকল দ্রব্য বা স্থানে 'সাজাদা' করত, মানত করত বা প্রার্থনা করত, যে সকল কর্ম ইসলামের পরিভাষায় 'ইবাদত' বলে গণ্য। তারা কখনোই দাবি করত না যে, এ সকল 'উপাস্য' এ বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে বা প্রতিপালন করে, বরং তারা আল্লাহকেই একমাত্র স্রষ্টা, রক্ষ, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করত।

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقَلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ

“বল, আসমান এবং জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিয়্ক দান করেন? কে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করেন? বিশ্ব পরিচালনা করেন কে? তারা উভয়ে বলবে: আল্লাহ। বল: তাহলে কেন তোমরা আল্লাহকে ডয় করছ না।”^{২৭}

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ هُلْ مَنْ شُرِكَّا كُمْ مِنْ يَنْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدَّهُ قُلِ اللَّهُ يَنْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِدُّهُ فَإِنَّى تُوَفِّكُونَ

“বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়েছ তাদের কেউ কি সৃষ্টি করতে পারে এবং ধ্বন্সের পরে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে? একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”^{২৮}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنِ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقَلْ أَفَلَا
تَنَكَّرُونَ قُلْ مَنِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ

^{২৭} সূরা (১০) ইউনূস: ৩১ আয়াত।

^{২৮} সূরা (১০) ইউনূস: ৩৪ আয়াত।

أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيدهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنِّي تُسْخِرُونَ.

“(কাফিরদেরকে) বল, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা রয়েছে তারা কার? তারা বলবে: আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল, সগু আকাশের রক্ষ-প্রতিপালন ও মহান আরশের রক্ষ-প্রতিপালক কে? তারা বলবে: আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? বল, তোমরা যদি জ্ঞান তবে বল, সকল কিছুর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি ত্রাণের ক্ষমতা রাখেন, যার উপর ত্রাণ দাতা বা রক্ষাকর্তা নেই? তারা বলবে: আল্লাহ। বল, তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?”^{২৯}

এভাবে আমরা দেখছি যে, কাফিররা মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র স্বষ্টি, প্রতিপালক, সকল ক্ষমতা, রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي بُوْفَكُونَ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلِّ أَكْثَرِهِمْ لَا يَعْقُلُونَ.

“তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় চলেছে? আল্লাহ তাঁর বাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয়্ক বর্ধিত করেন আর যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে কে তাকে সংজ্ঞীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্ত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।”^{৩০}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلِّ

^{২৯} সূরা (২৩) মুমিনুন: ৮৪-৮৯ আয়াত।

^{৩০} সূরা (২৯) আনকাবুত: ৬১- ৬৩ আয়াত।

أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, আকাশমণ্ডলী এবং ভূমগ্নি সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ! ’ আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।”^{৩১}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে এগুলি তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।”^{৩২}

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّى يُؤْفَكُونَ

“যদি জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?”^{৩৩}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَذَعُونَ مِنْ ذُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بَصَرًا هَلْ هُنَّ كَافِسَاتُ ضَرَرَهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسَبِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’ নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে।”^{৩৪}

এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানছি যে, কাফিররা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই বিশ্বের সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা,

^{৩১} সূরা (৩১) লুকমান: ২৫ আয়াত।

^{৩২} সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৯ আয়াত।

^{৩৩} সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৮৭ আয়াত।

^{৩৪} সূরা (৩৯) যুমার: ৩৮ আয়াত।

পরিচালক, প্রতিপালক, বৃষ্টিদাতা, ফসলদাতা, রিয়্কদাতা, সকল ক্ষমতার মালিক, সর্বশক্তিমান, তাঁর উপরে কেউ আশ্রয়দাতা নেই, মানুষের সকল শক্তি তাঁর নিয়ন্ত্রণে, তিনি অনিষ্ট চাইলে কেউ তা দূর করতে পারে না এবং তিনি কল্যাণ চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এ কথা তার অকপটে স্বীকার করতো।

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, তারা এভাবে মহান আল্লাহর রূবুবিয়াতের একত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেও অস্পষ্ট একটি ধারণা তাদের মধ্যে ছিল যে, আমাদের উপাস্যগণ আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে সক্ষম না হলেও, বা আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা দিলে তা পরিবর্তনের ক্ষমতা না রাখলেও সাধারণভাবে কিছু অলৌকিক নিষ্ঠ-অনিষ্টের ক্ষমতা তাদের আছে, যা আল্লাহই তাদের দিয়েছেন।

২. ৪. ১. ৩. নাম ও গুণাবলীর একত্ব

‘তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত’^১ বা ‘নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ’ অর্থ: দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর বিভিন্ন নাম ও বিশেষণের উল্লেখ করেছেন। এ সকল নাম ও বিশেষণের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, সকল প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ বা বিশেষণ কোনো সৃষ্টজীবের কর্ম, গুণ বা বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. ৪. ১. ৪. এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফিরদের কিছু আপত্তি ছিল

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি গাইবী বিষয়। মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে তাঁর সত্তা ও গুণাবলির খুটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ বিষয়ে দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তিতর্কের ভিত্তিকে কেউ বলেছেন, আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ থাকতে পারে না। কেউ বলেছেন, তাঁর অমুক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তমুক গুণ থাকতে পারে না বা অমুক নামে তাঁকে ডাকা যায় না। কুরআন কারীমে কাফিরদের এরূপ কিছু বিভ্রান্তির উল্লেখ করা হয়েছে। মৰ্কার কাফিরগণ আল্লাহকে একমাত্র স্বীকৃতি ও প্রাতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাকে ‘রাহমান’ বা করুণাময় বলে বিশ্বাস করতে বা এ নামে ডাকতে অস্বীকার করত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسِجْدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَهُمْ نُفُورًا

“যখন তাদেরকে বলা হয় ‘সাজ্দাবনত হও রাহমান-এর প্রতি’, তখন তারা বলে, ‘রাহমান আবার কি? তুমি কাউকে সাজ্দা করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজ্দা করব?’ এতে তাদের বিশ্বৃতাই বৃদ্ধি পায়।”^{৩৫}

এ বিভাগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এ বিষয়ে ওহীর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করা। কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে আল্লাহর বিষয়ে যে সকল বিশেষণ বা কর্মের গুণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলিকে কোনোরূপ বিকৃতি, ব্যাখ্যা, তুলনা বা পরিবর্তন ছাড়াই বিশ্বাস করা।

আল্লাহ পরিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَلَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَلَادْعُوهُ بِهَا وَتَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْجَرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“এবং আল্লাহরই নিমিত্ত উত্তম নামসমূহ, তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বা নামসমূহের বিষয়ে বক্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা বর্জন করবে। শীত্রেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।”^{৩৬}

قُلْ اذْعُوا اللَّهَ أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيْمًا مَا تَذْعُوا فَلَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

“বল, তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর বা ‘রহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।”^{৩৭}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।”^{৩৮}
অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

لَئِنْ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

^{৩৫} সূরা (২৫) ফুরকান: ৬০ আয়াত।

^{৩৬} সূরা (৭) আরাফ: ১৮০ আয়াত।

^{৩৭} সূরা (১৭) বানী ইসরাইল: ১১০ আয়াত।

^{৩৮} সূরা (২০) তাহা: ৮ আয়াত।

“কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বদ্রষ্টা।”^{৭৯}
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْتَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা আল্লাহর জন্য উপমা বা তুলনা স্থাপন করবে না। নিচ্য
আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।”^{৮০}

২. ৪. ১. ৫. নাম ও শুণাবলির তাওহীদের বিভিন্ন ফরকার বিভাসি

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা মহান আল্লাহর নাম ও শুণাবলির একত্রের বিষয়ে দ্বিতীয় হিজৱী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিভাসির উদ্ভব ঘটে। এ বিষয়ে একমাত্র ওইর উপর নির্ভর না করে মানবীয় পছন্দ, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করা হয়। ইফতিরাক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

২. ৪. ২. কর্ম পর্যায়ের একত্র বা ইবাদতের একত্র

আরবীতে একে ‘তাওহীদুল উলুহিয়াহ’ (تَوْحِيدُ الْأَلْهَيْهِ) অর্থাৎ ‘ইবাদত বা উপাসনার একত্র’ বা ‘আত-তাওহীদুল ইরাদী আত-তালাবী’ (الْتَّوْحِيدُ الْإِرَادِيُّ الْطَّلَبِيُّ) অর্থাৎ ‘ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্র’ বলা হয়।^{৮১}

২. ৪. ২. ১. ইবাদতের পরিচয় ও সংজ্ঞা

ইবাদত আভিধানিকভাবে ‘আবদ’ বা ‘দাস’ শব্দ থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে ‘উবৃদ্ধিয়াত’ ও ‘ইবাদত’ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উবৃদ্ধিয়াত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। আর ‘ইবাদত’ বুঝানো হয় অলৌকিক, অজাগতিক বা অপার্থিব দাসত্বের ক্ষেত্রে। সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই ‘ইবাদত’, উপাসনা, worship, veneration ইত্যাদি শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো সত্ত্বার ‘ইবাদত’ বা উপাসনা করে না। শুধু মাত্র যার মধ্যে অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তারই ‘ইবাদত’ করে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইস্পাহানী হসাইন ইবনু মুহাম্মাদ (৫০২ হি) বলেন:

^{৭৯} সূরা (৪২) শূরা: ১১ আয়াত।

^{৮০} সূরা (১৬) নাহল: ৭৪ আয়াত।

^{৮১} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫।

العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفعال (الإفضال)

“‘বৃদ্ধিয়াত’ (slavery, serfdom, bondage) হলো বিনয়-ভক্তি প্রকাশ করা। আর ‘ইবাদত’ (worship, veneration) এর চেয়েও অধিক গভীর অর্থজ্ঞপক। কারণ ইবাদত হলো চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি-অসহায়ত্ব প্রকাশ, যিনি চূড়ান্ত কর্ম-ক্ষমতা ও দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এই চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।”^{৪২}

অন্যান্য আলিমও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায়:

العبادة على المعنى اللغوي غاية التذلل والافتقار والاستكانة

“ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব।”^{৪৩}

আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি) বলেন:

والعبادة في اللغة من النلة ... وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة
والخصوص والخوف

“আভিধানিকভাবে ইবাদত অর্থ ভক্তি-বিনয় বা অসহায়ত্ব। ... আর শরীয়তের পরিভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির সমষ্টিত অবস্থাকে ইবাদত বলা হয়।”^{৪৪}

এভাবে আমরা দেখছি যে, পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভীতিময় চূড়ান্ত ভক্তিই ইবাদত। আর চূড়ান্ত বিনয়, অসহায়ত্ব ভক্তি প্রকাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা বিভিন্ন পর্যায়ের। তার কাছে যেমন প্রার্থনা করা হয় তেমনি তার প্রশংসাও করা হয়। সবই ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা কিছু করে সবই ইবাদত বলে গণ্য। এজন্য ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলা হয়:

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

“আল্লাহ ভালবাসেন একুপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও হার্দিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।”^{৪৫}

^{৪২} রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩১৯।

^{৪৩} আর্যাম আবাদী, আউনুল মাবুদ ৪/২৪৭; মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১/২২০;
মুনাৰী, আব্দুর রাউফ, ফাইদুল কাদীর ৩/৫৪০।

^{৪৪} ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/২৬।

^{৪৫} উসাইমীন, মুহাম্মদ ইবনু সালিহ, আল-কাওলুল মুফীদ ১/১৬।

২. ৪. ২. ইবাদতের প্রকারভেদ

তবে সব কর্ম এক পর্যায়ের নয়। কিছু কর্ম আছে যা সাধারণভাবে মানুষ ‘ইবাদত’ হিসেবেই করে। যে সন্তার এবং অলৌকিক ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তাকেই তা প্রদান করে। সকল সমাজের সকল ভাষার মানুষই এগুলি জানেন। পূজা, অর্চনা, বলি, কুরবানী, মানত, প্রার্থনা ইত্যাদি এই জাতীয় কর্ম। পাশাপাশি কিছু কর্ম আছে যা মানুষ ইবাদত হিসেবে করে, আবার জাগতিকভাবেও করে। যেমন প্রশংসা করা, ভয় করা, আনৃত্য করা ইত্যাদি। এগুলি মানুষ মানুষ হিসেবে জাগতিকভাবে অন্য মানুষের জন্য করে। আবার ‘মা’বুদ’ বা পৃজিত সন্তার জন্যও করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকারের কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই শিরক। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, বলি, উৎসর্গ, জবাই ইত্যাদি করা। এগুলি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ কারো ভিতরে ঈশ্বরত্ব (divinity, holiness, sacredness, sanctity) ঈশ্বরিক ক্ষমতা, চূড়ান্ত আধিপত্য, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি কল্পনা না করলে কেউ তার জন্য এবং কর্ম করে না। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) বলেন:

اعلم أن العبادة هي التنال الأقصى. وكون التنال أقصى من غيره لا يخلو إما أن يكون بالصورة، مثل كون هذا قياماً وذلك سجوداً، أو بالنية بأن نوى بهذا الفعل تعظيم للعباد لمولاهم، وبذلك تعظيم الرعية للملوك، أو التلامذة للأستاذ، لا ثالث لهما.

“জেনে রাখ, ইবাদত হলো চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয়। কোন্ ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত এবং কোন্টি চূড়ান্ত নয় তা দুভাবে জানা যায়: (১) ভক্তি-বিনয়ের প্রকার থেকে, যেমন দাঙ্গিয়ে ভক্তি করা চূড়ান্ত ভক্তি নয় তবে সাজদা করা চূড়ান্ত ভক্তি এবং (২) নিয়াত বা উদ্দেশ্য থেকে, যেমন বান্দা হিসেবে তার মাবুদকে ভক্তি করার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি বা বিনয় প্রকাশ করা হয় তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রজা হিসেবে রাজার বা ছাত্র হিসেবে শিক্ষকের ভক্তির নিয়েতে যা করা হয় তা চূড়ান্ত ভক্তি নয় বলে গণ্য। ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত পর্যায়ের কি না তা জানার ত্বীয় কোনো পথ নেই।”^{৪৬}

২. ৪. ২. ৩. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ

তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ সকল প্রকার ইবাদাত, যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল-নির্ভরতা ইত্যাদি- একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।

^{৪৬} শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৯।

কেউ যদি আল্লাহর ইবাদাত করেন এবং সাথে সাথে অন্য কারো ইবাদাত করেন তাহলে তিনি আল্লাহর ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবেন না, কারণ তিনি ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করেছেন এবং শিরকে লিঙ্ঘ হয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ বিশুদ্ধভাবে, একনিষ্ঠভাবে, নিষ্কলুষভাবে বা শিরকের কল্পতা থেকে মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং কোনো প্রকার ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য না করা। কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন বিশুদ্ধভাবে ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করতে। এ হলো (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-র অর্থ ও নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য বা মাবুদ) নেই, সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্ঠার সাথে বিশুদ্ধভাবে তাঁকেই ডাক।”^{৪৭}

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ

“তাদেরকে তো কেবলমাত্র এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সঠিক ধর্ম।”^{৪৮}

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মৃত্যুকী হতে পার।”^{৪৯}

অন্যত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

^{৪৭} সূরা (৪০) মুমিন (গাফির): ৬৫ আয়াত

^{৪৮} সূরা (৯৮) বাইয়েনা: ৫ আয়াত।

^{৪৯} সূরা (২) বাকারা: ২১ আয়াত।

আভিধানিকভাবে সকল সীমা-লজ্জনকারীকে তাগৃত বলা যায়। তবে কুরআনের পরিভাষায় ‘তাগৃত’ অর্থ শয়তান। এছাড়া আল্লাহকে ছাড়া যা কিছুর ইবাদত, পূজা বা উপাসনা করা হয় তাকে ‘তাগৃত’ বলা হয়।^{১০}

এভাবে পরিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, একমাত্র তাঁরই উপাসনা ইবাদাত করতে এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত-উপাসনা সর্বতোভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ হলো তাওহীদুল উলুহীয়াহ অর্থাৎ ইবাদাতের একত্ব বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

২. ৪. ৩. উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য

তাওহীদের এ দুটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পরে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়কে পৃথক করা যায় না বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না। তবে এখানে প্রণিধানযোগ্য যে শাহাদাতাইন বা ঈমানের ঘোষনায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে শেষ পর্যায় বা “তাওহীদুল উলুহীয়াহ”-র ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ঈমানের ঘোষণায় প্রথম পর্যায়ের তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কালিমায়ে তাওহীদে “লা খালিকা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো স্তুষ্টা নেই”, “লা রায়িকা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো রিয়্কদাতা নেই”, “লা মালিকা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো বাদশাহ বা মালিক নেই”, “লা রাবু ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো রাবু বা প্রতিপালক নেই”, বা অনুরূপ বাক্য বলা হয় নি। বরং ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর দ্বিতীয় কারণ রয়েছে: (১) তাওহীদুল ইবাদাত তাওহীদুর রূবুবিয়াতের ফসল ও দাবি এবং (২) তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের বিরোধিতা ও অঙ্গীকৃতি।

২. ৪. ৪. তাওহীদুর রূবুবিয়াহের দাবি তাওহীদুল ইবাদাত

প্রথম কারণ হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদ, অর্থাৎ ইবাদাতের তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহীয়া) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা জানের তাওহীদের ফসল ও ফলাফল। যেহেতু আল্লাহ একমাত্র স্তুষ্টা, প্রতিপালক, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, রিয়্কদাতা ও সর্বশক্তিমান কাজেই একমাত্র তাঁরই ইবাদাত উপসনা করা দরকার। যেহেতু সকল ক্ষমতাই তাঁর সেহেতু তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে

^{১০} সূরা (২) বাকারা: ২৫৭ আয়াত; সূরা (৪) নিসা: ৭৬ আয়াত; বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৭৩; তাবারী, তাফসীর ৩/১৮-১৯।

“এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক বানিও না।”^{৫০}

মহান আল্লাহ বলেন,

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعَزْوَةِ الْوَعِيقِ لَا انْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

“দীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগৃতকে অশ্রীকার (অবিশ্বাস) করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক যথবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।”^{৫১}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْوَا الطَّاغُوتَ

“আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগৃতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।”^{৫২}

এখানে তাগৃতকে বর্জন করা বলতে তাগৃতের ইবাদত বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اجْتَبَيْوَا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنْابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرَى
فَبَشِّرْ عِبَادِ

“যারা তাগৃতের ইবাদত বর্জন করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।”^{৫৩}

তাগৃত শব্দটি আরবী ‘তুগইয়ান’ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ সীমা লজ্জন করা। অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লজ্জনকারীকে ‘তাগী’ বা সীমালজ্জনকারী বলা হয়। অত্যধিক সীমালজ্জনকারীকে ‘তাগিয়াহ’ (الظاغي) বলা হয়। কঠিনতম সীমালজ্জণকারী বা মহা-অবাধ্যকে ‘তাগৃত’ (الطاغوت) বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে ‘তাগৃত’ অর্থ মহা-সীমালজ্জনকারী।^{৫৪}

^{৫০} সূরা (৪) নিসাঃ ৩৬ আয়াত।

^{৫১} সূরা (২) বাকারা, ২৫৬ আয়াত।

^{৫২} সূরা (১৬) নাহল, ৩৬ আয়াত।

^{৫৩} সূরা যুমার, ১৭ আয়াত।

^{৫৪} যাইনুদ্দীন রায়ী, মুখ্তারুস সিহাহ, পৃ. ১৬৫।

উপসনা করা নিতান্তই অথচীন ও জঘন্য অন্যায়। এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্রের (তাওহীদুর কুবুবিয়াহুর) কথা উল্লেখ করে একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের আহ্বান জানিয়েছেন।

বস্তুত, 'ইলাহ' (উপাস্য) এবং 'রাব' (প্রতিপালক)-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। তাওহীদ পঙ্গী মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কারো 'ইলাহ' বলতে পারেন না; কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনোভাবে কোনো মুমিনের 'ইলাহ' বা উপাস্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কারো পালনকর্তা বা মালিক হিসেবে 'রাব' বলতে পারে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৫ হি) বলেন:

رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ: مَالِكُهُ. وَالرَّبُّ: اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَقُولُ فِي

غَيْرِهِ إِلَّا بِالْأَضَافَةِ

"রাব অর্থ মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী, যে কোনো কিছুর রাব অর্থ তার মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী। 'আর-রাব' মহান আল্লাহর একটি নাম। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এ নামটি ব্যবহার করা যায় শুধু সম্পর্কের সাথে (অমুকের রাব)।"^{৫৬}

ইউসুফ (আ)-এর কারাবাসের ঘটনায় আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٌ مِّنْهُمَا أَنْكَرَنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ دُكْرَ رَبِّهِ

"উভয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ইউসুফ ধারণা করেছিল তাকে সে বলল, তোমার রবের (প্রভুর) নিকট আমার কথা বলো; কিন্তু শয়তান তাকে তার তার রবের (প্রভুর) নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দেয়।"^{৫৭}

এখানে রাবুকা ও রাবুহু বলতে বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে।

আরবের কাফিরগণ এবং অন্যান্য কাফির-মুশরিকগণ মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক ও সার্বভৌম সর্বশক্তিমান মালিক বা 'রাব' বলে মানত, অথচ তাঁকে একমাত্র 'ইলাহ' হিসেবে মানত না। বিষয়টি ছিল একান্তই অযৌক্তিক ও মানবীয় জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ যিনি একমাত্র প্রতিপালক তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট 'চূড়ান্ত ভয় ও আশা-সহ চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে যাব কেন?

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, ইলাহ এবং রাব-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য থাকলেও, ব্যবহারে দুটি শব্দ একই সন্তান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া

^{৫৬} জাওহারী, আস-সিহাহ ১/২৩৪।

^{৫৭} সুরা (১২) ইউসুফ: ৪২ আয়াত।

উচিং। যিনিই রাক্র তিনিই ইলাহ হবেন। আর যিনি রাক্র নন তার ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না। এজন্য অনেক সময় ইলাহ অর্থে রাক্র ও রাক্র অর্থে ইলাহ ব্যবহার করা হয়।

এ কারণে কুরআন কারীমে বারংবার কাফিরদের কর্ম ও বিশ্বাসের এ অযৌক্তিকতা তুলে ধরে বারংবার মহান আল্লাহর রূবুবিয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে বারংবার রাক্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেহেতু তিনিই একমাত্র রাক্র বলে তোমরাও স্বীকার করছ, তবে কেন তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করছ?

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন 'তাওহীদুর রূবুবিয়াহ' সম্পর্কে কাফিরদেরকে অশু করতে। এ সকল প্রশ্নের উদ্দেশ্য জানের তাওহীদ থেকে কর্মের তাওহীদের দাওয়া। যেহেতু তোমরাই স্বীকার করছ যে, আল্লাহই একমাত্র স্বষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান, সেহেতু তাকে ছাড়া আর কারও উপাসনা করা, প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, জবাই, মানত বা উৎসর্গ করা সুস্পষ্ট বিভাস্তি ছাড়া কিছুই নয়। এভাবে কাফিরদেরকে তাদের শিরকের অসারতা সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্মের অসারতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এ ছাড়াও কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের কথা উল্লেখ করে একমাত্র তারই ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاتًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثُّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা যুক্তাকী হতে পার। যিনি পুথিরীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করে দিয়েছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল ফসল উৎপাদন করেছেন। অতএব তোমরা জেনেশনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।" ৫৮

অন্যত্র বলা হয়েছে:

^{৫৮} সূরা (২) বাকারা: ২১-২২ আয়াত।

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
 سَيَذْلِلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ。 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ
 اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ。 نَلَمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالقٌ
 كُلُّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بَأْيَاتِ اللَّهِ
 يَجْحَدُونَ。 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوْرَكُمْ فَأَخْسَنَ
 صَوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ نَلَمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ。 هُوَ
 الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ حَمَدُوا لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ。 قُلْ إِنِّي
 نَهِيَتْ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদতে বিমুখ হয় তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবে। আল্লাহই তোমাদের বিশ্বামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন এবং দিনকে আলোকজ্বল করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্ফোটা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (মারুদ বা উপাস্য) নেই। তাহলে তোমরা কিভাবে বিপথে যাচ্ছ? এইভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহর নির্দশনাবলিকে অস্থীকার করে। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসোপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম আকৃতি দান করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয়ক। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ, কত মহান তিনি! তিনি চিরজীর, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাকেই ডাক। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত সকল প্রশংসা। বল, আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট নির্দেশন আসার পর আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমর ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাকে জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।”^{১০}

আমরা দেখেছি যে, ‘ডাকা’ বা প্রার্থনা করাই ইবাদতের মূল। এখানে মহান আল্লাহ প্রথমে আল্লাহকে ডাকতে বা তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে

^{১০} সুরা (৪০) যুমিনুন (গফির) ৬০-৬৬ আয়াত

নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ‘অহঙ্কারবশত’ যারা আল্লাহর ইবাদত করে না, অর্থাৎ আল্লাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ডাকে তাদের পরিণতি উল্লেখ করেছেন। এরপর আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের তাওহীদের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে তাদেরকে ইবাদতের তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদতের তাওহীদ জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের স্বাভাবিক প্রকাশ ও ফলাফল। যিনি একমাত্র সুষ্ঠা ও প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত উপাসনা করা উচিত। আর তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে যদি উপাসনা করা হয় তাহলে তাঁকে একমাত্র সুষ্ঠা, প্রতিপালক, সব কিছুর মালিক বা সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করা অর্থহীন হয়ে যায়। এজন্যই ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদতের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَاتُلُوا رَبِّنَا اللَّهَ ثُمَّ أَسْتَقْلَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

‘যারা বলে, ‘আমাদের রাবব (প্রতিপালক) তো আল্লাহ’ এবং এতে অবিচলিত থাকে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দৃঢ়খ্যিতও হবে না।’^{৬০}

কাফিরগণ স্বীকার ও বিশ্বাস করত এবং বলত যে ‘রাবুনাল্লাহ’ বা ‘আমাদের রবব তো আল্লাহ’। তারা মহান আল্লাহকে ‘আল্লাহ’ ও ‘আল্লাহমা’ এবং ‘রাববানা’ বা ‘রাববী’ বলেই ডাকত। তবে তাদের এ ডাক ও বিশ্বাস ছিল অর্থহীন। কারণ আল্লাহকে রাবব হিসেবে বিশ্বাস করার পর আবার অন্য কারো ইবাদত করার অর্থ ‘রাবুনাল্লাহ’ বিশ্বাসে অবিচলিত না থেকে তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। কাফিরদের এ বিচ্যুতির দিকে বারংবার ইঙ্গিত করে কুরআন কারীমে সর্বদা আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ৪. ৫. তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের আপত্তি

ইবাদতের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এ পর্যায়ের তাওহীদেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয়। যুগে যুগে ঈমান ও কুফ্রের মধ্যে মূলত এ ব্যাপারেই বিরোধ। প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের একত্রে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বের একাধিক সুষ্ঠা আছেন অথবা এই বিশ্বের কোনো সুষ্ঠা নেই- এ ধরণের বিশ্বাস খুবই কম মানুষেই করেছে বা করে। সকল যুগে সকল দেশের প্রায় সব মানুষই মূলত বিশ্বাস করেছেন এবং করেন যে, এই বিশ্বের একজনই সুষ্ঠা ও প্রতিপালক রয়েছেন। কিন্তু তারা উপাসনা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে ফিরিশতা, নবীগণ, নেককারগণ, জিন্নগণ,

^{৬০} সূরা (৪৬) আহকাফ: ১৩ আয়াত। পুনর্ক্ষ: সূরা হজ্জ: ৪০ ও সূরা ফুস্সিলাত: ৩০ আয়াত।

অন্যান্য দেবদেবী, পাথর, গাছপালা, মানুষ, মানুষের মৃত্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা স্মৃতিচিহ্নের পূজা, উপাসনা বা 'ভক্তি' করেছেন। আমরা যে কোনো শিরকে লিঙ্গ অমুসলিম সমাজের দিকে তাকালেই বিষয়টি খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারি। বিভিন্ন যুগের ও জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাঁরা সবাই এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন।^৬

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, যুগে যুগে আল্লাহ যে সকল নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের উচ্চতেরা কখনই বলে নি যে, আল্লাহ ছাড়া এই বিশ্বের কোনো স্তুষ্টা বা পালনকর্তা আছেন। বরং তারা সবাই আল্লাহকে একমাত্র স্তুষ্টা, প্রতিপালক, সংহারক বলে বিশ্বাস করতেন। তবে তারা মনে করতেন যে, অনেক দেব-দেবী, গাছ-পাথর, ফিরিশতা, জিন্ন বা মানুষের ঐশ্বরিক শক্তি আছে বা তারা আল্লাহর প্রিয়, কাজেই তাদেরকে উপাসনা করলে, তাদের নামে মানত, জবাই বা প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাই তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে তাদেরও ইবাদত করতেন। নবী রাসূলগণ তাদেরকে সকল দেবদেবী পাথর মৃত্তি ও মানুষের উপাসনা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্য আহ্বান জানান। কাফিরেরা তা মানতে অস্বীকার করে।

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় মুক্তার কাফিরদের বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা থেকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, তারা প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা প্রতীয় পর্যায়ের তাওহীদ, অর্থাৎ ইবাদতের তাওহীদে বিশ্বাস করতো না।

তারা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত না, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত। কুরআনে কাফিরদের 'দু'আ', মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি তারা আল্লাহর জন্য করত। তারা আল্লাহর নামে মানত-কুরবানি করত এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের জন্যও মানত-কুরবানি করত। ইরশাদ করা হয়েছে:

وَجَعْلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِشَرِكَانَا

'আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তনুধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে,

^৬ C. Jouco Bleeker And Geo Widengren, Historia Religionum: Handbook For The History Of Religions, Leiden 1969, Volume 1&2.

‘এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের উপাস্যদের জন্য’।^{৬২}

কুরআন কারীমের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুশরিকদের প্রধান ইবাদত ছিল ‘দু’আ’ অর্থাৎ ডাকা বা আণ বা উদ্ধারের জন্য আবেদন বা প্রার্থনা করা। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে ‘দু’আ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে ‘দু’আ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকগণ মহান আল্লাহর কাছে দু’আ করত, তাঁকে ডাকত এবং তার কাছে সাহায্য, বিজয় ইত্যাদি প্রার্থনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করলেন তখন কাফিরগণ আল্লাহর কাছে দু’আ করে বলত,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ اتْبِعْنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ

“হে আল্লাহ, যদি (মুহম্মদ ﷺ যা প্রচার করছে) তা আপনার পাঠান সঠিক ও সত্য ধর্ম হয়, তবে আপনি আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে যত্নগাদায়ক শাস্তি দান করুন।”^{৬৩}

বদরের যুদ্ধে যাত্রার আগে মক্কার কাফিরগণ পবিত্র কা’বা গৃহের গিলাফ বা বহিরাবরণী ধরে আল্লাহর কাছে দু’আ করেন এবং বলেন, “হে আল্লাহ আপনি আমাদের এবং মুহাম্মাদের (ﷺ) দলের মধ্যে যে দল বেশি সম্মানিত ও বেশি ভাল তাদেরকে বিজয়ী করে দেন।” কাফিরদের নেতা আবু জাহল আল্লাহর কাছে দু’আ করে বলে, “হে আল্লাহ আমাদের (কাফির ও মুসলিমদের) মধ্য থেকে যারা বেশি পাপী, যারা বেশী আৰুয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী তাদেরকে আপনি এই যুদ্ধে পরাজিত করুন।”^{৬৪}

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

إِنْ سَتَّفْتَهُوا فَقَدْ جَاءُكُمُ الْفَتْحُ

“তোমরা যদি বিজয় প্রার্থনা করে থাক, তবে বিজয় এসে গিয়েছে”^{৬৫}।

^{৬২} সূরা (৬) আনযাম: ১৩৬ আয়াত।

^{৬৩} সূরা (৮) আনফাল: ৩২ আয়াত।

^{৬৪} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৭০৪-১৭০৫; তাবারী, জামিউল বাযান ৯/২০৭-২০৮; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩০৮।

^{৬৫} সূরা (৮) আনফাল: ১৯ আয়াত।

অর্থাৎ তোমরা ভাল দলের বিজয় প্রার্থনা করেছিলে, আল্লাহ ভাল দলকে বিজয়ী করেছেন।

আল্লাহর কাছে দু'আ করার পাশাপাশি তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যের কাছেও দু'আ করত। সাধারণত দু'আ কুবুল হওয়ার আশায় তারা দু'আর পূর্বে মানত, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি পেশ করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফিরগণ সাধারণ ও ছেটখাট বিপদ-আপদে আল্লাহকে ডাকত না, বরং এ সকল ক্ষেত্রে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে ডাকত এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করত। আর কঠিন বিপদে পড়লে তারা আল্লাহকে ডাকত। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَنَّا كُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغْيَرُ اللَّهَ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ بَلْ إِنَّهُ تَدْعُونَ فَيُكْسِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْوُنَ مَا تُشْرِكُونَ

“বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা বলতো, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপত্তি হলে, অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে তোমাদের সে বিপদ তিনি দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে তোমরা ভুলে যাবে।”^{৬৬}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরুকে লিঙ্গ হয়।”^{৬৭}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

وَإِذَا غَشِيَّهُمْ مَوْجَ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى
الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيْمَانِهَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كُفُورٍ

“যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ঘেঁষছায়ার মত তখন তারা

^{৬৬} সূরা (৬) আনআম: ৪০-৪১ আয়াত।

^{৬৭} সূরা (২৯) আনকাবূত: ৬৫ আয়াত।

আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্দার করে স্থলে পৌছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তার নির্দেশনাবলি অস্থীকার করে।”^{৬৮}

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।^{৬৯} কুরআনের বিবরণ থেকে বুরা যায় যে, অধিকাংশ মুশরিকই এইভাবে চলত। সূরা হজুর একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, কিছু মানুষ সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা খুবই কম। এজন্য কঠিন বিপদে পড়লে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলত এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ত। তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যর কাছে চাওয়া শুরু করত।^{৭০}

এভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করলেও, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে ভয়ক্ষরভাবে অস্থীকার করত। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَنَّا لَنَّا رِجُلُوا
أَهْبَطْنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

“তাদের নিকট যখন বলা হয় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই’ তখন তারা অহঙ্কার করে। এবং বলে, আমরা কি এক উন্নাদ কবির জন্য আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করব?”^{৭১}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ. أَجْعَلْ
الْأَلْهَةَ إِلَيْهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا
وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَنْكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرِادُ. مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمُلْكِ الْآخِرَةِ إِنْ
هَذَا إِلَّا اخْلَاقٌ.

“এবং তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্কারী (রাসূল) এসেছেন এবং কাফিররা বলে: এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু উপাস্যের (ইলাহের) স্থানে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশৰ্য ব্যাপার। তাদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের বিষয়ে অবিচল-

^{৬৮} সূরা (৩১) লুকমান: ৩২ আয়াত।

^{৬৯} দেখুন: আন আম: ৬৩; আ'রাফ: ১৮৯; ইউনুস: ১২, ২২; নাহল: ৫৩-৫৪; ইসরাঃ ৬৭; আনকাবৃত: ৬৫; রূম: ৩৩; লুকমান: ২৩; সূরা যুমার: ৮ ইত্যাদি।

^{৭০} সূরা হাজু: ১১-১৩।

^{৭১} সূরা (৩৭) সাফকাত: ৩৫-৩৬ আয়াত।

স্থিরচিত্ত থাক। নিশ্চয় এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে
এরূপ কথা শুনি নি; নিশ্চয় এ এক মনগড়া কথা।”^{৭২}

তারা তাদের মাবৃদদের পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদত করলেও, মূলত
এককভাবে আল্লাহর কথা আলোচনা করা বা আল্লাহর একত্রে ও মহত্ত্বের
আলোচনা করায় তারা বিরক্ত হতো। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَةً وَلَوْا عَلَى أَنْبَارِهِمْ نَفُورًا

“যখন তুমি তোমার প্রতিপালককে উল্লেখ কর কুরআনের মধ্যে
এককভাবে তখন পৃষ্ঠপুর্দশন করে তারা সরে পড়ে।”^{৭৩}

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَةً الشَّمَائِرَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

“একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না
তাদের অন্তর বিত্তক্ষায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের
উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।”^{৭৪}

ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে তাদের চরম শক্তি এবং রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর চরম বিরোধিতার কারণ ছিল এই তাওহীদুল ইবাদাতের বিশ্বাস।

২. ৪. ৬. কাফিরদের আপত্তির কারণ

উপরের আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জগ্রিত
হয়। তা হলো, মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান
বলে বিশ্বাস করার পরেও কেন তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এত
কঠিনভাবে অস্বীকার করত? কেনই বা তারা এককভাবে আল্লাহর যিক্র বা
আলোচনা হলে বিরক্ত হতো?

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, তারা মহান আল্লাহকে
জাগতিক রাজা-মহারাজাদের মতই কল্পনা করত। তারা মনে করত যে,
ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা অনুরূপ পর্যায়ের আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর
ইবাদত-বন্দেগি করে আল্লাহর বিশেষ প্রেম ও ভালবাসা অর্জন করেছেন।
ফলে মহান আল্লাহ এদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন, যে
মর্যাদা ও অধিকারের ফলে এ সকল ‘প্রিয়পাত্র’ উল্লিখিয়াত’ অর্থাৎ ইবাদত বা

^{৭২} সূরা (৩৮) সাদ ৪-৭ আয়াত।

^{৭৩} সূরা (১৭) ইসরায়েলী ইসরাইল: ৪৬ আয়াত।

^{৭৪} সূরা (৩৯) যুমার: ৪৫ আয়াত।

চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। একজন জাগতিক মহারাজ যেমন তার প্রিয় দাস বা খাদিমকে খুশি হয়ে রাজত্বের কিছু অংশ প্রদান করেন, অনুরূপভাবে 'মহান আল্লাহ' এদেরকে বিশ্ব পরিচালনার কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ক্ষমতা এদের নেই, তবে মহারাজ যেমন সামন্ত রাজাদের রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন না, তেমনি আল্লাহও এদের কাজে কর্মে বাধা দেন না; কারণ তিনিই ভালবেসে এদেরকে উল্লিখিয়াত ও রবুবিয়াতে শরীক করেছেন। তাদের এ বিশ্বাস প্রকাশ করে হজ্জের তালবিয়া পাঠের সময় তারা বলত:

لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ أَكَ تَمَكَّنْتُهُ وَمَا مَأْكَلَ

লাক্বাইকা আল্লাহস্মা লাক্বাইক...আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে ছাড়া। এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন ...^{১৫}

এজন্য তারা বিশ্বাস করত যে, সরাসরি আল্লাহর ডাকলে বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্রের অধিকার ও ক্ষমতা অস্থীকার করা হয় এবং বেয়াদবি হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে এদের মাধ্যমেই যেতে হবে, যেমন মহারাজের নিকট আবেদন করতে 'যথাযথ কর্তৃপক্ষ' মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব না। তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زَلْفَى

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেবে।^{১৬}

তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল 'আউলিয়া'-র রয়েছে আল্লাহর কাছে বিশেষ অধিকার, ফলে এরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে দ্রুত হাজত মিটিয়ে দিতে পারেন। কাজেই এদের ডাকলে যত দ্রুত সাড়া পাওয়া যায়, সরাসরি আল্লাহকে ডেকে তা পাওয়া যায় না। এবিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَاعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

^{১৫} মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৪৩; তাবাৰী, তাফসীর ১৩/৭৮-৭৯।

^{১৬} সূরা (৩৯) যুমার: ২-৩ আয়াত।

‘তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফায়াতকারী)।’^{৭৭}

এখানে লক্ষণীয় যে, তাদের এ সকল দাবি ও বিশ্বাস বিবেক ও যুক্তি বিরোধী। কারণ আল্লাহই যথন একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান তখন কেন মানুষ অন্য কারো কাছে নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে?

এছাড়া তাদের এ দাবিগুলি সবই মহান আল্লাহ কেন্দ্রিক। মহান আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, অথবা তিনি সাধারণভাবে ফিরিশতা বা নবীগণ বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষদেরকে উল্লিখিয়াত বা রূবুবিয়াতের ক্ষমতা, অধিকার বা শরিকানা প্রদান করেছেন, এবং এসকল ক্ষমতা ও অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে তিনি অসম্ভব হবেন বলে দাবি করতে হলে তা আল্লাহর থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এজন্য কুরআন কারীমে বারংবার তাদের নিকট কিতাবের প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। স্বভাবতই তারা কখনো কোনো প্রমাণ দিতে পারে নি। তারা শুধু ওহীর কয়েকটি পরিভাষার অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে মহান আল্লাহ নেককার বান্দাদের বা নবী ও ফিরিশতাদের ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নেককার বান্দাদের সুপারিশ বা শাফা‘আতের বিষয়টিও ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃত। অনুরূপভাবে মুজিয়া ও কারামতের বিষয়টিও ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃত। মুশারিকগণ এ বিষয়গুলি বিকৃত করে তাদের শিরক প্রমাণ করতে চেষ্টা করত।

তাদের যুক্তির ধারা অনেকটা নিম্নরূপ: (১) আল্লাহ অমুক বা তমুককে ভালবাসেন, (২) যেহেতু তিনি তাঁকে ভালবাসেন সেহেতু নিষ্পয় তিনি তাকে রূবুবিয়াত ও উল্লিখিয়াতে শরীক বানিয়েছেন বা বিশ্ব পরিচালনার কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাকে দিয়েছেন, (৩) এ ক্ষমতার প্রমাণ তাদের মুজিয়া-কারামত বা অলৌকিক কার্যাদি, (৪) যেহেতু তিনি তাদেরকে রূবুবিয়াত ও উল্লিখিয়াতের কিছু ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছেন সেহেতু তাদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহর নেকট্য পাওয়া যায় না, (৫) যেহেতু তাদের শাফা‘আতের অধিকার স্বীকৃত, কাজেই তাদের কাছেই হাজত পেশ করতে হবে এবং (৬) তাদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে ডাকা হলে বা তাদের মহত্ত্বের আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদা আলোচনা করলে তাদের সাথে বেয়াদবি হয় যা ক্ষমার অযোগ্য।

^{৭৭} সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত।

তাদের এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা তওহীদের প্রচারকদের ভয়-ভীতি দেখাত। তারা বলত, আল্লাহর প্রিয়পাত্র যাদের আমরা ইবাদত করি তোমরা এদের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ না করলে এরা তোমাদের ক্ষতি করে দেবে। তাওহীদের প্রচারকদের ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারা ছিল নিম্নরূপ:

(১) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলার অর্থই আল্লাহর প্রিয়পাত্র ফিরিশতা, নবী, ওলী বা আল্লাহর সত্তানদের বিরুদ্ধে কথা বলা! আল্লাহ ছাড়া কারো ডাকা যাবে না, সাজদা করা যাবে না, মানত করা যাবে না ইত্যাদি বলার অর্থ এ আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্রের সাথে বেয়াদবী করা!!

(২) এরূপ বেয়াদবীতে আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্র বেজায় অবৃশি ও নারায় হন! ফলে এরূপ বেয়াদবদের তারা শান্তি দেন!! মহান আল্লাহ তাদেরকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সে ক্ষমতাবলে তারা বেয়াদবদের শান্তি দিতে পারেন!!!

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর প্রসঙ্গে বলেন:

وَحَاجَةٌ قَوْمٌ قَالَ أَتُحَاجِّوْنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ
بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءْ رَبِّي شَيْئًا وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ أَفْلَأَ تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ
أَخَافُ مَا أُشْرِكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَكْمَنَ أُشْرِكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিঙ্গ হলো। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিঙ্গ হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক কর আমি তাদেরকে ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক যদি কিছু ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ এসকল উপাস্য আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে আমি ভয় পাই না, আমার যদি কোনো ক্ষতি বা বিপদ হয় তবে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হবে, তোমাদের উপাস্যদের ইচ্ছাতে নয়)। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব, তবে কি তোমরা অবধান কর না? তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাদেরকে কিভাবে ভয় করব? অথচ আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার কোনোরূপ অনুমতি প্রদান না করা সত্ত্বেও তেমারা আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় পাও না? তাহলে তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল তো কোন দল নিরাপত্তা লাভের যোগ্য?”^{৭৮}

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

^{৭৮} সূরা (৬) আন'আম: ৮০-৮১।

الَّذِينَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيَخْوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ إِنَّ اللَّهَ بِعَزِيزٍ ذِي الْإِنْقَاصِ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَذَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِصَرًّا هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضَرَّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথ-প্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তার জন্য কোনো পথভূষকারী নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন? তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’ নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে।”^{১৯}

এখানে কুরআন কারীমের যুক্তি প্রদান পদ্ধতি লক্ষ্য করুন। এ সকল মুশরিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের ভয় দেখাচ্ছে যে, তাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলার অর্থই তাদের সাথে বেয়াদবী করা এবং তাদের অধিকার থেকে তাদের বাস্তিত করা। এতে তারা নারাজ হয়ে তোমার অঙ্গস্তুতি ও ক্ষতি করবে। এখন প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহ যদি আমার ভাল চান তাহলে কি তারা তা ঠেকাতে পারে? যদি তিনি আমার অঙ্গস্তুতি চান তাহলে কি তারা তা রোধ করতে পারে? উভয় ক্ষেত্রে মুশরিকদের উত্তর হলো: না। আর তারা যেহেতু এতই অক্ষম তাহলে তাদের ডাকার দরকার কী? মহান আল্লাহকে ডাকলেই তো হলো। তিনিই তো তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুশরিকগণ একটি ভিত্তিহীন কল্পনার উপরেই শিরকে লিখ হয়, যে মহান আল্লাহ যেহেতু এ সকল বান্দাকে অলবাসেন, সেহেতু তিনি অবশ্যই এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন এবং

না ডেকে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে এদের সাথে বেয়াদবী হয়।

কল যুক্তি সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনা এবং ওহীর কয়েকটি ক্ষুই নয়। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: “প্রত্যেক

নবীই তাঁর উম্মাতকে সুনিশ্চিতরূপে শিরকের হাকীকত বুঝিয়ে গিয়েছেন। এরপর যখন নবীর প্রিয় সহযোগীগণ এবং তাঁর দীনের বাহকগণ গত হন, তাদের পরে নতুন একটি প্রজন্ম আগমন করে, যারা সালাত বিনষ্ট করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তখন এরা ওহীর মধ্যে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলিকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রিয়ত্ব এবং শাফা'আতের বিষয়দৃটি সকল শরীয়তেই বিশেষ মানুষদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা এ দুটি বিষয়েরও বিকৃত অর্থ করে। এছাড়া তারা অলৌকিক কর্মাদি এবং কাশক-ইলহামের বিষয়টিকে ক্ষমতা ও গাইবী ইলহের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। যার থেকে এরূপ অলৌকিক কর্ম বা কাশক দেখা গিয়েছে তাকে অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের মালিক বলে তারা দাবি করে।”^{৮০}

২. ৪. ৭. ইবাদতের তাওহীদই সকল নবী-রাসূলের দাও'আত

ইবাদতের তাওহীদই ছিল যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের প্রথম ও মূল দাও'আত। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী ও রাসূল তাঁর উম্মাতকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করেছেন। প্রথম রাসূল নূহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ

“আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীয়ত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ (মাবুদ বা উপাস্য) নেই।’”^{৮১}

হুদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ

“আদ জাতির নিকট তাদের ভাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।’”^{৮২}

সালিহ (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ

“সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে

^{৮০} শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হৃজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৮১-১৮২।

^{৮১} সূরা (৭) আরাফ: ৫৯ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১১) হুদ: ২৫-২৬ আয়াত।

^{৮২} সূরা (৭) আরাফ: ৬৫ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১১) হুদ: ৪৯ আয়াত।

বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।’^{৮০}

শু’আইব (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِلَى مَدْنِينَ أَخَاهُمْ شَعِيْتَا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ

“মাদ্যানবাসীদের নিকট তাদের ভাতা শু’আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।’^{৮১}

সকল নবীকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ

“আমি তোমার পূর্বে কোনো রাসূলই প্রেরণ করি নি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।”^{৮২}

আমরা দেখেছি যে, অন্য আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: “আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগৃতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।”

২. ৪. ৮. তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচনা

তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচ্য এবং সকল আলোচনার মূল বিষয়। ইমাম আবু হানীফার (রা) ‘আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, তাওহীদের আলোচনাকালে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন:

‘তাওহীদুল উলুহিয়াহ বা ইবাদতের তাওহীদ স্বীকার করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে তাওহীদুর রূবুবিয়াহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের তাওহীদ স্বীকার করা হয়ে যায়। (তাওহীদুল উলুহিয়াহ স্বীকার করার অর্থই তাওহীদুর রূবুবিয়াহ স্বীকার করা।) কিন্তু তাওহীদুর রূবুবিয়াহ স্বীকার করলে তাওহীদুল উলুহিয়াহ স্বীকার করা হয় না।...’

কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াত এই দুই প্রকারের তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত। বরং সত্যিকার বিষয় যে, কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই এই দুই প্রকারের তাওহীদের বিবরণ।

^{৮০} সূরা (৭) আরাফः ৭০ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১১) হৃদ: ৬১ আয়াত।

^{৮১} সূরা (৭) আরাফः ৮৫ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১১) হৃদ: ৮৪ আয়াত।

^{৮২} সূরা (২১) আমিয়া: ২৫ আয়াত।

কারণ কুরআনে কোথাও আল্লাহর সন্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে, আর এগুলি জ্ঞান ও সংবাদের তাওহীদ। আর কোথাও শিরক-মুক্ত ভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় সব কিছু বর্জন করতে আহ্বান করা হয়েছে। এ হলো ‘আত-তাওহীদুল ইরাদী আত-তালাবী’ বা ‘ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্র’ (ইবাদতের তাওহীদ)।

আর কোথাও আদেশ, নিষেধ ও আল্লাহ আনুগত্য বজায় রাখার বর্ণনা রয়েছে। এগুলি তাওহীদের দাবি ও পরিপূরক। আর কোথাও তাওহীদের অনুসারীদের সম্মান-র্যাদার কথা, দুনিয়াতে তাদের সাথে কিরণ আচরণ করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদেরকে কিভাবে সম্মানিত করা হবে তা বলা হয়েছে। এ হলো তাওহীদের পুরস্কার। আর কোথাও শিরকে লিঙ্গ ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, পৃথিবীতে তাদেরকে কি লাভনা প্রদান করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের জন্য কি শান্তি ও যত্নণা অপেক্ষা করছে তা বলা হয়েছে। এ হলো তাওহীদ থেকে বাইরে যাওয়ার প্রতিফল। কাজেই কুরআনের সকল আলোচনাই তাওহীদ কেন্দ্রিক।^{৮৬}

^{৮৬} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৩।

তৃতীয় অধ্যায়

রিসালাতের ঈমান

ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ যুগে-যুগে মানব জাতির সঠিক পথের দিশা দানের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে অসংখ্য মানুষকে মনোনীত করে তাঁদেরকে তাঁর বাণী দান করেন এবং মানুষদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বানের দায়িত্ব তাঁদেরকে দান করেন। এরা সবাই মহান চরিত্রের অধিকারী ও কল্যাণময় মানুষ ছিলেন। এরা সবাই তাঁদের দায়িত্ব যথাযত পালন করেন। এদের অধিকাংশের নাম বা বিবরণ আমরা জানিন। শুধু যাদের নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরকে আমরা নির্দিষ্টভাবে নবী বা রাসূলরপে বিশ্বাস করি। অন্য কাউকে আমরা নিশ্চিতরপে আল্লাহর রাসূল বলে মনে করতে পারিনা, যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল যুগে সকল দেশে আল্লাহ নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমরা এদের সবাইকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আমরা অনুসরণ করি এবং তাঁর শরীয়ত মত জীবন পরিচালনা করি। আমরা এ অধ্যায়ে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের অর্থ আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ঈমানের অবশিষ্ট রূক্নগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ আলোচনা করব।

৩. ১. রিসালাতের সাক্ষ্য

৩. ১. ১. শাহাদাতের তিনটি শব্দ

আমরা দেখেছি যে, শাহাদাতাইনের দ্বিতীয় অংশে (মুহাম্মাদান আন্দুল্লাহ ওয়ারাসূলুন্ত) বলে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনটি শব্দ আছে: মুহাম্মাদ, আবদ ও রাসূল। রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ আলোচনা করার আগে আমরা এই তিনটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনের চেষ্টা করব।

৩. ১. ২. মুহাম্মাদ (ﷺ)

প্রথমে আমাদের জানা দরকার মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই কমবেশী রাসূলল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত আছি। তা সত্ত্বেও তার জীবনী আলোচনার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এখানে আমরা সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় উল্লেখ করব।

৩. ১. ২. ১. দেশ ও বৎস

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) আরব দেশের প্রাণ কেন্দ্র পরিত্র মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুল মুতালিব, তার পিতা হাশিম। হাশিম ছিলেন কুরাইশ বংশের, কুরাইশ একটি আরব গোত্র, যারা ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর।

কুরাইশ বংশ ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ। এ বংশের মধ্যে হাশিমের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত পরিবার। মক্কাবাসীরা তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন। এই হাশিম পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আব্দুল মুতালিব। তিনি তার পুত্র আব্দুল্লাহকে মক্কার কুরাইশ বংশের অপর শাখা বানু মুহুরার মেতা ওয়াহ্ব ইবনু আব্দু মানাফ বিন মুহুরার কল্যাণ আয়িনার সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের কয়েক মাস পরে, মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে আব্দুল্লাহ খেজুর আনার জন্ম মদীনায় (ইয়াসরিবে) তার মাতৃলালয়লে গমন করেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর।

৩. ১. ২. ২. জন্ম

আব্দুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আমুল ফীল’ (عَامَ الْفِيلِ) বা হাতির বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন।^১ হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতি নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।^২

সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জান যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।^৩ হাদীসে নববী থেকে তাঁর জন্মাম ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনু হিশাম, ইবনু সাঁদ, ইবনু কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন:

(১). কারো মতে তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং জানা

^১ তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। তিরমিয়ী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গৌরী।

^২ আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ আস-সহীহা ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯-১১০ পৃ।

^৩ মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১৯; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬।

সম্বন্ধ নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবাস্তর মনে করেন।

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৪). কারো মতে তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক মুহাদিস আবু মাশার নাজীহ বিন আবুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

(৫). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা) ও জুবাইর বিন মুতভিয়ম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

(৬). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১০-ই রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইয়াম হসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল বাকের (১১৪ হি) থেকে বর্ণিত। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহিল আশ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭ হি) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনু সাদ তার বিখ্যাত “আত-তাবাকাতুল কুবরা”-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।^৮

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১ হি) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।”^৯ এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন^{১০}। তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী জাবির (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) থেকে এই মতটি বর্ণিত।

(৮). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল।

^৮ ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৮০-৮১।

^৯ ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ ১/১৮৩।

^{১০} মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃ।

- (৯). অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল ।
 (১০). অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন ।
 (১১). অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন ।

(১২). অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন । তয় হিজরী শতকের প্রথ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি) থেকে এ মতটি বর্ণিত । তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নুরওয়াত পেয়েছেন । তিনি ৪০ বৎসর পৃত্তিতে নুরওয়াত পেয়েছেন । তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে । এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের পবিত্র দিনগুলিতে মাত্গর্ভে আসেন । সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত । এ মতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ।^১

৩. ১. ২. ৩. শৈশব ও কৈশর

জন্মের পরে তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন “আহমাদ”, আর তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার নাম রাখেন “মুহাম্মদ” । মক্কার আধিবাসীরা তাদের নবজাতক সন্তানদেরকে সাধারণত শহরের বাইরে বেদুইন গোত্রদের মধ্যে কিছুদিন লালান পালন করতেন, যেন তারা শহরের মিশ্র পরিবেশের বাইরে বেদুইনদের মাঝে পরিপূর্ণ মানসিক ও দৈহিক পূর্ণতা ও স্বাবলম্বিতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং তাদের ভাষা বিশুদ্ধ হয় । এ নিয়মে জন্মের কিছুদিন পরে মক্কার বাইরে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার বেদুইন গোত্র বনু সাদের হালীমা বিনতু আবু যু'আইব নামক এক মহিলা শিশু মুহাম্মদ (ﷺ)-এর লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন । তিনি সেখানে ৫ বৎসর কাটান ।

এরপর তিনি মক্কায় তাঁর মাতার কাছে ফিরে আসেন । প্রায় এক বৎসর পর তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন । তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের ভার গ্রহন করেন । আব্দুল মুত্তালিব তার এই ঐতিম পৌত্রকে অত্যন্ত মেহ করতেন । ২ বৎসর পরে, ৮ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাদাকেও হারান । মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আবু তালিবের উপর দায়িত্ব দেন ঐতিম বালক মুহাম্মদ (ﷺ)-এর লালন পালনের । পরবর্তী প্রায় ১৭ বৎসর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন ।

এসময়ে তিনি মাঝেমাঝে তার চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের ছাগল-

^১ ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া ১/২৪৫-২৪৮, ইবনু রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ ১/১৫০ ।

ভেড়া চরাতেন মৰ্কার প্রান্তৰে। কখনো চাচার সাথে ব্যবসায়ের অম্বণে অংশ নিয়েছেন। তিনি সাধারণ যুবকদের মত গল্পগুজব পছন্দ করতেন না। তিনি কখন কোনো মৃত্তিকে স্পর্শ করেন নি। মৰ্কায় প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, যখন তার বয়স প্রায় ২০ বৎসর, মৰ্কার কিছু সৎ ও সাহসী যুবক একত্রিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা সমাজের অত্যাচার রোধ করবেন। শক্তের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবেন এবং দুর্বলের অধিকার আদায় করে দেবেন। যুবক মুহাম্মদ (ﷺ) এই শপথে অংশ গ্রহণ করেন।

৩. ১. ২. ৪. বিবাহ ও নুরুওয়াত-পূর্ব জীবন

২৫ বৎসর বয়সে তিনি খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ নামক মৰ্কার একজন ধনী ব্যবসায়ী মহিলার ব্যবসায়ের সামগ্ৰী নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। খাদীজা তার সততা ও চারিত্রিক পৰিত্রায় খুবই মুগ্ধ হন। তিনি তার সাথে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয়পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি ও মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এসময়ে খাদীজার বয়স ছিল প্রায় ৪০ বৎসর, এবং মহানবীর বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

বিবাহের পরে খাদীজা তার সকল সম্পদ স্বামীর হাতে সমর্পন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতেন। তিনি অনাথদের লালন পালন, অসহায় ও দুষ্টদের সেবা, মুসাফিরদের আতিথেয়তা, আতীয়া-স্বজনের দেখাশুনা, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। এ সময়ে তিনি তাঁর সেবা, সততা, অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক পৰিত্রায় জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সমাজের লোকেরা তাঁকে আল আমীন (বিশ্বস্ত) ও আস সাদিক (সত্যবাদী) ইত্যাদী বিশেষণে আখ্যায়িত করত। বিভিন্ন সামাজিক বিরোধিতায় তারা তাঁর সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্থতা মেনে নিত।

এ বিষয়ে কাবাঘর নির্মাণকালে হাজার আসওয়াদ বা কাল পাথর পুনৰ্স্থাপন বিষয়ক ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। কাবাঘরের সংস্কার ও পুনৰ্নির্মাণের পরে পবিত্র হাজ্র আসওয়াদকে কাবাগ্হের দেওয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে পুনৰ্স্থাপন করার বিষয়ে মৰ্কার প্রতিটি গোত্র নিজেদের অগ্রাধিকার দাবি করে। প্রত্যেকে তার দাবিতে অনড় থাকে এবং অধিকার রক্ষার্থে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করে। মৰ্কাবাসীরা এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। একপর্যায়ে নেতৃবৃন্দ একমত হন যে, প্রথম যে ব্যক্তি গিরিপথের মধ্য থেকে তাদের সামনে আগমন করবেন সকলেই তার সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন। এ সময়ে মুহাম্মদ (ﷺ) তথায় উপস্থিত হন। তারা সকলেই আনন্দিত হয়ে বলে উঠেন, আল-আমিন এসেছেন! তখন তিনি নিজের চাদরটি বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি তুলে চাদরের

উপর রাখেন। এরপর বিবাদমান সকল গোত্রকে আহ্বান করেন চাদরটি চারিদিক থেকে ধরে পাথরটি কাবাগৃহের নিকটে নিয়ে যাওয়ার। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি কাবার প্রাচীরে পুনস্থাপন করেন। এভাবে মক্কাবাসী ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। এ ঘটনায় নবুয়াতের পূর্বেই মক্কাবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ শ্শ-এর গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল নুবুওয়াতের ৫ বৎসর পূর্বে, যখন রাসূলুল্লাহ শ্শ-এর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর কিশোর বয়সে এ ঘটনাটি ঘটেছিল।^৮

৩. ১. ২. ৫. নুবুওয়াত ও মাক্কী জীবন

৪০ বৎসর বয়সে তিনি ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি মক্কার বাইরে হেরো পাহাড়ের গুহায় বসে রাতদিন আল্লাহর স্মরণে ঘণ্টা থাকতেন। এ বছরেই, অর্থাৎ ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রময়ান মাসে সোমবার (ইংরেজী আগস্ট মাসে), ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাগনের নেতা জিবরীল আল- আমীন (আ) ওহী নিয়ে হেরো পাহাড়ের গুহায় আসেন এবং তাকে কুরআন কারীমের সূরা ইকরার প্রথম কয়েক আয়াত শিক্ষা দান করেন।

এর পরে তিনি আল্লাহর নির্দেশে গোপনে মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। এভাবে তিনি বৎসর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। এ সময়ে মক্কার কিছু সৎ ও নীতিবান যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এর পর আল্লাহ তাকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। তার নবুয়ত প্রাপ্তির ৪৬ বৎসর থেকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী প্রায় দশ বৎসর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারে রত থাকেন।

এসময়ে মূলত তিনি মূলত তাওহীদুল ইবাদত বা ইবাদতের তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেন। পাশাপাশি সততা, নেতৃত্ব, মানবতা, মানবসেবা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় পালনের এবং শির্ক, হত্যা, হানাহনি অত্যাচার ইত্যাদি অমানবিক কর্ম বর্জনের জন্য আহ্বান করতেন। ইসলামের অন্যান্য বিধান যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রময়ানের সিয়াম, ইজ্জ, যাকাত ইত্যাদি তখনে প্রবর্তিত হয়নি। এগুলি কিছু মক্কী জীবনের একেবারে শেষে এবং বাকি সকল বিধান মদীনায় হিজরতের পরে অবর্তীর্ণ হয়।

^৮ ড. মাহদী রিয়কুল্লাহ, আস-সীরাতুল্লাবীয়্যাহ ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কঠোরভাবে তাঁর এ আহবান প্রত্যাখ্যান করে। আমরা দেখেছি যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র সুষ্ঠা, সর্বশক্তিমান ও প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহর ইবাদত করত। পাশাপাশি তারা আল্লাহর প্রিয় ও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত বান্দা হিসেবে ফিরিশতা, কোনো কোনো নবী, কোনো কোনো কঠিত বাক্তিত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর ইবাদত করত। তারা এদের ইবাদত করাকে পিতাপিতামহদের মাধ্যমে প্রাণ ইবরাহীম-ইসামাঈল (আ)-এর সঠিক ধর্ম বলে বিশ্বাস করত। এজন্য এদের ইবাদত পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নন এ কথাকে তারা উত্তর ও অবন্তর কথা এবং যুগ্মযুগ ধরে প্রচলিত পিতা পিতামহের আচরিত ধর্মের অবমাননা বলে মনে করে। তারা বিভিন্ন ভাবে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে অপমান ও অত্যাচার করতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতের যৌক্তিকতা খণ্ডন করার কোনো ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা বুঝতে পারে যে, তাঁর বক্তব্য শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষ তার বক্তব্য গ্রহণ করবেই। এজন্য তারা মানুষদেরকে তার থেকে দূরের রাখার জন্য চেষ্টা করে। তাকে ধর্মত্যাগী, ধর্মের অবমাননাকারী, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে মানুষদের মনে তাঁর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে।

তাদের শত অপগ্রাহ ও বাধা সত্ত্বেও ক্রমে ইসলামের বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ শিষ্ট হয়ে উঠে। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ডাকে সাড়া দানকারী নও মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। কোনো অত্যাচার নির্যাতন বা অপমান-লাঞ্ছনাই মহানবীকে সত্যের আহবান থেকে সরাতে পারে না। তিনি তার সকল অত্যাচারের মধ্যেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষদেরকে আহবান করতে থাকেন এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারের কারণে শতাধিক মুসলিম নারী ও পুরুষ আক্রিকার ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। অবশিষ্ট অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদ আকড়ে ধরে মুক্তাবাসীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকেন।

এত অত্যাচারের মাধ্যমেও ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে অক্ষম হয়ে মুক্তাবাসীর সকল গোত্র একত্রিত হয়ে সকল মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের মানুষদের সামাজিকভাবে বয়কট ও অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নুবুয়তের ৭ম থেকে ১০ম সন পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বৎসর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বংশের মানুষদের এবং মুসলিমদের নিয়ে পাহাড়ের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ হয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে অবস্থান করেন। এ সময়েও তিনি সাধ্যমত দীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

নবুয়তের ১০ম বৎসরে অবরোধ থেকে মুক্তির কিছু দিন পরে, তাঁর চাচা আবু তালিব ও তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা কিছু দিনের ব্যবধানে ইস্তেকাল করেন। তাঁর জন্য এ ছিল খুবই বেদনাময় বৎসর। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি তাঁর ব্যাথ্যা-বেদনার প্রিয়তম সাথীকে হারান। অপর দিকে চাচার মৃত্যুতে তিনি সামাজিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। কারণ আবু তালিব ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত নেতা। তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তার কারণে অনেক সময় কুরাইশ নেতারা মহানবীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে সাহস পেত না। আবু তালিবের মৃত্যুর পরে কুরাইশদের অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা তাকে কোনোভাবেই কথা বলতে দিত না। তেমনিভাবে তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতিও অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

এমতবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচারের কথা চিন্তা করেন। তিনি এ বছরের শেষ দিকে (শাওয়াল মাসে, ৬১৯ বৃষ্টিদে মে/জুন মাসে) মক্কার প্রায় ১০০ কিলোমিটার পূর্বে তায়েফ শহরে গমণ করেন। তিনি তাঁর প্রিয় খাদিম যায়িদ বিন হারিসাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফে গমণ করেন। পথিমধ্যে যে সকল বেদুইন গোত্রকে তিনি দেখতে পান, তাদেরকে তিনি তাওহীদের আহবান জানান। তারা কেউই তার আহবানে কর্ণপাত করে না। তিনি তায়েফে প্রায় দশদিন যাবৎ তাওহীদের আহবান জানান। তিনি তায়েফের সকল গোত্রপ্রধান ও সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের আহবান জানান। তারা কেউই তার ডাকে সাড়া দেয় না। বরং তারা তায়েফের দুষ্ট ছেলেদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়। ছেলেরা তায়েফের পথে পথে গালাগালি করে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। উপরন্তু তারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে থাকে। তিনি রক্তাক্ত দেহে তায়েফ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ডগ্হাদয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। সকল কষ্ট ও ব্যথা মেনে নিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন, যদিও মক্কায় তাঁর অবস্থান বা ইসলাম প্রচারের প্রায় অসম্ভব ছিল।

ইব্রাহিম (আ)-এর সময় থেকে মক্কায় কাবাঘরের হজ্জ প্রচলিত হয়। তখন থেকে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা যুলহাজ্জ মাসে মক্কায় এসে হজ্জ আদায় করত। যদিও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শিরক, মৃত্তিপূজা ও বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় অনাচার ছড়িয়ে পড়ে, তবুও হজ্জ ও হাজীদের সম্মান ছিল তাদের বিশ্বাসের অংশ। তারা হজ্জের সময়ে সকল প্রকার মারামারি, দৈহিক অত্যাচারকে নিষিদ্ধ মনে করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের এই সুযোগে গোপনে মক্কায় আগত বিভিন্ন এলাকার হাজীদের মধ্যে ইসলাম

প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন। নবুয়তের ১১শ বৎসরের হজ্জ মাওসুমে (৬২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে) মক্কার প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার উত্তরের ইয়াসরীব (মদীনা) শহরে থেকে আগত ৬ জন যুবক হাজী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হজ্জের পরে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

পরবর্তী বৎসরে, নবুয়তের ১২শ বৎসরের হজ্জ মাওসুমে (৬২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে) মদীনার আরো কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সাথে তার প্রিয় সাহাবী মুস'আব বিন উমাইরকে মদীনায় প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী হজ্জ মাওসুমে (নবুয়তের ১৩শ বৎসরে, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে) মদীনা থেকে হাজীদের যে কাফেলা আসে তার মধ্যে ৭০ জনেরও বেশি ছিলেন মুসলিম। তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে অবস্থান করার আহ্বান জানান। তাঁরা তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রাণের বিনিময়ে হলেও তাঁকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন।

৩. ১. ২. ৬. মদীনায় হিজরত ও মাদানী জীবন

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার নির্যাতিত মুসলিমদেরকে মদীনায় গমন করার (হিজরত করার) অনুমতি দেন। মক্কার কুরাইশ নেতাগণ মদীনায় ইসলামের সাফল্যে বিচলিত হন। তারা যে কোনো মূল্যে ইসলামের অগ্রগতি রোধ করার জন্য এক আলোচনায় মিলিত হন। আলেচনায় তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এসময়ে মহান আল্লাহ তার রাসূল (ﷺ)-কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। কুরাইশদের বড়্যন্ত ব্যর্থ করে তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে আকার পর মদীনায় রওয়ানা দেন। নবুওয়তের ১৪শ বৎসরের সফর মাসের ২৭ তারিখে (১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর মক্কা ত্যাগ করেন। প্রায় দশ দিন পথ চলার পরে রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে (২৩শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে) তিনি মদীনায় পৌছান।

তিনি মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদীনার প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ এবং অযুসলিম ও ইহুদীদের সাথে নাগরিক

চুক্তির মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তি, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি মদীনায় তিনি অত্যন্ত শান্তির সাথে মুসলমানদের ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থেকেন। এ সময় থেকে মহান আল্লাহ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নায়িল করেন।

মক্কার কাফিররা তাঁর সাফল্যে ক্ষিণ হয়ে উঠে। তারা বিভিন্ন ভাবে মদীনার মুসলমানদের ধর্মসের চেষ্টা করতে থাকে এবং মুসলিমদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে জিহাদের বা যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেন। কাফিরদের তুলনায় সংখ্যায়, অস্ত্রে ও ক্ষমতায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী তার প্রিয় সাহাবীদেরকে নিয়ে কাফিরদের মুকাবিলা করেন। পরবর্তী ৮ বৎসরে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফিররা পরাজিত হতে থাকে। সর্বশেষে ৮ম হিজরী সালে (৬৩০ খৃ) রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। মক্কার কাফিরদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর আরব উপদ্বীপের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তিনি আরদেশের বাইরে পারস্য, রোম, মিসর, আবিসিনিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে চিঠি লেখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে স্থানলাভ করে। আরবের বাইরেও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই বৎসরে (৬৩২ খৃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষাধিক সঙ্গীকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদ্যায় হজ্জ নামে পরিচিত।

৩. ১. ২. ৭. সর্বশেষ ওসীয়ত ও ওফাত

হজ্জ থেকে ফেরার পরে ১১শ হিজরীর (৬৩২ খৃ) প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জুর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইত্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। বস্তুত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ তারিখের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন না। এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনাও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা ও সংরক্ষণ করেছেন, কিন্তু এ সকল ঘটনার তারিখ কোনো হাদীসে উল্লেখ করেন নি। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইত্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন, তারিখ বা সময় বলা হয় নি। কবে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত তারিখে ইত্তিকাল করেন সে বিষয়ে কোনো হাদীসেই কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

২য় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিকভাবে দিন তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খৃ) বলেন: “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইত্তিকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।”^৯

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বৃথবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়।^{১০}

কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইত্তিকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্তিকাল করেন।^{১১}

তাঁর ওফাতের তারিখ সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ইত্তিকাল করেন।^{১২} কিন্তু এই সোমবারটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসের ১১ তারিখে ইত্তিকাল করেন।^{১৩} এই একক বর্ণনাটি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রবিউল আউয়াল মাসে ইত্তিকাল করেন। কিন্তু কোন্ তারিখে তিনি ইত্তিকাল করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইত্তিকালের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবেয়ী ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছে: ১লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল

^৯ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নববিয়্যাহ ৪/২৮৯।

^{১০} কাসতালানী, আল-মাওয়াহির আল-লাদুন্নিয়া ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহল মাওয়াহির ১২/৮৩।

^{১১} কাসতালানী, আল-মাওয়াহির আল-লাদুন্নিয়া ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহল মাওয়াহির ১২/৮৩।

^{১২} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৬২, ৪/১৬১৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩১৫; আবু নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম ২/৪৩-৪৪।

^{১৩} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৮/১২৯।

আউয়াল, ১২ই রবিউল আউয়াল ও ১৩ই রাবিউল আউয়াল।^{১৪}

আমরা ১২ই রবিউল আউয়ালকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত দিবস ধরে নিয়ে তাঁর ওফাতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলি সহীহ হাদীসের আলোকে উল্লেখ করছি। হাদীস শরীফে সাহাবীগণ তারিখ উল্লেখ না করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা বার ও প্রাসঙ্গিক পূর্বাপর ঘটনাদি উল্লেখ করেছেন। আমরা এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই ঘটনাবলি উল্লেখ করব।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি মসজিদ-সংলগ্ন আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। ওফাতের ৫ দিন আগে (রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ) বৃহস্পতিবার^{১৫} তিনি গোসল করেন এবং কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে মিস্বরে বসেন এবং সাহাবীদেরকে অভিম উপদেশ নসীহত দান করেন। এছাড়াও তিনি অসুস্থ অবস্থায় বারংবার বিভিন্ন বিষয়ে ওসীয়ত করেন। এ সকল ওসীয়তে তিনি তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক্ক সম্পর্কে সতর্ক করেন। আয়েশা (রা), আবু হুরাইরা (রা) জুনদুব (রা), আবু উবাইদাহ ইবনুল জারুরাহ (রা) প্রযুক্ত সাহাবী বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে এবং সর্বশেষ ওসীয়তের বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ فَيْكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ
أَلَا فَلَا تَتَخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنِّ ذَلِكَ... لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدًا... ... يَحْذَرُ مَا صَنَعُوا... ... وَاعْلَمُوا أَنَّ
شَرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ... ... لَا تَتَخَذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا
تَجْعَلُوا بَيْوَتَكُمْ قُبُورًا وَحِيتَمًا كُنْتُمْ فَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيَّ فِيْ إِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبَلَّغُنِي... ... اللَّهُمَّ لَا
تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدْ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ

“তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এই কাজ থেকে।” ...

‘আল্লাহ লানত-অভিশাপ প্রদান করেন ইহুদী ও খ্স্টানদের উপর, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।’ একথা বলে তিনি তাঁর উম্মতকে অনুরূপ কর্ম থেকে সাবধান করছিলেন। “তোমরা

^{১৪} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৮/১২৯।

^{১৫} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৮/১৪২।

জেনে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবর মসজিদ বানিয়ে নেয়।” ... “তোমরা আমার কবরকে ইদ (ইদগাহ বা নিয়মিত সমাবেশের স্থান) বানিও না, আর তোমাদের আবাসস্থলকে কবর বানিয়ে নিওনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর সালাত (দরূণ্ড) পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছে যাবে।” “হে আল্লাহ, আমার কবরকে পূজিত দ্রব্য বা পূজ্য-স্থানের মত বানিয়ে দিবেন না যার ইবাদত করা হবে, আল্লাহর ক্ষেত্র কঠিনতর হোক সে সকল মানুষের উপর যারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানায়।”^{১৬}

এতদিন পর্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত জামাতে সালাতের ইমামতি করছিলেন। বৃহস্পতিবার (৮ই রবি. আউয়াল) মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন। এরপর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তিনি মসজিদে যেতে সক্ষম হন না। তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন।

তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি এ সময়ে বারবার বলছিলেন:

الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“সালাত! সালাতের বিষয়ে সাবধান! (কোনোরূপ অবহেলা করবে না) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের (অধীনস্থগণের) বিষয়ে সাবধান!”^{১৭}

সোমবার দিন (১২ই রবিউল আউয়াল, ৬৩২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ৫/৬ তারিখ) দিবসের প্রথম দিকে- দিপ্তিরে পূর্বে- তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা) কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। এ সময়ে তিনি মেসওয়াক করেন এবং মৃদুস্বরে কিছু বলতে থাকেন। আয়েশা তার মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পান তিনি বলছেন: “তাদের সাথে, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন, নবী-রাসূলগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ, সৎকর্মশীলগণ। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহমত করুন, সর্বোচ্চ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন। হে আল্লাহ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিরিত করে দিন।” এরপর তিনি ইস্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

^{১৬} বিস্তারিত বর্ণনাগুলির জন্য দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬৫, ১৬৮, ৪৪৬, ৪৬৮, ৩/১২৭৩, ৪/১৬১৪, ৪/১৬১৫, ৫/২১৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭৫-৩৭৮; মালিক, আল-মুআত্তা ১/১৭২; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১৯৫, ২/২৪৬, ৩৭৬; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহ্তুল বারী ১/৫২৩-৫২৪, ৫৩১, ৩/২০০, ২০৮, ২৫৫।

^{১৭} ইবনু মাযাহ, আস-সুনান ১/৫১৮; আলবানী, সহীহ সুনান ইবনি মাজাহ ১/২৭১।

তার মৃত্যুর সংবাদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন সাহাবীরা। প্রচণ্ড শোকে স্থাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। তাঁর উফাত হতে পারে-এ কথা মানতে কেউ কেউ অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ قَفَّامَ عَمَرٌ يَعْوُلُ : وَاللَّهُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَتْ : وَقَالَ عَمَرٌ : وَاللَّهُ مَا كَانَ يَقْعُدُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَنْعِتَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعْنَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَبَّلَهُ قَالَ بَابِي أَنْتَ وَأَمِّي طَبَّتْ حَيَّاً وَمَيْتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْدِقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَسِينَ أَبْدَا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَلِهَا الْحَالُ فِي رِسْلَكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عَمَرُ فَحَمَدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَشْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ : (إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ) ، وَقَالَ : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَبْيِنِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) . قَالَ فَنَسَخَ النَّاسُ يَنْكُونُ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবু বাক্র (রা) (মদীনার প্রান্তরে) সুন্হ নামক স্থানে ছিলেন। তখন উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেন নি। আয়েশা (রা) বলেন, উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে এ ছাড়া অন্য কিছুই আসে নি। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে উঠাবেন এবং তিনি (যারা তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে) সে সকল মানুষের হস্তপদ কর্তন করবেন। তখন আবু বাক্র (রা) আগমন করেন। তিনি (আয়েশার ঘরের মধ্যে রক্ষিত) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক দেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁকে চুম্ব খান এবং বলেন: আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানি হোন, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পরিত্র ও মহান। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই দু বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। এরপর তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে (উমারকে সম্মোধন করে) বলেন, হে কসমকারী, একটু শান্ত হও! যখন আবু বাক্র (রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন উমার (রা) বসে পড়লেন। তখন আবু বাক্র আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণবর্ণনা করলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! যারা মুহাম্মাদের (ﷺ) ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) মুহাম্মাদ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) আল্লাহ চিরঝীব, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। এবং তিনি (কুরআনের আয়াত

উদ্ভৃত করে) বলেন^{১৮}: “তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল”, এবং বলেন^{১৯}: “মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।”^{২০}

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসারে আয়েশা (রা)-এর ঘরের মধ্যে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার (১৩ই রবিউল আউয়াল) উক্ত ঘরের মধ্যে তাঁকে গোসল করান হয় এবং কাফন পরান হয়। এরপর সাহাবীগণ তাঁর জানায়ার নামায আদায় করেন। একক বৃহৎ জামাতে জানায়া হয় নি। সাহাবীগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে জানায়ার সালাত আদায় করে বেরিয়ে যান। এভাবে মঙ্গলবার সারাদিন কেটে যায়। মঙ্গলবার দিনগত রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করা হয়।

আয়েশার (রা) এই বাড়িটির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত X ৮ হাত। অর্থাৎ, তাঁর পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও কম জায়গা। উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিছনের অংশটুকু (১০ হাত X ৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম। এই ঘরের মধ্যে (১০ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও আয়েশা (রা.) সেখানে বসবাস করতেন। আর কোনো বস্তবাড়ি তাঁর ছিল-না। পরবর্তী কালে আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-কেও এই ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয়। এই ঘরের মধ্যে কবরগুলির পাশেই আয়েশা (রা.) প্রায় ৫০ বৎসর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।^{২১}

৩. ১. ২. ৮. আয়াত ও মুজিয়া

মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কর্ম সম্পাদন করাতেন যা সাধারণ মানুষের

^{১৮} সূরা (৩৯) যুমার: ৩০ আয়াত।

^{১৯} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৪৪ আয়াত।

^{২০} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪১; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৭/২৯-৩০। আরো দেখুন, বুখারী, আস-সহীহ ১/৪১৮, ৪/১৬১৮; ফাতহল বারী ৩/১১৩; ৭/১৪, ৮/১৪৫।

^{২১} বিস্তারিত দেখুন, খোদ্দকার আল্লাহর জাহানীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৩৭৪-৩৭৮।

সাধ্যের বাইরে। এ সকল কর্ম তাদের নবৃত্তের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করত। কোনো নবী মৃতকে জীবিত করেছেন, কেউ জুলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে থেকেছেন। কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত, নির্দশন বা চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলিকে মু'জিয়া বলা হয়। এবিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ অনেক ‘আয়াত’ বা মু'জিয়া দান করেছিলেন। অন্যান্য সকল নবীর মু'জিয়া ছিল তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ তাঁর সময়ের মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ কেউ ঈমান এনেছে, কেউ অবিশ্বাস করেছেন। পরবর্তী যামানার মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি। তাঁরা শুধুমাত্র এ সকল মু'জিয়ার কথা পড়েছেন বা শুনেছেন।

যেহেতু মুহাম্মাদ (ﷺ) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মু'জিয়া দান করেছেন, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ কুরআন নাখিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহবান করেন। তারা তাতে অক্ষম হয়।

আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে স্তুতি করতে এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে মক্কার কাফিরগণ নিজেদের জীবন ও সম্পদ বাজি রেখেছে। অথচ তাদের জন্য খুবই সহজ ছিল যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করে জনসমক্ষে উপস্থিত করে দাবি করা যে, এই দেখ আমরা মুহাম্মাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার জবাব দিয়েছি। যেহেতু জনমত ছিল তাদের পক্ষে এবং অধিকাংশ মানুষই তাদের মতের ছিল সেহেতু মোটামুটি কাছাকাছি একটি সূরা তৈরি করেই তার হৈ চৈ করতে পারত এবং তাদের পক্ষের মানুষদের মনোবল জোরদার করতে পারত। কিন্তু কখনোই তার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। কারণ তারা জানত যে, এতে তাদের পক্ষের আরবদের সামনেই তাদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পাবে।

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মু'জিয়া। বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানব জাতি কুরআনের নতুন নতুন মু'জিয়া জানতে পেরেছেন। আধুনিক যুগেও যে সকল অমুসলিম বৈজ্ঞানিক, গবেষক বা পণ্ডিত কুরআন অধ্যয়ন করছেন তারও স্বীকার করছেন যে এই গ্রন্থ কোনো মানুষের রচিত নয়, বরং তা মহান স্বীকৃত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কেউ তাতে ঈমান এনেছেন, কেউ এড়িয়ে গিয়েছেন। এ ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের মানুষ নতুনভাবে এই চিরস্থায়ী মু'জিয়ার মাধ্যমে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতা বুঝতে পারবে।

এছাড়া মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরো অনেক মুজিয়া দান করেছিলেন যা তাঁর সমসময়িক মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সকল মুজিয়ার মধ্যে কিছু মুজিয়ার বিবরণ কুরআনে রয়েছে। অন্যান্য মুজিয়ার বিবরণ হাদীস থেকে জানা যায়। কুরআনে উল্লিখিত মুজিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি মুজিয়া:

(১) ইসরা ও মিরাজ: অঙ্গোকিকভাবে রাজিশ্রমন ও উর্ধ্বগমন

মহান আল্লাহ কুরআনে সূরা বনী ইসরাইলে বলেছেন:

**سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدَهُ لَنِلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ لِتُرِيهَ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ**

“পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বাস্তাকে রজনীয়োগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরাশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নির্দশন দেখাবার জন্য।”^{২২}

অন্যত্র সূরা নাজমে আল্লাহ বলেছেন:

**أَفَتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
عِنْهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ
رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبِيرَىٰ**

“সে (মুহাম্মাদ ﷺ) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া (অবস্থানের জান্নাত)। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নির্দশনাবলি দেখেছিল।”^{২৩}

এ সকল আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। আর ‘বাস্তা’ বলতে আজ্ঞা ও দেহের সমর্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ বলেন: “তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বাস্তাকে, যখন সে সালাত আদায় করে?”^{২৪} অন্যত্র সূরা

^{২২} সূরা ইসরা (বনী ইসরাইল), ১ আয়াত।

^{২৩} সূরা (৫৩) নাজম: ১২-১৮।

^{২৪} সূরা (৯৬) আলাক, ৯-১০ আয়াত।

জিন্ন-এর মধ্যে তিনি বলেন: “আর এই যে, যখন আল্লাহর বাদ্দা তাঁকে ডাকার জন্য দশায়মান হলো তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।”^{২৫} নিঃসন্দেহে উপরের দুই স্থানেই ‘বাদ্দা’ বলতে দেহ ও আজ্ঞার সমন্বিত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এথেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখানেও ‘বাদ্দা’ বলতে দেহ ও আজ্ঞার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভূমন করানোর কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরাও মিরাজ (নৈশভ্রমন ও উর্ধ্বারোহণ) অঙ্গীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিরাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরণপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহাত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অঙ্গীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপাতে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অঙ্গীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাহাত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবালির মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মূজিয়ার সঙ্কান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা।

(২) চন্দ্র ধ্বনি করা

মুক্তার কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শন দাবি করে। তখন রাত্রি বেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছু পরে আবার তা একত্রিত হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرُوا أَيْهَا يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ

“কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।”^{২৬}

^{২৫} সূরা (৭২) জিন্ন, ১৯ আয়াত।

^{২৬} সূরা (৫৪) কামার, ১-২ আয়াত।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আবুস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতায়িম (রা) ও হ্যাইফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আলিমগণ এ বিষয়ক হাদীসগুলিকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেছেন।

এ ছাড়া আরো অগণিত আয়াত বা মুজিয়া মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির বিস্তারিত তালিকার জন্যই পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। তাঁর দু'আয় খাদ্যে অলৌকিক বরকতের ঘটনা ঘটেছে অগণিতবার। সামান্য কয়েকটি ঝটি দ্বারা শতাধিক মানুষ ত্প্রিয়ি সাথে আহার করেছেন। সামান্য আধ আজলা পানির মধ্যে তিনি হাত রাখলে আঙুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা বের হয় যাতে কয়েক হাজার মানুষের এক বিশাল বাহিনীর সকলেই ওয়ু-গোসল ও পানি পান করেন। তাঁর দু'আয় মৃত ঝর্ণায় পানির সঞ্চার হয়, মাত্র দু পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা হয়, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হয়, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষ তাঁর নির্দেশে পালন করে, কথা বলে ও সাক্ষ দেয়। শুষ্ক খেজুরের গুড়ি তাঁর জন্য মানব শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে। তাঁর দু'আয় অঙ্গ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করেব, বাকশক্তিহীন কথা বলে, পাগল সুস্থ হয়।

তাঁর অলৌকিক নির্দেশ বা মুজিয়ার মধ্যে অন্যতম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে, তাঁর বিভিন্ন সাহাবী সম্পর্কে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যা তার জীবদ্ধশায় ও তার পরে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।^{২৭}

৩. ১. ২. ৯. আকৃতি ও প্রকৃতি

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাঝারি আকৃতির ছিলেন। তিনি বেঁটে ছিলেন না, আবার অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন ন। তাঁর কাঁধ প্রশস্ত, মাথা বড়, হাত-পায়ের আঙুলগুলো পৌরুষ প্রকাশক ও শক্ত এবং মুখ বড় ছিল। তাঁর চক্ষু ছিল আকর্ষণীয়ভাবে বড়।

^{২৭} রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনী ও মুজিয়া সম্পর্কিত উপরের তথ্যাদি ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: ইবনু হিশাম, আস-সিরাতুন নাবাবীয়াহ; ইবনু হিবান, আস সিরাতুন নাবাবীয়াহ; যাহাবী, আস সিরাতুন নাবাবীয়াহ, বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ কাসতালানী, আল-মাওয়াহিবুল্লাহমিয়াহ; মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ শামী, আস-সীরাহ আশ-শামিয়াহ সুবুলুল হৃদা ওয়ার রাশাদ; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী, শারহল মাওয়াহিব; সাফিউদ্দীন মুবারাকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম; ড. মাহাদী রিয়কুল্লাহ, আস সীরাতুন নাবাবীয়া ফী দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়াহ, ড. আকরাম দিয়া আর উমারী, আস সীরাতুন নাবাবীয়াহ আস সহীহাহ ও অন্যান্য সিরাত ও হাদীসের গ্রন্থ।

এবং ফাড়া। তাঁর শরীরের রং ছিল ফরসা, সুন্দর কিছুটা লালচে মিশ্রিত সাদা। তাঁর চেহারা মোবারক ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর ও মনেমুঝকর।

তাঁর মাথা ভরা কাল চুল ছিল। তাঁর চুল বেশী কঁকড়ান বা একবারে সোজা ছিল না, সামান্য কঁকড়ান ছিল। তাঁর সুবিন্যস্ত চুল সাধারণত তাঁর কান পর্যন্ত লম্বা নেমে আসত। তিনি হজ্জ-ওমরা ছাড়া কখনো মাথা মুগ্ন করতেন না। ইন্তেকালের পূর্বেও তার চুল ও দাঢ়ি কাল ছিল। সামান্য ১৫/২০টি চুল সাদা হয়েছিল।

তিনি দৃঢ় পায়ে বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটতেন, এমনভাবে যে তাকে দেখে মনে হত তিনি ঢালু যমিনের উঁচু থেকে নীচুতে নামছেন এবং পদক্ষেপের সাথে সাথে সামনে ঝুকে পড়ছেন।

তিনি জাগতিক চাকচিক্য ও বিলাসিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। খুব সামান্য খাদ্য খেতেন। কখনো কখনো মাসের পর মাস তাঁর ঘরে কিছুই রান্না হত না। শুধুমাত্র ২/১টি খেজুর ও পানি খেয়েই দিন কাটাতেন। মেহমানদের সাথে তিনি কখনো পেটভরে খান নি। তিনি খাওয়ার সময়ে সাধারণত তিনটি আঙুল ব্যবহার করতেন এবং খাওয়ার পরে আঙুলগুলো চেটে নিতেন। তিনি সাধারণ খেজুরের ছোবড়ার বিছানায় শুতেন। তিনি ডান দিকে কাত হয়ে, ডান হাতের তালু তার ডান গালের নীচে রেখে ঘুমাতেন।

মদীনার জীবনে তিনি ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান। সকল যুদ্ধলক্ষ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর তাঁর জন্য নির্ধারণ করে দেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই প্রচুর সম্পদ তাঁর মালিকানায় আসত। কিন্তু তিনি নিজের জন্য টাকা পয়সা নিজের কাছে রাখতেন না। সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন। তার ইন্তেকালের আগে তার কাছে মাত্র ৭টি দিরহাম ছিল যা তিনি বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার ব্যবহারের বর্মটিও তিনি ইন্তেকালের আগে আর ছাড়িয়ে গমের বিনিময়ে বক্ষক রাখেন, যা তিনি ইন্তেকালের আগে আর ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি। ইন্তেকালের সময় তিনি কোনো নগদ টাকা পয়সা রেখে যান নি। সামান্য কিছু খেজুরের বাগান তার ছিল। তিনি ওসিয়ত করেন যে তার মৃত্যুর পরে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদকাই বা ওয়াকফ দান বলে হণ্ড হবে, তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে না।

তিনি সুগঞ্জি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি সর্বদা সুগঞ্জি ব্যবহার করতেন। কেউ তাঁকে সুগঞ্জি উপহার দিলে তা কখনো ফেরত দিতেন না।

তিনি কথা বলতেন ধীরে এবং প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। তিনি কখনো উচ্চশব্দে হাসতেন না। সর্বদা তিনি মৃদু হাসতেন।

তিনি সবার সাথে হাসিমুখে মিলিত হতেন। কারো সাথে কথা বললে তিনি তাঁর দেহ ও মুখমণ্ডল পুরোপুরি তার দিকে ফিরিয়ে এমনভাবে মনোযোগ ও সমানের সাথে কথা বলতেন যে, তাঁর সাথে যেই কথা বলত সেই অনুভব করত যে, সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অত্যন্ত সমানিত ও প্রিয়।

তিনি অনাবিল হাসি তামাশা পছন্দ করতেন। কিন্তু কখনোই তিনি হাসি তামাশার জন্য এমন কথা বলতেন না যার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র রয়েছে। পারিবারিক জীবনে তিনি তাঁর স্ত্রী-পরিজনদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পারিবারিক মতভেদে কথা কাটাকাটিতে তাদের প্রতিবাদ, আপত্তি হাসিমুখে নীরবে শুনতেন। তিনি নিজের কাপড় নিজে পরিষ্কার করতেন, নিজের ছাগল নিজে দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন।

তিনি কখনো তার কোনো খাদেশ বা স্ত্রীকে ধর্মক দেন নি। তিনি কখনো চিৎকার করে কথা বলতেন না বা ঝগড়া বা গালিগালাজ করতেন না, কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না। একমাত্র ইসলামের বিরোধিতা দেখলেই তিনি রাগাশ্বিত হতেন। এছাড়া কখনো তাকে রাগতে দেখা যায়নি। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো উপর রাগ করেন নি, কোনো প্রতিশোধ নেন নি। কেউ তার প্রতি ব্যক্তিগত কোনো অপরাধ করলে বা তাঁকে কেউ কষ্ট দিলে, তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ি ছিলেন। মদীনায় তিনি ছিলেন একচুরি অধিপতি, শাসক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রধান। কিন্তু কখনো তাঁর আচরণে শক্তি বা প্রতিপত্তির সামান্যতম প্রভাব ছিল না। মদীনার দরিদ্রতম বা নগণ্যতম ব্যক্তিকেও তিনি পরিপূর্ণ সম্মান দান করতেন, ডাকলে তার বাড়ীতে যেতেন, তার কাছে বসে তার কথা শুনতেন। তিনি সর্বদা অতি সাধারণ পোষাক ও বাসস্থান ব্যবহার করতেন। তাঁর বিনয়ের একটি দিক ছিল যে, কেউ তার সম্মানে উঠে দাঁড়াক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর সাহাবীগণ তাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁকে আসতে দেখলে তার সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে তিনি মাজলিস ছেড়ে প্রস্থান করার সময় যখন উঠে দাঁড়াতেন তখন উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াতেন।^{১৮}

৩. ১. ৩. আব্দুল্ল

এখানে দুটি শব্দ রয়েছে ‘আব্দ’ ও ‘হ’, অর্থাৎ তাঁহার আব্দ বা

^{১৮} রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক গঠন, চারিত্রিক শুণাবলী ও আচরণ সম্পর্কে তথ্যগুলোর জন্য দেখুন: ইমাম তিরমিয়ি, আশ শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়াহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, মুখতাসারুল শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ।

আল্লাহর আব্দ। আরবী ‘আব্দ’ (عبد) শব্দের ফারসী ভাষায় অর্থ (বান্দা)। সাধারণভাবে বাংলাভাষায় এই ফার্সী শব্দটি প্রচলিত। আবদ বা বান্দার বাংলা অর্থ ‘দাস’, ‘ক্রীতদাস’ বা “চাকর”। আরবী ভাষায় সাধারণভাবে (আব্দ) বলতে সৃষ্টি বা মানুষ বুঝানো হয়, কারণ প্রতিটি মানুষই আল্লাহর দাস বা বান্দা। আবু সাইদ খুদুরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃ থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আর মধ্যে বলতেন:

أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلَّا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ وَلَا مُغْطِيٌ
لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَقْعُدُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدَّ

“আমরা সবাই তো আপনার দাস, আর একজন দাসের সবচেয়ে বড় সত্য ও সঠিক কথা হলো: হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না, আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ দিতে পারে না এবং কোনো ক্ষমতাবান বা ধনবানের ক্ষমতা বা ধন আপনার কাছে তার কোনো উপকারে আসে না।”^{২৯}

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে শিরকের আলোচনায় দেখে যে, যুগে যুগে মানুষের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ও শিরকে নিপত্তি হওয়ার মূল কারণ ছিল, ফিরিশতা, জিন, নবী, নেককার মানুষ, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত হ্রান, দ্রব্য গাছ, পাথর বা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ইশ্বরত্ব বা ঐশ্঵রিক শক্তি কল্পনা করে বা এদের সাথে মহান আল্লাহর বিশেষ সুপারিশ বা লেনদেনের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করে জাগতিক বিপদ, আপদ, সমস্যা, অনাবৃষ্টি, অসুস্থতা, ফসলহীনতা ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য এদের কাছে ধর্না দেওয়া, প্রার্থনা করা এবং এরা যেন তুষ্ট হয়ে ডাকে সাড়া দেয় সে জন্য এদের নামে বা এদের কবর, মূর্তি বা স্মৃতি বিজড়িত হ্রানে মানত, ভেটে, ফুল, সাজাদা ইত্যাদি প্রদান।

নবী-রাসূলগণকে নিয়ে তাঁদের পরবর্তী উম্মতগণ এভাবে শিরকের মধ্যে নিপত্তি হয়েছে। যে নবী রাসূলগণ মানবজাতিকে শিরকের অঙ্ককার থেকে তাওহীদের আলোয় আনতে জীবনপাত করেছেন, তাঁদেরই উম্মতেরা তাঁদের তিরোধানের পরে তাঁদের মধ্যে “ইশ্বরত্ব” কল্পনা করে তাঁদের ইবাদত শুরু করে। তাঁদের মু'জিজা ও অলৌকিক নির্দর্শনাবলীকে তারা তাঁদের ঐশ্বরিক শক্তির প্রমাণ হিসাবে পেশ করে আল্লাহর পরিবর্তে তাঁদের কাছেই প্রার্থনা, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি চাওয়া, তাঁদের খুশি করতে ভেটে, মানত ইত্যাদি প্রদান করা শুরু করে।

^{২৯} মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৪৭; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ২/৩৩২; আয়াম আবাদী, আউনুল মাবুদ ৩/৫৯।

সৃষ্টির মধ্যে “ইশ্বরত্ব” কল্পনার প্রধান দুটি দিক: প্রথমত, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার বিশেষ সম্পর্ক দাবী করা। তাকে ইশ্বরের পুত্র, কন্যা বা বংশধর বলে দাবী করা। খ্রীষ্টানগণ আল্লাহর মহান রাসূল ঈস্বা (আ)-কে “আল্লাহর পুত্র” রূপে দাবী করে। তারা “পুত্রত্ব” বলতে জাগতিক পিতাপুত্র সম্পর্ক বুঝায় না। তাদের কাছে পুত্রত্ব অর্থ স্রষ্টা ঈস্বাকে (আ.) তার নিজের জাত বা সম্ভা (Same Substance) থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তাঁর মধ্যে ইশ্বরত্ব রয়েছে। অগণিত বিভাস্তি ও জগন্য যিথ্যা কথা দিয়ে তারা বাইবেলের তাওহীদমূলক অসংখ্য নির্দেশনা ও উক্তিকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে এই মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনুরূপভাবে আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা কন্যাসন্তান বলে বিশ্বাস করব।

সৃষ্টির মধ্যে ইশ্বরত্ব দাবীর দ্বিতীয় দিক হলো অবতারত্ব (Incarnation) দাবী। অমুকের মধ্যে স্রষ্টা বা তাঁর বিশেষ কোনো গুণ বা শক্তি মিশে গিয়েছে বা স্রষ্টার সাথে তার মিলন হয়েছে বা তিনি তাঁর সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন।

এ ধরনের সকল শিরকে মূলোৎপাটন করতে এবং সেগুলির দরজা বঙ্গ করতে ইসলামী ঈমানের মধ্যে “মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ” ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর মনোনিত রাসূল, তাঁর মহত্বম সৃষ্টি ও তাঁর প্রিয়তম। কিন্তু সর্বাবস্থায় তিনি তাঁর বান্দা, দাস ও মানুষ। তিনি স্রষ্টার অবতার নন, স্রষ্টার সত্তার অংশ নন, স্রষ্টা বা তাঁর কোনো গুণের সাথে মিলে মিশে তিনি একাকার হয়ে যান নি। কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। তাঁর মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণতম বান্দা ও উপাসক হওয়ার মধ্যে। তাঁকে পরিপূর্ণ ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক মূলত বাড়াবাঢ়ি ও অতিভক্তি থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই বিশ্বাস রক্ষা কবজ।

পূর্ববর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতকে “আল্লাহর বান্দা ও রাসূল” বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উম্মতের পরবর্তীতে ভক্তিকে আনুগত্যের উপরে স্থান দিয়ে তাদেরকে পুত্র বা অবতার বলে দাবী করেছে। এভাবে তাঁদের শিক্ষা, ধর্ম ও শরীয়ত বিকৃত ও নষ্ট হওয়ার পরে আল্লাহ সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে এভাবে তাওহীদের হেফায়ত করেছেন।

৩. ১. ৪. রাসূলুহ

এখনেও দুটি শব্দ রয়েছে: ‘রাসূল’ ও ‘হু’, অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহর) রাসূল। আরবী ‘রাসূল’ (رَسُول) শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, প্রেরণকৃত, দৃত, প্রতিনিধি, বার্তাবাহক (Messenger, emissary, envoy, delegate,

apostle) ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় রাসূল অর্থ আল্লাহর মনোনিত ও নির্বাচিত ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ওইর মাধ্যমে তাঁর বাণী ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং তা মানুষের কাছে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল মনোনিত মানুষকে আল্লাহ দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন 'নবী' ও 'রাসূল'। উভয় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও পার্থক্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে 'আরকানুল ঈমান'-এর মধ্যে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করা ঈমানের ভিত্তি। কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত ও অগপিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং নবী। উভয় পদমর্যাদাই তাঁর জন্য প্রযোজ্য।

নবী-রাসূলগণের প্রেরণে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা দেখব যে, নবী-রাসূলগণের প্রেরণ মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রেম ও করুণার মহান নির্দর্শন। আর এই করুণার সর্বশেষ প্রকাশ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল ও নবী হিসেবে প্রেরণ।

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে তাকে তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে সাথে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর মনোনিত ও নির্বাচিত বার্তাবাহক।

৩. ২. রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ

মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে সত্য বিশ্বাস করা। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিশ্বাসের যে সকল দিক শিক্ষা দিয়েছেন তা আমরা নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

(১) তাঁর নুরওয়াতের বিশ্বাস। অর্থাৎ তিনি নুরওয়াত পেয়েছেন, তাঁর নুরওয়াত সর্বজনীন, তাঁর মাধ্যমে নুরওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে, তিনি নুরওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করেছেন, তিনি নুরওয়াতের দায়িত্ব হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল।

(২) তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য, তাঁর অনুসরণ মুক্তির পর্য এবং তাঁর রীতির ব্যক্তিগত ঈমান বিধ্বংসী।

(৩) তাঁর মর্যাদা ও ভালবাসায় বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস, মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার পূর্ণতায় বিশ্বাস, তাঁকে ভালবাসার

অপরিহার্যতা এবং তাঁর কারণে তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ এবং তাঁর আনুগত্যে-অনুসরণে অগ্রগামীদের ভালবাসা।

নিম্নে রিসালাতের বিশ্বাসের এ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ২. ১. তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাত

একজন মুসলিম সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দিতে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণ শিক্ষা দিতে এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করতে আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِنْبَارِ
وَسِرَاجًا مُنْبِرًا

“হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।”^{৩০}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

“হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন।”^{৩১}

৩. ২. ২. তাঁর নুবুওয়াতের সর্বজনীনতা

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রাহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো মানুষ মুক্তির দিশা পাবে না। আল্লাহ বলেছেন:

^{৩০} সূরা (৩৩) আহ্যাব: ৪৫-৪৬ আয়াত।

^{৩১} সূরা (৫) মায়দা: ৬৭ আয়াত।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِّرًا وَنَذِيرًا

“আমি তো আপনাক সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।”^{৩২}

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ يَحْيِي وَيَمْتَعُ فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَيْعُوهُ لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“বল: হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক রাসূল উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।”^{৩৩}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“তিনিই মহিমাময় যিনি তাঁর বান্দার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।”^{৩৪}

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য করুণা বা রহমত-স্বরূপ প্রেরণ করেছি।”^{৩৫}

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَضَلَّتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَسْتُ أَغْطِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلَمِ وَنُصِرِّتْ بِالرُّغْبَ
وَأَحْلَتْ لِيَ الْغَنَائِمَ وَجَعَلَتْ لِيَ الْأَرْضَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْخَلْقَ

^{৩২} সূরা (৩৪) সারাঃ ২৮ আয়াত।

^{৩৩} সূরা (৭) আ'রাফः ১৫৮ আয়াত।

^{৩৪} সূরা (২৫) গফুরকান: ১ আয়াত।

^{৩৫} সূরা (২১) আনবিয়া: ১০৭ আয়াত।

كَافَةً وَخَتَمْ بِي النَّبِيُّونَ

“ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) উপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: (১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক উচাঙ্গের ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে, (২) আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, (৩) আমার জন্য যুদ্ধলক্ষ গন্মীমত বৈধ করা হয়েছে, (৪) পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রার উপাদান ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, (৫) আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাঞ্ছ হয়েছেন।^{৩৬}

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُغْطِهِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصْرَتْ بِالرُّغْبَ مَسِيرَةً
شَهْرٍ وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسِيدًا وَطَهُورًا وَأَيْمًا رَجْلٌ مِنْ أَمْتَى أَذْرَكَتْهُ
الصَّلَاةَ فَلَيَصِلُّ وَأَحْلَتُ لِي الغَنَامَ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَيْ قَوْمٍ خَاصَّةً وَيَعْثُثُ
إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ

“আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে প্রদান করা হয় নি: (১) এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, (২) আমার জন্য পৃথিবীকে মাসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করে দেওয়া হয়েছে, আমার উম্মাতের যে কোনো মানুষ যেখানেই তার সালাতের সময় উপস্থিত হবে সেখানেই সে সালাত আদায় করবে, (৩) আমার জন্য যুদ্ধলক্ষ গন্মীমতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, (৪) পূর্ববর্তী নবীদেরকে পাঠানো হতো বিশেষভাবে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য এবং (৫) আমাকে শাফা'আত প্রদান করা হয়েছে।^{৩৭}

কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (ﷺ) কোনো নির্দিষ্ট যুগের বা বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত নবী তবে তিনি ইসলামের গভীরতে প্রবেশ করতে পারবেন না, যদিও তিনি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে বিশ্বাস করেন। কারণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তার সকল কথা ও শিক্ষাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তাঁর কিছু কথাকে অবিশ্বাস করার অর্থ তাঁকে অবিশ্বাস করা।

^{৩৬} মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭১।

^{৩৭} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬৮।

৩. ২. ৩. খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তি

একজন মুসলিম আরো বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোনো ওহী নাফিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। বক্তৃত, কুরআন ও হাদীসের এ বিষয়ক কোনো ঘোষণা না থাকলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হতাম।

প্রথমত, সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর পরে অন্য নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আগমন করবেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী গ্রহণ করে মানুষদেরকে জানাবেন। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বা রাসূলল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে কখনো কোনোভাবে জানান নি যে, তাঁর পরে মানব জাতির মধ্যে কোনো নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন। এ বিষয়টিই সন্দেহাত্তীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোনো নবী আসবে না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দীনের সর্বজনীনতা ও পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে বারংবার এবং তাঁর দীনকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কাজেই এরপর আর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্পত্য়োজন।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয় নি। উপরন্তু কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) শেষ নবী। অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَنْدِرٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمَا

“মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।”^{৭৮}

যুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) উপরে ঘর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: ... (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।”

^{৭৮} সূরা (৩৩) আহযাব: ৪০ আয়াত।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوَهُمُ الْأَبْيَاءُ كُلُّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّمَا لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلُفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: فُوَا بِيَنْعِةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا إسْتَرْعَاهُمْ .

“ইস্রায়েল সভানগণকে (বনী ইসরাইলকে) শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। উপস্থিতি সাহাবীগণ বলেন: আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন: ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি এভাবে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (আনুগত্য) প্রদান করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।”^{৭৯}

সাদ ইবনু আবী ওয়াক্তাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে (রা) বলেন:

أَنْتَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

“মূসার সাথে হারুনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যক্তিক্রম এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।”^{৮০}

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَثْلِي وَمَثْلُ الْأَبْيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلَ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعُ لَبْنَةِ مِنْ زَوَابِيَّةِ مِنْ زَوَابِيَّةِ جَعْلَ النَّاسَ يَطْوُفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وَضَعَتْ هَذِهِ الْلَّبْنَةُ قَالَ فَإِنَّ الْلَّبْنَةَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

“আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যিনি একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরী করেছে, কিন্তু ইমারতের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এই মনোরম ইমরতটির চারিদিকে ঘূরতে থাকে এবং বলতে থাকে: এ ইটটি যদি স্থাপন করা হতো! তিনি বলেন: আমিই এই সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।”^{৮১}

^{৭৯} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/৪৯৫, ৮/১১০, ১০/৫৭৭।

^{৮০} বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৬০, ৩/১৩৫৭, ৮/১৫৫১; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৭০।

^{৮১} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩০০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯০-১৭৯১; ইবনু হাজার,

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَثْلِي وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ كَعَنْ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْلَهَا إِلَّا مَوْضِعٌ
لِبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ الْبَنَةِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّا مَوْضِعُ الْبَنَةِ جِئْتُ فَخَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ

“আমার ও অন্যান্য সকল নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। মানুষেরা এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হতে লাগল। তারা বলতে লাগল, এই ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকত! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিই সেই ইটের স্থান, আমি এসে নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি।”^{৪২}

অন্য হাদীসে জুবাইর ইবনু মুতায়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ لِي أَسْنَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَخْدُ وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يَغْنُوُ اللَّهَ بِيَ الْكُفَّرَ وَأَنَا
الْحَاسِرُ الَّذِي يُحْسِرُ النَّاسَ عَلَى قَدْمِيِّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَنْ يَسِّ بَعْدَهُ أَحَدٌ (نَبِيُّ)

“আমার অনেক নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, এবং আমি আহমদ, এবং আমি ‘মাহী’ (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফ্র উচ্ছেদ করবেন, এবং আমি ‘হাশির’ (একত্রিতকারী), আমার পদদ্বয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে, এবং আমি ‘আকিব’ (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই।”^{৪৩}

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ الرَّسُولَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْفَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ

“রিসালাত বা রাসূলের পদ এবং নুরওয়াত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গিয়েছে, কাজেই আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।”^{৪৪}

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত পরিক্ষারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর আগমনের সাথে সাথে নুরওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোনো নবী

ফাতহুল বারী ৬/৫৫৮।

^{৪২} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩০০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯১।

^{৪৩} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৯৯, ৪/১৫৯২, ১৮৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮২৮।

^{৪৪} তিরহিয়ী, আস-সুনান ৪/৫৩৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/২৬৭; হাকিম, আল-মুসতাদারাক ৪/৪৩৩। হাদীসটি ইয়াম মুসলিমের শর্তনুসারে সহীহ।

বা রাসূল আসবেন না। তিনি একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর পরে যদি কেউ নুরুওয়াতের দাবী করে তবে সে অবশ্যই একজন ঘোর মিথ্যাবাদী ভঙ্গ। বিভিন্ন হাদীসে তিনি তাঁর উম্মতকে ভঙ্গ নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দান করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ

“নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বেই অনেক ঘোর মিথ্যাবাদীর (ভঙ্গ নবীর) আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে”^{৪৫}

গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে নুরুওয়াতের সমাপ্তির বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে^{৪৬} এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বরং প্রকত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও খাতমুন-নুরুওয়াত একইভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত। যারা তাঁর নুরুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন তাঁরাই তাঁর খাতমুন নুরুওয়াতের বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে নবুয়তের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন।

যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কেউ নিজেকে নবী বলে দাবি করে বা কেউ একুপ দাবিদারের কথা সত্য বলে মনে করে তবে সে নিঃসন্দেহে ভঙ্গ ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বা একুপ ভঙ্গের অনুসারী। যদি কোনো মুসলিম নামধারী একুপ দাবি করে বা একুপ দাবিদারের কথা বিশ্বাস করে তবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

উপরন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কোনো নবী বা রাসূল এসেছেন, আসতে পারেন, আসার সম্ভাবনা আছে বা আসা অসম্ভব নয় তবে সে ব্যক্তিও অমুসলিম কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে, যদিও সে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একজন নবী ও রাসূল বলে মানে, অথবা তাঁকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে মানে, অথবা তাঁর শরীয়তের বিধান মেনে চলে। এই ব্যক্তি মূলত “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-য় বিশ্বাস করে নি। কারণ কুরআনের মাধ্যমে এবং অগণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত তাঁর দ্ব্যৰ্থহীন শিক্ষাকে অস্বীকার ও অমান্য করলে আর তাঁর নুরুওয়াতের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ থাকে না।

^{৪৫} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৫৪, ৪/২২৩৯।

^{৪৬} মুতায়িব ইবনু মুকবিল আশ-শাস্মান, খাতমুন নুরুওয়াত, পৃ. ২২-২৩।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সোনালী দিনগুলিতে নুরুওয়াতের দাবি করে কেউ ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। কারণ এ বিষয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সচেতনতা ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী যাবত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলিমদের অভিভা এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকগণের কৃটকৌশলের কারণে এ সকল ভও মুসলিম সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে এবং অসংখ্য মুসলিমকে ধর্মচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল ভঙ্গের অন্যতম পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮ খ্র.)।

এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাম আহমদ ও তার মত ভও নবীরা সরাসরি নুরুওয়াত দাবি করে নি; কারণ তাহলে কোনো মুসলিমই তার দাবি গ্রহণ করবে না। বরং তারা প্রথমে বেলায়াত, কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি দাবি করে। এরপর তারা নিজেদেরকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। এগুলি সবই ইসলামী পরিভাষা ও ইসলাম স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু এগুলির অর্থ ও মর্ম না জানার কারণে অনেকেই এ সকল কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এভাবে তারা যখন কিছু মানুষকে তাদের একান্ত ভক্ত হিসেবে পেয়ে যায়, তখন বিভিন্ন কৌশলে নুরুওয়াত দাবি করে। আর তার অনুসারী ভক্তরা বিভিন্ন অজুহাত ও ব্যাখ্যা দিয়ে তার দাবি মেনে নেয়।

এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গ্রন্থের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, খাতমুন নুরুওয়াতের একটি দিক এই যে, ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কোনো ‘ব্যক্তির’ কোনো ‘ইসমাত’ (অভান্ততা), কাদাসাত (পবিত্রতা) বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই।

ইসলামকে জানার জন্য কুরআন হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজতিহাদ করবেন, কিন্তু কোনো মুজতাহিদ দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁর মতটি কোনোভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং সেটিই ইসলামের একমাত্র অভান্ত ব্যাখ্যা, অথবা মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ কোনো পদমর্যাদা প্রদান করেছেন। উম্মাতের মধ্যে আলিম-মুজতাহিদগণ থাকবেন। তাঁদের যোগ্যতা তাঁদের ইলম ও ইব্লাসে, আল্লাহর বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো বাণী বা নির্দেশনা গ্রহণের মাধ্যমে নয়। কাজেই কোনো আলিম বা বুজুর্গ বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি এরূপ কোনো ‘পদমর্যাদা’, ‘ইসমাত’ বা ‘অভান্ততা’ দাবি করেন, বা নিজের মতটি সরাসরি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য আলিমদের মতামত এদিক থেকে অধিকতর মর্যাদাময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে দাবি করেন তবে তিনি

তঙ্গ প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

ইসলামে কাশফ, ইলহাম, ইলকা ও সত্য স্বপ্ন রয়েছে। তবে এগুলি একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ব্যক্তিগত সম্মান, কারামত ও নিয়ামত মাত্র। এগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কোনো মানুষের জন্য দীন বুবার বা দীনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ বা ভিত্তি নয়। যদি কেউ নিজেকে এরূপ কাশফ, ইলকা বা ইলহাম-ধারী বলে দাবি করেন বা এই দাবির ভিত্তিতে নিজের মতটির নির্ভুলতা, অভ্রাততা (ইসমাত) বা বিশেষত্ব দাবি করেন তবে তিনিও তঙ্গ, প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

যুগে যুগে মুসলিম সমাজে মুজাদ্দিদ বা সংক্ষারক আসবেন বলে আবু দাউদ সংকলিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কেউ কখনোই নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করেন নি। আলিমদের কর্ম বিবেচনা করে সাধারণত তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরে পরবর্তী যুগের আলিমগণ কাউকে কাউকে মুজাদ্দিদ বলে মনে করেছেন। এ-ই ‘মনে করা’ বা ধারণা করাও একান্তই ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। কোন্ যুগে কে বা কারা মুজাদ্দিদ ছিলেন সে বিষয়ে আলিমদের অনেক মতভেদ রয়েছে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বে কেউ কখনো নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন নি। যদি কেউ নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে, অথবা তার অনুসারীগণ তার জীবদ্ধশাতেই তাকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি ও প্রচার করে আর তিনি তা সমর্থন করেন এবং তার এই ‘পদমর্যাদা’-র কারণে তার মতের বিশেষত্ব, অভ্রাততা বা পবিত্রতা দাবি করেন তবে তিনিও অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদী তঙ্গ প্রতারক বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

এগুলি সবই নুরুওয়াত দাবি করার বিভিন্ন পর্যায় ও পদক্ষেপ। এগুলির পরে কেউ যদি সরাসরি নুরুওয়াত দাবি করে তবে সে নিঃসন্দেহে প্রতারক তঙ্গ ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ কাফির।

৩. ২. ৪. তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতা

একজন মুসলিম সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তার নুরুওয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উচ্চতকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কোনো কিছুই তিনি গোপন করেন নি। আমরা দেখেছি আল্লাহ তাকে প্রচারের দায়িত্ব দান করে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَ رِسَالَتَهُ

“হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবর্তীণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না।”^{৪৭}

নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন এবং তাঁর প্রচারের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَقِيقَةً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

‘আর (কাফিরেরা) যদি আপনার আহবানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষাকর্তারূপে প্রেরণ করি নি। আপনার উপরে তো শুধু প্রচারের দায়িত্ব।’^{৪৮}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীদের সামনে প্রশ্ন করেন: আমি কি আল্লাহ বাণী সকল প্রচার করেছি? সাহাবীগণ একবাক্যে বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন:

وَأَنْتُمْ سُؤَالُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا أَنْشَهَ أَنْكَ فَدَبَّغَتْ وَأَذْبَتْ وَنَصَختْ

“তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা কি বলবে? তার বলেন: ‘আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামলায় তাদের মঙ্গলের সকল উপদেশ তাদেরকে জানিয়েছেন।’^{৪৯}

এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْنَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।”^{৫০}

ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَذَرْكُتُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لِيَلْهَاهَا كَنْهَاهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ

^{৪৭} সূরা (৫) মায়দা: ৬৭ আয়াত।

^{৪৮} সূরা (৪২) শূরা: ৪৮ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা আল ইমরান: ২০; মাইদা: ৯২, ৯৯; রাদ: ৪০; ইব্রাহীম: ৫২; নাহল: ৩৫, ৮২; নূর: ৫৪; আনকাবুত: ১৮; তাগাবূন: ১২।

^{৪৯} মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৯০।

^{৫০} সূরা (৫) মায়দা: ৩ আয়াত।

‘আমি তোমাদেরকে আলোকোজ্জ্বল পরিষ্কার চকচকে ধ্বনিতে রাস্তার উপর রেখে গেলাম, যেখানে রাতও দিনের মত আলোকিত উজ্জ্বল। শুধুমাত্র ধর্মস্প্রাণ্ডরাই আমার পরে এই রাস্তা থেকে সরে অন্য পথে যাবে।’^{১১}

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন;

إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ فَقَبَّلَ إِلَّا كَانَ حَفْنًا عَلَيْهِ أَنْ يَتَلَقَّ أَمْرًا عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُ
لَهُمْ وَيَنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُونَ

“আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যত ভালো বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দান করবেন, এবং তিনি তাদের জন্য যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন সেগুলি থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।”^{১২}

আবু যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا بَقَيَ شَيْءٌ يُقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيْنَ لَكُمْ

“জান্নাতের নিকটে নেওয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।”^{১৩}

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে বিশেষভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। উম্মাতের মুক্তি ও কল্যাণের সকল তথ্য সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরেও যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, তিনি কোনো শিক্ষা গোপন রেখে গিয়েছেন, গোপনে কাউকে জানিয়ে গিয়েছেন অথবা ইসলামের যে শিক্ষা তিনি সবাইকে দান করেছেন তাতে অপূর্ণতা আছে, অথবা তার পরে কেউ ইসলামের পূর্ণতা দান করতে পারে, তাহলে তিনি (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এই কথা বিশ্বাস করেন নি। বরং তিনি দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন নি (নাউয়ুবিল্লাহ!)।

৩. ২. ৫. তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা

একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে আল্লাহর পক্ষ

^{১১} ইবনু মাজাহ, আস-সুন্নাহ ১/৪; ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ ১/২৬।

^{১২} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭২।

^{১৩} তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাৰীর ২/১৫৫-১৫৬; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৮/২৬৩; হাদীসটির সনদ সহীহ।

থেকে যা কিছু উচ্চতকে শিরিয়েছেন ও জানিয়েছেন সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। তার সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উচ্চতের দায়িত্ব হলো, কথাটি তিনি বলেছেন কিনা, কর্মটি তিনি করেছেন কিনা বা শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা তা যাচাই করা। কোনো কথা, শিক্ষা বা কর্ম তাঁর বলে প্রমাণিত হলো তা সত্য বলে গ্রহণ করায় কোনো মুশ্যিন বিধা করতে পারেন না। এ হলো তাঁকে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمْنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“হে মু’মিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর রহমত থেকে তোমাদেরকে দ্বিতীয় পুরস্কার দান করবেন এবং তোমাদেরকে তিনি নূর (আলো বা জ্যোতি) দান করবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।”^{৪৪}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার (কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।”^{৪৫}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِنَتْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَاجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনোই মুশ্যিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে বিরাজিত সকল বিষয়ে তোমার বিধানের স্মরণাপন হবে, তোমার দেওয়া বিধানের ব্যাপারে তাদের মনের গভীরে কোনো আপত্তি অনুভব করবে না এবং সর্বান্তঃকরণে আপনার বিধান মেনে নেবে।”^{৪৬}

কাজেই কোনো বিধান রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলে কুরআন বা সহীহ

^{৪৪} সূরা (৫৭) হাদীদ: ২৮ আয়াত।

^{৪৫} সূরা (৬৪) তাগাবুন: ৮ আয়াত।

^{৪৬} সূরা (৪) নিসা: ৬৫ আয়াত।

হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে সে বিষয়ে আর কোনো মুঘ্লিনের হন্দয়ে দ্বিধা বা আপত্তি থাকতে পারে না। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَغْصُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিধান দান করলে সে ব্যাপারে কোনো মুঘ্লিন পূরুষ বা নারীর আর কোনো পছন্দ করার বা বাছাই করার অধিকার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল সে স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিপত্তি হল।’^{১৩}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।’^{১৪}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস আনয়ন না করলে, তাঁর সকল শিক্ষা ও সকল কথাকে সত্য বলে না মানলে আল্লাহকে মানা বা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কোনো মূল্য থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বা তাঁর কোনো প্রমাণিত শিক্ষাকে অবিশ্বাস বা অবজ্ঞা করার অর্থ চূড়ান্ত কুফ্রী এবং তার পরিণতি ভয়ংকর। আল্লাহ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

‘আর যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে আমি কাফিরদের জন্য জুলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।’^{১৫}

কাজেই কোনো কথা বা শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলে প্রমাণিত হলে তা অবিশ্বাস করা, অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা বা বিকৃত করা কোনো মুসলিমের কর্ম নয়। আমরা জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা দুটি সূত্র থেকে আমরা পাই: কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ। যদি কোনো কথা বা শিক্ষা পবিত্র কুরআনে আছে বা সহীহ হাদীসে আছে বলে আমরা জানতে পারি, তবে তাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করাই মুসলিমের দায়িত্ব।

^{১৩} সূরা (৩৩) আহযাব: ৩৬ আয়াত।

^{১৪} সূরা হাশর ৭ আয়াত।

^{১৫} সূরা (৪৮) আল-ফাতহ: ১৩ আয়াত।

৩. ২. ৬. তাঁর আনুগত্য

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’- এ বিশ্বসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দিখাইন চিন্তে মেনে নেওয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাকে স্থান দেওয়া।

তাঁর আনুগত্যই ঈমানের আলামত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হৃকুম মান্য কর- যদি ঈমানদার হয়ে থাক।”^{৬০}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে রহমত করা হয়।”^{৬১}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُذْخَلَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَتَلَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্বোত্ত্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য।”^{৬২}

আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الدِّينِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا

“আর যদি কেউ আল্লাহর হৃকুম এবং তাঁর রাসূলের হৃকুম মান্য করে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা নবী, সিদ্ধীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর সাথী হিসেবে তারাই উত্তম।”^{৬৩}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

^{৬০} সূরা (৮) আনফাল: ১আয়াত।

^{৬১} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৩২ আয়াত।

^{৬২} সূরা (৪) নিসা : ১৩ আয়াত।

^{৬৩} সূরা (৪) নিসা: ৬৯ আয়াত।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائزُونَ

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শান্তি থেকে আত্মরক্ষা করে তারাই কৃতকার্য।”^{৬৪}

এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুমিনের জাগতিক সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর আনুগত্য মূলত তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে তার আদেশ নিষেধ জানতে হবে। আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। বিষয়টি কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

“যে ব্যক্তি রাসূলের হৃকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হৃকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে, তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।”^{৬৫}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ
مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَذُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبِلَاغُ الْمُبِينُ

“বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা তাঁর (রাসূল) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সঠিক পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়।”^{৬৬}

এখানেও আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

জাগতিক বিষয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা ‘আদেশ-

^{৬৪} সূরা (২৪) নুর: ৫২ আয়াত।

^{৬৫} সূরা (৮) নিসা : ৮০ আয়াত।

^{৬৬} সূরা (২৪) নুর: ৫৪ আয়াত।

নিষেধের অধিকারীদের' আনুগত্য প্রয়োজনীয়। তবে এ বিষয়ে যে কোনো মতভেদ বা সমস্যা নিষ্পত্তি করতে অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর শিক্ষার কাছে ফিরে আসতে হবে। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যকার সকল মতবিবোধের নিষ্পত্তি করা তার নির্দেশ ও শিক্ষা অনুসারে, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে। কুরআনে বা হাদীসে যে নির্দেশ থাকবে তা সর্বান্তরকরণে মেনে নিতে হবে। নিজেদের মতামতের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে তাঁর সিদ্ধান্তকে। এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'আদেশের মালিক' তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।" ^{৬৭}

৩. ২. ৭. তাঁর অনুকরণ

ইত্তা'আত বা আনুগত্য অর্থ আদেশ নিষেধ পালন করা। আর আদেশ-নিষেধের বাইরেও কর্মে ও বর্জনে অনুকরণকে আরবীতে 'ইতিবা' বলা হয়। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও দাবি হলো কর্মে ও বর্জনে হবহু তাঁর অনুকরণ করা। তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার সাথে সাথে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো জীবনের সকল পর্যায়ে কর্মে ও বর্জনে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তিনি যা যেভাবে করেছেন তা করা এবং তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা। কর্মে ও বর্জনে তাঁর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন:

لَفَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَنَكَرَ اللَّهَ كثِيرًا

"নিচ্য তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উভয় আদর্শ রয়েছে, যারা

^{৬৭} সূরা (৪) নিসা: ৫৯ আয়াত।

আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য।”^{৬৪}

এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, শুধু যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না, অর্থাৎ শুধুমাত্র কাফিররাই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে না বা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না। শুধু কাফিরদের জন্যই অন্য কারো আদর্শের প্রয়োজন হয়। মুমিনদের জন্য তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ আদর্শ। আর হ্বহু তাঁর আদর্শে জীবন পরিচালনাই ইমানের আলামত।

তাঁর আদর্শের অনুসরণ ও জীবন গঠনই আল্লাহর প্রেম, ক্ষমা ও মৃক্ষি লাভের একমাত্র পথ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বল, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না।”^{৬৫}

এভাবে আমরা দেখি যে, ‘লাইলাহ ইলালাহ’ বিশ্বাসের অর্থ হলো, চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভঙ্গি বা ভয় ও আশা মিশ্রিত অলৌকিক ভঙ্গি ও বিনয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বিশ্বাসের অর্থ হলো প্রশ়াতীত ও সামগ্রিক আনুগত্য ও অনুসরণ একমাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য। কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ আছে যে তাঁর আনুগত্যের উর্দ্ধে বা সে এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ না করলেও তার চলে, অথবা তাঁর আনুগত্য-অনুকরণ ছাড়াও আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব তাহলে সে ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যদিও সে কোনো বিষয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করে।

৩. ২. ৮. অনুকরণের ব্যতিক্রম ইমান বিমুক্তী

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো কল্পণ আছে বলে মুমিন বিশ্বাস করেন না। ‘মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল’ একথা বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাঁকে

^{৬৪} সূরা (৩৩) আহ্মাব: ২১ আয়াত।

^{৬৫} সূরা (৩) আল-ইমরান-৩১,৩২ আয়াত।

পেতে হলে, তাঁর বক্তৃত, বেলায়াত, সাওয়াব, প্রেম ও করুণা লাভ করতে হলে, তাঁর ইবাদত করতে হলে বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে, ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকলে বা ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فُتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“অতএব যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) আদেশের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়, তাদের উপর বিপর্যয় আপত্তি হবে, অথবা কোনো কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপত্তি হবে।”^{১০}

‘মুখালাফাহ’ অর্থ ব্যতিক্রম করা বা বিরোধিতা করা (to contradict, to be at variance)। ‘খিলাফ’ অর্থ ব্যতিক্রম, বিপরীত বা অসম্ভঙ্গ (difference, dissimilarity)। এ থেকে আমরা বুঝি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম, শিক্ষা বা আদর্শের ব্যতিক্রম বা তাঁর পথের ব্যতিক্রম চলা বা তাঁর শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধৰংসের কারণ।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।”^{১১}

আমরা জানি যে, একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নির্দেশনা লাভ করেছি। কাজেই আল্লাহর রাসূলের সামনে এগিয়ে যাওয়া বা অগ্রবর্তী হওয়ার অর্থই আল্লাহর সামনে অগ্রণী হওয়া। কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষা, আদর্শ, পথ ও মত থেকে একটু সামনে অগ্রবর্তী হবে বা দীন বুঝতে, পালন করতে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে তাঁর অতিরিক্ত কিছু কর্ম করবে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّسِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ

^{১০} সূরা (২৪) নূর: ৬৩ আয়াত।

^{১১} সূরা (৪৯) হজুরাত: ১ আয়াত।

الْمُؤْمِنِينَ نُولَّى مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيرًا

“কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দণ্ড করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!”^{৭২}

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক হাদীসে তাঁর পথের বা আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁর রীতি, পদ্ধতি বা কর্মের বাইরে কোনো কর্ম করলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর কর্মের বা আদর্শের বাইরে নব-উদ্ভাবিত কর্ম বা পদ্ধতিকে ‘বিআন্তি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمَلَ عَمَلاً لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَا فَهُوَ رَدٌّ

“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।”^{৭৩}

এ বিষয়ক আরো অনেক হাদীস আমরা উষ্ণ অধ্যায়ে বিদ্যাত ও বিভক্তি বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে আমরা মূলনীতি হিসেবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের ব্যক্তিক্রম মুমিনের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর। জীবনের প্রতি বিষয়ে ও প্রতি কর্মেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ রয়েছে। আদেশ নিষেধ ছাড়াও তাঁর কর্মরীতির বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রতি বিষয়েই তাঁর কর্মরীতি অনুসরণ প্রয়োজন। অন্তত তাঁর কর্মরীতিকে অপছন্দ করার পর্যায়ে কোনো মুমিনই যেতে পারেন না। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন :

جاءَ ثَلَاثَةٌ رَهَطَ إِلَى بَيْوَتِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانُوكُمْ تَقَالُوا هَا قَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُرِّلَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ نَبِيٍّ وَمَا تَأْخِرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي لِلَّلَّيْلِ أَبْدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصْوُمُ الدَّهْرِ وَلَا أَفْطَرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ أَبْدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ قَالَ : أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ اللَّهِ وَأَنْقَلْكُمْ لَهُ لَكُنِّي أَصْوُمُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلِي وَأَرْقَدُ وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ

^{৭২} সূরা (8) নিসা: ১১৫ আয়াত।

^{৭৩} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩; বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৫৩, ৯৫৯, ৬/২৬২৮, ২৬৭৫।

عن سُنْتِي فَلِيْسَ مِنِّي .

“তিনি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্তুগণের নিকট যেয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজাসা করলেন। তাঁরা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানালেন। মনে হলো এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পবরতী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উচ্চত, আমাদের উচ্চিৎ তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদত করা)। তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে (রাতের বা তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা সিয়াম পালন করব, কখনই রোয়া ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন: তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে (নফল) সিয়াম পালন করি, আবার মাঝেমাঝে সিয়াম পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি- শ্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”^{১৪}

এখানে এ সকল সাহাবী মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তাঁরা তাঁর রীতি জেনেছিলেন এবং মেনেও নিয়েছিলেন, তবে তাঁদের নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নেক আমলের জন্য তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। আমরা জানি, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করা নিষিদ্ধ নয়। হারাম দিবসগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালনও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে কোনো পুরুষের প্রয়োজন না থাকলে বা অসুবিধা থাকলে অবিবাহিত থাকাও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত শুরুত্বের সাথে তাঁদেরকে নিমেধ করেছেন। কারণ আল্লাহর নেকটা, বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াবের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির বাইরে বা অতিরিক্ত কোনো রীতির অনুসরণ করা মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, কেবলমাত্র সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্ম করলে বোধহয় প্রয়োজনীয় বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব হবে না। অবিকল সুন্নাত অনুসরণকারীর

^{১৪} বৃখারী, আস-সহীহ ৫/১৯৪৯।

চেয়ে অতিরিক্ত বা ব্যক্তিগত রীতিটি তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে। মনে হতে পারে তাহাজ্জুদ খুবই ভাল ইবাদত, কাজেই রাতে কিছু সময় ঘূর্মিয়ে নষ্ট করার চেয়ে সারারাত এই মহান ইবাদতে মাশগুল থাকাই উত্তম। রাতের অনেকখনি সময় ঘূর্মিয়ে নষ্ট করে কি লাভ? ইত্যাদি। আর একেই রাসূলুল্লাহ শ্শ ‘তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাদ বিন আবি ওয়াক্স (রা) বলেন:

لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونَ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عُثْمَانَ إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ بِالرَّهْبَانِيَةِ أَرَغَبْتَ عَنْ سُنْنَتِي قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنْنَتِي أَنْ أَصْلِي وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ وَأَنْكِحَ وَأَطْلَقَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلِيَنْسِي مِنِي .

“যখন উসমান বিন মায়উন (রা) দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুল্লাহ শ্শ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন: উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুম কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না। রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন: আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো (নফল) সিয়াম পালন করি, কখনো করি না, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিছেন্দণ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।”^{৭৫}

এ অর্থে অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমার আরু আমাকে বিবাহ দেন, কিন্তু ইবাদতের অগ্রহের কারণে আমি রাতদিন নামায রোয়ায় ব্যস্ত থাকতাম এবং আমার স্ত্রীর কাছে যেতাম না। তখন আমার আরু আমাকে অনেক রাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ শ্শ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন,

فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْتَئْتُهُ فَقَالَ لِي أَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَنَوَّمْ اللَّيلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِنِي أَصُومُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلِي وَأَنَامُ وَأَمْسِي النِّسَاءُ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلِيَنْسِي مِنِي ... ثُمَّ قَالَ ﷺ فَإِنَّ لَكُلَّ عَابِدٍ شَرَةً وَلَكُلَّ شَرَةً فَتَرَةً فَإِمَّا إِلَى سَنَةٍ وَإِمَّا إِلَى بِذْعَةٍ فَمَنْ كَانَ فَتَرَتَهُ إِلَى سَنَةٍ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَ فَتَرَتَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ.

^{৭৫} দারিয়ী, আস-সুনান ২/১৭৯; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৪৮; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৪/৩০১।

“রাস্লুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন সিয়াম পালন কর? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে সালাত আদায় কর? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি, আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে সালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই, স্নীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ‘আতের দিকে। যার স্থিতি-প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার স্থিতি-প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।”^{১৬}

এখানে প্রশ্ন হলো, উপরের হাদীসগুলিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করাকে রাস্লুল্লাহ ﷺ ‘সুন্নাত অবহেলা করা’ বা ‘সুন্নাত অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করলেন কেন? আমরা সুনিশ্চিত যে, উপরের হাদীসগুলিতে উল্লেখিত সাহাবীগণ কখনোই রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তাঁরা এমন কিছু করতে ইচ্ছা করেন নি যা ইসলামের নিষিদ্ধ। বরং তাঁরা কিছু নেক আমল রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর রীতির অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে পালন করতে আগ্রহ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কেন বারংবার রাস্লুল্লাহ ﷺ এরূপ করাকে ‘তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং বললেন যে, যে তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করবে সে তাঁর উম্মাত নয় বা তাঁর সাথে সম্পর্কিত নয়?

বিষয়টি অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন। সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদ‘আত সম্পর্কে আমি ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহ, বিদ‘আতী আকীদা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পরিচয় প্রসঙ্গে সুন্নাত বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে সুন্নাতের ব্যতিক্রমে ঈমানের বিচ্যুতি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে নিম্নের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি:

(১) উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রাস্লুল্লাহ যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন তা ততটুকু ও সেভাবে করাই সুন্নাত এবং তিনি যা করেন নি বা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত।

^{১৬} আহমাদ ইবনু হায়াল, মুসনাদ, নং ৬৪৪১, ৬৬৬৪, হাইসামী, যাওয়ারিদুয় যামআন বি যাওয়াইদি ইবন হিবান ২/৩৯৪, নং ৬৫৩, ইবনু আবী আসেম, কিতাবুস সুন্নাত, পঃ: ২৭- ২৮, নং ৫১, আলবানী, সাহীহত তারগীব ১/৯৮।

(২) তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতি ইসলামের অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, বিশেষ কোনো কারণে জরুরীও হতে পারে, তবে তা কখনোই দীনের অংশ হতে পারে না। তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রম, খেলাফ বা অভিরিঞ্চ কোনো কর্ম, রীতি বা পদ্ধতিকে দীনের অংশ বলে মনে করা বা তা পালন না করলে দীন, বেলায়াত, ভক্তি, সাওয়াব বা আখিরাতের মর্যাদা সামান্য পরিমাণ ব্যাহত হবে বলে ধারণা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতি দীনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে বিশ্বাস করা। এরই অর্থ সুন্নাত অপচন্দ করা। এরপ বিশ্বাস পোষণ করী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয়। ফলে সে আর তাঁর সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে না।

(৩) তাহাঙ্গুদের সালাত কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত ফয়েলতের ইবাদত। এ সকল সাধারণ দলীলের আলোকে বেশি বেশি তাহাঙ্গুদ আদায় বা সারারাত তাহাঙ্গুদ আদায় নিষিদ্ধ নয়। কোনো আবিদ যদি ইবাদতের উদ্দীপনায় তা কখনো করেন তবে তা ক্ষতিকর নয়। তবে তার কর্মের শ্রীতি ও নিয়মিত অবস্থান যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির ব্যতিক্রম হয় তবে তা ক্ষতিকর। কারণ এ পর্যায়ে তিনি ‘সারারাত’ তাহাঙ্গুদ আয়াতকে রাতের কিছু অংশ ঘূমানোর চেয়ে অধিক ফয়েলত বলে মনে করবেনই এবং বিভিন্ন দলিল দিয়ে নিজের এরপ কর্মকে রাতে কিছু সময় ঘূমিয়ে বাকি সময় তাহাঙ্গুদ আদায়ের চেয়ে অধিক উত্তম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকবেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি সারারাত তাহাঙ্গুদ আদায় না করে রাতে কিছু সময় ঘূমিয়ে কাটান তার প্রতি তিনি কিছুটা হলেও কষ্ট বোধ করবেন এবং তাঁর বেলায়াত, সাওয়াব বা কামালাত কিছুটা হলেও অপূর্ণ বলে অনুভব করবেন। তার কাছে মনে হবে, এভাবে কিছু সময় ঘূমিনে নষ্ট না করে একটু কষ্ট করে সারারাত তাহাঙ্গুদ আদায় করলে আরো বেশি কামালাত তিনি অর্জন করতেন! এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ও রীতিকে ‘অপূর্ণ’ বলে মনে করলেন!! আর এই হলো সুন্নাত অপচন্দ করা।

(৪) সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম বা নেক কর্মের বা রীতির উন্নোষ, উৎপত্তি ও বিকাশ সাধারণত ‘সুন্নাত অবহেলা করা’ বা ‘সুন্নাত অপচন্দ করা’-র কারণে হয় না, বরং ইসলাম নির্দেশিত ও সুন্নাত সমাত নেক আমল বেশি করে পালনের জন্য এবং বেশি করে আল্লাহর পুরক্ষার ও বরকত লাভের জন্যই তা হয়ে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সকল খেলাফে সুন্নাতই ‘সুন্নাত অপচন্দ করার’ পর্যায়ে চলে যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি।

(৫) ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

জন্মে আনন্দিত হওয়া, তাঁর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করা বা তাঁর উপর দরকুদ-সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত সম্মত ইবাদত। তবে এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী কয়েক শতকের মুসলিমগণের পদ্ধতি ছিল সাধারণ। মীলাদে নববীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুন্নাত পদ্ধতি ছিল সোমবার সিয়াম পালন করা। আর তার জন্ম জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে যে যখন যেভাবে পেরেছেন তাঁর জন্ম, জীবনী, সীরাত, শামাইল ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। ৭ম হিজরী শতাব্দী থেকে বাংসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পদ্ধতি চালু হয়। কয়েক শতাব্দী পরে মীলাদ মাহফিলের প্রচলন ঘটে।

(৬) মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল ‘বিদ‘আত’ বা নব-উত্তীবিত কর্ম। তাঁদের কেউ তা বিদ‘আতে হাসানা এবং কেউ তা বিদ‘আতে সাইয়েয়াহ বলে গণ্য করেছেন। যারা তা বিদ‘আতে সাইয়েয়াহ বলেছেন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ, জন্ম, জীবনী, সীরাত-শামাইল আলোচনা ও দরকুদ-সালাম পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিমত পোষণ করেন নি। বরং তারা এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণের তাকিদ দিয়েছেন। যারা একে বিদ‘আতে হাসানা বলেছেন তারাও এ সকল ইবাদত পালনের জন্য এ পদ্ধতিকে জরুরী বলে গণ্য করেন নি, বরং এ পদ্ধতিকে তারা জায়েয বা বৈধ বলে গণ্য করেছেন।

(৭) কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যারা ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন করেন তারা বিশেষ পদ্ধতিকে দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে বা সাহাবীগণের মত সোমবারে সিয়াম পালন করেন, সর্বদা দরকুদ-সালাম পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন না করেন তবে তারা কখনোই তাকে কামিল মুতাবিক মুমিন বলে মনে করবেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ মনে করবেন লোকটি ভাল, তবে আমাদের মত মীলাদ করলে আরো ভাল হতো। আর কেউ হয়ত বলবেন, যত কিছুই কর না কেন, মীলাদ পালন না করে জান্নাতে যেতে পারবে না। জেনে অথবা না জেনে তিনি ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ বা ‘মীলাদ মাহফিল’কেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের এবং তার প্রতি শৃঙ্খলা জ্ঞাপনের একমাত্র পথ বলে গণ্য করছেন।

(৮) আরো লক্ষণীয় যে, যে ব্যক্তি এরূপ সুন্নাতের ব্যতিক্রম, খিলাফে সুন্নাত বা ‘বিদ‘আত’ কর্ম বা পদ্ধতির অনুসারী তার মধ্যে এরূপ কর্ম বা

পদ্ধতির মুহারিত বা ভালবাসা সাধারণত সুন্নাতের ভালবাসার চেয়ে অনেক গভীর ও সুড়ত হয়। যিনি মীলাদ মাহফিল বা সৈদ মীলাদুন্নবী পালন করেন তিনি প্রতি সোমবারে সিয়াম পালন করে অথবা সাহাবীগণের পদ্ধতিতে সীরাত-শামাইল আলোচনা করে তত তৎপৰি, হাল বা 'ফায়ে' লাভ করবেন না যতটা তৎপৰি, হাল বা ফায়ে তিনি লাভ করবেন আনুষ্ঠানিক মীলাদ পালন করে। এভাবে তার মনের গভীরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে যে, হ্বহ সুন্নাত পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনে পূর্ণত লাভ সম্ভব নয়।

(৯) খেলাফে সুন্নাতের প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসার একটি বিশেষ দিক এই যে, এরপ কর্মই মুসলিম উম্মার দলাদলি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। যতদিন মীলাদের উত্তোবন হয় নি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি হয় নি। বিষয়টি ছিল উন্মুক্ত। যে যখন যেভাবে পেরেছেন তা পালন করেছেন। সৈদে মীলাদুন্নবী এবং মীলাদ মাহফিলের উত্তোবনের পরে অনেক আলিমই এ বিষয়ক বিতর্ক হার্ষক করে সমরোতার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিভক্তি রোধ করা যায় নি। সাধারণভাবে 'মীলাদের পক্ষের ব্যক্তি' মীলাদকেই 'স্বদল' ও 'বেদলের' মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। যদি কেউ আরকালুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত পূর্ণভাবে পালন করেন কিন্তু মীলাদ না করেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি আরকালুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদতে অবহেলা করেন, কিন্তু মীলাদ পালনের পক্ষে থাকেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের মানুষ বলেই মনে করেন।

(১০) এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের জন্য, তাঁর জন্ম ও জীবনী আলোচনার জন্য বা তাঁর উপর দরুন-সালাম পাঠের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের শেখানো ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। বরং সুন্নাত পদ্ধতিটি অপূর্ণ বা অচল, নতুন পদ্ধতিতে তা পালন না করা পর্যন্ত মুমিন তার কামালাত, বেলায়াত বা সাওয়াবের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। আর এ-ই হলো 'সুন্নাত অপছন্দ করা'।

(১১) এভাবে দীনের যে বিষয়েই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক আমল বা নেক আমলের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেখানেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে দীনের অংশ বলে গণ্য হয়েছে এবং সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

(১২) এভাবে আমরা দেখছি যে, যত ভাল নিয়াতেই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম করা হোক চূড়ান্ত পর্যায়ে তা 'সুন্নাত অপছন্দ করা'র পর্যায়ে চলে

যায়। আর বাহ্যত এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম নেক কর্ম করতে আপনি করেছেন। বরং সুন্নাত পালন না করলে যতটুকু আপনি করেছেন তার চেয়ে বেশি আপনি করেছেন সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে নেক কর্ম করলে। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ মোটেও আদায় করতেন না তিনি তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু ধর্ম দেন নি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে ইচ্ছা করেছেন তাকে ধর্ম দিয়েছেন। কারণ সাধারণভাবে প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুন্নাত অপচন্দ করার পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথচ এরপ সম্ভাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে খুবই প্রবল। বাহ্যত এজন্যই কুরআন কারীয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখালাফত বা ব্যতিক্রম করতে এবং অঘবতী হতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এজন্য মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কর্মে, রীতির বা আদর্শের অতিরিক্ত, ব্যতিক্রম বা বিরোধী কোনো কর্ম, রীতি বা আদর্শ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ। আল্লাহর নৈকট্য, কামালাত, তাকওয়া, বেলায়াত, সাওয়াব বা জান্নাত লাভের জন্য তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করার অর্থ তাঁর রিসালাতের পূর্ণতায় অবিশ্বাস করা। মুমিন হয়ত কোনো কারণে কোনো সুন্নাত পালনে অক্ষম হতে পারেন, অথবা বৈধ বা অবৈধ ওজরে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম করতে পারেন, তবে সুন্নাতের ব্যতিক্রমকে তিনি কখনোই সুন্নাতের চেয়ে উত্তম, সুন্নাতের সম্মতৃত্য, দীন, সাওয়াব বা বেলায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারেন না। মুমিন কখনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি তা না করলে তার দীনের কোনো ক্ষতি হবে বা অপূর্ণতা থাকবে।

৩. ২. ৯. তাঁর ভালবাসা

(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)-এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যে, এ বিশ্বাস পোষণকারী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সকল মানুষের উর্ধ্বে ভালবাসবেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

“যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তাঁর পিতা ও সন্তান থেকে বেশি ভালবাসবে।”^{১১}

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

^{১১} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪।

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَّذِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُينَ

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালবাসবে।”^{৭৮}

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। তিনি তখন উমারের (রা) হাত ধরে ছিলেন। উমর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তখন তিনি বলেন,

لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عَمَرُ فَإِنَّهُ
الآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْآنَ يَا عَمَرُ

“হলো না উমার, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, অবশ্যই আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। তখন উমার (রা) বলেন: আল্লাহর কসম, আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাঁ, উমর, এখন (তোমার ঈমান পূর্ণতা পেল)।”^{৭৯}

এখানে বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা কোনো মুখের দাবির ব্যাপার নয়। তার নির্দেশিত পথে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা, তার শরীয়তকে পুজানুপূজ্ঞরূপে পালন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকাই হলো তার মহবতের প্রকাশ। যে যত বেশী তার শরীয়তকে মেনে চলবেন এবং তার সুন্নাত মত জীবন যাপন করবেন, তার ভালবাসা তত বেশী গভীর হবে। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগ, ইয়ামগণ কর্ম ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাকে ভালবেসেছেন।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালবাসার অর্থ হলো তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সকল নবীর নেতা, সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা, তাঁর সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা এবং সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁকে সম্মান দান করা, তাঁর জন্য বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করা, তাঁর জীবনী, শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ ভালভাবে জানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। এভাবেই মুসলিমের অন্ত রে তাঁর প্রতি ভালবাসা গভীর হতে থাকে, তখন জীবনের সবকিছুর উর্ধ্বে, সকল মানুষের উর্ধ্বে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাঁকে ভালবাসতে সক্ষম হয় একজন মুসলিম। আমরা আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি,

^{৭৮} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৭।

^{৭৯} সহীহ বুখারী ৬/২৪৪৫; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ১১/৫২৩।

তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকৃত অনুসরণের ও প্রকৃত ভালবাসার তাওফীক দান করেন। আমীন!

৩. ২. ১০. তাঁর আহলু বাইত ও সাহাবীগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরদেরকে, তাঁর উম্যাতকে, তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালবাসা তাঁরই ভালবাসার প্রকাশ। বিশেষত তাঁর সাহাবী ও আহলু বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ২. ১০. ১. আহলু বাইত

কুরআনের আলোকে আমরা দেখি যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। এখানে কোনো বংশ, রক্ত, বর্ণ বা দেশের কোনো ‘পবিত্রতা’, ‘অলৌকিকত্ব’ বা বিশেষ অধিকার ঘোষণা করা হয় নি। হাদীসের শিক্ষাও অনরূপ। কুরআন কারীমে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে, বংশ বা বর্ণের কারণে নয়।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, দীন পালন ও বুআর ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের মানুমেরাও সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি ইমান, তাঁকে ভালবাসা, সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অগ্রণী ছিলেন। এছাড়া কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতীয়তার ভালবাসা রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহর বলেন:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوْدَةٌ فِي الْقُرْبَىٰ

“বল, ‘আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আতীয়তার সৌহার্দ্য ব্যক্তিৎ অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।’”^{১০}

যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মঙ্গা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। এরপর তিনি ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন :

أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَئِهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ
وَأَنَا تَارِكٌ فِيهِمْ تَقْلِينِ أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ

^{১০} সূরা (৪২) শূরা: ২৩ আয়াত।

وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ أَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ... ثُلَاثًا.

“হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দৃত এসে পড়বেন এবং আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। এরপর তিনি বললেন : ‘এবং আমার বাড়ির মানুষ বা পরিবার-পরিজন। আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।’ এ কথা তিনি তিনবার বলেন।”^{৮১}

ইবনু আবুস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
 أَحَبُّوا اللَّهَ (لِمَا يَغْنُوكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ) وَأَحَبُّوْنِي (بِحُبِّ اللَّهِ) وَأَحَبُّوا أَهْلَ
 بَيْتِي (بِحُبِّي)

“তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান করেন, এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় আমার বাড়ির মানুষদের (পরিবার, বংশধর ও আজীয়দের) ভালবাসবে।”^{৮২}

৩. ২. ১০. ২. সাহাবীগণ

ইসলামের শক্তিগণ বাহ্যিক বিরোধিতা, যুদ্ধ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে সক্ষম না হয়ে মুসলিম সেজে গোপনে ইসলামের মধ্যে বিভাস্তি দুকিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে চেষ্টা করে। এ ছাড়া কোনো কোনো মুসলিম নিজের আবেগ তাড়িত উদ্দীপনায় অক্ষ হয়ে সাহাবীগণের মর্যাদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বিভাস্তি জন্ম নেয়।

আমরা ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর ফিরকা ও দলাদলির বিষয়ে আলোচনার সময় দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর প্রথম দুটি বিভক্তি ও বিভাস্তি-খারিজীগণের বিভক্তি ও শিয়াগণের বিভক্তি- ছিল এ বিষয় কেন্দ্রিক। খারিজীগণ কুরআন ও হাদীস বুর্বার ক্ষেত্রে ও পালন করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তার

^{৮১} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৭৩।

^{৮২} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৬৬৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/১৬২। তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

নিজেরা কুরআন পড়ে বা হাদীস পড়ে যা বুঝত তাই চূড়ান্ত ও সঠিক বুঝ বলে মনে করত এবং তাদের বুঝের বিপরীতে সাহাবীগণের বুঝকে বিভাস্তি ও কুফ্র বলে আখ্যায়িত করত।

অন্যদিকে শীয়াগণ ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে বিভাস্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শক্তি বলে গণ্য করে। তারা নবী-পরিবারের ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত পাঞ্চাত্য প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিশোধার করেন। এ সকল প্রচারের একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। কারণ সাহাবীগণের সততা প্রশ়াবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ়াবিদ্ধ হয়ে যায়; কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল ভিত্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের জামা'আত অনুসরণ করা। এ বিষয়ে আমরা কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা ইসলামী আকীদার উৎস অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ইফতোরাক বা বিভক্তি বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব। এখানে সংক্ষেপে সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করছি।

(১) কুরআন কারীমে অনেক স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা ও তাদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক স্থানে স্পষ্টভাবে তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دُرَجَةً مِنَ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلُّا وَعْدُ اللَّهِ حَسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিক্রিতি দিয়েছেন।”^{৩০}

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَكُنَّ اللَّهُ حَبِيبُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفَسُوقُ
وَالْعِصْتَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّأْشِدُونَ

^{৩০} সূরা (৫৭) হাদীদ: ১০ আয়াত।

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফৰী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।”^{৮৪}

(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব আলোচনাকালে আমরা এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন: “মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।”^{৮৫}

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَيَانُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

“মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।”^{৮৬}

তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন:

لَكُنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সৎগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম।”^{৮৭}

(৪) মহান আল্লাহ কুরআনে মুমিনগণকে তিনভাগে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে তাদের

^{৮৪} সূরা (৪৯) হজ্জুরাত, ৭ আয়াত।

^{৮৫} সূরা (৯) তাওবা, আয়াত ১০০।

^{৮৬} সূরা (৪৮) ফাত্হ, আয়াত ১৮।

^{৮৭} সূরা (৯) তাওবা, ৮৮ আয়াত।

প্রশংসা করেন। এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا خُوَافِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“তাদের পরে যারা আগমন করল তার বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্রো রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদৃ, পরমদয়ালু।”^{৮৮}

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু’আ করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্রোভাব ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৫) অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এক হাদীসে উমর ইবনুল খাতোব (রা) বলেন, রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَكْرَمُونَا أَصْنَابِيْ (فَإِنَّهُمْ خِلَارُكُمْ), ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَثُنَّهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَبْرُ.

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।”^{৮৯}

আবু হুরাইরা ও আবু সাইদ (রা) বলেন, রাসূলল্লাহ ﷺ বলেন:

لَا تَسْبُوا أَصْنَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ
وَلَا نَصِيفَةَ

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌছাতে পারবে না।”^{৯০}

^{৮৮} সূরা (৫৯) হাশর: ১০ আয়াত।

^{৮৯} নাসাই, আস-সুনানুল কুরবা ৫/৩৮৭; আল-মাকদ্দিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ১/১৯৩, ২৬৬, ২৬৮; তাহাবী, শারহ মা’আনীল আসার ৪/১৫০; মা’মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি ১/৩৪১; আবদ ইবনু হুমাইদ, মুসনাদ, পঃ ৩৭। হাদীসটির সনদ সহীহ।

^{৯০} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬৭।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন:

(১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(২) খুলাফায়ের রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে।

(৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুঘ্য সামান্যতম অমর্যাদা, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুঘ্য কখনো বলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ'আত ও বিভক্তি আলোচনাকালে আমরা সাহাবীগণের বিষয়ে ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের’ বিশ্বাস ও মূলনীতি বিষয়ে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

৩. ২. ১১. তাঁর মর্যাদা ও সম্মান

রিসালাতের সাক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মান করা। তিনি সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তাঁর হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা।

অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মর্যাদা সবই তিনি লাভ করেছেন। তিনি নিষ্পাপ, মনোনীত ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন। নবুয়ত প্রাণ্প্রাণির আগে ও নবুয়তের পরে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلُلُوكَ وَمَا يُضْلُلُونَ
إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

“তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাঁদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার

প্রতি কিতাব এবং হিকমাত অবর্তীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা-অনুগ্রহ রয়েছে।”^{১১}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ شَنَّا لَنَذَهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كِبِيرًا

“ওহীর মাধ্যমে আমি তোমার প্রতি যা নাযিল করেছি তা আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, সে অবস্থায় তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী বা কর্মবিধায়ক পেতে না। কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দয়া; নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ মহান।”^{১২}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“আমি তো তোমাকে রাসূল বানিয়েছি কেবল বিশ্ব জগতের জন্য রহমত-রূপে।”^{১৩}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

أَلَمْ نَشْرَخْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ نَكْرَكَ

“আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেই নি? আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক। এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।”^{১৪}

তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاحًا مُنِيرًا

“হে নবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।”^{১৫}

^{১১} সূরা (৪) নিসা: ১১৩ আয়াত।

^{১২} সূরা (১৭) ইসরাব (বনী ইসরাইল): ৮৬-৮৭ আয়াত।

^{১৩} সূরা (২১) আম্বিয়া: ১০৭ আয়াত।

^{১৪} সূরা (১৪) ইনশিরাহ: ১-৮ আয়াত।

^{১৫} সূরা (৩৩) আহয়াব: ৪৫-৪৬ আয়াত।

তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِزُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسْبِحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا

“নিক্ষয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্যকর এবং সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধায় তাঁর (আল্লাহর) পরিদ্রাবণ ও মহিমা ঘোষণা কর।”^{১৬}

সকল মানুষের উর্ধ্বে তাঁর সম্মান। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

النَّبِيُّ أُوتِيَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أُوتِيَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

“মুমিনদের নিকট নবী তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিনগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আজীয় তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর।”^{১৭}

এভাবে আল্লাহ সকলের উর্ধ্বে তাঁকে সম্মান দান করেছেন এবং কোনো ভাবে তাঁকে কষ্ট দান করা বা তার মনোকষ্টের কারণ হওয়া মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসাবে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَكْحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا إِنَّ
ذَلِكَمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“তোমাদের জন্য সংগত নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নীদিগকে বিবাহ করবে। আল্লাহর নিকট তা ঘোরতর অপরাধ।”^{১৮}

অন্যান্য সকল মানুষের থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাঁকে ডাকতে হবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْتَكُمْ كَذَّابَعَاءَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

“রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি

^{১৬} সূরা (৪৮) ফাতহ: ৮-৯ আয়াত।

^{১৭} সূরা (৩৩) আহ্যাব: ৬ আয়াত।

^{১৮} সূরা (৩৩) আহ্যাব: ৫৩ আয়াত।

আহবানের মত গণ্য করো না।^{১০৫}

তাঁর সাথে আদব রক্ষার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْتُمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْنَتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا إِلَّا بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بِعَضْكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْفِظَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ لِلْقُوَى لَهُمْ مَغْرِبٌ وَأَجْزَءُ عَظِيمٍ

“হে মুমিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোনো বিষয়ে অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কষ্টস্বরের উপর তোমাদের নিজেদের কষ্টস্বর উঁচু করো না এবং তোমাদের পরম্পরের মধ্যে যেভাবে জোরে কথা বল সেরূপ জোরে বা সশব্দে তাঁর সাথে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কষ্টস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কার।”^{১০০}

পাঠক, চিন্তা করুন! কত বড় সাবধানতার প্রয়োজন! কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অগ্রণী হওয়া যাবে না। তাঁর কথার উপরে কথা বলা যাবে না। নিজেদের মতামত, যুক্তি, কর্ম, পছন্দ ইত্যাদি দিয়ে তাঁর আগে যাওয়া যাবে না। বরং মতামতে, কর্মে, ইবাদতে, দাওয়াতে, পছন্দে-অপছন্দে সকল বিষয়ে তাঁর পিছে থাকতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর সামনে নিজেদের কষ্টস্বর উঁচু করা যাবে না। তাঁর মত, কর্ম, রীতি, নির্দেশ কোনো কিছু মুমিনের নিকট পৌছালে মুমিন আর তার সামনে নিজের মতামত বা পছন্দ বিকল্প হিসেবে দাঁড় করান না। বরং নিজের মত ও পছন্দকে নীচু করে তাঁর মতকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন। এ-ই ইমানের দাবি। এ-ই আল্লাহর নির্দেশ। না হলে আমাদের বড় বড় কথা, মহা মহা কর্ম আমাদের অজ্ঞানে-অজ্ঞাতে নিষ্ফল হয়ে যাবে! কী করুণ পরিণতি!

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মর্যাদার কথা উম্মাতকে জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিজের অহংকার প্রকাশের জন্য নয়, উম্মাতকে তাদের বিশ্বাসের ও কর্মের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই

^{১০৫} সূরা (২৪) নূর: ৬৩ আয়াত।

^{১০০} সূরা (৪৯) হজ্রাত: ১-৩ আয়াত।

তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাদেরকে জানিয়েছেন। ইতোপূর্বে আমরা এ অর্থে কয়েকটি হাদীস দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন দিক থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অন্যান্য সকল নবী-রাসূল থেকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ বিষয়ক আরো কয়েকটি হাদীস আমরা এখানে আলোচনা করব। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَنَا أُولُّ النَّاسِ خَرُوجًا إِذَا بَعْثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُبْشِرٌ لَّهُمْ
إِذَا أَيْسُوا لِوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدَ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرٌ

“মানুষ যখন কিয়ামতের সময় পুনরুত্থিত হবে তখন আমিই সর্বপ্রথম বের হব, মানুষেরা যখন হাজিরা দেবে তখন আমিই তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করব, যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদান করব এবং সেদিন আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার ঝাঙা। আদম সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতিপালকে কাছে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত, আর এতে কোনো অহংকার নেই।”^{১০১}

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ
وَأَوَّلُ مَشْفَعٍ

“কিয়ামদের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, কবর ফুড়ে আমিই প্রথম পুনরুত্থিত হব, আমিই প্রথম শাফা‘আতকারী এবং আমার শাফা‘আতই প্রথম গ্রহণ করা হবে।”^{১০২}

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٌ وَبِيَدِي لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٌ وَمَا
مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آتَمْ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أُولُّ مَنْ تَشْقَعُ عَنْهُ الْأَرْضُ
وَلَا فَخْرٌ

“কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, তবে এতে কোনো অহংকার নেই। আমার হাতেই প্রশংসার ঝাঙা থাকবে, তবে এতে কোনো অহংকার নেই। আদম থেকে শুরু করে যত নবী আছেন তারা সবাই আমার ঝাঙার নীচে সমবেত হবেন। আমিই প্রথম মাটি ফুড়ে পুনরুত্থিত হব, তবে

^{১০১} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫৪৬। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

^{১০২} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৮-২।

এতে কোনো অহংকার নেই।^{১০৩}

তাঁর মর্যাদা সুপ্রাচীন। প্রথম মানব আদম (আ)-এর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ তার জন্য নুরুওয়াত ও খাতিমুন্নাবিয়ানের মর্যাদা সংরক্ষিত করেছেন। আবু হুরায়রা বলেন:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَمَّى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآمِنْ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

“সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন: যখন আদম দেহ ও আত্মার মধ্যে ছিলেন।”^{১০৪}

ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّمَا عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ أَنَّمَا لَمْ يَجِدْ فِي طِينَتِهِ
وَسَأَنْبَتِكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ (بِأَوَّلِ ذَلِكَ) دُعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى قَوْمَهُ
وَرَوْقَانًا أَمْيَّتُنِي رَأَتْ آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاعَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ
تَرَى أَمْهَاتُ النَّبِيِّينَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

“আদম যখন তাঁর কাদার মধ্যে ভুল্পুর্ণ ছিলেন তখনই আমি আল্লাহর নিকট লাওহে মাহফুলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ছিলাম। আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম শুরুর কথা বলব: আমার পিতা ইবাহীমের (আ) দু'আ, ঈসার (আ) জাতিকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমার আমার স্বপ্ন; তিনি দেখতে পান যে তাঁর ভিতর থেকে একটি নূর (আলো) নির্গত হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহকে আলোকিত করে তোলে। এভাবেই নবীগণের (আ) মায়েরা দেখেন।”^{১০৫}

আবু উমায়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ فَضَلَّنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

“নিশ্চয় আল্লাহ নবীগণের উপরে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।”^{১০৬}

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ওসীলা, মাকাম মাহমূদ ও শাফা‘আত-এর মর্যাদা প্রদান

^{১০৩} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৩০৮, ৫৮৭। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি সহীহ হাসান।

^{১০৪} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫৪৬; আলবানী, সহীহুল জামি ২/৮৪০। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

^{১০৫} আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১২৭-১২৮; ইবনু হির্কান, আস-সহীহ ১৪/৩১৩; হাকিম, আল-মুসতাদারাক ২/৬৫৬। হাকিম, যাহাবী প্রযুক্ত মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

^{১০৬} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/১০৮। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

করবেন। ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য। এ বিষয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। হাদীস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহর নিকটতম ও সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানকে “ওসীলা” বলা হয়, যা মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (ﷺ)-কে প্রদান করবেন। আমর ইবনুল আস (রা) এবং আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন;

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤْدِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوْا عَلَىٰ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَّى
عَلَيْهِ صَلَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزَلَةٌ فِي
الْجَنَّةِ (فِي حِدِيثِ التَّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: أَعْلَى درَجَةً فِي الْجَنَّةِ) لَا تَتَبَغِي إِلَّا لِعِبْدِ
مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعةُ

“যখন তোমরা মুয়ায়্যিকে (তার আযান) শুনবে তখন সে যেরূপ বলে সেরূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত (দরুন্দ) পাঠ করবে; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে আল্লাহ তাঁর উপর দশবার রহমত করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে। ওসীলা জান্নাতের এমন একটি মর্তবা (তিরমিয়ী ও আবু দাউদের বর্ণনায়: জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা) যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউ লাভ করবে না। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য ‘ওসীলা’ প্রার্থনা করবে তার জন্য শাফা‘আত প্রাপ্য হবে।”^{১০৭}

মাকাম মাহমুদ অর্থ প্রশংসিত অবস্থান, যে অবস্থানে সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই তাঁর প্রশংসা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنْ اللَّلَّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

“এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এ তোমার জন্য অতিরিক্ত, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ‘মাকামে মাহমুদে’ বা প্রশংশিত স্থানে।”^{১০৮}

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, ‘মাকাম মুহাম্মদ’ বলতে কিয়ামদের দিন মহান আল্লাহর দরবারে শাফা‘আতের মাকাম।

৩. ২. ১২. তাঁর মর্যাদার বিষয়ে ওহীর অনুসরণ

মুসলিমের দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঠিক মর্যাদা নিরূপনে এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের

^{১০৭} মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৮৮; তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫৮৬; আবু দাউদ, আস-সুনান ১/১৪৮।

^{১০৮} সূরা (১৭) ইসরায়েল ইসরাইল: ৭৯ আয়াত।

উপর নির্ভর করা। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা অবগত হওয়া মুমিনের ঈমানের অংশ ও মৌলিক বিষয়। সকল মুমিনের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সমান। কাজেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, বিষয়টি আল্লাহ কুরআন কারীমে সহজভাবে সকলের বোধগম্য করেই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি তাঁর সাহাবীগণকে জানিয়েছেন। তাঁরাও মুমিনের ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য এভাবেই গুরুত্বের সাথে তা তাবিয়ীগণকে শিখিয়েছেন। এভাবে বিষয়গুলি অবশ্যই কুরআনে বা মুতাওয়াতির-মাশহূর সহীহ হাদীস সমূহে স্পষ্ট ও সর্বজনবোধগম্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ও আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শেখান হয়েছে। মুসলিমের দায়িত্ব হলো, তাঁর ব্যাপারে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তা সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্ত করণে বিশ্বাস করা। নিজের থেকে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ আমরা বা উম্মাতের আলিমগণ যা কিছুই বলেন না কেন সবই মানবীয় ইজতিহাদ। আর বিশ্বাস ও আকীদার ভিত্তি ওই। মানবীয় কথাকে ওহীর সাথে সংমিশ্রণ করলে বা ওহীর মর্যাদা দিলে সীমালজ্বন ঘটতে পারে।

পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাত এরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্বনের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে বলে আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারি। নবীগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদেরকে ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে সীমালজ্বন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবুস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাতাব (রা) যিদ্বারের উপরে বক্তৃতায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتُ النَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌهُ فَقُولُوا عَبْدُ
اللهِ وَرَسُولُهُ.

“বৃষ্টানগণ যেরূপ ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রশংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না। আমি তো তাঁর বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”^{১০৯}

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। বাড়াবাড়ির অর্থ হলো তাঁর বিষয়ে পরিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার অতিরিক্ত কিছু বাড়িয়ে বলা যা তিনি আমাদেরকে বলেন নি। তিনি

^{১০৯} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭১, ৬/২৫০৫; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/৪৭৮।

খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ির দিকে উম্মাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। কুরআন কারীমে ঘনান আল্লাহ খৃষ্টানদের এই বাড়াবাড়ির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَقٌّ إِنَّمَا
الْمُسِّبِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ أَفْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَأَمْنِيْ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ

“হে কিতাবীগণ, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সমক্ষে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আজ্ঞা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে উপর ঈমান আন এবং বলিও না ‘তিন’...।”^{১১০}

ঈসা (আ)-এর বিষয়ে খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ির স্বরূপ ছিল তাঁর বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া এ সকল বিশেষণকে বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির অপচেষ্টা করা। আল্লাহ তাঁর বিষয়ে বলেছেন যে, তিনি ‘আল্লাহর কালিমা’ এবং ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে ঝরহ’। ‘কালিমাতুল্লাহ’, ‘রহমতুল্লাহ’ ইত্যাদি শব্দ শুনে কিছু ভঙ্গের ঘনে যে অতিভিত্তির প্রাবন তৈরি হয়, সেগুলি ক্রমান্বয়ে ভয়ানক শিরকে পরিণত হয়। তারা দাবি করেন যে, আল্লাহর কালিমা আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ যা তাঁর সন্তার অংশ ও তাঁরই মত অনাদি, সেহেতু ‘ঈসা’ (আ) আল্লাহর যাত বা সন্তার অংশ। আর আল্লাহর ঝরহ আল্লাহরই সন্তার অংশ। এভাবে তারা দাবি করে যে, ঈশ্বরের সন্তার তিনটি ব্যক্তিত্ব ‘আল্লাহ বা ‘পিতা’, কালিমাতুল্লাহ বা ইবনুল্লাহ অর্থাৎ পুত্র এবং রহমতুল্লাহ বা পবিত্রআত্মা। এ তিনি ব্যক্তি সমন্বয়ে এক ঈশ্বর (নাউয়ু বিল্লাহ)।

তাদের এ ব্যাখ্যাভিত্তিক আকীদা বাইবেলের কোথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি। বরং বাইবেলের অগণিত নির্দেশনা এর সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। তারা তাদের এরূপ ব্যাখ্যাভিত্তিক মতামতকে মূল অকীদা হিসেবে গ্রহণ করে এর সাথে সাংঘর্ষিক তাওরাত ও ইঞ্জিলের তাওহীদ বিষয়ক ও ঈসা (আ)-এর মনুষ্যত্ব বিষয়ক অগণিত সুস্পষ্ট আয়াতকে অপব্যাখ্য করে। এ সকল অপব্যাখ্য গেলানোর জন্য অনেক দার্শনিক যুক্তি পেশ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে ঈসা (আ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন, ঈসার (আ) বিষয়ে আল্লাহ

^{১১০} সূরা : ৪ নিসা, ১৭১ আয়াত।

যতটুকু বলেছেন তোমরা ততটুকুই বল, কারণ ততটুকুই হক্ক ও সত্য। তার অতিরিক্ত বলো না, কারণ ব্যাখ্যা তাফসীরের নামে তোমরা যা বলছ তা বাতিল ও অসত্য। তোমরা তাঁকে কালিমাতুল্লাহ এবং রহস্যাহ বল, তবে কালিমাতুল্লাহ বা রহস্যাহ ব্যাখ্যা করে বাড়িয়ে কিছু বলো না। অন্যত্র আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বাড়াবাড়ির পিছনে রয়েছে কতিপয় ‘পঞ্জিতের’ প্রতি পরবর্তীদের অঙ্গ ভক্তি ও তাদের অঙ্গ অনুকরণ। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
فَذُلِّلُوا مِنْ قَبْلٍ وَأَضْلَلُوا كَثِيرًا وَضُلِّلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

‘বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং সে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের মর্জিমাফিক মতামতের অনুসরণ করো না।’^{১১১}

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খৃষ্টানগণের অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ির স্বরূপ ছিল ওহীর মধ্যকার কতিপয় দ্যর্ঘবোধক শব্দের অতিভক্তিমূলক অর্থকে দীনের ও আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ঈসা (আ)-এর বিষয়ে ওহীর বাইরে অতিরিক্ত গুণাবলি আরোপ করা এবং এগুলির বিপরীতে অগণিত দ্যর্ঘবীন ওহীর বাণীকে ব্যাখ্যা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে তাঁর বিষয়ে কি বলতে হবে তার নির্দেশনা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে আল্লাহ দুটি মূল বিশেষণে বিশেষিত করেছেন: আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল। তোমরা আমার বিষয়ে এরূপই বলবে। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে কুরআনে বা হাদীসে তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছে হ্রবহ তাই আমাদেরকে বলতে হবে। এগুলিকে ব্যাখ্যা করা বা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এগুলির সাথে আরো কিছু কথা যোগ করা আমাদেরকে বাড়াবাড়ির পথে নিয়ে যেতে পারে।

উপরের হাদীসের ন্যায় অন্যান্য অনেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে তাঁর প্রশংসা বা ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করতে এবং ওহীর ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَآبَنَ سَيِّدَنَا وَخَيْرَنَا وَآبَنَ خَيْرَنَا، فَقَالَ

^{১১১} সূরা (৫) মায়দা: ৭৭ আয়াত।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاتِكُمْ وَلَا يَسْتَهِنُوكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা (সাইয়েদ), আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মধ্যে সর্বত্ত্বোম, আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম, আমি ভালবাসি না যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তোমরা আমাকে তার উর্দ্ধে ওঠাবে।”^{১১২}

অর্থাৎ শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। নবী-রাসূলগণকে অশ্বীকার করার মাধ্যমে অনেককে সে বিভ্রান্ত করে। আবার তাঁদের ভক্তি ও প্রশংসায় সীমা লজ্জন করিয়েও শয়তান অনেককে বিভ্রান্ত করে। কাজেই সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান অনেক সময় কুমোরণা দিতে পারে যে, নবী-রাসূলকে বেশি প্রশংসা করলে বা ভক্তি করলে তিনি হয়ত খুশি হবেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে, একুপ ভক্তি বা প্রশংসায় তিনি খুশি হন না। বরং ওহীর মাধ্যমে প্রাণ বিশেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তিনি খুশি হন।

এখানে লক্ষণীয় যে, উপর্যুক্ত হাদীসে বঙ্গ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন সবই সত্য ও সেগুলি বলা ইসলামে কোনোভাবেই আপত্তির নয়। তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাঁকে যে বিশেষ দৃঢ়ি পদমর্যাদা প্রদান করেছেন তার বাইরে কিছু ব্যবহার করা অপচন্দ করছেন। বাহ্যত তিনি বাড়াবড়ির দরজা বন্দ করতে চেয়েছেন।

এ অর্থের অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনুশ শিখ্থীর (রা) বলেন,
جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قَرِيبِشْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّيِّدُ اللَّهُ
قَالَ أَنْتَ أَفْضَلُهُمَا فِيهَا قَوْلًا وَأَعْظَمُهُمَا فِيهَا طَوْلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِيَقُلُّ
أَحَدُكُمْ بِعَوْلَهِ وَلَا يَسْتَجِرُهُ الشَّيْطَانُ

“একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, আপনি কুরাইশদের নেতা বা প্রধান (সাইয়েদ)। তিনি বলেন নেতা বা প্রধান (সাইয়েদ) তো আল্লাহ। লোকটি বলে: আমাদের মধ্যে কথায় আপনিই

^{১১২} আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/১৫৩, ২৪১, ২৪৯। হাদীসটির সনদ সহীহ।

সর্বোত্তম এবং মহত্ত্ব-মর্যাদায় আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কথা বলতে চাইলে বলুক, তবে শয়তান যেন তাকে টেনে নিয়ে না যায়।”^{১১৩}

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো মানুষকে সাইয়েদ (নেতা বা প্রধান) বলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সাহাবীগণ একে অপরকে কখনো কখনো ‘সাইয়েদুনা’ (আমাদের নেতা) বলে উল্লেখ করেছেন। এইইয়াউস সুনান গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি।^{১১৪} পঞ্চম অধ্যায়ে শিরক আসগার বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাসদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মনিব বা মালিককে রাবু (প্রভু) না বলে সাইয়েদ (নেতা) বলে ডাকতে। এতদসেৱ্বত্বও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের বিষয়ে ‘সাইয়েদ’ শব্দ ব্যবহার করতে আপত্তি করছেন। বাহ্যত তিনি এ বিষয়ে বাড়াবাড়ির দরজা বক্ষ করতে চেয়েছেন এবং মহান আল্লাহ তাঁর বিষয়ে যে শব্দ ও উপাধি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উদ্যাতকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ওহীর ব্যবহৃত শব্দ আর মানবীয় আবেগ-বিবেকের ভিত্তিতে ভাষাজ্ঞনের আলোকে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে ঈমানের জগতে অনেক পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র হসাইন ইবনু আলী (রা) বলেন,
 أَحِبُّنَا بِحُبِّ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حُقُّنِي
 فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَتَخْذِنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَخْذِنِي رَسُولٌ

“তোমরা আমাদেরকে ইসলামের ভালবাসায় ভালবাসবে; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে আমার প্রাপ্ত্যের উপরে উঠাবে না; কারণ আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার আগেই আমাকে বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।”^{১১৫}

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভক্তি ও মর্যাদা প্রদান আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও ঈমানের অন্যতম দাবি। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, শয়তান বিভিন্ন ভাবে মানুষকে অবিশ্বাসের ন্যায় অতিভক্তির মাধ্যমেও বিভ্রান্ত করতে পারে। এজন্য আমাদেরকে ওহীর হ্বহ অনুসরণ করতে হবে।

^{১১৩} আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৪; আহমদ, আল-মুসলাদ ৪/২৪-২৫। হাদীসটি সহীহ।

^{১১৪} এইইয়াউস সুনান, পৃ. ৪৫৪-৪৫৭।

^{১১৫} হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/১৯৬; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৯/২১। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাইসামী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া আরো বুঝতে হবে যে, বিশ্বাসের ভিত্তি ‘গাইবী’ বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরুপ নয়। এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন। আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

ষষ্ঠি অধ্যায়ে বিদ্যাত ও বিভিন্ন আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যত্বাণী করেছেন, তাঁর উম্মাতের মধ্যেও পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত বিভিন্ন প্রবেশ করবে। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবী, তাবিয়া, তাবি-তাবিয়াদের যুগ এবং মুসলিম উম্মাহর সোনালী যুগগুলি অতিক্রম হওয়ার পরে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বিষয়ে ওহীর নির্দেশ নজরে ও ওহীর সাথে বিভিন্ন ব্যাখ্যা যোগ করে আকীদা তৈরির প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো আলিম মানবীয় বৃক্ষ দিয়ে ওহীর একটি বক্তব্যের নিজের পছন্দমত অর্থকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে অন্যান্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বিকৃত বা বাতিল করেন এবং ওহীর অতিরিক্ত এবং সাহাবীগণের বক্তব্যের ব্যতিক্রম অনেক বিষয়কে আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি:

৩. ২. ১২. ১. তাঁর মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক

কুরআন-হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদের মতই মানুষ। আবার কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনেক মুজিয়া, অলৌকিক কর্ম, ও অলৌকিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবিয়-তাবিতাবিয়া ও আহলুস সন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি। তাঁরা সর্বান্তকরণে সকল আয়াত ও হাদীসকে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন। তিনি মানুষ ছিলেন তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে মহান আল্লাহ তাকে অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে দুটি মতবাদ তৈরি হয়, যারা এক অর্থের আয়াত ও হাদীসকে অন্য অর্থের আয়াত ও হাদীসের বিপরীত বা

সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করে এবং একটি অর্থকে বিশ্বাস করার নাম করে অন্য অর্থের সকল আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেয়।

প্রথম ঘতটি দ্বিতীয় হিজরী শতকের মু'তাফিলা ও সময়না ফিরকাসমূহের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং পরবর্তীকালে দার্শনিক ও আধুনিক যুগে কোনো কোনো পাঞ্চাত্যপন্থী পঙ্গিতের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তারা রাসূলল্লাহ ﷺ-এর বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলিকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর অলৌকিকত্ব বিষয় আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। তাদের আকীদার মূল এই যে, তিনি একাত্তই অন্য সকলের মত মানুষ ছিলেন, তিনি কুরআন ছাড়া অন্য কোনো মুজিয়া দেখান নি এবং তাঁর কোনো অলৌকিক বৈশিষ্ট্যও ছিল না। এ বিষয়ক যে সকল আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অযুক্ত বা তমুক অর্থ রয়েছে। এভাবে তারা তাঁর মুজিয়া বিষয়ক ও তাঁর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির এমন ব্যাখ্যা করেন যে তাতে প্রকৃত পক্ষে তা সবই অস্থীকার করা হয়।

অন্য ঘতটি অনেক পরে জন্মলাভ করে। ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কেউ কেউ রাসূলল্লাহ ﷺ-এর মুজিয়া, অলৌকিক কর্ম ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এগুলির ভিত্তিতে তারা তাঁরা বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। তাদের মতামতের মূল কথা এই যে, তিনি মূলত বাশার বা মানুষ ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি অলৌকিক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একাত্তই রূপক অর্থে বা দাওয়াতের প্রয়োজনে তাকে মানুষ বলা হয়েছে। তার মানবত্ব ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীসগুলির অযুক্ত বা তমুক অর্থ রয়েছে। এভাবে তারা তাঁর বাশারিয়্যাত বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করেন যে, সেগুলি মূলত সবই বাতিল হয়ে যায়।

আমরা এখানে এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি আলোচনা করব।

‘বাশার’ (بَشَر) অর্থ মানুষ, মানুষগণ বা মানুষজাতি (man, human being, men, mankind)। কুরআন কারীমে প্রায় ৪০ স্থানে ‘বাশার’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই একই অর্থে। একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা দেখব যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাও'আত অস্থীকার করার ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের প্রধান দাবি ছিল যে, নবীগণ তো ‘মানুষ’ মাত্র, এরা আল্লাহর

নবী হতে পারেন না। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতেই চাইতেন তবে ফিরিশতা পাঠিয়ে দিতেন। যেহেতু এরা মানুষ সেহেতু এদের নুরুওয়াতের দাবি মিথ্যা। এদের কথার প্রতিবাদে নবীগণ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ‘আমরা তোমাদের মত মানুষ’ এ কথা ঠিক, তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ হলে আল্লাহর ওহী ও নুরুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা যায় না। বরং আল্লাহ মানুষদের মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছ নবী বা রাসূল হিসেবে বেছে নেন এবং মানবত্বের সাথেই তাকে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও ওহী প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়েও কুরআনে একথা বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘বাশার’ বা মানুষ। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ‘অন্যদের মত মানুষ’। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجِرْ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخِيلٍ وَعَنْبَقَ فَتَفْجِرَ الْأَنْهَارَ خَلَلَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبْلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زَخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَفِيقٍ حَتَّىٰ تَنْزَلْ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قَلْ سَبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كَنْتُ إِلَّا شَرَّا رَسُولاً وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءُهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولاً

“এবং তারা বলে, ‘কখনই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূমি হতে একটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত করবেন। অথবা আপনার একটি খেজুরের ও আঙুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে আপনি নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন। অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবেন, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করবেন। অথবা আপনার একটি অলংকৃত স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে। অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন, তবে আমরা আপনার আকাশ আরোহণে কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের (আসযান থেকে) একটি কিতাব অবতীর্ণ করবেন যা আমরা পাঠ করব।’ বল, ‘পবিত্র আমার প্রতিপালক (সুবহানাল্লাহ!)! আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ, একজন রাসূল। আর মানুষের কাছে যখন হেদায়তের বানী আসে তখন তো তারা শুধু একথা বলে ঈমান আনয়ন করা থেকে বিরত থাকে যে, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’”^{১১৬}

^{১১৬} সূরা (১৭) ইসরাঃ (বনী ইসরাইল): ৯০-৯৪ আয়াত।

অর্থাৎ কাফিরদের দাবি যে, আল্লাহর রাসূল ইওয়ার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতার কিছু অংশ লাভ করা। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ জানালেন যে, রাসূল ইওয়ার অর্থ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রচারের দায়িত্ব লাভ, ক্ষমতা লাভ নয়; ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যত্র মহান আল্লাহর বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو
لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“বল: ‘আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা’বুদ (উপাস্য) একমাত্র একই মা’বুদ। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সংকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।’”^{১১৭}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَعِمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

“বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা’বুদ একমাত্র একই মা’বুদ। অতএব তোমরা তারই পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রর্থনা কর। যারা শিরকে লিখে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভেগ।”^{১১৮}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার তাঁর উম্মতকে বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা তাঁর উম্মতরক জানিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে বারবার তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, তিনি একজন মানুষ।

এক হাদীসে নবী-পত্নী উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْنُ فَلَعِلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْيَغٌ مِّنْ بَعْضٍ
فَأَخْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَفْصِبِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَصَبَتْ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ
مِّنَ النَّارِ فَلِيَأْخُذْهَا أَوْ فَلِيَرْكَهَا

“আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে মানুষেরা আসে। বাদী ও বিবাদীর মধ্য থেকে একজন হয়ত অধিকতর বাকপটু হয়,

^{১১৭} সূরা (১৮) কাহাক: ১১০ আয়াত।

^{১১৮} সূরা (৪১) ফুস্সিলাতত (হা যি আস সাজদা): ৬ আয়াত।

ফলে তাকে সত্যবাদী মনে করে হয়ত আমি তার পক্ষেই বিচার করি। যদি আমি ভুল করে একের সম্পদ অন্যের পক্ষে বিচার করে দিই, তবে সে সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না। বরং তা হবে তার জন্য আঙ্গনের একটি পিও, তার ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক, আর ইচ্ছা হলে তা পরিত্যাগ করুক।”^{১১১}

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে ভুল করেন। সালামের পরে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতের কি কোনো নতুন বিধান নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন: তোমরা এ প্রশ্ন করছ কেন? তারা বলেন: আপনি এমন এমন করেছেন। তখন তিনি সালাত পূর্ণ করেন এবং বলেন:

إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنْ يَأْتِكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنْكُمْ
أَنْسَى كَمَا تَسْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَخَرَقْتُ نِي

“সালাতের নিয়ম পরিবর্তন করা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যেমন ভুল কর আমিও তেমনি ভুল করি। যদি আমি কখনো ভুল করি তবে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দেবে।”^{১২০}

রাফি ইবনু খাদীজ (রা) বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসলেন তখন মদীনার মুসলমানেরা খেজুরের মাওসুমের শুরুতে পুরুষ খেজুরের রেণুর সাথে স্ত্রী খেজুরের রেণু খেলাতেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন: আমরা সবসময় এভাবে করে আসছি। তিনি বলেন: এ না করলেই বোধহয় ভাল হবে। তখন তারা তা ত্যাগ করেন, ফলে সে বৎসর খেজুরের উৎপাদন কম হয়। তখন তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়। তিনি বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخَنَّوا بِهِ وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ
مِّنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

“আমি তো একজন মানুষ মাত্র। যখন আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দান করব, তখন তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি

^{১১১} বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৬৭, ৬/২৫৫৫, ২৬২২, ২৬২৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৭-১৩৭৮; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী, ৫/১০৭, ২৮৮, ১২/৩০৯, ১৩/১৫৭, ১৭২, ১৭৮।

^{১২০} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৫৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪০০; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ১/৫০৩-৫০৪।

আমি কোনো জাগতিক বিষয়ে আমার ধারণা বা মতামত বলি তবে তো
আমি একজন মানুষ মাত্র।”^{১২১}

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন:

نَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ فَكَلَمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أُذْرِي مَا هُوَ
فَأَغْضَبَاهُ فَلَعْنَاهُمَا وَسَهَّمَا فَلَمَّا خَرَجَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ
شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَا نَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ قَلْتُ لَعْنَتُهُمَا وَسَبَبَتُهُمَا قَالَ أَوْ مَا
عَلِمْتُ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قَلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعْنَتُهُ أَوْ
سَبَبَتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

“রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'জন লোক আসেন। তারা কি বলেন
আমি জানি না, তবে তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্তিত হন। তিনি
তাদেরকে গালি দেন এবং বদ দোয়া করেন। তারা বেরিয়ে গেলে আমি
বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এই দুইজন লোক কথনে কোনো কল্যাণ লাভ
করতে পারবে না। তিনি বলেন: কেন? আমি বললাম: কারণ আপনি
তাদেরকে গালি দিয়েছেন এবং বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন: তুমি কি
জান না আমার প্রতিপালকের সাথে আমার কি চুক্তি হয়েছে? আমি তো
আল্লাহকে বলেছি: ‘হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তাই যদি
কোনো মুসলিমকে আমি কথনে বদদোয়া করি বা গালি দিই, তাহলে আপনি
তা সেই ব্যক্তির জন্য পরিত্তা ও সওয়াব বানিয়ে দেবেন।’^{১২২}

উপরের অর্থে আবু হুরাইরা, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আনাস ইবনু
মালিক, আবু বাকরাহ ও অন্যান্য সাহাবী (رض) থেকে অনেক হাদীস সহীহ
বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সিহাহ অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এ সকল আয়াত ও হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক মুজিয়া ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও অন্যান্য মুজিয়া বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আমরা
ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি
যে, মহান আল্লাহ তার প্রিয়তম রাসূলকে অনেক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন যা
কোনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। এগুলিকে আরবীতে
‘খাসাইস’ বা ‘বৈশিষ্ট্যসমূহ’ বলা হয়। ইতোপূর্বে তার মর্যাদা বিষয়ক
হাদীসগুলিতে তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি। বিভিন্ন সহীহ হাদীস

^{১২১} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৩৫-১৩৮৬।

^{১২২} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০০৭।

থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ যেভাবে সামনের দিকে দৃষ্টিশাহী বস্তুসমূহ দেখে তিনি অনুরূপভাবে পিছনদিকেও দেখতেন^{১২৩}, তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর জগত থাকত^{১২৪}, সাধারণ মানুষের মত তার শরীরে ঘামে কোনো দুর্গন্ধ ছিলনা, বরং তার শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধ, সাহাবীগণ যা আতর হিসেবে ব্যবহার করতে অতীব আগ্রহী ছিলেন।^{১২৫} এ ছাড়া আরো অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান র্যাদার একটি দিক যে, মহান আল্লাহ তাকে ‘সিরাজুম মুনীর’: ‘জ্যোতির্য প্রদীপ’ বা ‘নূর-প্রদানকারী প্রদীপ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

“হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকেজ্জ্বল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে।”^{১২৬}

আমরা কুরআন কারীমের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনায় দেখব যে, মহান আল্লাহ বারংবার কুরআন কারীমকে ‘নূর’ বা জ্যোতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোনো কোনো স্থানে মহান আল্লাহ সাধারণভাবে ‘নূর’ বা ‘আল্লাহর নূর’ এর কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়াগণের যুগ থেকে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَّمٌ نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“তারা ‘আল্লাহর নূর’ ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ ‘তাঁর নূর’ পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপচন্দ করে।”^{১২৭}

এখানে ‘আল্লাহর নূর’ বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

^{১২৩} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬২, ২৫৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২০, ৩২৪।

^{১২৪} বুখারী, আস-সহীহ ১/৬৪, ২৯৩, ৩/১৩০৮; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২৮; ইবনু হাজার, ফাতলুল বারী ১/২৩৮, ২/৩৪৪, ১৩/২৪৯, ৪৭৮।

^{১২৫} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮১৫।

^{১২৬} সূরা (৩৩) আহ্যাব, ৮৫-৮৬ আয়াত।

^{১২৭} সূরা (৬১) সাফ, ৮ আয়াত। পুনশ্চ, সূরা (৯) তাওবা, ৩২ আয়াত।

এখানে 'আল্লাহর নূরের' ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে: (১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। ইবনু আবাস ও ইবনু যাইদ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায়। সুলী এ কথা বলেছেন। (৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ), কাফিররা অপপ্রচার ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তার ধ্বংস চায়। দাহ্হাক এ কথা বলেছেন। (৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলি অস্বীকার করে যিটিয়ে দিতে চায়। ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন। (৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য। অর্থাৎ ফুর্কারে সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত। ইবনু ইসা এ কথা বলেছেন।^{১২৮}

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভিন্ন আয়াতে 'নূর' বা 'আল্লাহর নূর' বলা হয়েছে এবং সেখানে নূর অর্থ 'কুরআন', 'ইসলাম' 'মুহাম্মাদ (ﷺ)' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেছেন মুফাস্সিরগণ^{১২৯}। এরপ এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءُوكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفِونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوْرُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءُوكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

"হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।"^{১৩০}

এই আয়াতে 'নূর' বা জ্যোতি বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে নূর অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)।^{১৩১}

এই তিনি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। যারা 'নূর' অর্থ ইসলাম বলেছেন, তারা দেখেছেন যে, এই আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা বলা হয়েছে এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ ছাড়া কুরআন

^{১২৮} কুরতুবী, তাফসীর ১৮/৮৫।

^{১২৯} দেখুন: সূরা ২: বাকারা, ২৫৭ আয়াত, সূরা ৪: নিসা, ১৭৪ আয়াত, সূরা ৫: মায়দা, ১৬ আয়াত, সূরা ৬: আল-আন'আম, ১২২ আয়াত, সূরা ১৪: ইবরাহীম, ৫ আয়াত, সূরা ৩০: আহ্যাব, ৪৩ আয়াত, সূরা ৫৭: হাদীস, ২৮ আয়াত ...।

^{১৩০} সূরা (৫) মায়দা, ১৫ আয়াত।

^{১৩১} তাবাৰী, তাফসীর ৬/১৬১; কুরতুবী, তাফসীর ৬/১১৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।

কারীমে অনেক স্থানে 'নূর' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।^{১০২}

যারা এখানে নূর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এই আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু শেষে 'নূর' ও 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে 'কুরআন কারীমকে' বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এভাবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে এবং 'স্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে। এখানে দুটি বিশেষণ একত্রিত করা হয়েছে।^{১০৩}

যারা এখানে 'নূর' অর্থ 'মুহাম্মাদ (ﷺ)' বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'নূর' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইমাম তাবারী বলেন,
يُعْنِي بِالنُّورِ مُحَمَّداً الَّذِي أَنَارَ اللَّهَ بِهِ الْحَقَّ وَأَظَاهَرَ بِهِ إِلَيْهِمْ الْحَقَّ
الشَّرِكُ فَهُوَ نُورٌ لِمَنْ اسْتَنَارَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَمَنْ إِنَّا رَبَّهُ حَقٌّ تَبَيَّنَهُ لِلْيَهُودِ كَثِيرًا مَا
كَانُوا يَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ.

'নূর (আলো) বলতে এখানে 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে, যাঁর দ্বারা আল্লাহ ইক্ব বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শিরুককে মিটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আলোকিত হতে চায় তাঁর জন্য তিনি আলো। তিনি ইক্ব বা সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর ইক্বকে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহুদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন করত তাঁর অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন।'^{১০৪}

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কারীমে সত্যের দিশারী, হেদায়াতের আলো ও সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কুরআন কারীমের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা নূর থেকে সৃষ্টি। আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্টি, জড় বা মৃত্যু নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ইসলাম ও কুরআন কোনো জাগতিক, 'জড়', ইন্দ্রিয়গাহ বা মৃত্যু 'আলো' নয়। এ হলো বিমৃত্য, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা মানুষের হন্দয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অঙ্ককার

^{১০২} ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২১৯।

^{১০৩} ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।

^{১০৪} তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১।

থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে।

কিন্তু ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন বা মাটির মানুষ নন; রবং প্রকৃতপক্ষে তিনি নূর এবং নূরেরই তৈরি। এরপর কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেন, যদি কেউ তাঁর নূর থেকে তৈরি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বা তাকে মানুষ বলে বা মাটির মানুষ বলে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। তাঁরা উপরের আয়তের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্যকে তাদের দাবির পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এছাড়া আরো দু প্রকারের দলিল তারা পেশ করেন:

(১) নূর-মুহাম্মাদী (ﷺ) বিষয়ক ‘হাদীস’ নামে প্রচারিত কিছু কথা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ ‘নূর’ থেকে বা ‘আল্লাহর নূর’ থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থে প্রচারিত কিছু সনদ-বিহীন ভিত্তিহীন বা জাল বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করা হয়। যেমন বলা হয় যে, জাবির (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ كَمِنْ نُورٍ.....

“সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন।”

এরপর এই লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।....

হাদীস নামে কথিত এ কথাগুলি কোনো একটি হাদীসের প্রচ্ছেও সনদ-সহ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীসগুলি, বা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস এছ তো দূরের কথা পরবর্তী যুগগুলিতে সংকলিত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলন-গ্রন্থগুলিতেও এর কোনো উল্লেখ নেই। সঙ্গম হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস বা সীরাতের প্রচ্ছে এর সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় না। “হাদীসের নামে জালিয়াতি” প্রচ্ছে আমরা দেখেছি যে, দশম-একাদশ হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি আব্দুর রায়হাক সান‘আনী তাঁর মুসান্নাফ প্রচ্ছে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, বাইহাকী তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ দু আলিমের কোনো প্রচ্ছের কোথাও এ হাদীসটির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদিস ইমাম সুয়তী স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য।^{১৩৫}

^{১৩৫} সুয়তী, আল-হারী ১/৩৮৪-৩৮৬।

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ আরবীয় সূফী গবেষক মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু সিদ্দীক আল-গুমারী সুয়তীর এ কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, সুয়তী এ হাদীসটিকে ‘অনির্ভরযোগ্য’ বলে এর অবস্থা সঠিকভাবে জানাতে পারেন নি, বরং তাঁর বলা দরকার ছিল যে, ‘হাদীসটি সন্দেহাতীতভাবে জাল’। তিনি বলেন: “ইমাম সুয়তীর এ কথাটি আপত্তিকর অবহেলা। বরং হাদীসটি সুস্পষ্টতই জাল বা বানোয়াট। এর ভাষা ও অর্থ আপত্তিকর। হাদীসটি আব্দুর রায়্যাক উদ্ভৃত করেছেন বলে সুয়তী উল্লেখ করেছেন। অথচ আব্দুর রায়্যাক সান‘আনী রচিত ‘আল-মুসান্মাফ’, ‘তাফসীর’ এবং ‘আল-জামি’ কোনো গ্রন্থেই হাদীসটির অস্তিত্ব নেই। এর চেয়েও অবাক বিষয় মরোক্কোর শানকীত এলাকার কোনো কোনো আলিম আব্দুর রায়্যাকের নামে আব্দুর রায়্যাক থেকে জাবির পর্যন্ত এর একটি সনদেও বানিয়েছেন। আব্দুল্লাহ জানেন যে, এ সবই ভিত্তিহীন কথা। জাবির (রা) কখনোই এ হাদীস বর্ণনা করেন নি এবং আব্দুর রায়্যাকও এ হাদীসটি কখনো শুনেন নি। প্রথম যে ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করেন তিনি হলেন ইবনু আরাবী হাতিমী (৬৩৮ হি)। ... আমি জানি না তিনি কোথা থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই কোনো সূফী দরবেশ হাদীসটি বানিয়েছে।”^{১৩৬}

এ ‘হাদীস’ এবং ‘নূর মুহাম্মাদী’ বিষয়ক অন্যান্য ‘হাদীস’-এর সনদের অবস্থা আমি ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে কোনো বিবেকবান আলিম স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নূর দ্বারা তৈরি বিষয়ক একটি হাদীসও কোনো সহীহ বা হাসান সমদ তো দূরের কথা আলোচনা করার মত যয়ীক সনদেও বর্ণিত হয় নি। হাদীসের কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত সবই হয় সনদবিহীন প্রচলিত কথা অথবা মুহাদ্দিসগনের ঐকমত্যে জাল ও বানোয়াট কথা।

(২) এ বিষয়ে গত কয়েক শতাব্দীর কোনো কোনো আলিমের মত

এ বিষয়ে হাদীস নামে কথিত কথাগুলি ইসলামের প্রথম ৫/৬ শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ হাদীস বলে কথিত বজ্রব্যগুলি প্রচারিত হওয়ার পরে অনেক আলিম এগুলির সমন্বয়ে সম্পর্কে খৌজাখুজি না করে সাধারণভাবে এগুলির কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সকল ব্যাখ্যা বা মতামতকে এ মতের স্বপক্ষে ‘দলিল’ হিসেবে পেশ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর থেকে সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে এ বিতর্কটি একেবারেই

^{১৩৬} ড. যাকারিয়া, আশ-শিরক ২/৮৮২।

ক্রিমভাবে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইসলামের প্রথম অর্ধ-সহস্র বৎসর যাবৎ বিষয়টি আকীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়া তো দূরের কথা মুসলিম উম্মাহর সাধারণ আলোচনার বিষয়ও ছিল না। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহর “আব্দ” বা বান্দা হিসাবে বিশ্বাস করা এবং সাক্ষ্য দেওয়া রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ‘আল্লাহর বান্দা’ বলতে মানুষকে বুঝানো হয়। তাই এই বিশ্বাসের সরল অর্থ এই যে, তিনি মানুষদেরই একজন। তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তবে তিনি মানবতার উর্ধ্বে উঠেন নি।

(২) কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তাঁর আবদিয়্যাত (দাসত্ব) ও বাশারিয়্যাত (মানবত্ব)-এর কথা বারংবার সুস্পষ্টরূপে এবং দ্ব্যুর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলনু ‘আমি নূর’। কোথাও বলা হয় নি যে, ‘যুহুমাদ নূর’। শুধু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, তোমাদের কাছে ‘নূর’ এসেছে বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাস্সির একথা বলেছেন।

(৩) কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের উর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম। সুপথপ্রাণ মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা। পক্ষান্তরে বিভান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেওয়া। আবদিয়্যারেত ও বাশারিয়্যাতের ওজুহাতে মুজিয়া ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে বিভাস্তি। অনুরূপভাবে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত-হাদীস বা এ বিষয়ক বানোয়াট কথা বা আলিমদের মতামতের ভিত্তিতে আবদিয়্যাত বা বাশারিয়্যাত অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা বা কুরআন-হাদীসে যে কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি সে কথাকে বিশ্বাসের অংশ বানানোও অনুরূপ বিভাস্তি।

(৪) এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী তা পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারছেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যুর্থহীন নির্দেশকে দ্ব্যুর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব। আর মুফাস্সিরদের কথাকে তার স্থানেই রাখব।

আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে আমরা ‘কুরআন’-কে বুঝাবো। কারণ কুরআনে স্পষ্টত কুরআন’কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তাঁর বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মানুষ। তবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মানব জাতির পথ প্রদর্শনের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাঁকে নূর বলা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে যে, তাঁর মধ্যে নুরুওয়াতের নূর বিদ্যমান ছিল।

(৫) কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি ‘হাকীকতে’ বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজায়ী বা রূপক অর্থেই তাঁকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্ব্যর্থহীন বাণী নেই।

(৬) ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-নূরের তৈরি’ বলে বিশ্বাস করাকে ইমানের অংশ বানানো, অথবা এ কথা অস্থীকার করাকে কুফরী বলে গণ্য করা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করা। যে কথা কুরআনে সুস্পষ্টত বলা হয় নি, যে কথা স্পষ্টভাবে কোনো মুতাওয়াতির হাদীস তো দূরের কথা কোনো সহীহ হাদীসেও বলা হয় নি, সে কথাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার ভিত্তিতে সকল সুস্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের বজ্রব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করা এবং কুফরী ফাতওয়া দেওয়া বিভ্রান্ত সম্প্রদায়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আমরা দেখব, ইনশা আল্লাহ।

(৭) বস্তুত নূরের তৈরি হওয়ার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা আছে বলে মনে করাই ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। সৃষ্টির মর্যাদা তার সৃষ্টির উপাদানে নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদায় এবং তার নিজের কর্মে। এজন্যই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিম নূরের তৈরি ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরি মানুষকে অধিক মর্যাদাশালী বলে গণ্য করেছেন।

এভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতিতে তিনি অন্য সবার মতই মানুষ। তার মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান কর্মে ও তাঁর মহোত্তম চরিত্রে। উপাদানে, সৃষ্টিত প্রকৃতিতে অন্য সবার মত হয়েও যে তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসায় ও ইবাদতে অবিচল,

অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন, তাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব ছাড়াও অনেক অলৌকিক বা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে তাঁর যে সকল অতিমানবীয় বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন। এর বাইরে কোনো অতিমানবীয় গুণাবলী তারা তাঁর প্রতি আরোপ করেন না। তারা বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে কথা যতটুকু বলা হয়েছে সে কথা ততটুকু বললেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করা হয়। মানবীয় যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিয়ে অভিপ্রিক্ত কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. ২. ১২. ২. তাঁর ইলম বিষয়ক বিতর্ক

উপরের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাইবী জ্ঞান সম্পর্কিত বিতর্ক। কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র অদৃশ্য বা গাইবী ইলমের অধিকারী বা ‘আলিমুল গাইব’। তিনি ছাড়া কেউ গাইবী ইলমের অধিকারী নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ইলমুল গাইব জানতেন না। কেবলমাত্র যে জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আসত তিনি তাই অনুসরণ করতেন ও প্রচার করতেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبٌ إِلَّا اللَّهُ

“বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইব বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”^{১৩৭}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَعِنْدَهُ مَقَاتِعُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

“অদৃশ্যের কুণ্ডি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না।”^{১৩৮}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْعِنْ

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গাইব তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দৃষ্টা ও শ্রোতা!”^{১৩৯}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

^{১৩৭} সূরা (২৭) নাম্বর: ৬৫ আয়াত।

^{১৩৮} সূরা (৬) আন'আম: ৫৮ আয়াত।

^{১৩৯} সূরা (১৮) কাহাফ: ২৬ আয়াত।

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে।”^{১৪০}

إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزَلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذْرِي
نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরাযুতে আছে। কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণীই জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।”^{১৪১}

এভাবে কুরআন কারীমে বহু স্থানে মহান আল্লাহ বারংবার ঘোষণা করেছেন যে গাইবের বিষয় ও ভবিষ্যতের বিষয় মহান আল্লাহ ছাড় কেউ জানে না, কোনো প্রাণীই নয়। এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে যতটুকু জানিয়েছেন এর অতিরিক্ত কোনো গাইবী জ্ঞান নবীগণের ছিল না। ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ফিরিশতাগণ এসেছেন তিনি চিনতে পারেন নি। অনুরূপভাবে লৃত, দাউদ, সুলাইমান, মুসা, ইয়াকুব, ঈসা (আ) সকলের ক্ষেত্রেই বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল নবী-রাসূলগণের বিষয়ে একত্রে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْعِيُوبِ

“যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমারা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই, তুমই তো অদৃশ্য সমস্ক্রে সম্যক পরিজ্ঞাত।”^{১৪২}

রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানতেন না বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَسْعَوْلُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْهَةً مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا وَاِنِّي
مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

^{১৪০} সূরা (১১) হৃদ: ১২৩ আয়াত।

^{১৪১} সূরা (৩১) লুকমান: ৩৪ আয়াত।

^{১৪২} সূরা (৫) মায়দা: ১০৯ আয়াত।

“তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নির্দশন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, ‘অদ্শ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।’”^{১৪৩}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لَا أُفُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَانُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أُفُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوَحَّى إِلَيَّ قُلْ هُنَّ لَيْسُوا بِالْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَشْكُرُونَ

“বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাগ্যসমূহ রয়েছে, অদ্শ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না য, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় তারই অনুসরণ করি।”^{১৪৪}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لَا أَمْلَكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَكَنَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنَّيِ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গাইব (গোপন জ্ঞান) জানতাম তাহলে প্রভৃতি কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবলমাত্র ত্যরিপ্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।”^{১৪৫}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَا كُنْتَ بَذِعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أُنْدِرِي مَا يَقْعُلُ بِي وَلَا يُكَمِّلُ بِكُمْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوَحَّى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

“বল, আমি তো প্রথম রাসূল নই। আর আমি জানি না, আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমি আমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করা হয় কেবলমাত্র তারই অনুসরণ করি। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।”^{১৪৬}

অন্য আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহূ আরো বলেন:

^{১৪৩} সূরা (১০) ইউনুস: ২০ আয়াত।

^{১৪৪} সূরা (৬) আনআম: ৫০ আয়াত। আরো দেখুন (সূরা ১১ হৃদ: ৩১ আয়াত)

^{১৪৫} সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত।

^{১৪৬} সূরা (৪৬) আহকাফ: ৯ আয়াত।

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
فَهُنَّ أُنْثُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوْلُوا فَقُلْ أَذْتَنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أُنْزِيَ أَقْرِبُتْ أَمْ بَعْدَ
مَا تُوَعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أُنْزِيَ لَعْلَةً فِتْنَةً
لَكُمْ وَمَنَّاعَ إِلَى حِينِ

“এবং আমি তো তোমাকে কেবল বিশ্ব-জগতের রহমত-রূপেই প্রেরণ
করেছি। বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য
একমাত্র একজনই, অতএব তোমরা আরসমর্পণকারী (মুসলিম) হয়ে যাও।
আর যদি তারা (আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে
বলে দাও, আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি। তোমাদেরকে
যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা শীঘ্রই আসবে না দেরী করে আসবে তা
আমি জানি না। নিশ্চয় আল্লাহ যা কথায় ব্যক্ত করা হয় এবং যা তোমরা
গোপন কর তা সব জানেন। আর আমি জানি না, হয়ত তা তোমাদের জন্য
একটি পরীক্ষা এবং কিছু সময়ের জন্য উপভোগের বিষয়।”^{১৪৭}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ مَنَّافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَّتُوا عَلَى
النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

“মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ
মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি
তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি।”^{১৪৮}

لَا تَنْزِي لَعْلَةً اللَّهُ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দেবেন।”^{১৪৯}

সাহাবী মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রা) বলেন,

إِنَّ نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ ضَلَّتْ فَقَالَ زَيْنُ الدِّينُ بْنُ الصَّبِّيْتِ: يَرْعَمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ نَبِيٌّ
وَيَخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ لَا يَنْزِي أَيْنَ نَاقَةَ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ رَجُلًا
يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلِمْتِي اللَّهُ وَقَدْ تَلَنَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَهِيَ
فِي شِعْبِ كَذَا قَدْ حَبَسْتَهَا شَجَرَةً فَذَهَبَوْهُ فِي جَاءُوهُ بِهَا

^{১৪৭} সূরা (২১) আবিয়া: ১০৭-১১১ আয়াত।

^{১৪৮} সূরা (৯) তাওবা: ১০১ আয়াত।

^{১৪৯} সূরা (৬৫) তালাক: ১ আয়াত।

“রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি উটনী হারিয়ে যায়। তখন যাইদ ইবনুল লামীত নামক একব্যক্তি বলে, মুহাম্মাদ (ﷺ) দাবি করেন যে, তিনি নবী এবং তোমাদেরকে তিনি আকাশের খবর বলেন, অথচ তাঁর নিজের উটটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন না! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এক ব্যক্তি এমন এমন কথা বলেছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে যা জানান তা ছাড়া আমি কিছুই জানি না। আল্লাহ আমাকে উটনীটির বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেটি অমুক প্রান্তরে অমুক গাছের সাথে আটকে আছে। তখন তারা তথায় যেযে উটনীটি নিয়ে আসেন।”^{১৫০}

এ হাদীস উল্লেখ করে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন:

فَإِنْ بَعْضُهُ مِنْ لَمْ يَرْسِخْ فِي الْإِيمَانِ كَانَ يَظْنُنَ ذَلِكَ حَتَّىٰ كَانَ يَرِى أَنَّ صَحَّةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْمُغَيْبَاتِ ... فَاعْلَمُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا مَا عَلِمَ اللَّهُ

“যাদের ঈমান পূর্ণ হয় নি এরূপ কেউ কেউ ধারণা করত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইলমুল গাইব জানেন। এমনকি তারা মনে করত যে, নুরুওয়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য নবীকে সকল গাইব জানতে হবে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ যা জানান তা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না।”^{১৫১}

সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ বুর্জু সাহাবী ছিলেন উসমান ইবনু মায়উন (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ-ভাই ছিলেন এবং জাহিলী যুগেও তিনি মদপান বা মুর্তিপূজা করেন নি। তিনি প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন। মহিলা সাহাবী উম্মুল আলা উসমান ইবনু মায়উনের (রা) ওফাতের পরের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَلَّتْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنِي أَبْنَا السَّائِبِ شَهَابَتِي عَلَيْكَ
لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُذْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قَالَتْ قَلَّتْ (لَا أَذْرِي)
يَا بَنِي أَنْتَ وَأَمِي يَا رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ يَكْرَمُهُ اللَّهُ؟ قَالَ أَمِّي هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَلِلَّهِ
الْيَقِينُ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَذْرِي وَاللَّهُ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَقْعُلُ بِي
قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ

^{১৫০} ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নবিয়াহ ২/৫২৩; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী

১৩/৩২৬৪। হাদীসটির সনদ হাসান। ড. যাকারিয়াহ, আশ-শিরক ২/৯৮৭।

^{১৫১} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ১৩/৩২৬৪।

“তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। আমি বললাম, হে আবুস সাইব (উসমান ইবনু মায়উন) আমি আপনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন, আমি তো জানি না, তবে তাঁকে যদি আল্লাহ সম্মানিত না করেন তবে আর কাকে করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তার কাছে একীন এসেছে, আল্লাহর কসম, আমি তার বিষয়ে ভাল আশা করি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল, আমিও জানি না যে, আমার বিষয়ে কি করা হবে।’ উম্মুল আলা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কাউকে ভাল বলি না।”^{১৫২}

মহিলা সাহাবী রুবাই' বিনতু মু'আওয়িয় বলেন:

نَحْلَ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَبِيحةً عَرْنَسِي وَعَنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَيَّبَتَانِ ...
وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ: وَقَبِنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا
يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ

“আমার বিবাহের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমার কাছে দ'জন বালিকা বসে গীত গাচ্ছিল। তারা তাদের কথার মাঝে মাঝে বলছিল: ‘আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছেন যিনি আগামীকাল (অর্থাৎ ভবিষ্যতে) কি আছে তা জানেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন: ‘এ কথা বলো না, আগামীতে (ভবিষ্যতে) কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।’^{১৫৩}

আয়েশা, উম্ম সালামা, আসমা বিনত আবী বাকর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আনাস ইবনু মালিক, আবৃ সাইদ খুদরী, সাহল ইবনু সাদ, আমর ইবনুল আস প্রমুখ প্রায় দশ জন সাহাবী (ﷺ) থেকে অনেকগুলি সহীহ সনদে বর্ণিত ‘মুত্তাওয়াতির’ পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউয়ে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব : এরা তো আমারই উম্মত ! তখন উত্তরে বলা হবে:

^{১৫২} বুখারী, আস-সহীহ ১/৪১৯, ৩/১৪২৯, ৬/২৫৭৫।

^{১৫৩} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৪৬৯, ১৭৩৩, ১৮৪০, ৫/১৯৭৬, ৬/২৬৮৭, ৮/৬০৯ ৯/২০৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৬১১; ইবনু হাজার, ফাতহস বারী ৭/৩১৫।

إِنَّكُمْ لَا تَذَرِّي مَا عَمِلُوا بَغْدَكَ

“আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَّادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“নেকবাদ্দা ঈসা ইবনু মারিয়াম (আ) যা বলেন আমি তখন তা-ই বলব^{۱۵۴}: “যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের শাহীদ-সাক্ষী। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (শাহীদ)।”^{۱۵۵}

এ সকল নির্দেশনার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنْ أَنْزَلْتِي أَقْرِبَ مَا تُوَعِّدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبَّيْ أَمْذَا عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِمَا لَدِيهِمْ وَأَخْصَى كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا

“বল, আমি জানি না তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন। তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞানী, তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত, সেক্ষেত্রে আল্লাহ সেই রাসূলের আগে ও পিছে প্রহরী নিয়োগ করেন, যেন তিনি জানতে পারেন যে, রাসূলগণ তাদের প্রভুর রিসালাতের বাণী পৌছিয়েছেন কি না। তাদের কাছে যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।”^{۱۵۶}

^{۱۵۴} সূরা (৫) মাযিদা: ১১৭ আয়াত।

^{۱۵۵} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৯১, ১৭৬৬, ৫/২৩৯১, ২৪০৪, ২৪০৬, ৬/২৫৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৩-১৭৯৪।

^{۱۵۶} সূরা (৭২) জিল্লা: ২৫-২৮ আয়াত।

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাঁর মনোনিত রাসূলদেরকে গায়েবের জ্ঞান প্রকাশ করেন। সাথে সাথে আমরা জানতে পারছি যে, সার্বিক গায়েব বা ভবিষ্যতের কথা তিনি রাসূলদেরকেও জানান না। কাফেরদেরকে যে শান্তির ওয়াদা করা হয়েছে তা কি শৈষ্টই আসবে না দেরী করে আসবে তা তিনি জানেন না।

আসমা বিন্তু আবী বাক্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায়ের পরে বলেন:

مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيَتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

“যা কিছু আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছিল না তা সবই আমি আমার এই অবস্থানে থেকে দেখেছি, এমনকি জান্নাত ও জাহানামও।”^{১৫৭}

আল্লাহ ইবনু আবাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَنَهُ فَلَمْ يَقُلْ يَا مُحَمَّدٌ هَلْ تَذَرِّي فِيمَ يَخْتَصِّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قَالَ قَلْتُ لَا قَالَ فَوْضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَنَيْيَهُ أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى تَجَلَّ لِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَّاهُ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْفَنِينَ). قَالَ يَا مُحَمَّدٌ هَلْ تَذَرِّي فِيمَ يَخْتَصِّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قَلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالْكُفَّارَاتُ الْمُكْثُتُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخِيرٍ وَمَاتَ بِخِيرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيبَتِهِ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. ...

“আজ রাতে আমার মহিমায় প্রতিপালক সর্বোত্তম আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন, তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেন: স্বপ্নের মধ্যে। তখন তিনি বলেন: হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান সর্বোচ্চ পরিষদ কোনু বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম: না। তখন তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যে রাখলেন, এমনকি আমি তার শীতলতা আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আকাশমণ্ডলীর মধ্যে যা আছে এবং যমিনের মধ্যে যা আছে তা জানলাম। অন্য বর্ণনায়: পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যা আছে তা আমি

^{১৫৭} বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৪, ৩১২।

জানলাম। তৃতীয় বর্ণনায়: তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা আমার কাছে উত্তোলিত হলো। তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন: “এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।”^{১৫৮} তখন তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান সর্বোচ্চ পরিষদ কোন্ বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বলেন, তারা কাফ্ফারা বা পাপের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিতর্ক করছেন। আর কাফ্ফারা হলো সালাত আদায়ের পরে মসজিদে অবস্থান করা, পায়ে হেঠে জামাতে সালাত আদায়ের জন্য গমন করা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওয়ু করা। যে ব্যক্তি এগুলি করবে সে কল্যাণের সাথে জীবন যাপন করবে, কল্যাণের সাথেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার ঘাত্গর্ভ থেকে জন্মের সময় তার পাপ যেরূপ ছিল তদৃপ হয়ে যাবে।”^{১৫৯}

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে আসমান-যমিনের ও পূর্ব-পশ্চিমের অদ্যুৎ বিষয়াদি জানিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন। এ দেখানোর অর্থ স্বভাবতই সকল গাইবী ইলম প্রদান করা নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর এই দর্শনকে ইবরাহীম (আ)-এর দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালন-ব্যবস্থা দেখান। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাঁকে সকল গাইবী জ্ঞান প্রদান করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখি যে, ইবরাহীম (আ)-এর শেষ জীবনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সুসংবাদ নিয়ে এবং লৃত (আ)-এর দেশের মানুষদের ধর্মসের দায়িত্ব নিয়ে যখন ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে আগমন করেন, তখন তিনি ফিরিশতাদেরকে চিনতে পারেন নি, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও কিছু জানতে পারেন নি, তাঁর নিজের সন্তান হবে তাও তিনি জানতেন না এবং সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে তিনি খুবই আশ্চর্যাপ্নিত হন। এ সকল বিষয় সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এরূপ দর্শনের অর্থ গাইবী জগতের অনেক বিষয় দেখা, সকল বিষয়ের স্থায়ী জ্ঞান লাভ নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি সাহাবীগণ এবং তাঁদের অনুসারী তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুসলিমগণ।

^{১৫৮} সূরা (৬) আন'আম: ৭৫ আয়াত।

^{১৫৯} তিরিমিয়ী, আস-সুনান ৫/৩৬৬-৩৬৮; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৬৬, ৫/৩৭৮; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৭/১৭৬। তিরিমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান।

এ সকল নির্দেশ সবই সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন তারা। আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানতেন না- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। পাশাপাশি মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হিসেবে নুরওয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইবের বিষয়াদি দেখিয়েছেন ও জানিয়েছেন- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যতটুকু জানিয়েছেন বা দেখিয়েছেন বলে কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই সরল অর্থে তারা বিশ্বাস করেছেন। এর বাইরে কিছু জানা বা না জানা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা-চিন্তা করা মুশ্মিনের দায়িত্ব নয়।

৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামগ্রিক ইলমুল গাইবের অধিকারী ছিলেন বা তিনি ‘আলিমুল গাইব’ ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে যে সকল মিথ্যা কথা বলা হয় তার অন্যতম হলো:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى عِلْمَ الْأُولَئِينَ وَالْآخَرِينَ مَفْصِلًا وَوَهْبَ لَهُ عِلْمٌ كُلُّ
مَا مَضِيَ وَمَا يَأْتِي كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنِ عِلْمِهِ وَعِلْمِ رَبِّهِ مِنْ حِيثِ
الْأَحْاطَةِ وَالشَّمُولِ ، وَإِنَّمَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَزْلَى أَبْدِيَّ بِنَفْسِ ذَاتِهِ
بِدُونِ تَغْلِيمٍ غَيْرِهِ بِخَلْفِ عِلْمِ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِتَعْلِيمِ رَبِّهِ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন। যা কিছু অতীত হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জ্ঞান তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপকতায় ও গভীরতায় রাসূলুল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান অনাদি ও স্বয়ংজ্ঞাত, কেউ তাঁকে শেখান নি। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তাঁর প্রভুর শেখানোর মাধ্যমে।”^{১৬০}

এ কথা উল্লেখ করার পর আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: “এগুলি সবই সুন্দর করে সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। ইবনু হাজার মাঝী তার ‘আল-মিনাহল মাক্রিয়াহ’ গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রাচীন আলিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই কথাগুলি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী

^{১৬০} আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার, পৃ. ৩৮।

একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র তিনিই সকল অদ্যশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গাইব। এই জ্ঞান একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব ও তাঁরই গুণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এই গুণ প্রদান করা হয় নি। হ্যাঁ, আমাদের নবী (ﷺ)-এর জ্ঞান অন্য সকল নবী-রাসূলের (আ) জ্ঞানের চেয়ে বেশি। গাইবী বা অতিশ্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর প্রতিপালক অন্যান্য সবাইকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিকতর ও পূর্ণতর শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে। তিনি জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণতম এবং সমান ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির নেতা।^{১৬১}

মোল্লা আলী কারীও অনুরূপ কথা বলেছেন। কুরআন কারীমের যে সকল আয়াতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘গাইব’ জানতেন না সেগুলি তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন আয়েশা (রা)-এর গলার হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদের ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, এরূপ গাইব কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন না এবং এরূপ জানার দাবি তিনি কখনোই করেন নি, বরং তিনি বারংবার বলেছেন যে, আমি গাইব জানি না। এরপর তিনি বলেন: “নিঃসন্দেহে তাদের এরূপ অতিভক্তি ও সীমালজ্ঞনের কারণ হলো, তারা মনে করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের গোনাহগুলি মাফ করে দিবে এবং তাদেরকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবেন। তারা এভাবে তাঁর বিষয়ে যত বেশি অতিভক্তি ও অতিরিক্ত কথা বলবে ততই তারা তাঁর বেশি প্রিয় হবে। এভাবে ভক্তির নামে এরা তাঁর সবচেয়ে বেশি অবাধ্যতা করছে এবং তাঁর সুন্নাত সবচেয়ে বেশি লজ্জন করছে। খ্স্টানদের সাথে এদের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট, যারা ঈসা মাসীহের (আ) বিষয়ে অতিভক্তি করেছে, তাঁর শরীয়ত লজ্জন করেছে এবং তার দীনের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, এরা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসগুলি সত্য বলে গ্রহণ করে আর সহীহ হাদীসগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে বাতিল করে।”^{১৬২}

এক নথরেই আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইব বিষয়ক উপরের এ মতটি একটি বিদ‘আতী বা বিভ্রান্ত মত। কারণ কুরআন কারীমে, কোনো সহীহ মুতাওয়াতির বা আহাদ হাদীসে বা সাহার্বিগণের বাণীতে কোথাও এরূপ কথা বলা হয় নি। অন্যান্য বিভ্রান্ত বিদ‘আতী আকীদার ন্যায় কুরআনের কোনো কোনো কথার ব্যাখ্যা, কোনো কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন মুক্তির মাধ্যমে এ ‘আকীদা’ তৈরি করা হয়েছে।

^{১৬১} আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার, পৃ. ৩৮।

^{১৬২} মোল্লা কারী, আল-আসার, পৃ. ৩২৩-৩২৫।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) কুরআনে অনেক স্থানে সুস্পষ্ট ও দ্যৰ্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই ‘আলিমুল গাইব’ এবং তিনি ছাড়া আসমান-যমীনের মধ্যে অন্য কেউ গাইব জানেন না। এ কথা বলা হয় নি যে, ‘আল্লাহর মত গাইব’ কেউ জানেন না, বরং বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কেউই গাইব জানেন না।

(২) কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট ও দ্যৰ্থহীনভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানেন না। এর বিপরীতে একটি স্থানেও একটি বারের জন্যও দ্যৰ্থহীন বা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি যে, তিনি ‘আল্লামুল শুইউব’, বা ‘আলিমুল গাইব’ বা সকল গাইবের জ্ঞান তাঁরা আছে।

(৩) অনেক সহীহ হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানেন না। এর বিপরীতে একটি হাদীসেও তিনি বলেন নি যে, ‘আমি গাইব জানি’ বা ‘আমি আলিমুল গাইব’।

(৪) এই মতটিতে যে কথাগুলি দাবি করা হয়েছে সে কথাগুলি কখনোই এক্ষেপভাবে বা এ ভাষায় কখনো কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল হাদীসেও বলা হয় নি।

৩. ২. ১২. ৩. হায়ির-নায়ির প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইবের দাবির আরেকটি পরিভাষা তাঁকে ‘হায়ির-নায়ির’ বলে দাবি করা। হায়ির-নায়ির দুইটি আরবী শব্দ। (حاضر) হায়ির অর্থ উপস্থিতি। (باطل) নায়ির অর্থ দর্শক, পর্যবেক্ষক বা সংরক্ষক। ‘হায়ির-নায়ির’ বলতে বোঝান হয় ‘সদাবিরাজমান ও সর্বজ্ঞ বা সবকিছুর দর্শক’। অর্থাৎ তিনি সদা-সর্বদা সবত্র উপস্থিত বা বিরাজমান এবং তিনি সদা সর্বদা সবকিছুর দর্শক। স্বভাবতই যিনি সদাসর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক তিনি সর্বজ্ঞ ও সকল যুগের সকল স্থানের সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ‘হায়ির-নায়ির’ দাবি করেন, তাঁরা দাবি করেন যে, তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, উপরন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

এখানেও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, এই শুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ বারংবার এরশাদ করেছেন যে, বান্দা যেখানেই থাক্ তিনি তার সাথে আছেন, তিনি বান্দার নিকটে আছেন... ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কে কখনোই ঘূনাক্ষরেও কুরআন বা হাদীসে বলা হয় নি যে, তিনি সর্বদা উম্মাতের সাথে আছেন, অথবা সকল মানুষের সাথে আছেন, অথবা কাছে আছেন, অথবা সর্বত্র উপস্থিত আছেন, অথবা সবকিছু দেখেছেন। কুরআনের আয়াত তো দূরের কথা একটি যয়ীফ হাদীসও দ্যৰ্থহীনভাবে এই

অর্থে কোথাও বর্ণিত হয় নি। কোনো একটি সহীহ, যয়ীফ বা মাউয়ু হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি বলেছেন ‘আমি হায়ির-নায়ির’। অথচ তাঁর নামে এ মিথ্যা কথাটি বলা হচ্ছে। এমনকি কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা ইমাম কখনোই বলেন নি যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হায়ির-নায়ির’।

ঘূর্তীয়ত, কুরআন-হাদীসে বারংবার অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গোপন জানের অধিকারী নন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ‘হায়ির-নায়ির’ বলে দাবি করা উক্ত সকল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা।

ঘূর্তীয়ত, বিভিন্ন হাদীসে তিনি বলেছেন, উম্মাতের দরুন্দ-সালাম তাঁর কবরে উপস্থিত করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হায়ির-নায়ির বলে দাবি করার অর্থ হলো, এ সকল হাদীস সবই মিথ্যা। উম্মাতের দরুন্দ-সালাম তাঁর কাছে উপস্থিত হয় না, বরং তিনিই উম্মাতের কাছে উপস্থিত হন!! কাজেই যারা এ দাবিটি করছেন, তাঁর শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। উপরন্তু তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেন, নাউয়ু বিল্লাহ।

চতুর্থত, যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইলমুল গাইব ও সদাসর্বদা সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার মত পোষণ করেছেন, তারা একে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফযীলত বা মর্যাদা বিষয়ক মতামত হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং একে মুমিনের ঈমানের অংশ বলে দাবি করেছেন।

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, দশাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ওফাতের পরে মহাবিশ্বের সর্বত্র বা সকল উম্মাতের কাছে ‘হায়ির-নায়ির’ থেকে তাদের সকল পরিবর্তন বা অন্যায়-অপকর্ম অবলোকন করার বামেলা মহান আল্লাহ তাঁকে দেন নি। অনুরূপভাবে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, অতীত উম্মাতগুলির নিকটও তিনি উপস্থিত বা হায়ির-নায়ির ছিলেন না। আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِّمُونَ
يَكْفُلُ مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِّمُونَ

“এ গাইবের সংবাদ যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত করছি। মার্যামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে তার জন্য যখন তারা কলম নিষ্কেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।”^{১৬৩}

^{১৬৩} সূরা (৩) আল-ইমরান: ৪৪ আয়াত।

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ... وَمَا كُنْتَ ثَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدِينَ تَنَّوْ عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَا وَلَكِنَّا كَنَّا
مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَنَا

“মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন পশ্চিম প্রান্তে তুমি
উপস্থিত ছিলে না এবং তুমির শাহিদ বা প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। ... তুমি তো
মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি
করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। মূসাকে যখন আমি আহ্বান
করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না...।”^{১৬৪}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ
وَهُمْ يَمْكُرُونَ

“এ গাইবের সংবাদ যা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। ষড়যন্ত্রকালে
যখন তারা মতেক্ষে পৌছেছিল তখন তুমি তাদের সংগে ছিলে না।”^{১৬৫}

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী, সীরাত, সাহাবীগণের কর্ম, মতামত
ইত্যাদি সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান আছে তিনিও বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর জীবদ্ধশায় তিনি নিজে কখনো কোনোভাবে দাবি করেন নি যে, তিনি
সদা সর্বদা সর্বত্র বা সকল উম্মাতের কাছে ‘হায়ির-নায়ির’ বা তাদের কাছে
উপস্থিত থেকে তাদের সব কিছু দেখছেন। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও কখনোই
এরূপ কোনো কথা কল্পনা করেন নি।

তাদের এ মতের পক্ষে পেশকৃত দলিলগুলি নিম্নরূপ:

স্বভাবতই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ থেকে কোনো একটি
সুস্পষ্ট বা দ্ব্যুর্থীন বক্তব্যও তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। বিভিন্ন
আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা-ভিত্তিক যুক্তি-তর্কই তাদের দলিল।
তাঁদের এ জাতীয় দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে:

প্রথম দলীল: কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
'শাহিদ' ও 'শাহীদ' (شَاهِد و شَهِيد) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৬৬} এই শব্দ

^{১৬৪} সূরা (২৮) কাসাস: ৪৪-৪৬ আয়াত।

^{১৬৫} সূরা (১২) ইউসুফ: ১০২ আয়াত।

^{১৬৬} সূরা: ৩৩ আহ্যাব ৪৫; সূরা: ৪৮ ফাত্হ ৮; সূরা: ৭৩ মুয়্যামিল ১৫; সূরা: ২ বাকারা

১৪৩; সূরা: ৮ নিসা, ৪১; সূরা: ১৬ নাহল, ১৯; সূরা: ২২ হজ, ৭৮ আয়াত।

দুইটির অর্থ ‘সাক্ষী’, ‘প্রমাণ’, ‘উপস্থিত’ (witness, evidence, present) ইত্যাদি। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুফাস্সিরগণ এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (ﷺ) দীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে ও সাক্ষীরাপে প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর প্রচারিত দীন গ্রহণ করবেন, তিনি তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণ যে তাঁদের দীন প্রচার করেছেন সে বিষয়েও তিনি এবং তাঁর উম্মাত সাক্ষ্য দিবেন। অনেকে বলেছেন, তাঁকে আল্লাহ তাঁর একত্বের বা ওয়াহদানিয়তের সাক্ষী ও প্রমাণ-রূপে প্রেরণ করেছেন।^{১৬৭}

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে মুমিনগণকেও মানব জাতির জন্য ‘শাহীদ’ বলা হয়েছে।^{১৬৮} অনেক স্থানে আল্লাহকে ‘শাহীদ’ বলা হয়েছে।^{১৬৯}

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ‘সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী’ বা ‘হাযির-নাযির’ বলে দাবি করেন তাঁরা এই ‘দ্ব্যর্থবোধক’ শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর সেই অর্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী বাতিল করে দেন। তাঁরা বলেন, ‘শাহীদ’ অর্থ উপস্থিত। কাজেই তিনি সর্বত্র উপস্থিত। অথবা ‘শাহীদ’ অর্থ যদি সাক্ষী হয় তাহলেও তাঁকে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ না দেখে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। আর এভাবে তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাযির-নাযির ও সকল স্থানের সকল গোপন ও গাইবী জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁদের এই ব্যাখ্যা ও দাবির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত, তাঁরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুফাস্সিরদের মতামত গ্রহণ না করে নিজেদের মর্জিমাফিক ব্যাখ্যা করেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীদের ব্যাখ্যা বাতিল করে দেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যাকে মূল আকীদা হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমাফিক বাতিল করে দিলেন। তাঁরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করলেন, যে অর্থে একটি দ্ব্যর্থহীন আয়াত বা হাদীসও নেই। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা কোনো ইমামও কখনো এ কথা বলেন নি।

^{১৬৭} তাবারী ২২/১৮, ২৬/৭৩; ইবনু কাসীম ৩/৪৯৮।

^{১৬৮} সূরা (২) বাকারা, ১৪৩; সূরা (২২) হজ্জ, ৭৮ আয়াত।

^{১৬৯} সূরা : ৪ নিসা, ৭৯, ১৬৬; সূরা : ৫ মায়দা ১১৭; সূরা : ১০ ইউনুস, ২৯; সূরা : ১৩ রাদ, ৪৩; সূরা : ১৭ ইসরারা, ৯৬; সূরা : ২৯ আনকাবৃত, ৫২; সূরা : ৩৩ আহ্যাব, ৫৫; সূরা : ৪৬ আহকাফ, ৮; সূরা : ৪৮, ফাত্হ, ২৮ আয়াত।

তৃতীয়ত, তাঁদের এ ব্যাখ্যা ও দাবি মূলতই বাতিল। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকেই ‘ইলমে গাইবের অধিকারী’ ও হাযির-নাযির বলে দাবি করতে হবে। কারণ মুমিনগণকেও কুরআনে ‘শাহীদ’ অর্থাৎ ‘সাক্ষী’ বা ‘উপস্থিত’ বলা হয়েছে এবং বারংবার বলা হয়েছে যে, তাঁরা পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সহ পুরো মানব জাতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। আর উপস্থিত না হলে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও দাবি অনুসারে বলতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কারণ না দেখে তাঁরা কিভাবে মানবজাতির পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন?!

তৃতীয় দলীল: কুরআন কারীমে অন্যত্র যথান আল্লাহ বলেন:

النَّبِيُّ أُولَئِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُمْ أَمْهَاتُهُمْ
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بِعِصْمَهُمْ أُولَئِي بِبعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“নবী মুমিনগণের নিকট তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (closer) এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের মাতা। এবং আল্লাহর কিতাবে আত্মায়গণ পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর।”^{১৭০}

এখানে ‘আউলা’ (أولى) শব্দটির মূল হলো ‘বেলায়াত’ (الولاية), অর্থাৎ বস্তুত্ব, নেকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। “বেলায়েত” অর্জনকারীকে “ওলী” (الولي), অর্থাৎ বস্তু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। ‘আউল’ অর্থ ‘অধিকতর ওলী’। অর্থাৎ অধিক বস্তু, অধিক নিকটবর্তী, অধিক যোগ্য বা অধিক দায়িত্বশীল (more entitled, more deserving, worthier, closer)।

এখানে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর (closer) বলতে ভঙ্গি, ভালবাসা, দায়িত্ব, সম্পর্ক ও আত্মায়তার ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হচ্ছে। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহকে তাঁদের নিজেদের চেয়েও বেশি আপন, বেশি প্রিয় ও আনুগত্য ও অনুসরণের বেশি হৃক্ষদার বলে জানেন। এই ‘আপনত্বের’ একটি দিক হলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আবার উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরদ ও প্রেম তাঁর আপনজনদের চেয়েও বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এই আয়তের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। জাবির, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أُولَئِي بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَقْرَبُوهُ إِنِّي شَنَّتُمْ النَّبِيَّ
أُولَئِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. فَإِنَّمَا مُؤْمِنٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَا لَا فِلْرَثَةَ عَصَبَتْهُ مَنْ

^{১৭০} সূরা (৩৩) আহযাব, ৬ আয়াত।

كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيَّعَهُ فَلِيَأْتِي (فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، عَلَيَّ قَضَاؤُه) فَأَنَا مَوْلَاهُ

“প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুনিয়া ও আবেদাতে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ কর: “নবী মুমিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর”। কাজেই যে কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ যারা থাকবে তারা সেই সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি সে ঝণ রেখে যায় বা অসহায় সন্তান-সন্তানি রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; সে ঝণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপরেই থাকবে। কারণ আমিই তার আপনজন।”^{১৭১}

কিন্তু ‘হায়ির-নায়ির’-এর দাবিদারগণ দাবি করেন যে, এখানে দৈহিক নৈকট্য বৃক্ষান্বে হয়েছে। কাজেই তিনি সকল মুমিনের নিকট হায়ির আছেন।

এখানেও আমরা দেখছি যে একটি বানোয়াট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা কুরআন ও হাদীসে অগণিত দ্যুর্ঘাতীন নির্দেশকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাঁর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স্লত্তিম) -এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করছেন না। সর্বোপরি তাদের এই ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই বাতিল। কারণ এই আয়াতেই বলা হয়েছে যে “আত্মীয়গণ পরম্পর পরম্পরের ঘনিষ্ঠিতর”। অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, “আত্মীয়গণ একে অপরের ঘনিষ্ঠিতর বাণ নিকটতর।”^{১২} তাহলে এদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের বলতে হবে যে, সকল মানুষই হায়ির নায়ির। কারণ সকল মানুষই কারো না কারো আত্মীয়। কাজেই তার সদাসর্বদা তাদের কাছে উপস্থিত এবং তাদের সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন!

অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (ﷺ) ও মুমিনগণ মানুষদের
মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে ‘নিকটতর’ বা ‘ঘনিষ্ঠিতর’^{১৭} (أولى)
এখানে দাবি করতে হবে যে, সকল মুমিন ইবরাহীমের নিকট উপস্থিতি...!

তৃতীয় দলীল: আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ زَكَرِيَّاً ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رَفِيْقِ الْمُنْبِرِ) فَقَالَ إِلَيْهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْتَقِعُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْفَقَامِ وَلَا بِالْأَنْصَارَافِ (أَتَمُوا الصُّوفَ) فَإِنِّي أَرَأَكُمْ أَمَامِي وَمَنْ خَلَفَنِي (خَلَفُ ظَهْرِيِّ / مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيِّ)، فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَأَكُمْ مِنْ

^{১৯} বুখারী, আস-সহীহ ২/৮০৫, ৮৪৫, ৪/১৭৯৫; ৫/২০৫৪; ৬/২৪৭৬, ২৪৮০;

ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ ୨୯୨୫/୩/୧୨୩୭, ୧୨୩୮ ।

১৭২ সুরা (৮) আনফাল, ৭৫ আয়াত।

১৭৩ সুরা (৩) আল-ইমরান, ৬৮।

وَرَأَيْتَ كَمَا أَرَكُمْ (مِنْ أَمَامِي) (أَفِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرَبِّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَّعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ)

“একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে (অন্য বর্ণনায়: মিম্বরে আরোহণ করে) তিনি বলেন: হে মানুষেরা, আমি তোমাদের ইমাম। কাজেই তোমরা আমার আগে রুকু করবে না, সাজদা করবে না, দাঁড়াবে না এবং সালাত শেষ করবে না। অন্য বর্ণনায়: কাতারগুলি পূর্ণ করবে। কারণ আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই আমার সামনে এবং আমার পিছনে, যখন তোমরা রুকু কর এবং যখন তোমরা সাজদা কর। অন্য বর্ণনায়: সালাতের মধ্যে এবং রুকুর মধ্যে আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখি যেমন আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে দেখি। অন্য বর্ণনায়: তোমরা রুকু এবং সাজদা পূর্ণ করবে; কারণ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে আমার পরেও, অথবা বলেন: আমার পিঠের পরেও দেখি যখন তোমরা রুকু কর এবং সাজদা কর।”^{১৭৪}

এ অর্থে আবু হুরাইরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

هُلْ تَرَوْنَ قَبْلَنِي هَا هَنَا وَاللَّهِ مَا يَخْفِي عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خَشْعَكُمْ
وَإِنِّي لَأَرَكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

“তোমরা কি এখানে আমার কিবলাহ দেখতে পাচ্ছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের রুকু, সাজদা এবং বিন্দুতা আমার কাছে অপ্রকাশিত থাকে না এবং আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছনে দেখি।”^{১৭৫}

এ হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারছি। এ হাদীসের আলোকে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য মানুষ যেভাবে সামনে দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিছনেও দেখতেন। এখন কেউ ‘বাশারিয়্যাত’ বা মানবত্বের বিশেষণকে ভিত্তি করে পিছনে দেখার এই বৈশিষ্ট্যটির ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন যে, এখানে ‘দেখি’ অর্থ ‘ধারণা করি’, কারণ ‘দেখা’ আরবীতে ‘ধারণা’ বা মনের দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়, অথবা দেখি অর্থ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়... ইত্যাদি। তবে এরূপ ব্যাখ্যা ও অর্থ-করণ ওহীর সীমা লজ্জন বলে গণ্য হবে। বরং বাশারিয়্যাত ও পশ্চাত-দর্শন উভয়কেই স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ অর্থে গ্রহণ করা এবং উভয়কে

^{১৭৪} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬২, ২৫৩, ২৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩১৯, ৩২০, ৩২৪।

^{১৭৫} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৫৯।

সরলভাবে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে যদি কেউ দেখা অর্থ জানা বলেন এবং সামনের মত পিছনে দেখা বলতে অতীতের মত ভবিষ্যত সম্পর্কে জানা বলেন তবে তা নিঃসন্দেহে মনগড়া অর্থ হবে।

হাদীসটি পাঠ করলে বা শুনলে যে কেউ অনুভব করবেন যে, বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টি ও দর্শনের বিষয়ে। মানুষ সামনে যেরূপ সামনের দিকে দেখতে পায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে সেভাবেই পিছনে দেখতে পেতেন। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, এই দর্শন ছিল সালাতের মধ্যে ও রূপুন সাজাদরা মধ্যে। অন্য সময়ে তিনি এইরূপ দেখতেন বলে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তা সত্ত্বেও যদি তা মনে করা হয় যে, তিনি সর্বদা এইরূপ সামনে ও পিছনে দেখতে পেতেন, তবুও এ হাদীস দ্বারা কখনোই বুঝা যায় না যে, তিনি দৃষ্টির আড়ালে, ঘরের মধ্যে, পর্দার অন্তরালে, মনের মধ্যে বা অনেক দূরের সর্বকিছু দেখতে পেতেন। তা সত্ত্বেও যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী না হতো, তবে আমরা এই হাদীস থেকে দাবি করতে পারতাম যে, তিনি এভাবে সর্বদা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখতেন এবং দেখছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন আয়াতে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টত ও দ্যর্থহীনভাবে বারংবার এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। মূলত মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়মত রাসূল (ﷺ)-কে এইরূপ বামেলা ও বিড়ম্বনাময় দায়িত্ব থেকে উর্ধ্বে রেখেছেন।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন:

ظاهر الحديث إن ذلك يختص بحالة الصلاة ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة

“হাদীসের বাহ্যিক বা স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, পিছন থেকে দেখতে পাওয়ার এ অবস্থাটি শুধুমাত্র সালাতের জন্য খাস। অর্থাৎ তিনি শুধু সালাতের মধ্যেই এইরূপ পিছন থেকে দেখতে পেতেন। এমনও হতে পারে যে, সর্বাবস্থাতেই তিনি এইরূপ দেখতে পেতেন।.... দাউদী^{১৭৬} নামক ব্যাখ্যাকার একটি উচ্চিত কথা বলেছেন। তিনি এ বর্ণনায় ‘পরে’ শব্দটির অর্থ

^{১৭৬} আবু জাফর আহমদ ইবনু সাইদ দাউদী নামক একজন আলিম সহীহ বুখারীর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। তাঁর পরিচয় বা ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহল বারী রচনায় এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি থেকে অনেক সময় উচ্চিতি প্রদান করেছেন।

‘মৃত্যুর পরে’ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উমাতের কর্ম তাঁর কাছে পেশ করা হবে। সম্ভবত তিনি আবু হুরাইরার (রা) হাদীসের সামগ্রিক অর্থ চিন্তা করেন নি, যেখানে এ কথার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে...।^{১৭৭}

এখানে লক্ষণীয় যে, দাউদীর যুগ বা হিজরী ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এরপ উত্তর ব্যাখ্যাকারীরাও ‘দেখা’ বলতে ‘উমাতের কর্ম তাঁর কাছে উপস্থিত করা হলে দেখেন’ বলে দাবি করতেন। তিনি নিজে মদীনায় থেকে সবত্র সবকিছু দেখতেন অথবা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত হয়ে সব কিছু দেখতেন বলে কেউ কল্পনা করে নি। কিন্তু যুগের আবর্তন, ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়, পার্শ্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ও অতিভিত্তির প্রাবনে পরবর্তী যুগে ‘ইলমুল গাইব’ বা ‘হায়ির-নায়ির’ দাবিদারগণ এখানে ‘তোমাদেরকে দেখতে পাই’ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, তিনি সদা সর্বদা সর্বস্থানে সর্বজনকে দেখতে পান। আমরা দেখছি যে, এই ব্যাখ্যাটি শুধু হাদীসটির বিকৃতিই নয়, উপরন্তু অগণিত আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী।

সর্বোপরি সামনে ও পিছনে ‘দেখা’ বা ‘গায়েবী দেখা’ দ্বারা ‘সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি’ বা সবকিছু দেখা প্রমাণিত হয় না। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, শয়তান ও তার দল মানুষদেরকে গায়েবীভাবে দেখে:

إِنَّهُ بِرَأْكُمْ هُوَ وَقِبِيلَةٌ مِّنْ حَيَّثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

“সে ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।”^{১৭৮}

এখানে কি কেউ দাবি করবেন যে, যেহেতু “তোমাদিগকে দেখে” (براكِم) বর্তমান কালের ক্রিয়া, সেহেতু শয়তান ও তার দলের প্রত্যেকে সদা সর্বদা সকল স্থানের সকল মানুষকে একই ভাবে দেখতে পাচ্ছে বা দেখেই চলেছে?!

চতুর্থ দলীল: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি) বলেন:

أَخْبَرَنَا أَبْنَى الْمَبَارِكُ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو،
حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْبَّبَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا تُعَرَّضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَمْتَه
غُذْوَةٌ وَعَشْيَةٌ، فَيُعْرَفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، فَلَذِكَ يَشَهِّدُ عَلَيْهِمْ،

“(প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী) আন্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন, আনসারী এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছেন, মিনহাল ইবনু আমর তাকে বলেন, তিনি (প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯০ হি)-কে বলতে শুনেছেন: প্রতি দিনই সকালে বিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তাঁর

^{১৭৭} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ১/৫১৫, ২/২২৫।

^{১৭৮} সূরা : ৭ আ'রাফ, ২৭ আয়াত।

উম্মাতকে পেশ করা হয়, ফলে তিনি তাদেরকে তাদের নামে ও কর্মে চিনতে পারেন। এজন্য তিনি তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।”^{১৭৯}

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্যকে ‘হায়ির-নায়ির’ মতবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্যটি তাঁর থেকে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কথাটি মিনহালের সূত্রে জেনেছেন বলে দরি করেছেন। হাদীসের সনদ বিচার সম্পর্কে নৃনতম জ্ঞানের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এক্ষেপ বর্ণনার কোনোরূপ নির্ভরযোগ্যতা নেই মুসলিম উম্মাহর মুহাদিসগণের নিকট।

(২) ৭ম হিজরী শতকে আল্লামা কুরতুবী ২য় শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সূত্রে বক্তব্যটি উদ্ভৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সুপরিচিত গ্রন্থসমূহে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অপরিচিত হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে লিপিকারণণ অনেক সংযোজন বিয়োজন করত। কাজেই বক্তব্যটি আদৌ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক কর্তৃক সংকলিত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া কষ্টকর।

(৩) সর্বাবস্থায় এ বক্তব্যটি তাবিয়ী সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা কোনো সাহাবীর বক্তব্য নয়।

(৪) ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, দশজনেরও অধিক সাহাবী থেকে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর ওফাতের পরে সাক্ষী বা হায়ির-নায়ির হয়ে উম্মাতের সকল কর্ম দেখান্তা করার বামেলা মহান আল্লাহ তাকে দেন নি। বরং তাদের অনেকের পরিবর্তন-উত্তোলন তিনি জানবেন না। এর পাশাপাশি কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় নি যে, উম্মাতের সকল কর্ম তাঁর নিকট পেশ করা হয়।

(৫) ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘হায়ির-নায়ির’ (সদা-সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান ও সবকিছুর দর্শক) নন; বরং তিনি রাওয়া মুবারাকার মধ্যে বিদ্যমান এবং উম্মাতের কর্ম তাঁর নিকট হায়ির করা হয়, তিনি উম্মাতের নিকট হায়ির (উপস্থিত) হন না।

^{১৭৯} কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ, আত-তায়কিরা ফী আহওয়ালিল মাউতা ও উম্রিল আখিরাহ, পৃ. ২৪৯; আল-জামিয় লি আহকামিল কুরআন ৫/১৯৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৫০০।

পঞ্চম দলীল: মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন:

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَذَّبْتُمْ^{১৪০}

“এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে।”^{১৪০}

এ আয়াত দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বত্র বিরাজমান। অথচ এ আয়াতের অর্থ খুবই স্পষ্ট। সুস্পষ্টতই এখানে সাহাবীদেরকে সমোধন করা হয়েছে। এ আয়াত ও আগের ও পরের আয়াতগুলি থেকে তা সুস্পষ্ট। সাহাবীগণও কখনো বুবেন নি যে, ‘তোমাদের মধ্যে রয়েছেন’ অর্থ প্রত্যেকের সাথে রয়েছেন বা সর্বত্র রয়েছেন।

ষষ্ঠ দলীল: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে কবরস্থ ব্যক্তিকে ফিরিশতাগণ তার প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশংসন করবেন। এ বিষয়ে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাকে তিনটি প্রশংসন করা হবে:

مَنْ رَبَّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيَّكَ

“তোমার প্রতিপালক কে? এবং তোমার দীন কী? এবং তোমার নবী কে?”^{১৪১}

এ হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তৃতীয় প্রশংসনের ভাষা হবে নিম্নরূপ:

مَا هَذَا الرَّجُلُ؟

“এই ব্যক্তি কে (তাঁর পদব্যর্থাদা কী)?”^{১৪২}

হাযির-নাযির মতের অনুসারিগণ দাবি করেন যে, এখানে ‘হায়া’ (اَه) বা ‘এই’ (this) বলা হয়েছে, আর নিকটবর্তী কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করতেই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রশংসনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকটেই থাকবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান ও সব কিছুর দর্শক, অর্থাৎ হাযির-নাযির!

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, তাঁদের এ দাবিটি প্রমাণ করে যে, তাঁরা কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যবহার বিধির সাথে ভালভাবে পরিচিত নন, অথবা এ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান গোপন করতে চান। ‘হায়া’ বা ‘এই’ শব্দটি কেবলমাত্র দৈহিকভাবে

^{১৪০} সূরা (৪৯) হজুরাত: ৭ আয়াত।

^{১৪১} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২৯৫। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{১৪২} আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৯; ইবনু মাজাহ ২/১৪২৬।

নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করতেই ব্যবহার করা হয় না, উপরন্তু মানসিকভাবে নিকটবর্তী বা দৈহিক ও মানসিকভাবে দূরবর্তীর প্রতি ইঙ্গিতের জন্যও ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনো উদাহরণ না দিয়ে অবিকল এই বাক্যটিই বুখারী ও অন্যান্য মুহাম্মদ সংকলিত অন্য হাদীস থেকে উদ্ভৃত করছি। আমর ইবনু সালামা (রা) মরবাসী আরব গোত্রের মানুষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচার শুরু করলে এ খবর তাদের কানেও পৌছায়। তারা সেই দূর মরগ্রান্টের বসেই তাঁর বিষয়ে বিভিন্ন কাফেলার মানুষদেরকে প্রশ্ন করতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন,

كُنَّا بِمَاءِ مَفَرَّ رِئَاسٍ وَكَانَ يَمْرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسَّالُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا
لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ يَزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أُوْحَى إِلَيْهِ
لِلنَّاسِ

“আমরা মানুষের যাতায়াতের পথে এক জলাধারের পাশে বসবাস করতাম। আমাদের নিকট দিয়ে কাফেলাগুলি অতিক্রম করত। আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতাম: মানুষদের খবর কি? মানুষদের খবর কি? “এই ব্যক্তি কে (তাঁর পদমর্যাদা কী)?” তারা বলত, তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ তাঁকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন...”^{১৮৩}

এখানে আমরা দেখছি যে, সুদূর মঙ্গায় অবস্থিত মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ‘হায়া’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই শুধু ‘হায়া’ শব্দের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দিয়ে এরূপ একটি ধর্ম বিশ্বাস তৈরি করার প্রক্রিয়া সঠিক নয়।

ঢিতীয়ত, যদি এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকটবর্তী হবেন তবুও এদ্বারা কোনোভাবেই ‘হায়ির-নায়ির’-এর তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় না। পারলৌকিক জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জগৎটি সম্পূর্ণভাবেই এ পার্থিব জীবন ও জগত থেকে ভিন্ন। সে জগতের দর্শন, নৈকট্য ইত্যাদি এ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্ববর্তী যুগের মুহাম্মদিসগণ এরূপ দর্শন বা নৈকট্যের অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু মৃতকে প্রশ্নের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দর্শন করা বা নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা সদা-সর্বদা তিনি মৃতদের নিকট উপস্থিত বা সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবি করার মত কল্পনা কারো মনে উদয় হয়েছে বলে জানা যায় না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ মত যারা পোষণ করেছেন, তাঁরা তাঁদের কথাগুলির পক্ষে একটিও দ্যৰ্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করছেন না।

^{১৮৩} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৫৬৪।

তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক বা দ্যৰ্থবোধক কিছু আয়াত বা হাদীসকে ঘনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর একে ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে তাঁরা অগণিত আয়াত ও সহীহ হাদীস বাতিল করে দেন। যারা একে ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান তাঁদের অনেকের নেক নিয়্যাত ও ভক্তি-ভালবাসার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা তাল উদ্দেশ্যে ওহীর নামে মিথ্যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে এমন কথা বলেছেন যা তিনি কখনোই নিজের বিষয়ে বলেন নি। সর্বোপরি তারা এমন কিছু কথা দাবি করছেন যেগুলিকে সঠিক প্রমাণ করতে শুধু কুরআন ও হাদীসের অগণিত শিক্ষাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমগ্র জীবনের সকল ঘটনারই বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ সর্বপ্রকারের ইলমুল গাইবের অধিকারী হলে এবং সদাসর্বদা সবত্র বিরাজমান হলে নুরুওয়াত, ইসরার, মিরাজ, হিজরত, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি সবই অর্থহীন হয়ে যায়।

কুরআন-সুন্নাহ, সাহারীগনের পদ্ধতি ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির ভিত্তিতে মুমিনের দায়িত্ব হলো এ বিষয়ে ওহীর সকল নির্দেশনা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা। মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদির অনেক কিছু জানিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে, বরং অন্য সকল নবী-রাসূলের জ্ঞানের উর্ধ্বে অনেক জ্ঞান তাঁকে আল্লাহ দান করেন। আমরা আগেই দেখেছি তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তাঁর আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে বলে প্রতিটি মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তবে আল্লাহর জ্ঞানান্তর জ্ঞানের বাইরে কোনো গাইবী ইলম তাঁর ছিল না। তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাকে কতটুকু জানিয়েছেন তা নিয়ে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের অতিরিক্ত কোনো কল্পনা বা ব্যাখ্যা মুমিন করতে চান না। যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে, তাই আমরা এভাবেই বিশ্বাস করব, এর বাইরে কিছু বাড়িয়ে কিছু বলব না আমরা, কারণ তাতে আমরা বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তির মধ্যে নিপত্তি হব, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন। কুরআন ও হাদীসে যে শব্দ, বাক্য বা বিশেষণ ব্যবহার করা হয় নি বা সাহারীগণ যে কথা তাঁর বিষয়ে বলেন নি সেগুলি না বললে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা, পথ ও আদর্শের ব্যতিক্রমের অপরাধে অপরাধী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. ২. ১২. ৪. তাঁর ওফাত বিষয়ক বিতর্ক

কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মহান
আল্লাহ বলেন:

إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ

“তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল”^{১৮৪}

তিনি আরো বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِّلَ اقْتُلْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَىٰ عَيْنِهِ فَلَنْ يَصْرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

“মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছে। সুতরাং
যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং
কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং
আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।”^{১৮৫}

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدٌ أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

“আমি তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব বা অনন্ত জীবন প্রদান
করি নি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কী চিরজীবী হয়ে থাকবে?”^{১৮৬}

কুরআনে অনেক আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহীদগণ মৃত
নন, তারা জীবিত ও রিয়্ক প্রাণ্ড হন। নবীগণের বিষয়ে কুরআন কারীমে
কিছু না বলা হলেও সহীহ হাদীসে তাঁদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলা
হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْأَنْبِيَاءُ أَخْيَاءُ فِي قُبُوزِهِمْ يُصَلَّوْنَ

“নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত, তাঁরা সালাত আদায়
করেন।” হাদীসটির সনদ সহীহ।^{১৮৭}

অন্য একটি যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُنْرِكُونَ فِي قُبُوزِهِمْ بَعْدَ أَرْبِيعِينَ لَيْتَهُ

^{১৮৪} সূরা (৩৯) যুমার: ৩০ আয়াত।

^{১৮৫} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৪৪ আয়াত।

^{১৮৬} সূরা (২১) আমিয়া: ৩৪ আয়াত।

^{১৮৭} আবু ইয়ালা আল-যাউসিলী, আল-মুসনাদ ৬/১৪৭; বাইহাকী, হাইয়াতুল আমিয়া, পৃ.
৬৯-৭৪; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৮/২১১।

ولكهم يُصَلُّونَ بَيْنِ يَدِيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْفَخَ فِي الصُّورِ

“নবীগণকে ৪০ রাতের পরে তাঁদের কবরের মধ্যে রাখা হয় না; কিন্তু তারা মহান আল্লাহর সম্মুখে সালাতে রত থাকেন; শিংগায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত।”

হাদীসটির বর্ণনাকারী আহমদ ইবনু আলী আল-হাসনবী মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে পরিচিত। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস একে মাউফ বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস এই অর্থের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে একে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।^{১৮৮}

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাত্রিতে মূসা (আ)-কে নিজ কবরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং ঈসা (আ)-কেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। আল্লামা বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এই দর্শনকে উপরের হাদীসের সমর্থনকারী বলে গণ্য করেছেন।^{১৮৯}

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোনো কোনো পূর্ববর্তী নবীকে হজ্জ পালনরত অবস্থায় দেখেছেন। এ সকল হাদীসকেও কোনো কোনো আলিম নবীগণের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নির্দর্শন বলে গণ্য করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এই দর্শনের বিষয়ে কাফী ইয়ায বলেন, এই দর্শনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, নবীগণ শহীদগণের চেয়েও মর্যাদাবান। কাজেই নবীগণের জন্য ইত্তিকালের পরেও এইরূপ ইবাদতের সুযোগ পাওয়া দূরবর্তী কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, তাঁরা জীবিত অবস্থায় যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার সূরাত দেখানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে তাকে তিনি দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন।^{১৯০}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওফাত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسْلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحِيْ حَتَّى أَرْدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ

“যখনই কোনো মানুষ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের প্রতিউত্তর দিতে পারি।”^{১৯১}

^{১৮৮} দাইলামী, আল-ফিরদাউস ১/২২২; ৩/৩৫; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/৪৮৭; সুযৃতী, আল-লাআলী ১/২৮৫; আলবানী, যায়ফুল জামি, পৃ. ২০৫।

^{১৮৯} বাইহাকী, হায়াতুল আবিয়া, পৃ. ৭৭-৮৫।

^{১৯০} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/৪৮৭।

^{১৯১} আবু দাউদ, আস-সুনান ২/২১৮। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

অন্য হাদীসে আবু হৱাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ صَلَى عَلَيْهِ عَنْ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَى عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ أَعْلَمْتُهُ

“কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করলে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয়।”^{১৯২}

হাদীসটির একটি সনদ খুবই দুর্বল হলেও অন্য আরেকটি গ্রহণযোগ্য সনদের কারণে ইবনু হাজার, সাখাবী, সুযৃতী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।^{১৯৩}

আউস (ক্ষেত্র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ... فَأَكْثِرُوا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ صَلَاتُكُمْ مَغْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَعْرَضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْمَتَ أَيْنِي بِيَوْلُونَ قَذْ بَكْبَتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَذْ حَرَمٌ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَكُلَّ أَجْسَادُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

“তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।” সাহাবীগণ বলেন : “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, যিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: “মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।”^{১৯৪}

আরো অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিন বিশ্বের যেখানে থেকেই দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন, ফিরিশতাগণ সেই সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওয়া মুবারাকায় পৌছিয়ে দেবেন।

উপরের হাদীসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইষ্টে কালের পরে তাঁকে এক প্রকারের জীবন দান করা হয়েছে। এই জীবন বারযাক্তী জীবন, যা একটি বিশেষ সম্মান ও গায়েবী জগতের একটি অবস্থা।

^{১৯২} বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া ১০৩-১০৫ পৃ. সাখাবী, আল-কাউলুল বাদী ১৫৪ পৃ।

^{১৯৩} সুযৃতী, আল-সালালী ১/২৮৩; ইবনু ইরাক, তানয়ীহ ১/৩০৫; দরবেশ হৃত, আসনাল মাতালিব, পৃ. ২১৬; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ২/৪১০; আলবানী, যায়িকুল জামি, পৃ. ৮১৭, যায়িকাহ ১/৩৬৬-৩৬৯।

^{১৯৪} নাসাই, আস-সুনান ৩/৯১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৪৫, ৫২৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ১/২৭৫, ২/৮৮।

এ বিষয়ে হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই বলতে হবে। হাদীসের আলোকে আমরা বলব, এই অপার্থিব ও অলৌকিক জীবনে তাঁর সালাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। কেউ সালাম দিলে আল্লাহ তাঁর রহ মুবারাককে ফিরিয়ে দেন সালামের জবাব দেওয়ার জন্য। রাওয়ার পাশে কেউ দর্দন বা সালাত পাঠ করলে তিনি তা শনেন, আর দূর থেকে পাঠ করলে তা তাঁর নিকট পৌছানো হয়। এর বেশি কিছুই বলা যাবে না। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে যে, উম্মাতের জানার প্রয়োজন নেই বলেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকি বিষয়গুলি বলেন নি।

কিন্তু বর্তমান যুগে কেউ কেউ এ বিষয়ে ওহীর অতিরিক্ত কথা বলেন, এবং সেগুলিকে ‘আকীদা’ বা বিশ্বাসের অংশ বলে গণ্য করেন। এরপ বিষয়গুলির অন্যতম হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও নবীগণের ইতিকাল পরবর্তী এই বারযাবী জীবনকে পার্থিব বা জাগতিক জীবনের প্রতই মনে করা। এ বিষয়ে তাঁরা যা কিছু বলেন সবই ওহীর বজ্বের ব্যাখ্যা বা যুক্তি মাত্র, এবং তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ও যুক্তি সাহাবীগণের মতামত ও কর্মধারার বিপরীত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইতিকালের পরের ঘটনাগুলি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগুলিতে পাঠ করলেই আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কখনোই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেন নি। খলীফা নির্বাচনের বিষয়, গোসলের বিষয়, দাফনের বিষয়, পরবর্তী সকল ঘটনার মধ্যেই আমরা তা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবদ্ধশায় তাঁর পরামর্শ, দোয়া ও অনুমতি ছাড়া তাঁরা কিছুই করতেন না। কিন্তু তাঁর ইতিকালের পরে কখনো কোনো সাহাবী তাঁর রাওয়ায় দোয়া, পরামর্শ বা অনুমতি গ্রহণের জন্য আসেন নি। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওয়া মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া-পরামর্শ চাননি।

আবু বকরের (রা) খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপত্তি হয় মুসলিম উম্মাহ। একদিকে বাইরের শক্তি, অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভঙ নবী। মুসলিম উম্মাহর অস্তি ত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর (রা) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওয়ায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রাওয়া শরীকে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন ক্যাটিয়েছেন আলী (রা)। অর্থ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওয়ায়

যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি বা আল্লাহর কাছে দোয়ার জন্য রাওয়া শরীফে কোনো অনুষ্ঠান করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে ফাতিমা, আলী ও আবুরাস (রা) খলীফা আবু বাক্র (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার চেয়েছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক ঘতভেদ ও মনোমালিন্য হয়েছে। উস্মাল মুমিনীন আয়েশার (রা) সাথে আমীরুল্লাহ মুমিনীন আলীর (রা) কঠিন যুদ্ধ হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। এসকল যুদ্ধে অনেক সাহাবী সহ অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছেন। কিন্তু এসকল কঠিন সময়ে তাঁদের কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে পরামর্শ চান নি। তিনি নিজেও কখনো এসকল কঠিন মুহূর্তে তাঁর কন্যা, জামাতা, চাচা, খলীফা কাউকে কোনো পরামর্শ দেন নি। এমনকি কারো কাছে রহনীভাবেও প্রকাশিত হয়ে কিছু বলেন নি। আরো লক্ষণীয় যে, প্রথম শতাব্দীগুলির জালিয়াতগণ এ সকল মহান সাহাবীর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে, কিন্তু কোনো জালিয়াতও প্রচার করে নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তিকালের পরে রাওয়া শরীফ থেকে বা সাহাবীগণের মাজলিসে এসে অযুক সাহাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।^{১৯৫}

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন্দশায় সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিকট দু'আ চাইতেন। কুরআন বা হাদীসে কোথাও ঘুনক্ষণেও নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, তোমরা বিপদে পড়লে রাওয়া শরীফে যেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দু'আ চাইবে। সাহাবীগণও কখনো এরূপ করেন নি।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন

وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا

“যদি তারা পাপে লিঙ্গ হওয়ার পরে আপনার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাঁদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে তারা আল্লাহকে তাওবা করুকারী করুণাময় হিসাবে পেত।”^{১৯৬}

এখানে পাপী মুমিনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করতে। সাহাবীগণ তাঁর জীবন্দশায় এরূপ করতেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের পরে একটি ঘটনাতে একজন সাহাবীও তাঁর রাওয়ায় যেয়ে বলেন নি যে, হে আল্লাহর রাসূল আমি

^{১৯৫} দরবেশ হৃত, আসন্নাল মাতালিব, পৃ. ২৯৮-২৯৯।

^{১৯৬} সূরা নিসা : ৬৪।

পাপ করেছি, তাওবা করছি আপনি আমার জন্য ক্ষমা চান। সাহাবীগণের যুগের অনেক পরে কোনো কোনো মানুষের মধ্যে একুশ কর্ম প্রকাশ পেয়েছে।^{১১৭} এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত পরবর্তী জীবনকে কখনোই সাহাবীগণ জাগতিক জীবনের মত মনে করেন নি।

৩. ২. ১২. ৫. তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক

উপরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে সাধারণভাবে এবং মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বিশেষভাবে অনেক র্যাদা, অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিয়া দান করেছেন। পরবর্তী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এবং বিশেষত শিরক-কুফর বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, নবী-রাসূলগণের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিয়াকে ‘ক্ষমতা’ ও অধিকার ধারণা করে পূর্ববর্তী উম্মাতের মানুষেরা শিরকে নিপত্তি হয়। এ জন্য কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে মুজিয়া, শাফা‘আত বা অন্য কোনো কিছুই নবী-রাসূলগণের ইচ্ছাধীন বা ক্ষমতাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাধীন। বিশ্ব পরিচালনা বা কারো মঙ্গল অঙ্গলের ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে দেন নি। এ বিষয়ে অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لَا أَمْلَكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরেও আমার কোনো অধিকার নেই।”^{১১৮}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لَا أَمْلَكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করে তা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই।”^{১১৯}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلَكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشْدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ
وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرَسَالاتِهِ

“বল, আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা বা মালিকানা আমার নেই। বল: আল্লাহ থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পরবে না এবং

^{১১৭} বিস্তারিত দেখুন, খোদ্দকার আব্দুল্লাহ জাহান্সীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৩০৭-৩০৯।

^{১১৮} সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১০) ইউনুস: ৪৯ আয়াত।

^{১১৯} সূরা (১০) ইউনুস: ৪৯ আয়াত।

আল্লাহ ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না, কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার (আমাকে রক্ষা করবে)।”^{২০০}

কুরআন ও হাদীসে বারংবার ঘ্যথহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি ছাড়া আর কেউই কোনো মানুষকে বিপদ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এর বিপরীতে কখনোই কোনোভাবে কুরআন ও হাদীসে একটি স্থানেও বলা হয় নি যে, রাসূলল্লাহ ﷺ বা অন্য কোনো নবী বা ওলী কোনোভাবে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে এরূপ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এ অর্থের আয়াত ও হাদীস অনেক। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَنْ يُنْجِيْكُمْ مِنْ ظُلُّمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضْرِيْغًا وَخَفْيَةً لَنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ يُنْجِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ

“বল, কে তোমাদের আগ করে স্থলভাগের এবং সমুদ্রের অঙ্ককার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তার নিকট অনুনয় কর: ‘আমাদেরকে এ থেকে আগ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হব?’ বল, ‘আল্লাহই তোমারদেকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ থেকে আগ করেন। এতদসম্মতেও তোমরা তার শরীক কর।’”^{২০১}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلْفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

“তিনিই আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীত (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে কি কোনো ইলাহ আছে? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই প্রহণ করে থাক।”^{২০২}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

^{২০০} সূরা (৭২) জিন্ন: ২১-২২ আয়াত।

^{২০১} সূরা (৬) আন‘আম: ৬৩-৬৪ আয়াত।

^{২০২} সূরা (২৭) নামল: ৬২ আয়াত।

“আল্লাহ তোমাকে বিপদ-কষ্ট দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।”^{২০৩}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِبَصْرٍ فَلَا كَافِشَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَأْدٌ لِفَضْلِهِ

“এবং আল্লাহ তোমাকে বিপদ-আপদ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মজ্জল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।”^{২০৪}

এরূপ বহুসংখ্যক সুস্পষ্ট ও দ্যুর্থহীন আয়াতের বিপরীতে একটি আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন নি যে, আমি বিপদ আনের বা কষ্টদুঃখ দূর করার দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতা মুহাম্মাদ (ﷺ) বা অন্য কোনো নবী, নবী বংশের ইমাম বা কোনো ওলীকে প্রদান করেছি। উপর্যুক্ত বারংবার বলা হয়েছে যে, এরূপ কোনো অধিকার, সুযোগ বা ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে কখনোই প্রদান করেন নি। উপরে উল্লিখিত অনেক আয়াত ও হাদীসে তা আমরা দেখেছি।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণের এবং বিশেষত মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দু'আ করুল করতেন। তবে দু'আ করুল করা বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহর একত্তিয়ারে। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। তার অনেক দোয়া আল্লাহ করুল করেছেন। আবার কখনো কখনো করুল করেন নি। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের শেষ রাকাতের রুকু থেকে ওঠার পরে কতিপয় কাফিরের জন্য বদদোয়া করে বলতেন: হে আল্লাহ, আপনি অমুক, অমুককে লানত করুন। তখন আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন^{২০৫}:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

“এ বিষয়ে আপনার কোনো অধিকার নেই, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাদেরকে শান্তি দিবেন, কারণ তারা জালিম।”^{২০৬}

^{২০৩} সূরা (৬) আন'আম: ১৭ আয়াত।

^{২০৪} সূরা (১০) ইউনুস: ১০৭ আয়াত।

^{২০৫} সূরা (৩) আল ইমরান: ১২৮ আয়াত।

^{২০৬} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৪৯৩, ১৬৬১, ৫/২৩৪৮, ৬/২৬৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ

কুরআনে আল্লাহ বারবার জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম হারীব ও খলীল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষের হিসাব, শাস্তি, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির ঝামেলায় ফেলেন নি। এগুলি সবই মহান আল্লাহর একক দয়িত্ব। মহান আল্লাহ যদি অপারগ হতেন বা তাঁর কারো সহযোগিতার প্রয়োজন হতো তবে অবশ্যই তিনি সর্বাত্মে সর্বোচ্চ সহযোগিতা গ্রহণ করতেন তাঁর প্রিয়তম রাসূল থেকে। কিন্তু তিনি যেহেতু কারো সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, সেহেতু তিনি তাঁর প্রিয়তমকে এ সকল বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেন নি।

وَإِنْ مَا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنْوَفِينَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

“তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিক্রিতি প্রদান করি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা (তার পূর্বেই) তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দিই, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।”^{২০৭}

তাঁর দু’আয় আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে মাফ করেছেন। তাঁর শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তবে তাঁর দু’আ ও শাফায়াত করুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর রাসূলের দু’আর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ বলেছেন:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ سَتَغْفِرْ لَهُمْ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা। আপনি সত্ত্বে বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।”^{২০৮}

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন: “তোমার নিকট আতীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও”^{২০৯} তখন তিনি তাঁর নিকট আরীয়দের একত্রিত করে বলেন:

**يَا مَعْشِرَ قُرَيْشٍ ... اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي
عَبْدٍ مَنَافٍ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبْيَاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَغْنِي**

১/৪৬৬-৪৬৭, ৩/১৪১৭; তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান ৪/৮৬-৮৯; ইবনু হাজার, তত্ত্ব বারী ৭/৩৬৫, ১১/১৯৩, ১৩/৩১২।

^{২০৭} সূরা (১৩) রাদ: ৪০ আয়াত।

^{২০৮} সূরা (৯) তাওবা: ৮০ আয়াত।

^{২০৯} সূরা (২৬) শু’আরা: ২১৪ আয়াত।

عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيفَةً عَمَّا رَسُولُ اللَّهِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“হে কুরাইশ বংশের লোকেরা, তোমরা (নিজের ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে ক্রয় কর; আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না। হে আবদ মানাফ গোত্রের মানুষেরা, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না। হে আবাস ইবনু আব্দুল মুজালিব, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়া, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমার কোনোই উপকারে আসব না।”^{২১০}

আবু হুরাইরা (রা) বলেন,

فَامْ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَذَرَ الْغَلُولَ فَعَظِمَةً وَعَظِيمَةً أَمْرَةً قَالَ لَا أَفْيَنَ أَحْدَكُمْ بِوَمْ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَبِّبِهِ شَاءَ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَبِّبِهِ فَرَسَنَ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَغْثِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَبِّبِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَبِّبِهِ صَامَتْ
فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَبِّبِهِ
رِقَاعٌ تَخْفَقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْثِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلَكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

‘নবী’ (ﷺ) আমাদের মধ্যে দণ্ডয়মান হয়ে যাকাত বা সরকারী সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করার বা মালিকানায় নেওয়ার বিষয়ে কথা বললেন। তিনি এর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন এমন না পাই যে, তার কাঁধে একটি চিংকার রত মেষ অথবা ঘোড়া রয়েছে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব: তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম। অথবা তার কাঁধে চিংকার রত উট থাকবে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম। অথবা তার কাঁধে নীরব (জড়) সম্পদ থাকবে এবং সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো

^{২১০} বুখারী, আস-সহীহ ১/১৯২, ৪/১৭৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৯২; ইবনু হাজার, ফাতহ্ল বারী ৫/৩৮৩, ৬/৫৫১, ৮/৫০১।

কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম।”^{১১১}

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মুনাফিক মুসলমানদের খুব কষ্ট দিত। তখন আবু বাকর (রা) বলেন, চল, আমরা এ মুনাফিক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আবেদন করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّهُ لَا يُسْتَعْثِبُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَعْثِبُ بِاللَّهِ

“আমার কাছে আণ প্রার্থনা করতে হয় না, একমাত্র আল্লাহর কাছেই আণ প্রার্থনা করতে হয়।”^{১১২}

এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণ এখানে উদ্ধার প্রার্থনা বলতে জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের কথার স্বাভাবিক অর্থ, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করি, বা তাঁকে অনুরোধ করি, এ মুনাফিকের শাস্তির ব্যবস্থা করে আমাদেরকে এর অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। এরপ জাগতিক সাহায্য, সহযোগিতা বা আণ প্রার্থনার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শেখালেন যে, সকল বিষয়েই একমাত্র আল্লাহর কাছেই আণ প্রার্থনা করতে হয়।

মুসলিম উমাহর অবনতির দিনগুলিতে কোনো কোনো আলিম এ সকল আয়াত ও হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। বিষয়টিকে তাঁরা মুমিনের ঈমানের অংশ বানিয়ে নেন। এরপ দাবির ভিত্তিতে তারা দাবি করেন যে, বিপদে আপদে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় এবং তিনি যাকে ইচ্ছা অলোকিকভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সাথে সাংঘর্ষিক এ মতটির পক্ষে তারা কোনোরূপ সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসকে তাঁদের মতের দলিল হিসেবে পেশ করেন নি। বরং দ্ব্যর্থবোধক কিছু কথার তাঁরা বিশেষ একটি অর্থ গ্রহণ করেন এবং সেই ‘অর্থ’-কে ভিত্তি করে দ্ব্যর্থহীন অগণিত আয়াত ও হাদীসকে বাতিল করে দেন। তাঁদের এ জাতীয় দলিলের দু একটি নমুনা উল্লেখ করছি।

^{১১১} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১১৮, ৩/১৩৯৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৬১।

^{১১২} হাইসামী, যাজ্ঞমাট্য যাওয়াইদ ৮/৪০, ১০/১৫৯। হাইসামী হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসের সনদের সকল রাবী বুখারী-মুসলিমের রাবী, কেবলমাত্র ইবনু লাহিয়াহ বাদে, আর ইবনু লাহিয়াহের হাদীস হাসান। ইবনু লাহিয়াহের বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাম্মদসংগ্রহের মতভেদ আছে।

প্রথম দঙ্গীল: মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“নিশ্চয় আমি আপনাকে রাসূল বানিয়েছি কেবলমাত্র সমস্ত সৃষ্টি জগতের রহমত-স্বরূপ।”^{২১৩}

এখানে আল্লাহ স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাত বা তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠানো সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাঁর অনুসরণই আল্লাহর রহমত লাভের একমাত্র পথ। কিন্তু এ আয়াতের অর্থে তারা বলেন, বিশ্বজগতের রহমত তার অধিকারে রাখা হয়েছে। কাজেই রহমত বটনের ক্ষমতা ও অধিকার তাঁরই। আরবী ভাষা, নাহউ ও ‘তারকীব’ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এরূপ ব্যাখ্যা আয়াতটির অর্থ বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয় দঙ্গীল: ইমাম বুখারী (রাহ) বলেন^{২১৪}:

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَةُ وَلَلَّهِ رَسُولُ), يَعْنِي لِلنَّبِيِّ قَسْمَ
ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُغْنِي.

মহান আল্লাহর বাণী “(যুক্তে যা তোমরা গন্তব্য কর) তার একপঞ্চমাংশ আল্লাহর এবং রাসূলের) এ বিষয়ক অধ্যায়। অর্থাৎ এই একপঞ্চমাংশ সম্পদ বটন করার দায়িত্ব রাসূলের। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি বটনকারী ও খাজাপ্তি এবং আল্লাহই প্রদান করেন।”

ইমাম বুখারী এ অধ্যায়ে নিম্নের হাদীসগুলি উল্লেখ করেন:

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একজন আনসারী সাহাবীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তার নাম ‘মুহাম্মাদ’ রাখতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন:

سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْتِي فَإِنَّمَا إِنَّمَا جَعَلْتُ قَاسِمًا (فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ)
أَقْسَمُ بِيَنْتَكُمْ

তোমরা আমার নামে রাখবে, তবে আমার কুনিয়াতে (আবুল কাসিম) কুনিয়ত রাখবে না; কারণ আমাকে কাসিম অর্থাৎ বটনকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বটনকারী মাত্র) তোমাদের মধ্যে বটন করি।^{২১৫}

^{২১৩} সূরা (২১) আনবিয়া: ১০৭ আয়াত।

^{২১৪} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৩।

^{২১৫} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৩-১১৩৪ ৫/২২৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮-২-

(২) মু'আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَقْعِدُهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُغْطِيٌ وَإِنَّا الْفَاسِدُ (وَإِنَّمَا أَنَا فَاسِدٌ وَاللَّهُ يُغْطِيٌ) .
أَنَا فَاسِدٌ وَيَعْطِيَ اللَّهُ (وَإِنَّمَا أَنَا فَاسِدٌ وَاللَّهُ يُغْطِيٌ) .

“আল্লাহহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বিষয়ে প্রজ্ঞা (ফিক্হ) প্রদান করেন। আর আল্লাহই প্রদান করেন আর আমি বট্টনকারী (দ্বিতীয় তুর্ণনায়: আমি তো বট্টনকারী মাত্র প্রদান করেন আল্লাহহ)”^{২১৬}

(৩) আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا أَعْطَيْتُكُمْ وَلَا أَمْتَحِنُكُمْ إِنِّي أَنَا فَاسِدٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

“আমি তোমাদের প্রদানও করি না, তোমাদের প্রদান করা বঙ্গও আমি করি না। আমি তো বট্টনকারী মাত্র, যেখানে আমাকে আদেশ করা হয় সেখানেই আমি প্রদান করি।”^{২১৭}

(৪) খাওলা আনসারিয়াহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“কিছু মানুষ আল্লাহর সম্পদ স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে অন্যায় খাতে খরচ করে, তদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিন জাহানাম।”^{২১৮}

এ সকল হাদীসের অর্থ সূর্যের আলোর মতই পরিষ্কার। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধলুক বা যাকাতের যে সকল সম্পদ বট্টন করা দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করা হয় সেগুলি বট্টনের বিষয়ে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কিছুই করতেন না। নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহে তিনি কাউকে কিছু দিতেন না, বরং আল্লাহর বিধান অনুসারেই তা বট্টন করতেন।

এ বট্টনের সাথে গাইবী সাহায্য, রহমত বা অলৌকিক কিছু বট্টনের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ মতের অনুসারীরা এ হাদীসের একটি ব্যাক্য (আমি বট্টনকারী) উল্লেখ করে দাবি করেন যে, তিনি বট্টনকারী অর্থ আল্লাহর রহমত বা অলৌকিক সাহায্য বট্টন করার দায়িত্ব তাঁর।

নিঃসন্দেহে তাদের এ ব্যাখ্যা পদ্ধতি হ্বহু খৃস্টানগণের পদ্ধতির মতই। এভাবে তাঁরা একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে সম্পূর্ণ মনগড়া বিকৃত অর্থ

১৬৮৩।

^{২১৬} বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৯, ৩/১১৩৪, ৬/২৬৬৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭১৯।

^{২১৭} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৪।

^{২১৮} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৩৫।

করে তার ভিত্তিতে অগণিত দ্ব্যৰ্থহীন আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন উপ্তট ও অবাস্ত ব ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন।

তৃতীয় দলীল: আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي أُتَبِعُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضَعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُذْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَمْ تَلْعَنُونَهَا أَوْ تَرْغَبُونَهَا

“আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমি দেখলাম যে, আমাকে পৃথিবীর ভাগ্নারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হলো এবং তা আমার সামনে রাখা হলো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গিয়েছেন এখন তোমরা সে ভাগ্নারগুলি পরিত্তির সাথে ভোগ করছ।”^{১১৯}

এখানে খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর ভাগ্নারের চাবি বলতে পৃথিবীর ধনসম্পদ তার উন্মাতের নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে বুঝানো হয়েছে। সাহাবী আবু হুরাইরা (রা) তাই বুঝেছেন। এজন্য তিনি বলছেন যে, পৃথিবীর ভাগ্নারগুলি এখন তোমরা ভক্ষণ করছ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَّتْ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فِرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا يُنْظَرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُغْطِي بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ: مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَفَسُّوا فِيهَا

‘নবী’ (ﷺ) একদিন বের হয়ে উহদের উপর জানায়ার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিষ্বারের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আর আমি আমার হাউয এখন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ভাগ্নারসমূহের চাবিগুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে, অন্য বর্ণনায়: আমাকে পৃথিবী ও আসমানের ভাগ্নারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা সেগুলি (ভাগ্নারগুলি) নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।’^{১২০}

^{১১৯} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৪।

^{১২০} বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৫১, ৮/১৪৯৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৫; ইবনু

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, তাঁর উম্মাত তাঁকে দেওয়া পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভাগারগুলির চাবি বা ভাগারগুলি নিয়ে অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বলে তিনি ভয় পান। এভাবে আমরা দেখি যে, ‘পৃথিবীর ভাগারসমূহ বা পৃথিব ও আসমানের ভাগারসমূহ বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, কোনো গাইবী ক্ষমতার ভাগার বুঝানো হয় নি। কারণ গাইবী ক্ষমতার ভাগার নিয়ে উম্মাত প্রতিযোগিতা করে না এবং এরপ প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকলে তা শিরকের মত কোনো খারাপ বা ভয়ের কারণ না।

আবু মুহাইহিবা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন,

يَا أَبَا مُؤْيِّبَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِّيْ أَنْ يُوْتِينِيْ خَزَانَ الْأَرْضِ وَالْخَلَدُ فِيهَا ثُمَّ
الْجَنَّةُ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّيِّ، فَقَلَّتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْيَ فَخَذْ مَفَاتِنِحَ خَزَانَ هَذِهِ الْأَرْضِ
وَالْخَلَدُ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةُ. قَالَ: كَلَّا، يَا أَبَا مُؤْيِّبَةٍ لَقَدْ اخْتَرْتَ لِقَاءَ رَبِّيِّ عَزَّ وَجَلَّ

“আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, দুটি বিষয়ের একটি আমি বেছে নেব: (১) পৃথিবীর ভাগারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত, অথবা (২) আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত এবং জান্নাত। তখন আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন! তাহলে আপনি পৃথিবীর ভাগারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত বেছে নিন। তিনি বলেন, কখনোই না! আবু মুহাইহিবা, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত বেছে নিয়েছি।”^{২২১}

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ زَوِيْ لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أَمْيَ سَيِّلَغُ
مُلْكُهَا مَا زُوِيْ لِي مِنْهَا وَأَعْطَيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ

“মহান আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন এবং আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমগুলি দেখতে পাই, আর আমার জন্য যতটুকু সংকুচিত করা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌছাবে। আর আমাকে লাল ও সাদা উভয় ধনভাগার প্রদান করা হয়েছে।”^{২২২}

এভাবে কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পৃথিবীর

হিক্বান, আস-সহীহ ৭/৪৭৪।

^{২২১} হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৫৭। হাদীসটি সহীহ।

^{২২২} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২১৫।

বা পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি প্রদান করা হয়েছিল। সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ স্বভাবতই ‘ভাণ্ডারসমূহের চাবি’ বলতে ‘ধন-সম্পদের অধিকার’ বুঝিয়েছেন যা তাঁর উচ্চাত তাঁর ওফাতের পরে লাভ করে। কিন্তু গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ কেউ কেউ এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁকে মহান আল্লাহর সকল গাঁথী ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, উপরে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: “বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই...।” এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ‘আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের চাবি’ প্রদান করা হয়েছে। বরং এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাঁকে ‘পৃথিবীর বা পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি’ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এ সকল হাদীসকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যুর্থহীন আয়াতগুলির বিপরীতে দাঁড় করানোর কোনোরূপ সুযোগ নেই। ওহীতে যতটুকু বলা হয়েছে আমরা ততটুকুই বলব। কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, ‘আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নয়।’ আর উপরের হাদীসগুলির নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, ‘পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁকে প্রদান করা হয়, যেগুলি পরবর্তীতে তাঁর উচ্চাত ভোগ ও ভক্ষণ করেছে এবং তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিঙ্ঘ হয়েছে।’ ওহীর মাধ্যমে যা বলা হয়েছে ততটুকুই যিনি বলবেন তিনি নিরাপদ। ওহীর বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলা বা ব্যাখ্যার নামে ওহীর নির্দেশনা বাতিল করা মুম্বিনের জন্য কঠিন বিভিন্নির পথ উন্মোচন করে, তা যে যুক্তিতে বা যে নিয়য়াতেই করা হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত, এ সকল হাদীসের স্পষ্ট ও সরল অর্থ তারা পরিত্যাগ করেছেন। এ সকল হাদীসের ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অর্থ বলেছেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণ যে অর্থ বলেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে মনগড়া একটি ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয়ত, তাঁরা এরূপ একটি মনগড়া ব্যাখ্যাকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের বহসংখ্যক দ্ব্যুর্থহীন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করেছেন।

চতুর্থত, তাঁরা এমন একটি আকীদা উন্নাবন করেছেন যে আকীদা কুরআন বা হাদীসে কোথাও নেই এবং সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ বা পূর্ববর্তী কোনো আলিম কখনোই বলেন নি। যেমন তারা বলেন:

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল হাজত প্রয়োজন বটেন করেন, দুনিয়া ও আধিরাতের সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বিশ্বে যা কিছু প্রকাশিত হয় সবই একমাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রদান করেন, তাঁর হাতেই ‘চাবিসমূহ’, আল্লাহর ভাণ্ডারগুলি থেকে কিছুই তাঁর হাত ছাড়া বের হয় না, তিনি যদি কিছু ইচ্ছা করেন ততে তাঁর বিপরীত কিছু হতে পারে না, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করার মত বিশ্বে কিছু নেই। বিশ্বের সবকিছু পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর’, তিনি দুনিয়া ও আধিরাতের সকল প্রয়োজন মেটান, আল্লাহর কাছে তাঁর একত্তু ছাড়া আর কি আছে, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা কর, ‘তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো কাজই হয় না’, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, তাঁর বিপরীতে কিছুই হয় না, তিনিই দেন এবং তিনিই আটকে দেন, তিনিই সকল বিপদগ্রস্তের বিপদ কাটান এবং যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করান, ইত্যাদি... ইত্যাদি... ইত্যাদি।’

কুরআন কারীম, সকল সহীহ হাদীস, দুর্বল হাদীস এবং জাল ও বানোয়াট হাদীস তন্ম তন্ম করে খুঁজলেও আপনি এ কথাগুলি কোথাও পাবেন না। সাহাবীদের জীবন খুঁজে দেখুন, এ সকল কথার সামান্যতম ইশারাও তাদের কোনো কথায় পাবেন না। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনে যা কিছু পাবেন সবই এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে পাঠক দেখবেন যে, এ সকল বিষয় সবই একমাত্র এবং কেবল মাত্র মহান আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কেবলমাত্র তিনিই এসকল ক্ষমতার মালিক। এর বাইরে কিছুই বলা হয় নি।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা নির্দেশনা আমরা উপরে দেখেছি। সকল আয়াত ও হাদীস আলোচনা করতে গেলে বইয়ের কলেবর আরো অনেক বেড়ে যাবে। উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নিজের এবং অন্যান্যদের কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয় নি বলে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও উল্লেখ করা হয় নি যে, তাঁকে এরপ কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চমত: কুরআন ও হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এরূপ ‘আকীদা’ তৈরি করার পরে তাঁরা এর ভিত্তিতে বিপদে আপদে তাঁর কাছে সাহায্য বা আগ প্রার্থনা করার রীতি প্রচলন করেছেন।

প্রতিদিন অগণিতবার আমরা বলছি: “আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই।” এ হলো মুমিনের ঈমান।

কুরআন ও হাদীসের সর্বত্রই এ শিক্ষাই বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবুস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ জীবনে প্রায় আড়াই বৎসর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে থাকেন। বিশেষত বিদ্যায় হজ্জের সময় তিনি তাঁর সাথে উটের পিঠে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ خَلِفَ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلْمَاتٍ أَحْقَظَ اللَّهَ بِحَفْظِكَ أَحْقَطَ اللَّهَ تَجْدِهَ تُجَاهِكَ إِذَا سَأَلْتَ فَلَسْأَلَ اللَّهُ وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنَ بِاللَّهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُبُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُبُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفْعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَقَّتِ الصُّحْفُ

“আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : ‘হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে (তাঁর বিধানবলীকে) হেফায়ত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র তত্ত্বকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র তত্ত্বকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।’”^{২২৩}

এভাবে কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুমিনগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকল বিপদে কঠে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে। আমি আমার লেখা ‘রাহে বেলায়াত’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস ও মাসন্নুন দু’আ আলোচনা করেছি। এর বিপরীতে একটি নির্দেশও নেই যে, বিপদে-আপদে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যে বলবে, হে রাসূল, আপনি আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচান।

^{২২৩} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/৬৬৭, নং ২৫১৬, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৬২৩, ৬২৪।
হাদীসটি সহীহ।

ষষ্ঠি: সাহাবীগণের জীবন দেখুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্ধায় তাঁর তাঁর কাছে দু'আ চেয়েছেন, তবে কখনোই তাঁর কাছে যেয়ে বলেন নি, আমাদের বিপদ আপনি কাটিয়ে দেন। তাঁর ওফাতের পরে তাঁর রাওয়া মুবারাকায় যেয়ে তাঁর কখনোই তাঁর কাছে বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন নি। এমনকি কখনো তাঁর তাঁর রাওয়ায় যেয়ে তাঁর কাছে স্বাভাবিক দু'আও চান নি। কখনোই তাঁর রাওয়ায় যেয়ে বলেন নি, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুতি অর্থই ধৰ্মস। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ বলেছেন, “কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যৌদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহানায়ে তাকে দন্ধ করিব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!”^{১২৪}

এখানে ‘মুমিনগণ’ পথ বলতে স্বাভাবতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের মুমিন অর্থাৎ সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যদি কেউ সাহাবীগণের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তবে তার পরিণতি সহজেই অনুমেয়।

সপ্তমত: এখানে খস্টানদের অবস্থা উল্লেখ্য। তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল ভালমন্দের ক্ষমতা ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছে। কাজেই তার কাছেই সব কিছু চাইতে হবে। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বর্তমান তোমাদের মধ্যে প্রচলিত বিকৃত বাইবেল থেকেই একটি আয়াত বের করে দেখাও যেখানে ঈসা (আ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত কর বা আমার কাছে ভালমন্দ প্রার্থনা কর। তারা বলে, তিনি ইহুদীদের ভয়ে এবং মানুষ বুঝাবে না বলে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি, তবে অমুক স্থানে এ বিষয়ে ‘ইঙ্গিত’ আছে, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে তা বুঝা যায় ... ইত্যাদি। এভাবে ইঙ্গিত, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে এমন একটি আকীদা তারা বানিয়েছে যার অস্তিত্ব বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও নেই।

অষ্টমত: মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনের এ সকল মানুষের অবস্থা দেখে আরবের মুশরিকদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত হালকা মনে হতে পারে! ফিরিশতাগণকে দায়িত্ব প্রদানের কথা এবং তাদের শাফা'আত কবুল করার কথা মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সুস্পষ্টতই বলেছেন। আরবের মুশরিকগণ একটু বাড়িয়ে ফিরিশতাগণের দায়িত্বকে ক্ষমতা ও শাফা'আতের সুযোগকে অধিকার বলে মনে করে তাদের কাছে

^{১২৪} সূরা (৪) নিসা: ১১৫ আয়াত।

প্রার্থনা করে, তাদেরকে ডেকে এবং তাদের নামে নথর-মানত করে শিরকে নিপত্তি হয়েছে। পক্ষান্তরে নবী-ওলীগণকে আল্লাহ কোনোরূপ অলৌকিক দায়িত্ব বা বিশ্ব পরিচালনা দায়িত্ব দিয়েছেন বলে কুরআন বা হাদীসে কোথাও বলেন নি। তার পরেও কিছু ফয়েলত জ্ঞাপক অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজের কেউ কেউ দাবি করছেন যে, মহান আল্লাহ নবী-ওলীগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এরপর তাঁরা সে দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে দাবি করছেন। এরপর তাঁরা তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন।

এখানে মুমিনকে বুঝতে হবে যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও মুমিনের অন্যতম সম্মত। তবে এ জন্য কুরআন কারীমের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বাইরে আমাদের যষীক্ষ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে- এ ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বিষয়ক উপরের বিভাগিকর আকীদাগুলির ক্ষেত্রে মূল সমস্যা আকীদার উৎসে বিভ্রান্তি। এখানে মূলত কিছু মানুষের বক্তব্যকে এবং নিজের পছন্দকে আকীদার মূল উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের যা কিছু বলা হয়, তা একান্তই এ সকল বক্তব্যকে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে সমর্থন করার জন্য। এরপ আকীদা পোষণকারীকে যদি আপনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল গাইব জানতেন না, তিনি মঙ্গল-অঙ্গলের ক্ষমতা রাখেন না, তাঁর কাছে গাইবী সাহায্য, বিপদ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা যাবে না, তবে তিনি আপনার ‘আকীদা’ বিভ্রান্ত বলে গণ্য করবেন। আপনি যদি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি তাকে বলেন তবে তিনি বলবেন: এগুলি আছে ঠিকই, তবে এগুলির অন্য ব্যাখ্যা আছে। আপনি যদি বলেন, এ ব্যাখ্যা কি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন? সাহাবীগণ বলেছেন? তিনি সীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এরপ কোনো ব্যাখ্যা তাঁদের থেকে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। তবে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন যে, অমুক বা তমুক এ কথা বলেছেন।

এবার আপনি যদি তাঁর ‘আকীদা’র বিষয়ে প্রশ্ন করেন যে, আপনি যে আকীদা বিশুদ্ধ বলে দাবি করছেন তা কি কুরআন বা হাদীসে কোথাও সুস্পষ্টভাবে আছে? তিনি বলবেন, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে বা অমুক হাদীস থেকে তা বুঝা যায়। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, এ সকল ব্যাখ্যা কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে? তিনি পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন, অমুক বা তমুক বলেছেন।

এ জাতীয় সকল আকীদার ক্ষেত্রেই এরূপ দেখতে পাবেন। বিদ'আত ও ফিরকা বিশ্বক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে শীয়া, মুতাফিলী ইত্যাদি সকল বিভাস্ত ফিরকার আকীদার অবস্থা একইরূপ।

এ সকল ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য নাজাতের একমাত্র উপায় হলো, সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা। বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধূমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন। আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

এখানে মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা। অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে নেই। একান্ত প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করলেও গুরুত্বের কম বেশি হবে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে। স্পষ্ট কথাকে অস্পষ্ট কথার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে স্পষ্ট ও দ্যৰ্থহীন কথার জন্য অস্পষ্ট বা দ্যৰ্থবোধক কথার ব্যাখ্যা করতে হবে। 'খবর ওয়াহিদ' একক হাদীসের জন্য কুরআনের স্পষ্ট বাণী বা মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদীস বাতিল করা যাবে না। প্রয়োজনে কুরআন বা প্রসিদ্ধ হাদীসের জন্য একক ও দ্যৰ্থ বোধক হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ছাড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানোই মুমিনের নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ।

চতুর্থ অধ্যায়

আরকানুল ইমান

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟେର ଶୁରୁତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛି ଯେ, କୁରାଆନ ଓ ହାଦୀସେ ବାରଂବାର ୬୮ ଟି ବିଷୟେର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେବେ ଯେଣ୍ଟିଲିକେ ଯଥାୟଥଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯୁମିନେର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ୟ । ଆମରା ଦେଖେଛି ଯେ, ତାଓହୀଦ ଓ ରିସାଲାତେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏ ୬୮ ଟି ବିଷୟେର ମୂଳ । ଏ ଜନ୍ୟ ଆମରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟେ ପୃଥକଭାବେ ଏ ଦୁଟି ବିଷୟେର ଆଲୋଚନା କରେଛି । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ଆମରା ଈମାନେର ଆରକ୍କାନ ବା ଶୁଣ୍ଡଗୁଲିର ବିଷୟେ ସାଧାରଣଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବ ।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো, যে সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশ বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষা বলে প্রমাণিত তা সবই সবই বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই এ খটি বিষয়ের উপর যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় তার তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের দাবী মুল্যহীন বলে প্রমাণিত হবে।

৪. ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের আলোচনায় ‘আল-ইমান বিল্লাহ’ বা আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থই ‘তাওহীদ’ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। তাওহীদের পর্যায় ও প্রকারণগুলি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

৪. ২. মালাইকার প্রতি ঈমান

৪. ২. ১. মালাক: অর্থ ও পরিচয়

আরবী ভাষায় “মালাক” শব্দকে ফাসী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফাসী শব্দই প্রচলিত। পারস্যের মুসলিমগণ অনেক ইসলামী পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফাসী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। যেমন খোদা, নামায, রোয়া, দরুল ইত্যাদি। এগুলি কোনোটিই আরবী শব্দের অর্থ বহন করে না। কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষাগুলির ইসলামীকরণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষার প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায়ও এ সকল

পরিভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ। গত কয়েক দশক ধরে লেখকগণ ফারসী পরিভাষা বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষার প্রচলনের চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাযের পরিবর্তে সালাত, রোয়ার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে। কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে ‘ফিরিশতা’ শব্দটিই সবত্র ব্যবহৃত। ‘মালাক’ শব্দটির প্রচলন নেই, যদিও তা কুরআন-হাদীসের মূল পরিভাষা। আর ধৰ্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

আরবী ‘মালাক’ (الملائكة) শব্দটির অর্থ পত্র, চিঠি বা দৃত। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির মধ্যে কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শব্দটি মূলত ‘আলাক’ (الله) ধাতুমূল থেকে গৃহীত, যৌব অক্ষরটি ‘হারফ যাইদ’ বা অতিরিক্ত অক্ষর। মূল শব্দটি ছিল ‘মাত্লাক’ (الملاك)। পরবর্তী কালে ‘হাময়া’ অক্ষরটিকে স্থানান্তরিত করে লামের পারে নিয়ে একে ‘মালাক’ (الملاك) বলা হয়। বহুল ব্যবহারে ‘হাময়া’ অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে ‘মালাক’ (الملاك) বলা হয়। বহুবচনে ‘হাময়া’ অক্ষরটি বিদ্যমান থাকে এবং বলা হয় ‘মালাইকা’ (الملايك). সর্বাবস্থায় এ সকল ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে মূল অর্থের পরিবর্তন হয় নি। মালাক, মালাক, মাত্লাক সবগুলি শব্দেই মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দৃত ইত্যাদি, আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দৃত (angel)।^১

৪. ২. ২. মালাকগণের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা

আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বারংবার মালাকগণের প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মালাকগণে অবিশ্বাসকারীর বিভ্রান্তির কথা জানান হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মালাকগণে বা ফিরিশতায় বিশ্বাস করা ইসলামী ঈমানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ।

৪. ২. ৩. মালাকগণের প্রতি ঈমানের মূলনীতি

মালাকগণ বা ফিরিশতাগণ আল্লাহর সৃষ্টি গাইব বা অদুশ্য জগতের অংশ। আল্লাহ অদুশ্য জগতের শুধুমাত্র সে সকল বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস আমাদেরকে পার্থিব বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে বা এক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনে। মালাকগণ সম্পর্কে আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করি যতটুকু কুরআনুল করীমে বা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এর অতিরিক্ত তথ্য

^১ খালীল ইবনু আহমাদ, কিতাবুল আইন ১/৪৪৫; আল-জাওহারী, আস-সিহাহ ২/১৮১; ইবনুল আসীর, আম-নিহাইয়া ৪/৭৯৯; যাবীদী, তাজুল আরুস ১/৬৬৪১-৬৬৪২।

জানা আমাদের প্রয়োজন নেই বলেই আল্লাহ আমাদের ওহীর মাধ্যমে জানান নি। কাজেই ওহীর অতিরিক্ত কিছু জানার চেষ্টা করলে, অতিরিক্ত কিছু কথা যুক্তি, তর্ক দিয়ে বললে বা কুরআন হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তাতে ভুল হওয়ার ও গাইবী বিষয়ে ওহীর বাইরে কথা বলার সম্মত সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে অনেক জাতি ওহীর কথা বিকৃত হওয়ার কারণে, ওহীর নামে বানোয়াট কথা প্রচলন হওয়ার কারণে এবং ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া ব্যাখ্যা ও মতামত প্রচলনের কারণে মালাকগণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তির বিশ্বাসের মধ্যে নিপত্তি হয়েছিলেন। কুরআন কারীমে তাদের কিছু বিভ্রান্তির বর্ণনা রয়েছে। আমরা প্রথমে মালাকগণ বা ফিরিশতাগণ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বর্ণনা করব এবং এরপর এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করব।

৪. ২. ৪. মালাকগণের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থ

আল্লাহর মালাইকা বা ফিরিশতাগণে বিশ্বাসের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ: “সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক মালাইকা বা ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাদের মধ্যে নেই। সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা, তাঁর নির্দেশ সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্ম।”

ঈমান বিল-মালাইকা বা মালাকগণের প্রতি ঈমানের বিস্তারিত চারটি দিক রয়েছে: (১) মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, (২) তাঁদের নামে বিশ্বাস, (৩) তাঁদের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস এবং (৪) তাঁদের কর্মে বিশ্বাস।

৪. ২. ৫. মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস

ফিরিশতাদের সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাঁদের অস্তিত্ব স্থীকার করা হয়েছে এবং তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মুসলিম সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের সৃষ্টি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবালি, কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই মুমিন আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করেন।

৪. ২. ৬. মালাকগণের নামে বিশ্বাস

আল্লাহর সৃষ্টি মালাকগণের সংখ্যা অগণিত ও অবরণনীয়। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। মালাকগণের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে ধারণা পাই

আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে। মালিক ইবনু সা'সা'আ (রা) বলেন, রাসূলগ্রাহ ﷺ মি'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলেন:

رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَغْمُورُ
يَنْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مَلَكٌ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ أَخْرُ مَا عَلَيْهِمْ

“আমার সামনে বাইতুল মা'মূর উদ্ধিত হলো। আমি বললাম, হে জিবরীল, এটি কী? তিনি বললেন: ‘এটি বাইতুল মা'মূর। প্রতিদিন এর মধ্যে ৭০ হাজার মালাক প্রবেশ করেন। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা আর কখনোই এখানে ফিরে আসে না।’^২

অন্য হাদীসে আবু যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলগ্রাহ ﷺ বলেন:
أَطْتَ السَّمَاءَ وَحْقَ لَهَا أَنْ تَنْطِ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكٌ
وَاصْبَعُ جَبَهَتِهِ سَاجِدًا لِلَّهِ

“আকাশ (ভারাক্রান্ত হয়ে) শব্দ করছে এবং তার শব্দ করার অধিকার আছে, সেখানে এমন ৪ আঙ্গুল স্থানও খালি নেই যেখানে একজন মালাক (ফিরিশতা) তাঁর কপাল রেখে আল্লাহর জন্য সাজদাবন্ত নেই।”^৩

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

“তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।”^৪

এদের মধ্য থেকে সামান্য কয়েকজনের নাম আমরা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জিবরাস্টেল (জিবরীল), মীকাস্টেল (মীকাল), ও মালিক নামগুলি কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ كَانَ عَذْوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَذْوٌ لِلْكَافِرِينَ

“যে কেউ আল্লাহর, তাঁর মালাকগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকালের (মীকাস্টেলের) শক্ত, (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শক্ত।”^৫

^২ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৭৩, ১৪১১; মুসলিম ১/১৪৬-১৫০।

^৩ তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/৫৫৬। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

^৪ সূরা (৭৪) মুদ্দাস্সির: ৩১ আয়াত।

^৫ সূরা (২) বাকারা: ৯৮ আয়াত।

জিবরীল (আ)-কে কুরআন কারীমে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। তাকে আর-রহুল আমীন (الروح الأمين) বা বিশ্বস্ত আত্মা (পবিত্র আত্মা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁর শক্তি-মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরীল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওহী শিক্ষা দানের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

عَلِمَةُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ

“তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন-সুন্দর।”^৬

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّهُ لِتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

“আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবর্তীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (আর-রহুল আমীন: জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সর্তকারী হতে পার।”^৭

জাহানামের প্রহরী বা অধিকর্তার নাম উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُثُونَ

“তারা চিত্কার করে বলবে, হে মালিক, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে: তোমরা এভাবেই থাকবে।”^৮

কোনো কোনো হাদীসে ‘ইসরাফীল’ নামটি এসেছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিতে তাহাজুদের সালাত শুরু করে শুরুর দু'আ বা ‘সানা’ পাঠে বলতেন:

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبَرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَا إِنِّي إِنِّي تَهْذِي مِنْ شَاءَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

“হে আল্লাহ, জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী, আপনি ফয়সালা করবেন আপনার বান্দাদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সে বিষয়ে আপনি আপনার অনুমোদন

^৬ সূলা (৫৩) নাজম: ৫-৬ আয়াত।

^৭ সূরা (২৬) উ'আরা: ১৯২-১৯৪ আয়াত।

^৮ সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৭৭ আয়াত।

দিয়ে আমাকে সত্ত্বের প্রতি পথপ্রদর্শন করুন।”^৯

এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে জান্নাতের প্রহরী বা অধিকর্তা মালাকের নাম ‘রিদওয়ান’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিহাহ সিন্তা বা প্রসিদ্ধ হাদীসগুলিতে সংকলিত হাদীসে নামটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারিনি। তবে ৪৭-৫ম শতকের কোনো মুহাদ্দিসের সংকলিত দু-একটি হাদীসে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।^{১০}

‘মালাকুল মাওত’ বা মৃত্যুর মালাকের নাম ‘আয়রাইল’ বলে কোনো কোনো মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন। প্রথম ৪ জন মালাকের নামই শুধু মুতাওয়াতিরুলপে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং অগণিত হাদীসে এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু মালাককে আল্লাহ কর্মভিত্তিক নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন ‘মালাকুল মাওত’, ‘মুনকার-নাকির’, ‘কিরামান কাতিবীন’ ইত্যাদি।

৪. ২. ৭. মালাকগণের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুর বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে তত্ত্বকুই জানিয়েছেন, যতটুকু জানলে এবং বিশ্বাস করলে আমরা জাগতিক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারব। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মালাকগণ সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও হাদীস মূলত আল্লাহর সাথে মালাকগণের সম্পর্ক, সৃষ্টি পরিচালনায় ও আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তাঁদের দায়িত্ব এবং মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের সৃষ্টি ও আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণত বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা নিম্নরূপ:

৪. ২. ৭. ১. মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্টি

কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যহান আল্লাহর মানব সৃষ্টির পূর্বে মালাকগণকে সৃষ্টি করেন, মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁদেরকে জানিয়েছিলেন এবং আদমের সৃষ্টির পরে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা আদমকে সাজাদা করেন। যেমন একস্থানে আল্লাহ বলেন:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

^৯ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫৩৪।

^{১০} বাইহাকী, শু'আরুল সৈমান ৩/৩০৫; মুনফিয়া, আত-তারগীব ২/৬০-৬১।

“তোমার প্রতিপালক যখন মালাকগণকে বলেছিলেন: ‘আমি মানুষ সৃষ্টি করছি মাতি থেকে, যখন আমি তাকে সুব্যব করব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সাজ্দাবন্ত হয়ো।’ তখন মালাকগণ সকলেই সাজ্দাবন্ত হলেন।”^{১১}

৪. ২. ৭. ২. মালাকগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বাস্তা

মক্কার কাফিরগণ মালাকগণকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যা-সন্তান বলে কল্পনা করত, তাঁদের ইবাদত করত এবং দাবি করত যে, তাঁদের ইবাদত করলে তাঁরা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। তাদের এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلْ عَبْدًا مُكْرَمًّونَ لَا يَسْقِفُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ
إِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِينَهُ مُشْفَقُونَ.

“তারা বলে, ‘দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বাস্তা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পক্ষাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।”^{১২}

৪. ২. ৭. ৩. মালাকগণ নূরের তৈরি

মানুষ ও জিন্ন জাতির সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে মানুষকে মাতি থেকে এবং জিন্ন-কে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মালাকগণের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে কিছুই বলা হয় নি। তবে একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁদেরকে নূর বা আলো থেকে তৈরি করা হয়েছে।

خَلَقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ وَخَلَقَ آدَمَ مِمَّا
وُصِفَ لَكُمْ

“মালাকগণকে নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিন্নদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর মানুষকে কোন্ বস্তু থেকে

^{১১} সূরা (৩৮) সাদ: ৭১-৭৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা বাকারা: ৩০, ৩৪; আরাফ: ১১; হিজর: ২৮, ৩০; ইসরা (বনী ইসরাইল): ৬১; কাহারফ: ৫০; সূরা তাহা: ১১৬ আয়াত।

^{১২} সূরা (২১) আবিয়া: ২৬-২৮ আয়াত।

সৃষ্টি করা হয়েছে তা তো আমাদেরকে জানানো হয়েছে।”^{১৩}

৪. ২. ৭. ৪. মালাকগণের আকৃতি

মালাকগণের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি, তবে আমরা জানি যে, তাঁদের কম-বেশি বিভিন্ন সংখ্যার পাখা আছে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ
مُشْتَنِي وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এবং দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা-বিশিষ্ট মালাকগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃক্ষি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।”^{১৪}

তাঁদের পাখার প্রকৃতি বা সংখ্যা আল্লাহই জানেন। তবে জিবরাইল (আ)-এর বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ৬০০ পাখা আছে। মহান আল্লাহ সূরা নাজমে বলেছেন:

نَمَّ دَنَّا فَنَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسِينَ أَوْ أَنْتَى

“অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান থাকল, অথবা তারও কম।”^{১৫}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةَ جَنَاحٍ

“নবী (ﷺ) জিবরীলকে দেখেন তার ছিল ৬০০ টি পাখা।”^{১৬}

আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জিবরীল (আ)-এর আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে জানা যায়। তাবিয়া মাসরুক বলেন:

كُنْتُ مُتَكَبِّلًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثَ مِنْ نَّكَلَمْ بِوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ
فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْنِيَّةَ قَلَّتْ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ
فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْنِيَّةَ قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكَبِّلًا فَجَلَسْتُ يَـا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ

^{১৩} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৯৪।

^{১৪} সূরা ফাতির: ১ আয়াত।

^{১৫} সূরা (৫৩) নাজম: ৮-৯ আয়াত।

^{১৬} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮১, ৪/১৮৪০, ১৮৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫৮।

أَنْظَرِينِي وَلَا تَغْجِلْنِي أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ), (ولقد رأاه نَزْلَةً أَخْرَى) فَقَالَتْ أَنَا أَوْلَى هَذِهِ الْأَمْمَةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جَنْرِيلٌ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّيْخُوكَ عَلَيْهَا غَيْرُ هَاتِئِنَ الْمَرْئَتَيْنِ رَأَيْتُهُ مَنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عَظِيمًا خَلَقَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (لَا تُنْزِرُكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ) أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكُلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ). فَقَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمْ شِئْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَيَّ اللَّهِ الْفَرِيْدَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: (بِاِنْهَا الرَّسُولُ بِلَغَ مَا اُنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَتَهُ). قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ (وفي روایة: أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ) فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَيَّ اللَّهِ الْفَرِيْدَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ)

“আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেন, হে আবু আয়েশা (মাসরুক), তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা যদি কেউ বলে তবে সে আল্লাহ নামে জগন্য যিথা বলার অপরাধে অপরাধী হবে। আমি বললাম: সে কথাগুলি কী কী? তিনি বলেন, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রতিপালককে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন তবে সে আল্লাহর নামে জগন্য যিথ্যচারী বলে গণ্য হবে। মাসরুক বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে ছিলাম। তাঁর কথায় আমি উঠে বসলাম এবং বললাম: হে মুমিনগণের মাতা, আপনি আমাকে একটু কথা বলতে দিন, আমার আগেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন না। আল্লাহ কি বলেন নি: “সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিল”^{১৭}, “নিশ্চয় তাকে সে আরেকবার দেখেছিল”^{১৮}?

আয়েশা (রা) বলেন: এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজাসা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেন: “এ হলো জিবরীলের কথা। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দুবার ছাড়া আর কখনো তাঁকে তাঁর সেই প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব

^{১৭} সূরা (৮১) তাকবীর: ২৩ আয়াত।

^{১৮} সূরা (৫৩) নাজম: ১৩ আয়াত।

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।” আয়েশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: “তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত”^{১৯}? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: “কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহাইর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দৃত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দৃত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সম্মুত, প্রজ্ঞাময়”^{২০}?

আয়েশা (রা) বলেন, আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাবের কিছু বিষয় গোপন রেখে গিয়েছেন সেও আল্লাহর নামে জগন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন: “হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবর্তীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।”^{২১} তিনি আরো বলেন: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগামীকাল (ভবিষ্যতে) কি হবে তা বলতেন (অন্য বর্ণনায়: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, তিনি আগামীকালে (ভবিষ্যতে) কী আছে তা জানতেন) তবে সেও আল্লাহর নামে জগন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন^{২২}: “আপনি বলুন: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”^{২৩}

৪. ২. ৭. ৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মালাকগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। ঈসা (আ)-এর আমা মারইয়াম (আ)-এর মাতৃত্বের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَلَّ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

“তখন আমি তার (মারইয়ামের) কাছে আমার রূহকে (পরিত্র আত্মা: জিব্রাইল) প্রেরণ করলাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।”^{২৪}

^{১৯} সূরা (৬) আন্তাম: ১০৩ আয়াত।

^{২০} সূরা (৪২) শূরা: ৫১ আয়াত।

^{২১} সূরা (৫) মায়দা: ৬৭ আয়াত।

^{২২} সূরা (২৭) নাম্রল: ৬৫ আয়াত।

^{২৩} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫৯-১৬১; তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২৬২, ৩৯৪; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/৩১৩, ৮/৬০৬।

^{২৪} সূরা (১৯) মারইয়াম : ১৭ আয়াত।

হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এ সকল বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সময় জিব্রাইল (আ) মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হতেন। কখনো মানুষের বেশে ওহী নিয়ে আসতেন। কখনো মানুষের বেশে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে সাহাবীদের সামনে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যাতে উপস্থিত সাহাবীগণ প্রশ্নোভরের মাধ্যমে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জানতে পারেন।^{১৫}

৪. ২. ৮. মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস

৪. ২. ৮. ১. আল্লাহর সর্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ

মালাইকা বা ফিরিশতাগণ মানবীয় দৰ্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর শুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন। ইতোপূর্বে একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, মালাকগনের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: “তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।” অন্যত্র আল্লাহ তাঁদের বিষয়ে বলেন:

لَا يَغْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

“আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লজ্জন করে না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা তাঁরা পালন করে।”^{১৬}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই (আল্লাহরই)। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিযুক্ত হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।”^{১৭}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

“যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর

^{১৫} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৪/১৯৩০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫-৩৯।

^{১৬} সূরা (৬৬) তাহরীম: ৬ আয়াত।

^{১৭} সূরা (২১) আবিয়া: ২০ আয়াত।

ইবাদতে বিমুখ হয় না, তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট
সাজদাবন্ত হয়।”^{২৮}

৪. ২. ১. কর্মনির্বাহ ও কর্মবন্টন

সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবীহ ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা
ছাড়াও মালাকগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন
করেন। মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য
তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاשِطَاتِ نَسْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبَقًا
فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا

“শপথ তাদের যারা নির্মতাবে উৎপাটন করে। এবং যারা মৃদুভাবে
বক্ষনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তুরণ করে। আর যারা
দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা কর্ম নির্বাহ করে।”^{২৯}

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে মালাকগণকেই বুঝানো
হয়েছে। তাঁদের কেউ কাফিরদের প্রাণ নির্মতাবে উৎপাটন করেন, কেউ
মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে বক্ষনমুক্ত করেন, কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলি নিয়ে
মহাবিশ্বে সন্তুরণ, চলাচল বা যাতায়াত করেন এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশিত
কর্মসমূহ নির্বাহ করেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَالْمَفْسَمَاتِ أَمْرًا

“শপথ কর্মবন্টনকারীগণের (কর্মবন্টনকারী মালাকগণের)।”^{৩০}

এভাবে আমরা সাধারণভাবে ফিরিশতাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে
পারি। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা তাঁদের বিভিন্ন
বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁদের এ সকল দায়িত্ব ও
কর্মের মধ্যে রয়েছে:

৪. ২. ১. ৩. ওহী পৌছানো

মালাকগণের একটি মৌলিক দায়িত্ব নবী বাসুলগণের নিকট আল্লাহর
ওহী পৌছান। জিবরাস্ল (আ)-এর নাম ও পরিচয় বিষয়ক আলোচনায়
আমরা এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি আয়াত দেখেছি।^{৩১}

^{২৮} সূরা (৭) ২০৬ আয়াত।

^{২৯} সূরা (৭৯) নাবিঁআত: ১-৫ আয়াত।

^{৩০} সূরা (৫১) যারিয়াত: ৪ আয়াত।

^{৩১} আরো দেখুন: সূরা বাকারা ৯৭, ৯৮ আয়াত; সূরা তাহরীম ৪ আয়াত; সূরা স্তআরা: ১৯২-

৪. ২. ৮. ৪. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ

মালাকগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হৃকুমে তাঁরই মর্জিমত
মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ مُعَبَّدَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْقِطُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

“মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী
থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।”^{৩২}

৪. ২. ৮. ৫. মানুষকে কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান

আদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ لِلشَّيْطَانَ لَمَّا بَيْنَ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّا فَارَأَ لَمَّا الشَّيْطَانَ فَأَبْعَادَ بِالشَّرِّ
وَتَكْذِيبٍ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّا الْمَلَكُ فَأَبْعَادَ بِالْخَيْرِ وَتَصْنِيفٍ بِالْحَقِّ ... ثُمَّ قَرَا:
(الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ) الآية

“শয়তান মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়, আবার মালাকও (ফিরিশাতও) মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। শয়তানের প্রেরণা অস্তু ও অকল্যানের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্থীকার করার প্রেরণা। মালাকের প্রেরণা হলো কল্যাণের ও মঙ্গলের ওয়াদা করা এবং সত্যকে মেনে নেয়া। ... এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি^{৩৩} পাঠ করেন: “শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্ললতা-কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”^{৩৪}

৪. ২. ৮. ৬. মুমিনদের জন্য দু'আ করা

মালাকগণের একটি বিশেষ কর্ম বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর
কাছে সুপারিশ ও দু'আ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا

১৯৪ আয়াত।

^{৩২} সূরা (১৩) রাদ: ১১ আয়াত।

^{৩৩} সূরা (২) বাকারা: ২৬৮ আয়াত।

^{৩৪} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২১৯; ইবনু ইবান, আস-সহাই ৩/২৭৮-২৭৯। তিরমিয়ী
বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

وَابْتَعُوا سَبِيلَكُمْ وَقُلُومُ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَنْخَلُهُمْ جَنَّاتٌ عَذْنَ التَّيِّ وَعَذْنَهُمْ
وَمَنْ صَلَحٌ مِّنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذَرَيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقُلُومُ
السَّيِّئَاتِ وَمَنْ نَقَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقُدْ رَحْمَتَهُ وَنَذَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“যারা আরুশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্ববাপ্তী, অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহানামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জানাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ, এবং তাদের পিতা-মাতা, পাতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজাময়।’”^{৩৫}

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দু'আ ও অন্যান্য সৎকর্মে লিঙ্গ মুমিনদের জন্য ফিরিশতাগণ দু'আ করেন।

৪. ২. ৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা

কুরআন কারীমের অনেক আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে মালাক নিয়োগ করেছেন তার সৎ-অসৎ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরআন কারীমে তাঁদেরকে “কিরামান কাতিবীন” বা সম্মানিত লেখকগণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

إِذْ يَنْلَقُ الْمُنَلْقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَاءِ قَعِيدٌ مَا يَنْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا
لَدِيْهِ رَقِيبٌ عَيْدَ

“দুই গ্রহণকারী (ফিরিশতা) তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।”^{৩৬}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرِامًا كَائِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত

^{৩৫} সূরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৭-৯ আয়াত।

^{৩৬} সূরা (৫০) কাফ: ১৭-১৮ আয়াত।

লিপিকারবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর।”^{৭১}

৪. ২. ৮. ৮. মৃত্যুর সময় আজ্ঞাহৃতি

কুরআন- হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের আজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একদল মালাককে। আল্লাহ বলেন:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَخْنَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّهُ رُسْلَنَا وَهُمْ لَا يَقْرَطُونَ

“অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দৃতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ক্রটি করে না।”^{৭২}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

“আপনি বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত ‘মালাকুল মাওত’ (মৃত্যুর মালাক) তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।”^{৭৩}

কুরআনে বা নির্ভরযোগ্য হাদীসে ‘মালাকুল মাউতের’ নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে কোনো কোনো মুফাস্সির তাঁর নাম আযরাইল বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যামানার মুসলিমদের মধ্যে এই নামই প্রসিদ্ধ।^{৭৪}

৪. ২. ৯. আরশ বহন করা

মালাইকা বা ফিরিশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম মহান আরশ বহন করা। এ বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ বলেছেন: “যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ ধিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে...।” অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

“এবং সেইদিন আটজন (মালাক) তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।”^{৭৫}

^{৭১} সূরা (৮২) ইনফিতার: ১০-১২ আয়াত।

^{৭২} সূরা (৬) আন'আম: ৬১ আয়াত।

^{৭৩} সূরা (৩২) সাজ্দা: ১১ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা নিসা: ৯৭; সূরা আন'আম: ৯৩; সূরা আনফাল: ৫০; সূরা নাহল: ২৮, ৩২; সূরা গাফির (মুমিন): ৭ আয়াত।

^{৭৪} আবু জাফার তাবারী, তাফসীরে তাবারী : ২১/৯৭-৯৮।

^{৭৫} সূরা (৬৯) হা�ক্কা: ১৭ আয়াত।

৪. ২. ৮. ১০. অন্যান্য কর্ম

এছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানি যে, আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মালাককে দায়িত্ব দিয়েছেন। চাঁদ-সূর্যের জন্য, পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য, মেঘের জন্য, বৃষ্টির জন্য, মাতৃগর্ভের ঝন্নের জন্য, জাহানামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাপীদের শাস্তিদানের জন্য, জাহানাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শাস্তিদানের জন্য বিভিন্ন মালাককে দায়িত্ব প্রদান করেছেন আল্লাহ।

মুসলিমদের জিকিরের মাজলিস, আলোচনার মজলিস, ইলমের মাজলিস, সালাতের জামাত ইত্যাদি সংকর্মে উপস্থিত থাকেন কিছু মালাক, বিশ্বের সকল প্রাণ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম তাঁর রওয়া মুবারকে পৌঁছে দেন কিছু মালাক, মৃত্যুর পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশংসন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুনকার নাকির নামক মালাক। ‘মালিক’ (আ)-কে দিয়েছেন জাহানামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। ইস্রাফিল (আ)-কে দিয়েছেন কিয়ামতের সিংগায় ফুরুকার দানের দায়িত্বে। মিকাটল ফিরিশতা বৃষ্টিপাত ও ফল-ফসলের দায়িত্বে নিয়োজিত। এভাবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফিরিশতাদের কথা আমরা জানতে পারি যারা বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন। তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তাঁরই সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তেমনি এসকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাকগণ। সকল সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, সকল প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁরই সৃষ্টি, ফিরিশতাগণ তাঁরই দাস। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীনে। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।^{৪২}

৪. ২. ৯. মালাকগণ বিশ্বাস্ক বিভাস্তি

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফিরিশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক অনুসরণ ও বিশ্বাসই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ। গাইবী বিষয়ে ওহীর সাথে কল্পনা, ধারণা, বৃক্তি ইত্যাদি মিশ্রিত করে ওহীর অতিরিক্ত কিছু বলা বিভাস্তির পথ উন্মুক্ত করে। মালাকগণের বিষয়ে এ ধরনের কিছু বিভাস্তিতে নিপত্তি হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো কোনো জাতি।

^{৪২} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/৩১১-৩১৭; ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান ২/১২৫-১২৬।

৪. ২. ৯. ১. দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, ক্ষমতা দেন নি। এই দায়িত্বকে অতীত কালের অনেক বিভাগ সম্প্রদায় ‘ক্ষমতা’ বলে বিশ্বাস করেছে। এরপর তারা এ সকল ‘মালাক’ বা ফিরিশতাকে ভক্তির নামে ইবাদত করেছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করেছে। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ মালাকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানান নি। কিন্তু অনেক বিভাগ জাতি তাদের মধ্যকার অনেক নবী, ওলী, ‘বীর’ ‘সাধু’ বা ‘সৎ’ মানুষকে মৃত্যুর পরে ‘মালাকগণের’ মত ‘দায়িত্বপ্রাণী’ বলে বিভিন্ন ঘূর্ণি দিয়ে দাবি করেছে। এরপর তারা দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে। এরপর তারা তাদের ইবাদত করেছে বা তাদের কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চেয়েছে।

মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও নির্দেশকে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মত সেই ফিরিশতাকে বৃষ্টির দেবতা মনে করে তার কাছে বৃষ্টি চেয়ে প্রার্থনা করেন না। অনুরূপভাবে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ প্রাণ সংহারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই বলে তারা সেই ফিরিশতাকে প্রাণ সংহারের ক্ষমতাশালী মনে করে দীর্ঘায়ু চেয়ে তার কাছে প্রার্থনা করেন না।

এভাবে আমরা মালাকগণ সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বাসের পার্থক্য বুঝতে পারছি। একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আল্লাহর। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি যেমন আলো ও তাপ দানের জন্য সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, জীবনের উৎস হিসেবে পানিকে সৃষ্টি করেছেন, বাতাস প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, আলোছায়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মালাকগণকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই সূর্য ছাড়াই আলো ও তাপ দিতে পারেন বা পানি ছাড়াই ফসল দিতে পারেন। তবে তিনি এই মহাবিশ্বকে একটি সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের আর সব সৃষ্টির মত ফিরিশতারাও আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাঁরই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। তাই আমরা ফিরিশতাকে সম্মান করি, তাঁদেরকে ভালবাসি, আল্লাহর কাছে তাঁদের কল্যাণ ও শান্তি চেয়ে দুঃস্থি করি এবং বুলি (আলাইহিমু সালাম: তাঁদের উপর শান্তি হোক), কিন্তু কখনই তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি না, তাঁদেরকে উপাসনা করি না, তাঁদেরকে ডাকি না।

৪. ২. ৯. ২. সম্পর্ক ও সুপারিশ

কুরআনুল করীমের বিভিন্ন দেশের মানুষেরা মালাক বা ফিরিশতার অঙ্গে বিশ্বাস করত। তাদের এই বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন অমূলক ধারণা এবং কুসংস্কার মিশ্রিত। তারা বিশ্বাস করত যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তারা মানুষের থেকে উন্নত ও সম্মানিত। আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের রয়েছে বিভিন্ন ক্ষমতা বা ঐশ্বরিক শক্তি।

কুরআনের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, মুশরিকগণ মালাকগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত।^{৪৩} এতেই তারা ক্ষান্ত হতো না, বরং তাদের শাফায়াত ও সুপারিশ লাভের আশায় তারা তাদের ইবাদত উপাসনা করত বা তাদেরকে ডাকত। এছাড়া অন্য অনেক মানব গোষ্ঠী বিভিন্ন সৎ মানুষ বা নবী-রাসূলকে আল্লাহর সত্ত্বান বলে বিশ্বাস করে তাদের শাফায়াত-সুপারিশ লাভের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করত। কারণ, যেহেতু এরা বিশেষ সৃষ্টি ও বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী, সেহেতু আল্লাহ এদের সুপারিশ ফেলবেন না। কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে অবিশ্বাসীদের বিভাসি প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلْ عِبَادٌ مُكَرَّمُونَ لَا يَسْبُقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْعُفُونَ إِلَّا مَنِ
أَرْتَصَى وَهُمْ مِنْ خَشِبَتِهِ مُشْفَقُونَ. وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ
نَجْزِيَهُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

“তারা বলে, ‘দয়াময় সত্ত্বান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে ‘আমি ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত’, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহানাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।”^{৪৪}

মহান আল্লাহ মালাকগণের বা আল্লাহর অন্যান্য সম্মানিত সৃষ্টির ‘শাফা’আতের’ সুযোগ অর্বীকার করেন নি। তবে এক্ষেত্রে কাফিরদের

^{৪৩} দেখুন: সূরা যুখরুফ: ১৯, সূরা সাফাফাত: ১৪৯-১৫২ আয়াত।

^{৪৪} সূরা (২১) আরবিয়া: ২৬-২৯ আয়াত।

‘বিকৃতি’র প্রতিবাদ করেছেন। কাফিরগণ আল্লাহর সাথে মালাকগণ বা আল্লাহর প্রিয় সম্মানিত বান্দাগণের সম্পর্ককে পৃথিবীর রাজাবাদশার সাথে আমলা-চামচাদের সম্পর্কের মত মনে করেছে। পৃথিবীর শাসক বা রাজার অঙ্গাতে অন্যায়কারী তার কোনো প্রিয়পাত্রকে তোয়াজ করে সুপারিশ আদায় করে নিতে পারে। আর এরূপ সুপারিশে শাসক বা রাজা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। আর এক্ষেত্রে সুপারিশ প্রার্থী উক্ত ‘আমলা’-কে যেকোনো প্রকারে ভক্তি বা তোয়াজ করে সুপারিশ আদায়ের চেষ্টা করেন। উক্ত রাজাকে যেমন ভক্তি তোয়াজ করেন, আমলাকেও অনুসরণ করলেও অসুবিধা নেই।

আল্লাহ তাদের এ সকল বিভাস্তির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রথমত ফিরিশতাগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণ ‘আল্লাহর বান্দা’, আল্লাহর সন্তান নন, বা আল্লাহর সাথে তাদের সৃষ্টিগত কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই বা তাঁদের কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। তাঁদের কেউ তাঁর অবাধ্য হলে বা কোনো প্রকারের ইশ্বরত্ব বা উপাস্য হবার দাবী করলে তাদেরকে ও অন্য সকল অত্যাচারী পাপীর মত শাস্তি পেতে হবে।

মালাকগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণের সুপারিশ কখনোই জাগতিক রাজা-বাদশাহগণের কাছে আমলাদের সুপারিশের মত নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ফিরিশতাগণ বা নেক বান্দাগণ সদা সর্বদা তাঁরই ভয়ে ভীত। তাঁরা শুধু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যই আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন। যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের জন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন না। কাজেই পাপ, শিরক ও অবিশ্বাসে লিঙ্গ থেকে ফিরিশতাদের শাফাআতের আশা করা কাফিরদের অবাস্তব কল্পনা। আর কোনো কাফির যদি ভক্তির নামে বা শাফাআতের আশায় তাদের কাউকে ‘ইবাদত’ করে আর তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয় তবে আল্লাহ তার জন্যও ডয়ঙ্কর শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضَى

“আকাশে কত ফিরিশতা রয়েছে তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুমতি না দেন।”^{৮৪}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

لَمْ اتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا

^{৮৪} সূরা (৫৩) নাজম: ২৬ আয়াত।

يَعْلَمُونَ قُلْ لِلّهِ السَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“তবে কি তারা আল্লাহ ব্যক্তীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন: তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকও এবং তারা না বুঝলেও?” বলুন: ‘সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।’”^{৪৬}

এভাবে কুরআন মালাকগণের শাফা‘আত অস্বীকার করছে না। তবে তাদের শাফা‘আতের মালিকানা বা ক্ষমতার ধারণার ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করছে। শাফা‘আতের মালিকানা ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা যখন অনুমতি প্রদান করবেন সে তখন কেবলমাত্র যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন তাদেরই সুপারিশ করবেন।

৪. ২. ১০. মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ

আমরা দেখেছি যে, অদ্য জগতের বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র সে সকল বিষয়ই জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যার বিশ্বাস আমাদের জীবনে কল্যাণ ও পূর্ণতা বয়ে আনে। আমরা একটু চিন্তা করলেই মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ অনুভব করতে পারব।

এই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কল্যাণ, আমরা আল্লাহর এই সম্মানিত বান্দাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করি এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের কুসংস্কার, অলীক বিশ্বাস, অতিভক্তি, শিরক ইত্যাদি থেকে আমরা রক্ষা পাই, যে সকল কুসংস্কার মানুষের ইহলোকিক জীবনকে অস্থিরচিত্ত, ভীত সন্তুষ্ট করে তুলে, কল্যাণের কামনায় তারা এখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়, তাদের ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় বহুবিভক্ত। উপরন্তু এসকল কুসংস্কার তাদের জন্য বয়ে আনে পরলোকিক ধ্বংস ও সর্বনাশ, কারণ আমরা জানি যে, শিরকের একমাত্র পরিণতি জাহানামের অনন্ত শাস্তি।

এছাড়া ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস আনার ফলে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ত্ব জানতে পারি। এ বিশ্বাস আমাদের মনে শাস্তি বয়ে আনে। একজন বিশ্বাসী কখনই নিজেকে অসহায় মনে করেনা। একাকিত্তের অনুভূতি কখনই তাকে গ্রাস করবে না। তিনি সর্বদা অনুভব করেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতা তাকে ঘিরে রেখেছেন, তাঁদের দু'জ্ঞ তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। সকল কষ্ট, সকল বেদনা উত্তরণে তিনি সাহস ও প্রেরণা পাবেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি সকল হতাশাকে জয় করতে পারবেন।

^{৪৬} সূরা (৩৯) যুমার: ৪৩-৪৪।

মালাকগণে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণ ও সততার পথে চলতে উদ্বৃক্ত করে। তিনি জানেন যে, কল্যাণ-কর্মে রত মানুষের জন্য প্রার্থনা করেন মালাকগণ। একজন মুসলিম অন্যান্য মুসলিমের কল্যাণের জন্য তাদের অনুপস্থিতে অন্তরের আকৃতি দিয়ে দু'আ করেন, কারণ তিনি জানেন যে, এ দু'আর ফলে তিনিও লাভবান হবেন। আল্লাহর মালাকগণ তার জন্য দু'আ করেন। এমনিভাবে সকল ন্যায় ও কল্যাণের কাজে তিনি প্রেরণা ও উৎসাহবোধ করেন।

এ ছাড়া মালাকগণের ঈমান আমাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মহসূল, বিশালত্ব ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ঈমান দান করুন।

৪. ৩. আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস

ঈমানের অন্যতম রূপকল্প আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা। আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে 'আল্লাহর গ্রন্থসমূহে' বিশ্বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাতে বিশ্বাস করে না তাদের ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার সাধারণ প্রকাশ এই যে, মুঘ্লিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের নিকট ওহীর মাধ্যমে 'কিতাব' প্রেরণ করেছেন, যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হেদায়াত, মানবজাতির পথখনির্দেশক নূর। তবে সেগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন' নামিল করেছেন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলির স্থান পূরণ করতে এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করতে। এই সর্বশেষ কিতাব কুরআনের মধ্যেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানব জাতির মুক্তির পথ রয়েছে।

আল্লাহর কিতাবসমূহের ঈমানের বিস্তারিত দিকগুলি নিম্নরূপ:

৪. ৩. ১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন

মানব জাতির ইহলোকিক ও পরলোকিক মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে-যুগে তাঁর নবী রাসূলদের কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কিতাব নামিল করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে ছিল সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের জন্য সত্য ও সৎ পথের দিশা। আমরা তাই সাধারণভাবে বিশ্বাস করি যে, যুগে-যুগে নবী রাসূলগণের কাছে আল্লাহ তাঁর বাণী গ্রন্থ আকারে প্রেরণ করেছেন, যার মধ্যে তিনি তৎকালীন মানব সমাজের জন্য সত্য, সৎ কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের নির্দেশনা দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ

الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

“সকল মানুষ ছিল একই উদ্যতভূক্তি। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদাতা ও সর্তর্কারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল বিষয়ে বিধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ গ্রহ অবতীর্ণ করেন।”^{৪৭}

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ যুগে-যুগে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের সাথে সত্যসহ গ্রহ নায়িল করেছেন, যে সকল গ্রহে মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। এ সকল গ্রহের নাম ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমরা জানতে পারি না। অন্যত্র আল্লাহ কৃতিপয় নবীর (আ) নাম উল্লেখ করে তাঁদের উপর অবতীর্ণ গ্রহসমূহে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

فُولُوا أَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহতে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের উপরের যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে, সবকিছুর উপরে আমরা বিশ্বাস আনয়ন করেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা এবং আমরা তাঁর (আল্লাহ) নিকট আত্মসম্পর্কারী (মুসলিম)।”^{৪৮}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحْفِ الْأُولَى صُحْفٌ لِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

“এ তো আছে পূর্ববর্তী ‘সাহীফা’গুলিতে; ইবরাহীম ও মূসার ‘সাহীফা’গুলিতে।”^{৪৯}

‘সাহীফা’ অর্থ ‘লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ’, ‘পুস্তিকা’ বা গ্রন্থ। এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবরাহীম ও মূসাকেও সাহীফা বা গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছিল।

^{৪৭} সূরা (২) বাক্সারা: ২১৩ আয়াত।

^{৪৮} সূরা (২) বাক্সারা: ১৩৬ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৩) আল ইমরান: ৮৪ আয়াত।

^{৪৯} সূরা (৮৭) আলা: ১৮-১৯ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৫৩) নাজর: ৩৬-৩৭।

৪. ৩. ২. জানা ও অজ্ঞানা কিতাব

এভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীগণের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর সকল গ্রন্থই ছিল সত্য ও কল্যাণের পথের দিশারী। কিন্তু আমরা এ সকল গ্রন্থের অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। আমরা কেবল আল্লাহর অপার করুণা, মানব জাতির হেদয়াতের জন্য গ্রন্থ নাযিলের ধারায় বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি যে যুগে যা কিছু নাযিল করেছেন সব কিছুই সংশ্লিষ্ট মানুষদের জন্য সুনিশ্চিত সত্য ও কল্যাণের দিশারী ছিল।

৪. ৩. ৩. প্রসিদ্ধ তিনি কিতাব

কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে ‘তাওরাত’, ‘যাবুর’ ও ‘ইনজীল’- এই তিনটি পুস্তকের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

প্রথমত: আল্লাহ তিনজন প্রসিদ্ধ নবীকে গ্রন্থার প্রদান করেছিলেন।

(১) **তাওরাত:** কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর নবী মুসা (আ)-এর কাছে তাওরাত নামক গ্রন্থ ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। কুরআনে এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ أَنْتَنَا مُوسَى الْكَاتِبَ تَمَامًا عَلَى الدِّيْنِ أَحْسَنَ وَنَقْصِبِلَا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدْيَ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

“এবং মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং দয়া-স্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।”^{১০}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدْيٌ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْقِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
فَلَا تَخْشُوْا النَّاسَ وَاحْشُوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْمَانِي ثُمَّنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“বিশ্য আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও নূর (আলো)। নবীগণ যারা আল্লাহ অনুগত ছিল তারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাখ্বানীগণ (আল্লাহওয়ালাগণ)

^{১০} সূরা (৬) আন্দাম: ১৫৪ আয়াত।

এবং বিদ্যানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল
এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সতরাঁ মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয়
কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্য বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ
করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।”^১

(২) যাবুর : মহান আল্লাহ তাঁর নবী দাউদ (আ)-কে যাবুর গ্রহ প্রদান
করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاؤِدَ زَبُورًا

“আমি নবীগণকে কারো উপরে কারো অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছি; এবং
দাউদকে আমি যাবুর প্রদান করি।”^২

(৩) ইনজীল : কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি
যে, আল্লাহ তাঁর নবী ঈসা (আ)-কে যে গ্রহ প্রদান করেন তার নাম ছিল
“ইনজীল”。 আল্লাহ বলেন:

وَقَبَّلَنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًىٰ وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًىٰ
وَمُؤْنَثَةٌ لِلْمُفْتَنِينَ

“মারযাম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরণে
তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম তার
পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরণে এবং মুসাকীদের জন্য পথের নির্দেশ
ও উপদেশকরণে; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও নূর (আলো)।”^৩

ছিতীয়ত: তাদের অনুসারীগণ গ্রহণগ্রস্ত বিকৃত করেছে।

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে
বিশ্বাস করি যে, উপর্যুক্ত তিনটি গ্রহকেই তাদের অনুসারীগণ বিকৃত
করেছে। ‘বনী ইসরাইল’ বা ‘আহলু কিতাব’ তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলি

^১ সূরা (৫) মায়দা: ৪৪ আয়াত। তাওরাত বিষয়ে আরো দেখুন: সূরা বাকারা : ৫৩, ৮৭;
আল ইমরান: ৩, ৪৮, ৬৫, ৯৩; নিসা: ১৫৩; মায়দা: ৪৩, ৬৮, ১১০; আন'আম: ৯১,
১৫৪; আ'রাফ: ১৫৪, ১৫৭; তাওবা ১১১; হুদ: ১৭, ১১০; সূরা বনী ইসরাইল: ২;
আবিয়া: ৮৮; মুমিনুন: ৪৯; কাসাস: ৪৩; সাজদা: ২৩; গাফির/মুমিন: ৫৩; ফুস্সিলাত:
৪৫; আহকাফ: ১২; ফাতহ: ২৯; সাকফ: ৬; জুম'আ: ৫ আয়াত।

^২ সূরা (১৭) ইসরা/ বনী ইসরাইল: ৫৫ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা নিসা: ১৬৩ আয়াত।

^৩ সূরা (৫) মায়দা: ৪৬ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা আল-ইমরান ৩, ৪৮, ৬৫; মায়দা: ৬৬,
৮৭, ৬৬, ৬৮, ১১০; আ'রাফ: ১৫৭; তাওবা: ১১১; ফাতহ: ২৯; হাদীদ: ২৭ আয়াত।

সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত গোপন করা, ভুলে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করে বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَقْطَمُؤْمِنُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَلِمُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় সৈমান আনবে? অথচ তাদের অবস্থা তো এই যে, তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবন করত এবং বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।”^{৪৪}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَسْتُرُوا
بِهِ ثُمَّ نَمَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

“সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, ‘এ আল্লাহর নিকট হতে’। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের।”^{৪৫}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَبِمَا نَفَضُّهُمْ مِنْثاقِهِمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَطَّا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ

“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লান্ড করেছি এবং তাদের হন্দয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে।”^{৪৬}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخْدَنَا مِثْاقَهُمْ فَنَسُوا حَطَّا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَابَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُبَيِّنُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَخْفَونَ مِنْ

^{৪৪} সূরা (২) বাকারা ৭৫ আয়াত।

^{৪৫} সূরা (২) বাকারা ৭৯ আয়াত।

^{৪৬} সূরা (৫) মায়দা: ১৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা মায়দা ৪১ আয়াত।

الْكِتَابِ وَيَعْقُوْ عَنْ كَثِيرٍ فَذَ جَاءُكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

“যারা বলে ‘আমরা খৃস্টান’ তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তার ভূলে গিয়েছে।”^{১১}

ইহুদী-খৃস্টানগণ কোনো কোনো নবীর ক্ষেত্রে ‘ঈশ্বরত্ব’ দাবি করে এবং তাদের ইবাদত করে। বিশেষত খৃস্টানগণ দাবি করে যে, ইসা (আ) নিজেকে ‘আল্লাহ’ বলে দাবি করেছেন। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে, এ সকল বক্তব্য যা কিছু তাদের কিতাবে রয়েছে সবই বিকৃতি ও সংযোজন। কোনো নবী কখনোই আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করতে বলতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَسْنَنَهُمْ بِالْكِتَابِ لِنَخْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يُبَشِّرُونَ أَنَّ يُؤْتَيْهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنُوا رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে: ‘তা আল্লাহর পক্ষ হতে’, কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে। কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্মত ও নুরওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, ‘আল্লাহর পরিবর্তে তোমার আমার বান্দা হয়ে যাও’- তা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে, তোমরা রাব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।”^{১২}

তৃতীয়ত: বিকৃত অবস্থায় সেগুলির অস্তিত্ব আছে এবং সেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও শরীয়তের অনেক বিধান রয়েছে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মূল তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলের অনেক অংশ তারা ভূলে, অবহেলায় ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করেছে। আবার কিছু পুস্তক তারা নিজেরা লিখে ওঠী বলে চালিয়েছে। তবে অন্যান্য গ্রন্থের মত তা একেবারে

^{১১} সূরা (৫) মায়দা: ১৪-১৫ আয়াত।

^{১২} সূরা (৩) আল-ইমরান ৭৮-৭৯ আয়াত।

হারিয়ে যায় নি। বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন, বিলুপ্তি, জুরে যাওয়া, গোপন করা ইত্যাদির পরেও ‘আহলু কিতাব’ বা ইহুদী-খ্স্টানগণের নিকট তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল নামে কিছু কিতাব রয়েছে, যেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতি সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের বিষয়ে, তাওহীদ ও রিসালাতের বিষয়ে, শরীয়ত বা ব্যবস্থার বিষয়ে এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে অনেক সঠিক শিক্ষা এখনো বিদ্যমান। এ সব বিষয় থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করতে আল্লাহ ‘আহলু কিতাব’-দেরকে আহ্বান করেছেন। কখনো কখনো তাদের বিকৃত বিশ্বাস বা কর্মের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন; কারণ অনেক বিকৃতি তারা তাওরাত, যাবুর বা ইনজীলের মূল পাঠে সংযোগ করেছিল এবং কিছু বিষয় তার অর্থ ও তাফসীরের নামে বিকৃতি করলে মূল পাঠের মধ্যে তা ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّلَوُنَ الْكِتَابَ كُلُّكَاذَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

“ইহুদীরা বলে, ‘খ্স্টানদের কোনো ভিত্তি নেই’, এবং খ্স্টানগণ বলে, ‘ইহুদীদের কোনো ভিত্তি নেই’; অথচ তারা কিতাব পাঠ করে! এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মিমাংসা করবেন।”^{১৯}

অর্থাৎ তাদের প্রস্তাবলি বিকৃত করার পরেও যা তাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে তাও সুস্পষ্ট বা আক্ষরিকভাবে তাদের এই দাবি প্রমাণ করে না। বরং তাদের নিকট বিদ্যমান কিতাব প্রমাণ করে যে, উভয় ধর্মেরই ভিত্তি আছে এবং উভয় সম্প্রদায়ই বিভিন্ন বিভিন্ন ও সীমালঙ্ঘনে লিঙ্গ। যাদের কোনোই কিতাব নেই তারা যেমন আন্দায়ে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কথা বলে এরাও তেমনি কথা বলে।

ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিব্রত করার জন্য তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْهُمْ التَّوْرَأُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

^{১৯} সূরা (২) বাকারা: ১১৩ আয়াত।

“তারা কিভাবে তোমার উপর বিচারভাব ন্যস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, যার মধ্যে আল্লাহর আদেশ বিদ্যমান? তার পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়।”^{৬০}

অর্থাৎ যে বিষয়ে তারা বিচার প্রার্থনা করছে সে বিষয়ক বিধান তাওরাতেই বিদ্যমান। অথচ তদনুসারে বিচার না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিচার চাওয়া প্রমাণ করে যে, তারা অবিশ্বাস ও প্রতারণার জন্মাই এরূপ করেছে।

ইহুদীরা দাবি করত যে, উটের গোশত হারাম। বিষয়টি তাদের বালোয়াট ব্যাখ্যা মাত্র, তাওরাতে তা ছিল না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

كُلُّ الطَّعَامَ كَانَ حلاً لِبْنَي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَأُةُ قُلْ فَأَتُوا بِالْتَّوْرَأِ فَاتَّلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার ইসরাইল (ইয়াকুব) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন তা ব্যতীয় বনী ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বলঃ ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আন এবং পাঠ কর।’”^{৬১}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَأَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أَنْزَلْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

“বলুন, হে কিতাবীগণ, তাওরাত, ইন্জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (আল-কুরআন) তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তিই নেই।”^{৬২}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“ইন্জীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক (সত্যত্যাগী)।”^{৬৩}

^{৬০} সূরা (৫) মায়দা: ৪৩ আয়াত।

^{৬১} সূরা (৩) আল-ইমরান: ৯৩ আয়াত।

^{৬২} সূরা (৫) মায়দা: ৬৮ আয়াত।

^{৬৩} সূরা (৫) মায়দা: ৪৭ আয়াত।

চতুর্থত: ওহী ও বিকৃতির মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি কুরআন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ তাঁর তিন নবীকে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল নামে তিনটি আসামানী গ্রন্থ প্রদান করেন, যেগুলিতে নূর ও হেদায়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বেই তাঁদের অনুসারীগণ বিভিন্নভাবে পুস্তকগুলির কিছু অংশ ভুলে যায় ও বিলুপ্ত করে এবং বিদ্যমান অংশ বিকৃত ও পরিবর্তিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং বর্তমানে এ নামে যে পুস্তকগুলি বিদ্যমান সেগুলির মধ্যে কিছু ওহী এবং কিছু ওহীর নামে মানবীয় সংযোজন, পরিবর্তন বা বিকৃতি বিদ্যমান। এগুলির মধ্যে ঠিক কোন্ কথাটি সঠিক ওহী এবং কোন্ কথাটি বিকৃতি তা বুঝার বা যাচাই করার কোনো নিরপেক্ষ উপায় নেই। এজন্য আল-কুরআনই সত্যসত্য যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَنَّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمِّمًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirming) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) রূপে।”^{৬৪}

এভাবে আমরা জানছি যে, আল-কুরআন প্রবীর্তী সকল গ্রন্থের নিয়ন্ত্রক, পর্যবেক্ষক ও পরীক্ষক। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কোনো তথ্য যদি কুরআনের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আর যে তথ্য কুরআনের সাক্ষ্যে মিথ্য বলে প্রমাণিত তাকে আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। আর কুরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে, তবে আমরাও সে বিষয়ে নীরব থাকি; কারণ তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সহজ মূলনীতি শিখিয়েছেন। ইহুদী-খ্রিস্টানদের কিভাবে যা কিছু রয়েছে তা কুরআনের আলোকে বিচার করা সাধারণভাবে সকলের জন্য হয়ত সহজ নয়। কাজেই এ সকল পুস্তকের কিছুই সঠিক বলে গ্রহণ করার বা মিথ্যা বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে না। বরং বলতে হবে, আল্লাহ যা নায়িল করেছেন তা সঠিক। তোমাদের গ্রন্থে কোন্ কথাটি সঠিক এবং কোন্টি বিকৃতি তা তিনিই ভাল জানেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْزِيرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيَسْرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لَا هُلْ

^{৬৪} সুরা (৫) মায়েদা: ৪৮ আয়াত।

الإِسْلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ... الْآيَة.

কিতাবীগণ হিক্র ভাষায় তাওরাত পাঠ করে তা আরীতে অনুবাদ করে মুসলিমদের শুনাতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “তোমরা কিতাবীদেরকে সত্য বলেও বিশ্বাস করবে না এবং মিথ্যা বলেও ঘোষণা দিবে না। বরং বলবে: “আমরা ইমান এনেছি আল্লাহতে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের উপরে”^{৩৫}..... আয়াত।”^{৩৬}

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন নায়িলের সময় এবং পরবর্তী প্রায় হাজার বৎসর যাবত ইহুদী-খ্স্টানগণ দাবি করত যে, তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ইত্যাদি গ্রন্থ সবই আক্ষরিকভাবে বিশুদ্ধ। এর মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি হয় নি। কিন্তু গত কয়েকশত বৎসরের গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইহুদী খ্স্টানগণই প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের অনেক পুস্তিকা হারিয়ে গিয়েছে, হাজার হাজার স্থানে পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাদের এ আবিষ্কার কুরআন কারীমের অলৌকিক সত্যতার আরেকটি প্রমাণ। ইহুদী-খ্স্টান পশ্চিমগণের গবেষণার আলোকে তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল নামক গ্রন্থগুলির বা ‘বাইবেল’ নামে পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, অসঙ্গতি, পরস্পর বিরোধিতার অসংখ্য নমুনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রমাণাদি জানার জন্য আমি পাঠককে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৮৯১ খ্র.) রচিত ‘ইয়হারুল হক্ক’ নামক কালজয়ী গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। মহান আল্লাহর তাওফীকে আমি পুস্তকটি অনুবাদ করেছি এবং ইসলামিক ফাইলেশন বাংলাদেশ তা প্রকাশ করেছে।

৪. ৩. ৪. মহাত্ম আল-কুরআন

আল-কুরআনুল কারীমের পরিচয় সম্পর্কে এ পুস্তকের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। মানবজাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে আহবানের জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম, যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করেন। পবিত্র কুরআনই আল্লাহর প্রেরিত চূড়ান্ত ও সর্বশেষ গ্রন্থ। কুরআন কারীমে মানবজাতির সকল

^{৩৫} সূরা (২) বাকারা: ১৩৬ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৩) আল ইমরান: ৮৪ আয়াত।

^{৩৬} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৩০।

কল্যাণ, সকল মঙ্গল ও সকল সফলতার উৎস। আল্লাহর এই সর্বশেষ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্বের গ্রন্থগুলিকে দেননি। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে কুরআন করীমের এ সকল বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করব:

৪. ৩. ৪. ১. অলৌকিকত্ব

কুরআন করীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অলৌকিকত্ব। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহ অনেক ‘আয়াত’ বা মুজিয়া প্রদান করেছেন। সেগুলি ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। তাঁদের সমসাময়িক মানুষেরা সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে পরবর্তী মানুষেরা আর তা প্রত্যক্ষ করেন নি। কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মহান আল্লাহ অন্যান্য অগণিত আয়াত বা মুজিয়ার পাশাপাশি ‘চিরস্তন’ মুজিয়া হিসেবে আল-কুরআন প্রদান করেন। যার অলৌকিকত্ব যেমন তাঁর সমকালীন মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا دُعِيَ إِلَى أَغْنِيَةِ مِنَ الْآيَاتِ مَا مَتَّهُ أَمَّنْ عَلَيْهِ
الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتْ وَحْيًا أُوحِيَ اللَّهُ إِلَيْيَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ
تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত বা মুজিয়া প্রাপ্ত হয়েছেন যে মুজিয়ার পরিমাণে মানুষেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে ‘আয়াত’ বা মুজিয়া প্রদান করা হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওই, এজন্য আমি আশা করি যে, নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।’^{৬৭}

বস্তুত, কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরস্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সঙ্কান লাভ করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সঙ্কান লাভ করবে। কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলৌকিত করবেন। কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা এড়িয়ে

^{৬৭} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৯০৫, ৬/২৬৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩৪।

যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ।

মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য ‘নিয়ম পুস্তক’ নয়, বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থ। এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে অর্থ, ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। আর এই অপার্থিব ও অলৌকিক ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থের আবহের সর্বোচ্চ মান রাখ্বিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল স্থানে একইভাবে। এটিই কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ব নয়, তবে তার অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক।

আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সহিত্যের মূল্যায়নে ছিলেন অতি পারঙ্গম। মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি-সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন কুরআনের যে কোনো একটি ছোট সূরার সম্পরিমাণ সূরা কুরআনের সাহিত্যমানে রচনা করার জন্য।”

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مَئَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قَاتِلُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا
شَهِدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَانْقُوا النَّارَ
الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ

“আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবর্তীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার- আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না- তবে সেই নরকাগ্নিকে তয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইঙ্কন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।”^{৬৮}

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْهِ وَادْعُوا مِنْ إِنْ سَطَعَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

^{৬৮} সূরা: ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।

“তারা কি বলে, ‘সে তা রচনা করেছে?’ বল: ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’”^{৬৯}

তিনি আরো ঘোষণা করছেন:

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسَانُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় হয় এবং তারা পরম্পরাকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।”^{৭০}

কাফিরগণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রতিহত করতে তাদের জান-মাল কুরবানী করেছে, কিন্তু এই সহজ ছোট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণীয় অবাক হয়ে কখনো তারা একে ‘যাদু’ বলে অভিহিত করেছে।^{৭১} কখনো বলেছে, এগুলি পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিলী^{৭২} এবং বানোয়াট কথা মুহাম্মাদ (ﷺ) তা বানিয়েছেন^{৭৩}। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে বলেছে: “তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।”^{৭৪}

এগুলি সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শক্তির আচরণ। কিন্তু কখনোই এর মুকাবিলায় একটি ছোট সূরা তারা উপস্থাপন করে নি। আর একথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্বক্তা ও উৎকৃষ্ট জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভূতি সুপ্রিসিন্দ, তারা জনন্তুমি পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তানসন্তি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুপ্তিত হলো। অথচ এই সহজ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করল না।

^{৬৯} সূরা : ১০ ইউনুস, ৩৮ আয়াত।

^{৭০} সূরা: ১৭ ইসরার (বানী ইসরাইল), ৮৮ আয়াত।

^{৭১} নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা আনআম: ৭, ইউনুস: ২, হৃদ: ৭, হিজর: ১৫, ইসরার: ৪৭, আনবিয়া: ৩, ফুরকান: ৮, সাবা: ৪৩, সাফ্ফাত: ১৫, সাদ: ৮, যুবরুফ: ৩০, আহকাফ: ৭, কামার: ২, মুদ্সিস্র: ২৪ আয়াত।

^{৭২} দেখুন: সূরা আনআম: ২৫, আনফাল: ৩১, নাহল: ২৪, মুয়িনুন: ৮৩, ফুরকান: ৫, নামল: ৬৮, আহকাফ: ১৭, কালাম: ১৫, মুতাফ্ফিফীন: ১৩ আয়াত।

^{৭৩} নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা ফুরকান: ৮, সাবা: ৪৩, আহকাফ ১১ আয়াত।

^{৭৪} সূরা : ৪১ ফুসিলাত (হা-য়ীম-আস্সাজদা): ২৬ আয়াত।

নুবওয়াতের শুরু থেকে রাস্তাহাতে বারবৎসার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জয়ায়েত করে কুরআনের ছোট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য শুরু করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সন্ত্রেণ তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জয়ায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল।

আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

৪. ৩. ৪. ২. সংরক্ষণ

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক এর সংরক্ষণ। মহান আল্লাহ কুরআনকে অবিকল ও আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

আমরা জেনেছি যে, পূর্ববর্তী নবী-রাস্তাগণের উপর অবর্তীর কিতাবগুলি বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে। যেহেতু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আল্লাহ পরবর্তী সকল যুগের মানুষদের জন্য অবর্তীর্ণ করেছেন, তাই তিনি নিজে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে পবিত্র কুরআন সকল পবিত্রন, পরিবর্ধন কোনো অংশের বিলুপ্তি বা বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত থেকেছে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَرَأْنَا الدَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চিতরপেই আমি তাঁর সংরক্ষক।”^{৭৪}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَنْتَهِي وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَزَرِّيلٌ مِنْ

حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“এটি অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো অসত্য এতে অনুপ্রবেশ করে না বা করবে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়। প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে তা অবতীর্ণ।”^{৭৫}

বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ইত্যাদির ভাব, ভাষা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, এগুলি প্রথমত কতিপয় ধর্মগুরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এগুলির স্থান ছিল না। উপরন্তু সাধারণ মানুষদেরকে এগুলি পাঠ করতে নিষেধ করা হতো। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে সামান্য কিছু অংশ পাঠ ছাড়া সাধারণ মানুষ এসকল পুস্তকের কেন্দ্রে খোজ রাখতো না। এছাড়া এগুলির ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর বর্ণনা, যা কোনোভাবেই মুখ্য রাখা যায় না। এ সকল কারণে এগুলির বিকৃতি ও বিলুপ্তি সহজ হয়।

কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক যে, মহান আল্লাহ একে মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এবং রাত্রিতে তাহাজুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন পাঠ ও কুরআন ‘খতম’ করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়মিত পাঠ করাকে মহান আল্লাহ মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছে তারা যথাযথভাবে তা আবৃত্তি করে তারাই এতে ঈমান আনে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।”^{৭৬}

^{৭৪} সূরা ১৫ হিজর: ৯ আয়াত।

^{৭৫} সূরা ৪১ ফুসসিলাত/হামিম সাজদা: ৪১-৪২ আয়াত।

^{৭৭} সূরা (২) বাকারা: ১২১ আয়াত।

কুরআন কারীমের অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক। এর অপূর্ব ভাষাশৈলী ও অপার্থিব অর্থ-আবহ যে কোনো মুমিনকে তা পাঠ করতে আগ্রহী করে তোলে। সর্বোপরি অলৌকিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ কুরআন মুখস্ত করা অলৌকিকভাবে সহজ করেছেন। আমরা জানি যে, নিজের মাতৃভাষার রচিত ১০০ পৃষ্ঠার একটি সাহিত্যকর্ম ছবছ আক্ষরিকভাবে মুখস্ত রাখা যে কোনো মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব বিষয়। অথচ ১০/১২ বৎসরের একজন অনারব কিশোরও কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্ষরিকভাবে মুখস্ত রাখতে সক্ষম। এই অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহাবীগণের যুগ থেকেই অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন কারীম পরিপূর্ণ মুখস্ত করেছেন। তাঁরা রাতে তাহজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন খতম করতেন। এছাড়া দিবাভাগে নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা খতম করতেন।

একারণে কুরআন যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, অবিকল সেভাবেই মুখস্ত করেছেন, সালাতের মধ্যে পাঠ করেছেন ও নিয়মিত খতম করেছেন সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মানুষেরা সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতির কোনো সুযোগেই ছিল না।

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মুখস্ত করার পাশাপাশি কুরআন কারীম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশিদীন।

বন্ধুত্ব: কুরআন কারীমে উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থ তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল, বা বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে যেমন আধুনিক খ্রিস্টান ও ইহুদী গবেষকগণ একমত, তেমনিভাবে কুরআন কারীমের অবিকৃতিও অমুসলিম গবেষকরাও মেনে নিয়েছেন। যারা কুরআনকে আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন না, বরং মুহাম্মদ (ﷺ)- এর রচনা বলে মনে করেন, তারাও স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সময়ের তাঁর প্রচারিত কুরআনই এখন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। কারণ, সাহাবীদের সময় থেকে নিয়ে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের কুরআন কারীমের হাতে লেখা অনেক পাঞ্জলিপি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পাঠাগারে বা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে, সে সকল পাঞ্জলিপি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রয়েছে।^{৭৮}

^{৭৮} বিস্তারিত দেখুন: The New Encyclopedia Britannica (knowledge in depth) 15th edition Vol 2 pp 879-977 (Biblical literature), Vol 4 pp 459-545:

৪. ৩. ৪. ৩. সার্বজনীনতা

আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ অবতরণ করেছেন তাতে একদিকে একমাত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাস, আল্লাহর ইবাদত, ভাল ও মন্দ কর্মের ফলাফল, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির কল্যাণ, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও সত্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। অপর দিকে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাগতিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক বিধান, সমাধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো মূলত সার্বজনীন। বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একই প্রকৃতির। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো যুগ ও সময়ের পরিবর্তনে কিছু পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্নযুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে সামাজিক ও জাগতিক সমস্যা থাকতে পারে এবং এ সকলের সমাধানও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হতে পারে। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকল আসমানী কিতাবের বর্ণনা ও শিক্ষা একই ধরনের। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুসারে করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের পূর্বে আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ মানবজাতিকে প্রদান করেছেন তা ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও নির্দিষ্ট একটি সময়কালের জন্য। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনগোষ্ঠীর বৃক্ষিকৃতি ও মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও তাদের উপরোক্ত সমাধানই দেওয়া হয়েছে।

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বে কোনো নবী-রাসল তাঁর ধর্মের বা তাঁর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেন নি। উপরন্তু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য মানুষদের কাছে তাঁর ধর্ম বা কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। এজন্য অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন না।

খ্রিস্টানগণ তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন। অথচ তাদের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেলে ‘যীশু’ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবলমাত্র ‘ইস্রায়েল-সন্তানগণের’ জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ ছাড়া অন্যদের নিকট তাঁর ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। বিকৃত বাইবেলের

Christianity, Vol 10 pp 145-155: Jesus Christ , Encyclopedia of Religion and Ethics ,Edition by James Hastings, New York. Vol 2 pp 532-615: Vol 3 pp 579-600 : Vol 7 pp 439-550: Israel, Jesus Christ, Historia Religionum Edited by C. Jousou Bleeker and Geo Widengren Vol 1 pp 237-317.

বর্ণনা অনুসারে যীশু খ্রিস্ট যখন তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, “তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহূদীদের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ করিও না...”^{৭৯} তিনি আরো বলেছেন: “ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।”^{৮০}

এভাবে তিনি অ-ইহূদী সকল জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করলেন। এবং তাঁর ধর্মকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল সত্তান বা ইহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন। প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম ও দীক্ষা প্রদান তো দূরের কথা, অ-ইস্রায়েলীয় বা অ-ইহূদীদেরকে যীশু সামন্য দু'আ করতে বা ঝাড়-ফুঁক দিতেও রাজি হন নি। বরং তাদেরক কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন।^{৮১}

পক্ষান্তরে কুরআন কারীম সর্বদা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়ত ও কুরআনের নির্দেশনা ‘মানব জাতি’র জন্য বলে উল্লেখ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বজনীনতা বিষয়ক আয়াতগুলি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনকে তিনি মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفَرْقَانِ

“রামাদান মাস, যাতে মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দেশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।”^{৮২}

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

كِتَابٌ أُنزِلَنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসেন অঙ্ককার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।”^{৮৩}

^{৭৯} মুখ্য : ১০/৬।

^{৮০} মুখ্য : ১৫/২৪।

^{৮১} মুখ্য: ১৫/২২-২৬।

^{৮২} সূরা (২) বাকারা: ১৮৫ আয়াত।

^{৮৩} সূরা (১৪) ইব্রাহিম : ১ আয়াত।

এজন্য কুরআন কারীমে প্রথম পর্যায়ের বিশয়গুলো, অর্থাৎ সঠিক বিশ্বাস (সহীহ আকীদা), নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি, সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ ও পরিণতি বর্ণনায় এমন এক পরিপূর্ণ স্পষ্টতার অনুসরণ করা হয়েছে যেন, সকল যুগে সকল সমাজের মানুষই সাধারণ ভাষাজানের মাধ্যমেই এর শিক্ষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অপর দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশয়গুলো, অর্থাৎ সামাজিক, জাগতিক বা বৈশ্বিক সমস্যাসমূহের সঠিক ও কল্যাণমূখী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে এক্ষতা বে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে যেন সকল যুগের সকল সমাজের মানুষেরা এর অনুসরণ করতে পারে, আবার বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের চাহিদা, মূল্যবোধ, ও নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। আর এসব কিছুই সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সহজ ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ

“নিশ্চয় আমি কুরআনকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, শিক্ষা গ্রহণের জন্য কি কেউ আছে?”^{৪৪}

৪. ৩. ৪. ৪. পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রহিতকরণ

কুরআন অবতারণের মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহাগ্রন্থের পূর্বের সকল গ্রন্থকে রহিত করেছে। তাওরাত, ধাবুর ও ইনজীল বিষয়ক আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলির সমর্থক ও নিশ্চিতকারী, সেগুলির পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক। কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই কিতাবীদের মনগড়া বিষয়, কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির অনুসরণ করা যাবে না। এজন্য মহান আল্লাহ কুরআন করীমকে পূর্বে অবর্তীণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmier) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. ৩. ৪. ৫. মুক্তির একমাত্র দিশারী

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর একমাত্র অবিকৃত ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত বাণী, যাকে আল্লাহ সকল যুগের সকল মানুষের মুক্তির জন্য সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের দিশারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এর অনুসরণই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। কল্পনা, বরকত,

^{৪৪} সূরা (৫৪) কঢ়ামার: ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ আয়াত।

সফলতা ও মুক্তির সন্ধান দিয়ে মানুষকে তার কাঞ্চিত লক্ষে পৌছাতে পারবে একমাত্র এই গ্রন্থই। আল্লাহ এই মহা গ্রন্থকে প্রেরণ করেছেন তা অনুধাবন করার জন্য এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَسَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা রয়েছে তার প্রতিকার এবং সঠিক পথের পথনির্দেশ ও রহমত মুমিনদের জন্য।”^{৪৫}

এই গ্রন্থের অনুসরণই মানুষকে দুনিয়া ও আবেদনাতের সকল কল্যাণ ও রহমত পথে পরিচালিত করবে। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتِّبِعُوهُ وَأَنْقُوا الْعَلَّاكُمْ تَرْحَمُونَ

“আমি এই কিতাব নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবাধান হও, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত পেতে পারবে।”^{৪৬}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“নিশ্চয় এই কুরআন পথ নির্দেশ করে সর্বোত্তম বিষয়ের এবং সুসংবাদ প্রদান করে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে যে, তাদের জন্য মহাপুরুষের রয়েছে।”^{৪৭}

আমরা দেখেছি যে, কুরআনকে আল্লাহ নাযিল করেছেন সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায়, যেন সকল পাঠক সহজেই তা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তার শিক্ষা অনুসরণ করতে পারে। কুরআনের অর্থ চিন্তা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا

^{৪৫} সূরা ইউনুস: ৫৭ আয়াত।

^{৪৬} সূরা আনয়াম: ১৫৫ আয়াত।

^{৪৭} সূরা বানী ইসরাইল (ইসরার): ৯ আয়াত।

“তারা কি কুরআনকে অনুধাবণ করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবক?”^{৮৮}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدْبَرُوا أَيَّاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَبْيَابِ

“এটি এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণা করে এবং বৈধশক্তিসম্পন্ন বাক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।”^{৮৯}

এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব কুরআন পাঠ করা ও অনুধাবন করা। সম্ভব হলে একটু কষ্ট করে কুরআন বুঝার মত সহজ আরবী শিক্ষা করা। না হলে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব কুরআন দিয়ে হৃদয় আলোড়িত ও আলেকিত করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর শিক্ষার অনুসরণ করা।

এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই নূর বা আলো যা মানব জাতিকে সত্য, কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। যার অনুসরণের মাধ্যমেই সফলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাখিল করেছি তার (কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।’^{৯০}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

**فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمَقْلُحُونَ**

“যারা তাঁর (রাসূল উম্মী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।”^{৯১}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

^{৮৮} সূরা মুহম্মদ: ২৪ আয়াত।

^{৮৯} সূরা (৩৮) সাঁদ: ২৯ আয়াত।

^{৯০} সূরা (৬৪) তাগাবুন: ৮ আয়াত।

^{৯১} (সূরা (৭) আ'রাফ: ১৫৭ আয়াত)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بِرُّهَانٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

“হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি।”^{১২}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَذَرِّي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى
صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ.

“এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি আমার নির্দেশের রূহ, তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী, পক্ষান্তরে আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ।”^{১৩}

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يَأْذِنُ رَبِّهِمْ إِلَى
صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“আমি এই কিতাব আপনার উপর নায়িল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অঙ্ককার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, মহাপ্রাকৃতমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে।”^{১৪}

আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা ও তাঁর নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করা বিশ্বাসীদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহর গ্রন্থের কিছু অংশকে বিশ্বাস করা আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করার অর্থ একে পুরোপুরি অবিশ্বাস করা। তেমনিভাবে এর শিক্ষা ও বিধানমত জীবন পরিচালনা না করা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, অত্যাচার ও কঠিন পাপ। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অবিশ্বাসী।”^{১৫}

^{১২} সূরা (৪) নিসা: ১৭৪ আয়াত।

^{১৩} সূরা (৪২) শূরা: ৫২ আয়াত।

^{১৪} সূরা ইব্রাহীম: ১ আয়াত।

^{১৫} সূরা (৫) মায়দা: ৪৪ আয়াত।

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অত্যাচারী ।”^{১৬}

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো পাপী ।”^{১৭}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِيَعْصِيِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِيَعْصِيِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَعْصِيَ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরূপ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিষ্ক্রিপ্ত হবে। তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন ।”^{১৮}

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম অংশ। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম আল্লাহর প্রেরিত সকল গ্রন্থে বিশ্বাস করেন। কুরআন কারীমের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আমাদের বিশ্বাস মৌলিক সত্যতায় বিশ্বাস ও সম্মান দানে সীমাবদ্ধ, আর কুরআনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কর্মময়। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে-যুগে যত গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন সবই সত্য এবং সবই আল্লাহ বাণী। তবে যেহেতু পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে, তাই সেসকল গ্রন্থের অনুসরণ বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমকে আল্লাহ সর্বশেষ গ্রন্থ হিসেবে সর্বকালের সকল মানুষের জন্য অবতারিত করেছেন এবং তাঁর বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করেছেন। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর একমাত্র সংরক্ষিত বিশুদ্ধ বাণী বলে বিশ্বাস

^{১৬} সূরা (৫) মায়দা: ৪৫ আয়াত।

^{১৭} সূরা (৫) মায়দা: ৪৭ আয়াত।

^{১৮} সূরা (২) বাকারা : ৮৫ আয়াত।

করেন এবং এর শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন।

৪. ৩. ৫. আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাসের কল্যাণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা আমাদের জন্য অযুক্ত কল্যাণের উৎস। প্রথমত: এই বিশ্বাস আমাদের প্রতিপালক সৃষ্টির সাথে আমাদের মনের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে এবং তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে উঠে। আমরা মানুষের জন্য আল্লাহর অন্ত ভালবাসা ও করণা অনুভব করতে পারি। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে এবং বিবেক ও বিচার জ্ঞান দান করেই ছেড়ে দেনননি। উপরন্তু আমাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের দিশা দানের জন্য তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। বিশেষত মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ যে সকল বিষয় বুঝতে পারে না বা শুধু মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বুঝতে গেলে বিভিন্নির মধ্যে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মানুষ ভালমন্দ বুঝলেও পার্থিব স্বার্থ বা কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল মত দান করতে পারে সেসকল বিষয়ে সঠিক পথের ও সঠিক মতের জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহর তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে থাকতে পারে। মানুষের প্রতি সৃষ্টির এ এক অপরীক্ষিয় করণা। এ করণার উপলক্ষ্মি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি গভীর করে। আমরা জানি যে, সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার অনুভব আমাদের মনের সকল প্রশান্তি ও শক্তির উৎস। এই অনুভব যত গভীর হবে, আমাদের মনের প্রশান্তি এবং শক্তি ও তত প্রগাঢ় হবে।

উপরন্তু এই বিশ্বাস আমাদেরকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের অনুসরণ এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় উদ্ভুদ্ধ করে। আর আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বাণীর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবনের সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও সফলতা।

এছাড়া আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিরাজিত ধর্মীয় আচার আচরণে বিভিন্নতার কারণ জানতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষদেরকে বিভিন্ন ধরণের বিধান দান করেছেন। এসকল ধর্মের বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান মূলত এক। তবে ব্যবহারিক বিধানবলী সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ছিল। সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন প্রেরণ করে আল্লাহর সকল বিধানের সমন্বয় সাধন করেছেন।

৪. ৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নুরুওয়াত ও রিসালাতের বিষয়ে বিশ্বাস আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আল্লাহর মনোনীত নবী রাসূলগণের প্রতি ইসলামী বিশ্বাসের অবশিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ করব।

৪. ৪. ১. আল্লাহর অপার করণা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর অপার করণা সিদ্ধ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এই প্রিয় ও সম্মানিত সৃষ্টিকে দায়িত্ব দিয়েছেন এ পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করার। এই দায়িত্বের সাথে সংগতি সম্পন্ন বিভিন্ন গুণাবলি তাদেরকে দান করেছেন। তাদেরকে তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে সম্মান দান করেছেন, দান করেছেন বিবেক ও উন্নত জ্ঞান। মানুষের অন্তরে দিয়েছেন শুভ, মঙ্গল ও কল্যাণময় কমের প্রতি আকর্ষণ ও অশুভ-অকল্যাণের প্রতি বিরক্তি। তাকে দিয়েছেন লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ভালবাসা, আত্মপ্রেম ইত্যাদি মৌলিক মানবীয় শক্তি বা গুণাবলি, যে সকল গুণের সঠিক প্রয়োগ মানুষকে তার মানবীয় পূর্ণতার শিখরে উঠায়। আবার এ সকল গুণ বা স্বভাবজাত শক্তির ভুল প্রয়োগ মানুষকে মানবেতর জীবের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত করে।

তাই সৃষ্টি জগতে মানুষের সম্মানের সাথে সাথে তার দায়িত্ব অপরাসিম। আর এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং পরলৌকিক মুক্তি ও শান্তি।

মানুষের প্রতি মহান স্রষ্টার করণা অসীম। তিনি তাকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও গুণাবলী দান করা ছাড়াও তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁদের কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন।

৪. ৪. ২. নবী ও রাসূল

আল্লাহর মনোনীত এসকল মানুষকে ইসলামের পরিভাষায় নবী বা রাসূল বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয় নি।

‘নবী’ (النبي) শব্দটি ‘নূন, বা ও হাম্মা’ তিনি বর্ণের সম্বয়ে গঠিত আরবী (نبأ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। ‘নাবা’ (نَبَّا) অর্থ সংবাদ, খবর

ইত্যাদি। কিয়া হিসেবে আন্বাআ (أَنْبَأَ) ও নাব্বাআ (لَبَّى) অর্থ সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো। শব্দটির শেষ অক্ষর হামায়। এজন্য ‘আন-নাবিইউ’ শব্দটি মূলে ছিল ‘আন-নাবী-উ (النبيٌّ)। অত্যধিক ব্যবহারের ফলে হামায়টি পরিবর্তিত হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে। ‘আন-নাবিইউ’ শব্দটির অর্থ সংবাদদাতা।

আরবীতে ‘নূন’, ‘বা’ ও ‘ওয়াও’ তিনি বর্ণের সমষ্টিয়ে আরেকটি শব্দ রয়েছে, যার অর্থ উচ্চ হওয়া। কোনো কোনো ভাষাবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, ‘নবী’ শব্দটি এই ধাতু থেকে গৃহীত। সেক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হয় সুউচ্চ, ‘উচ্চীকৃত’ বা ‘মর্যাদাময়’। তবে কুরআন কারীমের বিভিন্ন ব্যবহার ও কুরআনের বিভিন্ন কিরাআতের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদেরকে ‘সংবাদ’ প্রদানের অর্থেই ‘নবী’ বলা হয়।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূল (الرَّسُول) শব্দটির অভিধানিক অর্থ প্রেরিত, দৃত ইত্যাদি। আরবী ‘আরসালা’ (أَرْسَل) অর্থ প্রেরণ করা। অন্যের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ, তথ্য বা বাণী নিয়ে যিনি আগমন করেন তাকে রাসূল বলা হয়।

ধর্মীয় পরিভাষায় নবী অর্থ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত কল্যাণ অকল্যাণ, শুভ-অশুভ বিভিন্ন কর্মের পথ ও পরিণতি সম্পর্কে সকল সংবাদ মানুষকে জানান, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষদেরক সংবাদ দান করেন। আর (রাসূল) যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওইর মাধ্যমে, প্রাপ্ত বার্তা বা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দৃত হিসেবে মানুষদের কাছে পৌছে দেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থের দিক থেকে দুইটি শব্দই প্রায়ই সমার্থক। ব্যবহারের দিক থেকেও শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক। সকল নবী রাসূলই আল্লাহর মনোনীত মানুষ যাদেরকে আল্লাহ ওইর মাধ্যমে তাঁর বাণী শিক্ষা দান করেছেন, যে শিক্ষা সাধারণ কোনো মানুষ মানবীয় জ্ঞান বা কোনো সাধনা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন।

শব্দদ্বয়ের মধ্যে শরীয়তের পরিভাষায় কোনো পার্থক্য আছে কি না সে বিষয়ে অলিমগণ মতভেদ করেছেন। মতভেদের কারণ এ বিষয়ে কুরআন কারীমের বা হাদীস শরীফে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এজন্য অলিমগণ কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার আলোকে ইজতিহাদ করেছেন। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী।

অধিকাংশ আলিম মতপ্রকাশ করেছেন যে, শব্দদুটির মধ্যে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা আরো একমত প্রকাশ করেছেন যে, রিসালাত (الرسالة) বা রাসূলের দায়িত্ব সাধারণতর। এ জন্য সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন। যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে দীন বা শরীয়ত বিষয়ক কোনো নির্দেশনা লাভ করেন তিনিই নবী। আর রাসূল অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব লাভ করেন।

রাসূলের অতিরিক্ত দায়িত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে তাঁরা খুটিনাটি মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন:

وَقَدْ نَكَرُوا فِرْوَقًا بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ، وَأَحْسَنُهَا أَنْ مَنْ نَبَّأَ اللَّهُ بِخَيْرِ السَّمَاءِ، إِنْ أَمْرَةٌ
أَنْ يَلْتَغِيَ غَيْرُهُ فَهُوَ نَبِيٌّ رَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَلْتَغِيَ غَيْرُهُ فَهُوَ نَبِيٌّ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ.

‘নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর মত যে, যাকে আল্লাহ আসমানী সংবাদ প্রদান করেন যদি তাকে আল্লাহ সেই সংবাদ অন্যকে প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন তবে তিনি নবী ও রাসূল। আর যদি তাকে এরূপ প্রচারের দায়িত্ব না দেওয়া হয় তবে তিনি নবী মাত্র, রাসূল নন।’^{১৯}

মোল্লা আলী কারী বলেন:

الرسول من أمر بالتبليغ، والنبي من أُوحى إليه، أعم من أن يُؤمر بالتبليغ أم لا. قال القاضي عياض: وال الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسولنبي من غير عكس. وهو أقرب من نقل غيره الإجماع عليه، لنقل غير واحد الخلاف فيه، فقيل: النبي مختص بمن لا يُؤمر، وقيل هما مترادافان، واحتار ابن الهمام، والأظهر أنهما متغايران لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ) الآية

‘যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি রাসূল। আর যাকে ওহী দেওয়া হয়েছে তিনিই নবী, তাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হোক বা না হোক। কায় ইয়ায় বলেন: অধিকাংশ আলিম একমত যে, সকল রাসূলই নবী, তবে সকল নবী রাসূল নন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, আলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কায় ইয়ায়ের বর্ণনাটিই সঠিক, আর্থাৎ এ বিষয়ে সকল আলিম একমত পোষণ করেন নি, বরং অধিকাংশ আলিম একমত পোষণ করেছেন। কারণ একাধিক আলিম এ বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয় নি তাঁকেই শুধু নবী বলা হয়।

^{১৯} ইবনু আবিল ইয্য, শারহ আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৮৫।

কেউ বলেছেন: নবী ও রাসূল দুটি একার্থবোধক শব্দ; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইবনুল হুমাম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। সঠিকতর মত যে, উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন^{১০০}: আমি আপনার পূর্বে যে কোনো রাসূল অথবা যে কোনো নবী পাঠিয়েছি...।”^{১০১}

এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাণ্ত প্রত্যেক মানুষকেই নবী বলা হয়। যদি কোনো ওহী প্রাণ্ত মানুষকে আল্লাহর নতুন বিধানাবলী দান করে তা প্রচারের নির্দেশ দান করেন তাহলে তাঁকে রাসূল বলা হয়। আর যদি তাঁকে শুধু ওহীর মাধ্যমে, আল্লাহর বাণী দান করা হয়, নতুন কোনো বিধান প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া না হয় তাহলে তিনি রাসূল নন, কেবলমাত্র নবী বলে আখ্যায়িত হন, যেমন ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁদেরকে নতুন কোনো বিধানাবলী দান করেন নি তাঁরা পূর্ববর্তী রাসূল মুসা (আ)-এর শরীয়ত অনুসারে তাঁদের জাতিকে পরিচালিত করতেন। আসমানী দায়িত্ব লাভের প্রথম পর্যায় নবীর দায়িত্ব লাভ এবং চূড়ান্ত পর্যায় রাসূলের দায়িত্ব লাভ।

৪. ৩. নবী রাসূলগণের সংখ্যা

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَلِنِّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّ فِيهَا نَذِيرٌ

“প্রত্যেক জাতিতেই সর্তককারী প্রেরণ করা হয়েছে।”^{১০২}

অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَكُلُّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُصِّيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقُسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

“প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল, আর যখন কোনো জাতির রাসূল তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তখন তাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা দান করা হয়েছে, এবং তাদেরকে জুলুম করা হয়নি।”^{১০৩}

এসকল সর্তককারী নবী-রাসূলের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ জানান নি। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে:

وَرَسُلًا قَدْ قَصَّنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرَسُلًا لَمْ نَقْصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

^{১০০} সূরা (২২) হাজ: ৫২ আয়াত।

^{১০১} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৬।

^{১০২} সূরা (৩৫) ফাতির: ২৪ আয়াত।

^{১০৩} সূরা (১০) ইউনূস: ৪৭ আয়াত।

“অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি আপনাকে বলি নি।”^{১০৪}

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
تَقْصُصْ عَلَيْكَ

“আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, আর কারো কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।”^{১০৫}

নবী-রাসূলদের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবী ইয়ালা মাওসিলী, সহীহ ইবন হি�কান ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা এক হাজার বা তার বেশি ছিল। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন বা ৩১৫ জন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের নামে জালিয়াতি গ্রন্থে এ সকল হাদীসের সনদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সামগ্রিক বিচারে একাধিক সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।^{১০৬}

যেহেতু এ বিষয়ক সংখ্যাগুলি খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস এবং বিশেষত এগুলির সনদে দুর্বলতা রয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উচ্চ বলে মত প্রকাশ করেছেন মুহাকিক আলিমগণ। মোল্লা আলী কারী বলেন: “বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন: ১ লক্ষ ২৪ হাজার। কোনো কোনো বর্ণনায়: ২ লক্ষ ২৪ হাজার। তবে তাঁদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উচ্চম।”^{১০৭}

তিনি আরো বলেন: “উচ্চম এই যে, নবীগণের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা; কারন ‘খাবারুল ওয়াহিত’ পর্যায়ের হাদীসের উপরে আকীদার বিষয়ে নির্ভর করা যায় না। বরং জরুরী এই যে,

^{১০৪} সূরা (৪) নিসা: ১৬৪ আয়াত।

^{১০৫} সূরা (৪০) গাফির/মুয়িন: ৭৮ আয়াত।

^{১০৬} মুহাম্মাদ নাসিরুল্লাহ আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৬/৩৫৮-৩৬৯।

^{১০৭} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯৯-১০০।

আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ... ফিরিশতাগণেল সংখ্যা, কিতাবসমূহের সংখ্যা, নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।”^{১০৮}

৪. ৪. ৪. নবী-রাসূলগণের নাম

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম, ইদরিস, নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, লৃত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসূফ, আইয়ুব, শুয়াইব, মূসা, হারুন, ইউনূস, দাউদ, সুলাইমান, ইল-ইয়াস, ইল-ইয়াসা’, যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া, সেসা, মুহাম্মাদ (^ص)^{১০৯} (عليهم الصلاة والسلام)

কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উযাইরকে ইহুদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত।^{১১০} কিন্তু তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (^ﷺ) বলেছেন:

مَا أُنْرِيَ أَعْزِيزَ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا

“আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না।”^{১১১}

মূসার (আ) খাদিম হিসাবে ইউশা ইবনু নূন-এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (^ﷺ) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি। কোনো কোনো ঘয়ীফ হাদীসে আদম (আ) এর পুত্র “শীস”-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কালুত, হায়কীল, হায়লা, শাম্যুলে, জারজীস, শামউন, ইরমিয়া, দানিয়েল প্রমুখ নবীর নাম, জীবণবৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই মূলত ইসরাইলীয় বর্ণনা ও সেগুলির ভিত্তিতে মুফাসিস ও ঐতিহাসিকগণের মতামত।

কুরআন কারীমে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণকে আমরা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। এঁদের সবাইকে আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পবিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী ছিলেন। এঁদের নবুয়ত বা রিসালত আমরা অঙ্গীকার করিন। কেউ যদি এঁদের কারো নবুয়ত বা রিসালত অঙ্গীকার করেন, অথবা এঁদের ঘূনা বা অবমাননা করেন তিনি অবিশ্বাসী বা কাফির বলে গণ্য হবেন।

^{১০৮} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০১।

^{১০৯} ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৫৮৬; কুরতুবী, তাফসীর, ৩/৩১;

^{১১০} সূরা ৯: তাওবা, আয়াত ৩০।

^{১১১} আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২১৮; আয়ীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ১২/২৮০।

কুরআন-হাদীসে যাদেরকে নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাদের কাউকে আমরা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহর মনোনীত নবী বলতে পারিনা। অন্য কোনো মানুষের সম্পর্কেই আমরা বলতে পারিনা যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ যুগে যুগে আরো অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা আল্লাহর মনোনীত প্রিয় পুত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বান্দা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। তাঁদের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা।

৪. ৫. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত

কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবীর মধ্যে কারো-কারো বিষয়ে আল্লাহ বিস্তারিত কিছু বর্ণনা দান করেছেন। যেমন, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ইউসূফ, ঈসা, হুদ, সালেহ, ও লুত। আর কারো কারো সম্পর্কে শুধুমাত্র নবৃত্তের উল্লেখ করেছেন, যেমন যুলকিফল, ইলইয়াস, ইলইয়াস' (আলাইহিমুস সালাম)।

সকল নবীর ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা ও বিবরণ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, কখনোই তাদের ব্যপারে ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক তথ্য প্রদানের বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের বৎশ বিবরণ, দেশ, যুগ, বয়স, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনো কিছুই বলা হয়নি।

কুরআন কারীমে নূহ (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো নবীর আযুক্তাল কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয় নি। আদম (আ) এর আযুক্তাল ১ হাজার বৎসর বলে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ক আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

মূলত কুরআন কারীমে নবী-রাসূলগণের বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আল্লাহর করুণা, সাহায্য, তাঁদের দাওয়াত বা তাঁদের জাতির প্রতি তাঁদের শিক্ষা ও আহবান কি ছিল, তাঁদের আহবানে তাদের জাতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল, তাঁদের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছেন এবং যারা অবিশ্বাস করেছেন তাঁদের প্রতি তাদের কি বক্তব্য ছিল, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের মধ্যের বিরোধ ও দ্঵ন্দ্ব, তাদের কর্মের ফলাফল কি হয়েছিল ইত্যাদি সম্পর্কে। এ সকল বিষয়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো কোনো কোনো নবীর পিতা বা মাতার নাম বা জন্মবৃত্তান্ত বা জীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় এসকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন: ঈসা (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর মাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মুসা (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও দেশের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ নবী, যেমন নূহ, লুত, হুদ, সালেহ, আইয়ুব, যুল-কিফল ইলইয়াস প্রমুখ নবীর (আ) ক্ষেত্রে তাঁদের পিতা, মাতা, যুগ বা দেশের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

৪. ৪. ৬. নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন

কুরআন কারীম বারংবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূলগণ সকলেই আল্লাহর বান্দা ও মানুষ ছিলেন। তাঁরা সকলেই পুরুষ ছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পূর্ববর্তী নবীগণের নুবুওয়াত অঙ্গীকার করার ক্ষেত্রে কাফিরগণের বড় ‘দলিল’ ছিল যে, নবীগণ তাদের মতই মানুষ, কাজেই তাঁরা নবী হতে পারেন না। অপরদিকে কোনো কোনো বিভাত্ত সম্প্রদায় তাদের নবীদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড, আয়াত বা মুজিয়াকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দা হওয়ার কারণে তাঁদেরকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বা ‘আল্লাহর সন্তান’ বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন কারীমে সকল বিভাত্তির অপনোদন করে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও ওহীপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। তাঁরা কোনো ‘ঐশ্বরিক ক্ষমতা’ বা কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার অধিকারী ছিলেন না। তাঁদের মর্যাদা আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা ও রাসূল হওয়ায়; আল্লাহর ক্ষমতা, গুণাবলি বা ইবাদত পাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর শরীক হওয়ায় নয়।

তাঁদের মানবত্ব প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে তাঁদের মানবীয় দিকগুলি উল্লেখ করেছেন, যেমন তাঁদের খাদ্যগ্রহণ, বাজার করা, বিবাহ-শান্তি, সন্তান গ্রহণ, মৃত্যুবরণ, মানবীয় সীমাবদ্ধতা, কল্যাণ-অকল্যাণে অক্ষমতা, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাইরে কোনো অলৌকিক কর্ম করতে না পারা ইত্যাদি। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

قَالُوا إِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْذِذُ أَبْأَوْنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِكُمْ سُلْطَانًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“তারা (কাফিরগণ) বলত: ‘তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাঁদের ইবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিয়া) উপস্থিত কর। তাঁদের রাসূলগণ তাঁদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিয়া) উপস্থিত করা

আমাদের কাজ নয়। মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।”^{১১২}
অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقَرَىٰ

“আপনার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ মানুষগণকে ছাড়া
কাউকে প্রেরণ করি নি (রিসালাত-নুবওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করি নি),
যাদেরকে আমি ওহী প্রদান করেছিলাম।”^{১১৩}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيَضْلِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি,
তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য; অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা
বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি
পরাক্রমশালী প্রজাময়।”^{১১৪}

অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব তাদের সম্প্রদায়ের বোধগম্য ভাষায়
দীনের কথা প্রচার ও ব্যাখ্যা করা। হেদয়াত করা বা না করা তাদের দায়িত্ব
নয়, বরং তা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

“তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তার সকলেই তো
আহার করত এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করত।”^{১১৫}

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْمَةٌ
صِدِيقَةٌ كَانَ أَيْكَلَانِ الطَّعَامَ

^{১১২} সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১০-১১ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৬) আন'আম: ৯১ আয়াত;
সূরা (২১) আমিয়া: ৩ আয়াত; সূরা (২৩) মুমিনুন: ২৪, ৩৩ আয়াত; সূরা (২৬)
শু'আরা: ১৫৪, ১৫৬ আয়াত; সূরা (৩৬) ইয়াসীন: ১৫ আয়াত।

^{১১৩} সূরা (১২) ইউসুফ: ১০৯ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১৬) নাহল: ৪৩ আয়াত; সূরা
(২১) আমিয়া: ৭ আয়াত।

^{১১৪} সূরা (১৪) ইবরাহীম: ৪ আয়াত।

^{১১৫} সূরা (২৫) ফুরকান: ২০ আয়াত।

“মারইয়াম তনয় মসীহ তো একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে, এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত।”^{১১৬}
অন্যত্র তিনি বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

“মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?”^{১১৭}
মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِنِّي اللَّهُ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ

“তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নির্দর্শন (মুজিয়া) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রক্ষেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।”^{১১৮}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

“তবে ইবরাহীম তার পিতাকে বলেছিল: আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোনো অধিকার রাখি না।”^{১১৯}

ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলম ও ক্ষমতা বিষয়ক আলোচনায় আমরা এ অর্থে কয়েকটি আয়াত দেখতে পেয়েছি।

৪. ৪. ৭. সকল নবী-রাসূলের দাও-আত এক

নবী রাসূলদের বিষয়ে কুরআন কারীমের বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁদের সকলের দাওয়াত এর বিষয় মূলত: এক ছিল। তাঁরা সবাই মানুষদেরকে তাওহীদ বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহবান করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করছেন।

^{১১৬} সূরা (৫) মাযিদা: ৭৫ আয়াত।

^{১১৭} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৪৪ আয়াত।

^{১১৮} সূরা (১৩) রা�'দ: ৩৮ আয়াত।

^{১১৯} সূরা (৬০) মুমতাহিনা: ৮ আয়াত।

মানুষদেরকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর শিখানো পথে চলতে এবং সকল মানুষের জন্য কল্যাণময় সামাজিক জীবনে বাস করতে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। যে কর্ম বা আচরণ মানুষের অকল্যাণ করে বা মানুষের কাছে তার মহান সুষ্ঠার সম্পর্কে ক্ষতি করে তা থেকে তারা মানুষদের কে নিষেধ করেছেন। তাদের মূল দাওয়াত ও ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন ইসলাম, তবে তাদের বিস্তারিত শরীয়াত বা বিধানাবলী ছিল যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। মানুষদেরকে কল্যাণের পথে আহবান করা, পথের নির্দেশ দেওয়াই ছিল তাদের দায়িত্ব। তাদের আহবানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া ছিল মানুষের এখতিয়ার।^{১২০}

৪. ৪. ৮. ইসমাতুল আমিয়া

ইসমাত শব্দটি 'আসামা' (عَصَمْ) (العصمة) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ নিষেধ করা, সংরক্ষণ করা বা হেফায়ত করা (to hold back, restrain, curb, check, prevent, guard, safeguard, protect)। আল্লাহ বলেন:

بِأَيْمَانِ الرَّسُولِ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَقْعُلْ فَمَا بَلَغْتَ
رَسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন।"^{১২১}

ইসমাতুল আমিয়া বলতে নবীগণের অভ্রান্ততা বা নিষ্পত্তি (sinlessness, infallibility) বুঝানো হয়। নবীগণকে আল্লাহ সংরক্ষণ করেন বা হেফায়ত করেন, ফলে তাঁরা বিভ্রান্তি বা পাপের মধ্যে নিপত্তিত হন না। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুম নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, নবীগণ বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদয়াত ও মনোনয়ন প্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ উত্তম জানেন কোথায় তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব অর্পন করবেন।"^{১২২}

^{১২০} দেখুন: সূরা আনআম: ৪৮-৪৯, আমিয়া: ২৫, সূরা: ১৩, নাহল: ৩৬ আয়াত।

^{১২১} সূরা (৫) মায়দা: ৬৭ আয়াত।

^{১২২} সূরা (৬) আন'আম: ১২৪ আয়াত।

এ থেকে বুবা যায় যে, বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ দায়িত্ব প্রদান করেন না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَئِمَّةٍ وَمِمَّنْ حَلَّنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

“এরা নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ধৃত, ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশোদ্ধৃত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলম।”^{১২৩}

আল্লাহ বারংবার নবীগণকে পবিত্র, একনিষ্ঠ, সৎ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন।^{১২৪} সর্বোপরি মহান আল্লাহ মানব জাতিকে নবী-রাসূলদের ‘ইতিবা’ বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশও প্রমাণ করে যে, তাঁরা ‘নিষ্পাপ’ ছিলেন। কারণ যার থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে নিঃশর্ত ‘ইতিবা’ করার নির্দেশ আল্লাহ দিবেন না।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস এই যে, নবীগণ সকলেই আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। তারা সবাই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তারা সবাই নিষ্পাপ ছিলেন সকল প্রকার পাপ বা অন্যায় থেকে মুক্ত ছিলেন। মানবীয় ভুলক্রুতি ছাড়া কোনো পাপে তারা কখনও লিঙ্গ হননি।

ইসমাতুল আম্বিয়া বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

الأنبياء كلهم مُنَزَّهُون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبح، وقد كانت منهم زلات وخطايات. ومحمد ﷺ نبيه، وعبده ورسوله، وصفيه ونبيه، ولم يبعده الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط.

“নবীগণ সকলেই সঙ্গীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদক্ষেপ ও ভুলক্রুতি তাদের ঘটেছে। এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর মনোনিত নির্বাচিত, তাঁর বাছাইকৃত। তিনি কখনো মুর্তির ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেন নি। তিনি কখনোই কোনো সঙ্গীরা বা কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিঙ্গ হন নি।”^{১২৫}

^{১২৩} সূরা (১৯) মারইয়াম: ৫৮ আয়াত।

^{১২৪} দেখুন: সূরা নিসা: ৬৯, সূরা আনআম: ৮-৯০, সূরা মারইয়াম: ৪১-৫৮।

^{১২৫} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯৯-১০১।

‘আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়াহ’-এর লেখক আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.) নবীগণের (আ)-এর বিষয়ে বলেন:

كلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى صادقين ناصحين للخلق

“তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং প্রচার করেছেন, সত্যবাদী ছিলেন, সৃষ্টির উপদেশদাতা ও কল্যাণকামী ছিলেন।”^{১২৬}

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী (৭৯১হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়াহ গ্রন্থে বলেন:

في هذا إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكتب خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. أما عمداً بالإجماع. وأما سهواً فعند الأكثرين. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل. وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. وكذلك عن تعمد الكبائر عند الجمهور، خلافاً للحسوية... وأما سهواً فجوره الأكثرون. أما الصغار فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجباري وأتباعه، ويجوز سهواً بالاتفاق، إلا ما يدل على الخسأة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. لكن المحققون اشتربطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه. وهذا كله بعد الوحي، وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. وذهب المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة. والحق منع ما يوجب النفرة، كعهر الأمهات والفحور، والصغراء الدالة على الخسأة. ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده، لكنهم جوزوا إظهار الكفر نقية. وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام مما يشعر بكتب أو معصية فما كان منقولاً عن طريق الآحاد فمردود، وما كان بطريق التواتر فمحروم عن ظاهره إن أمكن، وإلا محمول على ترك الأولى، أو كونه قبل البعثة.

“এতে ইশারা করা হয়েছে যে, নবীগণ বিশেষভাবে শরীয়তের বিষয়ে, দীনের আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও উচ্চাতকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে মা’সূম বা নির্ভূল ও সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে তাঁরা ইচ্ছাকৃত কোনো ভুল করেন না সে বিষয়ে সকলেই একমত এবং অধিকাংশের মতে এক্ষেত্রে তাঁরা অনিচ্ছাকৃত বা বেথেয়ালেও কোনো ভুল করতে পারেন না। অন্যান্য সকল পাপ থেকে তাদের মা’সূম বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ: মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐক্যমত্য এই যে, নবীগণ ওহী বা নুরুওয়াত জ্ঞানের পূর্বে ও পরে কুফ্রী থেকে

^{১২৬} সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী, শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়াহ, পৃ. ৩১৯।

সংরক্ষিত বা মা'সূম। অনুরূপভাবে অধিকাংশের মতে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও মা'সূম। হাশাবিয়া সম্প্রদায় এ বিষয়ে মতভেদ করেছে (তারা নবীগণ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব বলেছে।) আর ইচ্ছাকৃত সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকাংশের মত এই যে, তা সম্ভব। তবে মুত্যিলী নেতা আল-জুবাঈ^{১২৭} ও তাঁর অনুসারীরা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে (তাদের মতে নবীগণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়)। আর নবীগণের জন্য অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সকলের মতেই সম্ভব, তবে যে সকল সগীরা গোনাহ নীচতা প্রমাণ করে তা তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন এক লোকমা খাদ্য চুরি করা, একটি দানা ওয়নে কম দেওয়া, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে (সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে) মুহাকিম আলিমগণ শর্ত করেছেন যে, নবীগণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা তা বর্জন করেন। এ সবই ওহী বা নুরুওয়াত প্রাপ্তির পরের বিষয় (তাঁরা কবীরা বা সগীরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করতে পারেন বা পারেন না বিষয়ক উপরের মতভেদ সবই নবীগণের নুরুওয়াত প্রাপ্তির পরের পর্যায়ের ক্ষেত্রে।)

নুরুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নবীগণ থেকে কবীরা গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব বলে কোনো দলীল নেই। মু'তাফিলাগণ মতপ্রকাশ করেছেন যে, নুরুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না; কারণ এর ফলে জনগণের মধ্যে তাঁর প্রতি অভক্ষি সৃষ্টি হয়, যা তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সত্য কথা এই যে, যে কর্ম তাঁদের প্রতি অভক্ষি সৃষ্টি করে তা তাঁরা করতে পারেন না, যেমন, মাত্গণের সাথে অনাচার, অশ্লীলতা ও নীচতা জ্ঞাপক সগীরা গোনাহ। শীয়াগণ মনে করেন যে, নবীগণ থেকে নুরুওয়াতের পূর্বে ও পরে কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা গোনাহ প্রকাশিত বা সংঘটিত হতে পারে না। তবে তাঁরা তাকিয়াহ বা আত্মরক্ষামূলকভাবে কুফ্র প্রকাশ করা সম্ভব বলে মতপ্রকাশ করেছে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, নবীগণের (আ) বিষয়ে যদি এমন কিছু বর্ণিত হয় যা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা কেউ মিথ্যা বলেছেন বা পাপ করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে নিম্নের মূলনীতি অনুসরণ করতে

^{১২৭} আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব আল-জুবাঈ (৩০৩ হি)। তিনি মু'তাফিলা সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও নেতা ছিলেন। মু'তাফিলাদের একটি সম্প্রদায়ের বা উপদলের নাম 'জুবাইয়াহ' যারা তার অনুসারী ছিলেন। দেখুন, বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

হবে: যদি এরূপ বিষয় খাবারগুল ওয়াহিদ পর্যায়ে বর্ণিত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত। আর এ জাতীয় যা কিছু মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত তা সম্ভব হলে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ গ্রহণ করতে হবে, অথবা মনে করতে হবে যে, তাঁরা সেক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত বিষয় পরিত্যাগ করে বৈধ বিষয় গ্রহণ করেছেন অথবা তা নুরুওয়াতের পূর্বে ঘটেছিল।^{১২৮}

মোল্লা আলী কারী বলেন, ইবনুল হুমাম বলেছেন: আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, নবীগণ কর্তৃরা গোনাহ থেকে সংরক্ষিত, ভূলক্রমে বা অনিচ্ছৃতভাবে একক সঙ্গীরা গোনাহ করে ফেলা থেকে সংরক্ষিত নন। আহলুস সুন্নাতের কেউ কেউ নবীদের ক্ষেত্রে ভূল করাও অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। সঠিকতর বা সহীহ কথা এই যে, কর্মের মধ্যে ভূল হওয়া সম্ভব। সার কথা এই যে, আহলুস সুন্নাতের সকলেই একমত যে, নবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করতে পারেন না। তবে অসতর্কতা বা ভূলের কারণে যা ঘটে তা পদচ্ছলন বলে অভিহিত।^{১২৯}

৪. ৪. ৯. মুজিয়া, কারামাত ও ইসতিদরাজ

৪. ৪. ৯. ১. আয়াত ও মুজিয়া

আমরা ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরকানুল ঈমান আলোচনাকালে দেখেছি যে, সকল নবী-রাসূল আয়াত বা মুজিয়া প্রাপ্ত ছিলেন। মুজিয়া (المعجزة) শব্দটি আরবী 'ইজায' (اعجاز) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'অক্ষম করা'। মুজিয়া অর্থ 'অক্ষমকারী অলৌকিক নির্দর্শন'। নবীগণ তাঁদের নুরুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নির্দর্শন প্রদর্শন করেন সেগুলিকে মুজিয়া বলা হয়।^{১৩০}

মুজিয়া শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি। কুরআন ও হাদীসে মুজিয়া বুঝাতে 'আয়াত' (آيات) অর্থাৎ 'চিহ্ন' বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে আলিমগণ 'মুজিয়া' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। যতটুকু বুঝা যায় এ পরিভাষাটির ব্যবহার ২য় হিজরী শতকেও পরিচিতি লাভ করে নি। কারণ 'মুজিয়া' বুঝাতে ইমাম আবু হানীফা 'আয়াত' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন:

وَالآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالْكَرَامَاتُ لِلْأُولَى يَاءِ حَقٍّ. وَأَمَا
الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلُ إِبْلِيسِ وَفَرْعَوْنَ وَالْجَنَّلِ مِمَّا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ

^{১২৮} সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী, শারহল আকাইদ আন নাসাফিয়াহ, পৃ. ৩১৯-৩২১।

^{১২৯} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৪-১০৫।

^{১৩০} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০; জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ.

যিকুন লেম নসিহা আয়াত ও কرامات, লক্ষ নসিহা প্রচে জাগুত লেম, এলক লান লেহ তেহালি যে প্রচে জাগুত লেহ এস্টের জাগুত লেহ ও উভে লেহ ফিগুরোন বে ও বিজদাদুন টেগিয়া ও কফো, এলক কল জান্স ও মকন.

“নবীগণের জন্য ‘আয়াত’ প্রমাণিত। এবং ওলীগণের কারামত সত্য। আর ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর দুশ্মনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলিকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না, বরং এগুলিকে আমরা তাদের ‘কায়ায়ে হাজাত’ বা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশ্মনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন ‘ইসতিদ্রাজ’ হিসেবে তাদেরকে ক্রমাবয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শান্তি হিসেবে। এতে তারা ধোকগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপত্তি হয়। এগুলি সবই সম্ভব।”^{১৩}

মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ওহী ও মুজিজা লাভ করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে তাঁরা অনেক মুজিজা বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন ও অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের পথে আহবান করার জন্য। এ বিষয়ে কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, অবিশ্বাসিগণ সর্বদা নবী-রাসূলদেরকে ‘আমাদের মতই মানুষ, কাজেই তোমরা নবী হতে পার না’, আর যদি নবী হয়েই থাক তবে ‘আয়াত’ বা ‘সুলতান’ অর্থাৎ ক্ষমতার প্রমাণ পেশ কর। নবীগণ তাদের এ কথার উত্তরে তাদের মানবত্ব এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আয়াত প্রদর্শনের কথা জানিয়েছেন। আমরা দেখেছি এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

فَأَلْوَأْ إِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيشُونَ أَنْ تَصْنُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَيُّؤُنَا فَأَنْوَنَا بِسْلَطَانٌ مُّبِينٌ . قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكُنَ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِكُمْ بِسِلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“তারা (কাফিরগণ) বলত: ‘তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাদের ইবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিয়া) উপস্থিত কর। তাদের

^{১৩} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০-১৩৪।

রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ বৈ কিছুই নই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিয়া) উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।”^{১৩২}

আমরা দেখেছি অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَكُلُّ أَجْلٍ كِتَابٌ

“তোমার পূর্বে রাসূলগণ প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নির্দেশন (মুজিয়া) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।”^{১৩৩}

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
تَقْصُصْنَا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
فُضِّيَّ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَّا لَكَ الْمُبْطَلُونَ

“আপনার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, আর কারো কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো রাসূলই কোনো নির্দেশন (মুজিয়া) আনতে পারেন না। আর যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে যায় তখন ন্যায় সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হয় এবং তখন মিথ্যাশুয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।”^{১৩৪}

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانَهُمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ

“তারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক নির্দেশন দেখান হয় তাহলে তারা ইমান প্রহণ করবে। আপনি বলুন: অলৌকিক নির্দেশনাবলী তো একান্তই আল্লাহর কাছে।”^{১৩৫}

^{১৩২} সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১০-১১ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৬) আন'আম: ৯১ আয়াত; সূরা (২১) আমিয়া: ৩ আয়াত; সূরা (২৩) মুমিনুন: ২৪, ৩৩ আয়াত; সূরা (২৬) শু'আরা: ১৫৪, ১৫৬ আয়াত; সূরা (৩৬) ইয়াসীন: ১৫ আয়াত।

^{১৩৩} সূরা (১৩) রা�'দ: ৩৮ আয়াত।

^{১৩৪} সূরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৭৮ আয়াত।

^{১৩৫} সূরা (৬) আন'আম: ১০৯ আয়াত।

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“তারা বলে, ‘তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নির্দর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?’ বল, ‘নির্দর্শন নাযিল করতে আল্লাহ সক্ষম’, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।”^{১৩৬}

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُبِينٌ

“এবং তারা বলে: তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে অলৌকিক নির্দর্শনসমূহ প্রেরণ করা হোক। আপনি বলুন: অলৌকিক নির্দর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহরই কাছে এবং আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।”^{১৩৭}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ

“তারা বলে, ‘তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নির্দর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?’ বল, ‘গাইব (অদ্শ্যের জ্ঞান) তো কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।’”^{১৩৮}

তিনি আরো বলেন:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عَنِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَالِصِلِينَ قُلْ لَوْلَا أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ لَقَضَيْتِ الْأَمْرَ بِيَنِي وَبَيَّنْتُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

“বল, ‘আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সতৰ চাচ্ছ (মুজিয়া, শান্তি)

^{১৩৬} সূরা (৬) আন-আম: ৩৭ আয়াত।

^{১৩৭} সূরা (২৯) আনকাবুত: ৫০ আয়াত।

^{১৩৮} সূরা (১০) ইউনুস: ২০ আয়াত।

তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত-ভূক্ত তো কেবলমাত্র আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' বল, 'তোমরা যা সত্ত্বের চাছ (মুজিয়া-শান্তি) তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেত, এবং আল্লাহ জালিমদের সংবন্ধে সবিশেষ অবহিত।'"^{১৩৯}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَعْكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا
أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَبِيلٌ

তবে কি তুমি তোমর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন করবে এবং এতে, তোমার মন সংকুচিত হবে, এজন্য যে, তারা বলে, 'তার নিকট ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন? অথবা তার সাথে ফিরিষ্টা আসে না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ের কর্মবিধায়ক।"^{১৪০}

এ সকল আয়াত ও অন্যান্য আয়াত বারংবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছা মুজিয়া প্রদর্শন করেছেন। কুরআন কারীমে নবীগণের অনেক মুজিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আ)-এর নৌকার মুজিয়া, ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদ থাকার মুজিয়া, মূসা (আ)-এর লাঠি ও অন্যান্য মুজিয়া, ঈস্মা (আ)-এর মৃতকে জীবিত করা ও অন্যান্য মুজিয়া, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, ইসরার, মিরাজ ও অন্যান্য মুজিয়া কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এগুলি বিশ্বাস করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

৪. ৪. ২. কারামাতুল আওলিয়া

নবীগণের মুজিয়া বা আয়াত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে ইমামগণ আরো দু প্রকারের 'অলৌকিক' কর্মের আলোচনা করেছেন: (১) ওলীগণের কারামত ও (২) কাফির বা পাপীদের ইসতিদরাজ। কারণ এগুলির বাহ্যিক প্রকাশ অনেকটা এক রকম হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলির মধ্যে পার্থক্য অনেক। যেন কোনো মুমিন অঙ্গতার কারণে যে কোনো অলৌকিক কর্মকেই মুজিয়া বা কারামত বলে মনে না করে এজন্য তারা মুজিয়ার ব্যাখ্যার সাথে কারামাত ও ইসতিদরাজের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

^{১৩৯} সূরা (৬) আন'আম: ৫৭-৫৮ আয়াত।

^{১৪০} সূরা (১১) হৃদ: ১২ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৬) আন'আম: ২৭; (১৩) রাদ: ৭, ২৭; (২৫) ফুরকান: ৭, ২১ আয়াত।

‘ওলী’ শব্দটি আরবী (الولايَة، الولائِيَّة بـكسر السوا وفتحها) বিলায়াত বা ওয়ালায়াত শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ নেকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship)। ‘বেলায়াত’ অর্জনকারীকে ‘ওলী’ বা ‘ওয়ালী’ (الولي) বলা হয়। ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত ‘ওলী’ অর্থেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ ‘মাওলা’ (المولى)। ‘মাওলা’ অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion)।

ইসলামী পরিভাষায় ‘বেলায়াত’ ‘ওলী’ ও ‘মাওলা’ শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দময় সর্বাধিক ব্যবহৃত অর্থে (ولِيَ اللَّهِ) ‘আল্লাহর বন্ধুত্ব’ ও (ولِيَ اللَّهِ) ‘আল্লাহর বন্ধু’ অর্থে। আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

اَلَا إِنَّ اُولَئِإِنَّ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَذْنِينَ اَمْنُوا وَكَانُوا يَقُولُونَ

“জেনে রাখ! নিচয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁর চিন্তাপ্রস্তুত হবে না- যারা ইমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর অস্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে বা তাকওয়া অবলম্বন করে।”^{১৪১}

ইমান অর্থ তাকওয়া ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। “তাকওয়া” শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অস্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়। এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি শুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ইমান ও তাকওয়া। এই দুটি শুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার শুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী।

ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, ইমান ও মারিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান। এজন্য বেলায়াতের কর্মবেশি হয় মূলত নেক আমলে। যার নেক আমল ও সুন্নাতের ইত্তিবা যত বেশি তিনি তত বেশি ওলী। ইমাম তাহাবী বলেন:

الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أُولَاءِ الرَّحْمَنِ، وَأُكْرِمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتَبْعَثُهُمْ لِلْفَرَّانِ

“সকল মুমিন কর্মাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত

^{১৪১} সূরা ইউনস: ৬২-৬৩।

বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সমানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।^{১৪২}

ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন:

ويسْتُوِيَ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّهُمْ فِي الْعِرْفَةِ وَالْبَيْقَنِ وَالتَّوْكِلِ وَالْمُحْبَةِ وَالرَّضَا
وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالإِيمَانِ فِي ذَلِكَ وَيَتَقَوَّنُونَ فِيمَا دُونَ الإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلَّهُ.

“মারিফাত (পরিচয় লাভ), ইয়াকীন (বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), মাহাবাত (ভালবাসা), রিয়া (সম্মতি), খাওফ (ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে মুশিনগণ সকলেই সমান। তাদের মর্যাদার ক্ষমতাশীল হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সরকিছুতে।”^{১৪৩}

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

الإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّقَاضِلُ بَيْنَهُمْ بِالْخُشْبَةِ وَالْنَّقَىِ،
وَمُخَالَفَةُ الْهُوَى وَمُلَازَمَةُ الْأُولَىِ

“ঈমান একই, এবং ঈমানদারগণ এর মূলে সবাই সমান। তবে, আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ এবং সর্বদা উত্তম কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে তাদের মধ্যে শর ও মর্যাদাগত প্রভেদ হয়ে থাকে।”^{১৪৪}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেলায়াতের পথের কর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের সাথেসাথে অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيْاً فَقَدْ أَذْنَنَّهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْيَ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّهُ
إِلَيْيَ مَمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَرِزَّالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيْيَ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىْ أَحَبَّهُ فَإِذَا
أَحَبَّتْهُ كَنْتُ سَمْعَةَ الدَّوْلِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَةَ الدَّوْلِيْ يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ التَّيْبَطِشُ بِهَا
وَرِجْلَهُ التَّيْبَطِشُ بِهَا وَإِنْ سَالَتِيْ لِأَغْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَانَنَّهُ لَأَعْيَنَّهُ.

“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শক্রতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালন করাই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এবং বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার

^{১৪২} ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ (শারহ সহ), পৃ. ৩৫৭-৩৬২।

^{১৪৩} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫৪-১৫৭।

^{১৪৪} আবু জাফর তাহাবী, মাতমুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৪।

বেলায়তের পথে অগ্সর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্বার সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।”^{১৪৫}

কারামত (الكرامة) শব্দটির অর্থ ‘ভদ্রতা’, ‘সমান’, ‘সমাননা’, ‘সমান-চিহ্ন’ (nobility, dignity, respect, mark of honour, token of esteem)। ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘কারামাত’ বলা হয়।

কুরআন কারীমে এরপ অলৌকিক কর্মকেও আয়াত বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের একজন ‘ওলী’-র পদস্থলন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنْلَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ الدِّيَارِ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَثُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينِ

“তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি ‘আয়াত’ বা অলৌকিক নির্দশন দিয়েছিলাম, অতঃপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয় এবং শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অভূত হয়।”^{১৪৬}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ওলীর কথা উল্লেখ করেছেন যাদের বেলায়তের কারণে মহান আল্লাহ তাদেরকে ‘কারামাত’ বা অলৌকিক কর্ম প্রদান করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করায় পরে তিনি বিপথগামী হয়ে যান।

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বেলায়ত কোনো পদমর্যাদা নয় এবং কারামাত স্থায়ী পদমর্যাদার দলিল নয়। একজন নেককার মানুষ বেলায়ত ও কারামাত লাভের পরেও বিভ্রান্ত হতে পারেন। ‘কারামত’ প্রকাশিত হওয়া ওলী হওয়ার প্রমাণ নয়, বরং ঈমান ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই ওলী হওয়ার প্রমান। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, অনুসরণ ও তাকওয়ার উপর টিকে থাকা ও অনবরত ফরয ও নফল ইবাদত পালন করতে থাকই বেলায়তের একমাত্র চিহ্ন।

^{১৪৫} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৮৪।

^{১৪৬} সূরা (৭) আ'রাফ: ১৭৫ আয়াত।

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ নবীগণের অলৌকিক কর্মকে ‘মুজিয়া’ বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ নুবুওয়াতের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে তাঁরা ওলীদের অলৌকিক কর্মকে ‘কারামত’ নামে আখ্যায়িত করেছেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, এরপ অলৌকিক কর্ম ওলীর কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নয়, বরং একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘ইকরাম’ বা সম্মাননা মাত্র।^{১৪৭}

ইমাম আবৃ হানীফা (রাহ) বলেছেন: “ওলীগণের কারামত স্ত্রী।” এ কথা অর্থ ওলীগণ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় তাহলে তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বা কারামত বলে বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো নেককার বুয়ুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশ্বদ্বন্দ্ব সৃত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। তা অস্বীকার করা বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া মুত্তাফিলী ও অন্যান্য বিপ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকীদা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে নবী ছাড়াও অন্যান্য মুমিন মুত্তাকী মানুষের অলৌকিক কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এরপ অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

لَا يُفْصِلُ أَحَدًا مِنَ الْأُولَيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْأَبْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأُولَيَاءِ. وَنَؤْمِنُ بِمَاجِإِهِ مِنْ كِرَامَتِهِمْ وَصَحُّ عَنِ النَّقَاتِ مِنْ رُوَايَاتِهِمْ.

“আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর উপর প্রাধান্য দেই না। বরং আমরা বলি: একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের যে সকল কারামত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের মাধ্যমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি।”^{১৪৮}

৪. ৮. ৯. ৩. ইসতিদরাজ

‘ইসতিদরাজ’ শব্দটি আরবী ‘দারাজ’ (درج) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া, ক্রমান্বয়ে এগোনো ইত্যাদি। ‘দারাজাহ’ (الدرج) অর্থ ধাপ বা পর্যায়। ইসতিদরাজ (الاسترال) অর্থ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেওয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচে নামান, ক্রমান্বয়ে ধৰ্ষনের দিকে এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি (To make advance gradually, promote

^{১৪৭} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০-১৩৩।

^{১৪৮} আবৃ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৯।

gradually, to entice, tempt, lure into destruction)।

কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসলামের পরিভাষায় ‘ইসতিদরাজ’ বলা হয়। আমরা দেখেছি যে, ইসতিদরাজের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফা বলেছেন: “বরং এগুলিকে আমরা তাদের কায়ায়ে হাজাত বা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশ্মনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তাদেরকে ক্রমাগতে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে।”

মোল্লা আলী কারী বলেন: “ফিরাসাত তিন প্রকার। (১) ঈমানী ফিরাসাত। এর কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নূর যা আল্লাহ তার বাদ্দার অন্তরে নিষ্কেপ করেন। হঠাৎ অনুভূতি হিসেবে তা মানুষের অন্তরে হামলা করে, যেমন সিংহ তার শিকারের উপরে হামলা করে। (২) রিয়ায়ত বা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত ফিরাসাত। এ প্রকারের ফিরাসাত অর্জিত হয় ক্ষুধা, রত্ন-জাগরণ, নির্জনবাস ইত্যাদির মাধ্যমে। কারণ মানুষের নক্ষস যখন জাগতিক সম্পর্ক ও সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ থেকে বিমুক্ত হয় তখন তার বিমুক্তির মাত্রা অনুসারে তার মধ্যে অন্তর্দিষ্ট ও কাশফ সৃষ্টি হয়। এ প্রকার ফিরাসাত কাফির ও মুমিন উভয়েরই হতে পারে। এ প্রকার কাশফ বা ফিরাসাত ঈমান বা বেলায়াত প্রমাণ করে না। এর দ্বারা কোনো কল্যাণ বা সঠিক পথও জানা যায় না।... (৩) সৃষ্টিগত ফিরাসাত। এ হলো চিকিৎসক ও অন্যান্য পেশার মানুষের ফিরাসাত যারা সৃষ্টিগত আকৃতি থেকে প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীন অবস্থা অনুমান করতে পারেন।”^{১৪১}

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল অলৌকিক কর্মই কারামত নয় এবং কোনো অলৌকিক কর্ম কারো বেলায়াতের প্রমাণ নয়, কারণ একই প্রকার অলৌকিক কর্ম মুস্তাকী মুমিন থেকেও প্রকাশিত হতে পারে এবং ফাসিক বা কাফির থেকেও প্রকাশিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো অলৌকিক কর্ম কোনো মানুষের বেলায়াত তো দূরের কথা, ঈমানেরও প্রমাণ নয়। বরং মানুষের ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য ও সদা সর্বদা ফরয ও নফল ইবাদত পালন করাই বেলায়াতের প্রমাণ। যদি একুপ ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে কারামত বলা হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তির ঈমান, তাকওয়া বা ইতিবায়ে সন্মান না থাকে কিন্তু তিনি বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেন তবে তাকে ইসতিদরাজ বলা হবে।

^{১৪১} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩২-১৩৩।

৪. ৪. ১০. বিশ্বাস ও শুন্দির সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য

বিশ্বাস ও ভঙ্গির দিক থেকে সকল নবীর অধিকার সমান। আমাদের দায়িত্ব তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা এবং সবাইকে সম্মান ও মর্যাদা দান করা, কারো প্রতি সামান্যতম অর্মাদা মূলক কোনো কথা, কর্ম বা বিশ্বাস থেকে দূরে থাকা। কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুমিনগণ নবীগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكَتَبَهِ وَرَسُلَهُ لَا فَنْدَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

‘রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবর্তীণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর মালাকগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছে। (তারা বলে): ‘আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।’^{১৫০}

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَفْرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَخْذُلُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُلِهِ وَلَمْ يَفْرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহে ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমানের মধ্যে তারতম্য করতে চায়, এবং বলে: ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করি’ এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির, এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’^{১৫১}

এভাবে বিশ্বাস, ভঙ্গি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সাম্যের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের মধ্যে কারো মর্যাদা কারো চেয়ে বেশি বলে আল্লাহ জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

^{১৫০} সূরা (২) বাকারা: ২৮৫ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (২) বাকারা ১৩৬ আয়াত ও সূরা (৩) আল-ইমরান ৮৪ আয়াত।

^{১৫১} সূরা (৪) নিসা: ১৫০-১৫২ আয়াত।

تَلَكَ الرَّسُولُ فَضَلَّنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجاتٍ

“এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর প্রেষ্ঠভূত দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহর কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।”^{১৫২}

অন্যত্র আল্লাহর বলেন:

وَلَقَدْ فَضَلَّنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاءِوْدَ زَبُورًا

“আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।”^{১৫৩}

এভাবে আমরা সকল নবীকে সমান সম্মানের সাথে বিশ্বাস করি। আরো বিশ্বাস করি যে, তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্যদের চেয়ে বেশি। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

৪. ৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

৪. ৫. ১. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

মহান আল্লাহর বলেন:

مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরক্ষার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।”^{১৫৪}

কুরআনে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, স্বষ্টায় বিশ্বাস সকল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সার্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের জন্মগত অনুভূতির অংশ। পরকালের জীবনে বিশ্বাস ছাড়া স্মরণের প্রতি এই বিশ্বাস অথর্হীন হয়ে যায়। এই অথর্হীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে। মক্কার কাফিরেরা ঈমানের অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পরকালে বা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করত। কুরআন কারীমে কাফিরদের এ বিভাসি এবং আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আখিরাতের বিভিন্ন

^{১৫২} সূরা (২) বাকারা: ২৫৩ আয়াত।

^{১৫৩} সূরা (১৭) ইসরাব (বানী ইসরাইল): ৫৫ আয়াত।

^{১৫৪} সূরা (২) বাকারা: ৬২ আয়াত।

বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাদের অবিশ্বাস বিষয়ক যুক্তি-তর্ক খণ্ড করা হয়েছে এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহরে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআন কারীমে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা ‘আধিরাত’ বা ‘শেষ দিবসে’ ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।^{১৫} ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ক কয়েকটি নির্দেশ দেখেছি।

বক্তৃত কুরআন কারীম পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে: (১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত এবং (২) আধিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব। কুরআন কারীমের এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কঠ যে পৃষ্ঠাতে আধিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই।

আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহর বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্থলন ও বিভিন্নির দুটি পথ: (১) শিরকে নিপত্তি হওয়া এবং (২) আধিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অস্ত্রিতা, অসচেতনতা বা শয়তানী প্রৱোচনার কারণে আধিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আধিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। এই ভয়ঙ্করতম পদস্থলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আধিরাতের স্মরণ অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও আধিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণান্বেষণের এ হলো একটি কারণ।

৪. ৫. ২. আধিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস

পরকাল বা আধিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরুষার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলায়ত বা পূর্বাভাসসমূহ, কিয়ামত বা পূনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীরান ও মানুষের কর্ম ওয়ন করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউয়, জাহানামের উপর সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহানাম, জান্নাতের নিয়ামত, জাহানামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রূপ।

^{১৫} দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ৬৩, ১১৬, ১৭৭, ২২৮, ২৩২, ২৬৪; সূরা (৩) আল-ইমরান: ১১৮; সূরা (৪) নিসা: ৩৯, ৫৯, ১৬৩, ১৬২; সূরা (৫) মায়িদা: ৬৯; সূরা (৯) তাওবা: ১৮, ১৯, ৪৪, ৪৫, ৯৯; সূরা (২৪) নূর: ২; সূরা (২৯) আনকাবৃত: ৩৬; সূরা (৩৩) আহয়াব: ২১; সূরা (৫৮) মুজাদলা: ২২; সূরা (৬০) মুমতাহিনা: ৬; সূরা (৬৫) তালাক: ২।

৪. ৫. ৩. কবরের আর্থাৎ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা আখিরাত বা পরকালীন জীবনের বিভিন্ন দিক জানতে পারি, যেগুলি আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলির মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পরে কিয়ামত বা পুনরুত্থানের আগে মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন:

يَئِتُّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضْلَلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَقْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

“যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্ত্র বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভাস্তুতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।”^{১৫৬}

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহজীবনের ন্যায় পরজীবনেও শাশ্ত্র বাণীর উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে পরকালীন জীবনের শুরুতেই কবরে ‘মুনকার-নাকীর’ নামক মালাকদ্বয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوَنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ
الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ شَتَّاكِبُرُونَ

“যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং মালাকগণ হাত বাড়িয়ে বলবে: ‘তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সমঙ্গে অন্যায় বলতে ও তাঁর নির্দর্শন সমঙ্গে ঔর্তত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে।’”^{১৫৭}

এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরেই- সেদিনেই যে শাস্তি প্রদান করা হবে তার বিষয়ে জানা যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَحَاقَ بِآلِ فَرَّعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارِ يُغَرِّضُونَ عَلَيْهَا غُدوًا وَعَشِيًّا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَخْلُوا آلَ فَرَّعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

“কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে। সকাল সক্ষ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন

^{১৫৬} সূরা (১৪) ইবরাহীম: ২৭ আয়াত।

^{১৫৭} সূরা (৬) আন'আম: ৯৩ আয়াত।

(বলা হবে:) ফিরাউনের সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে।”^{১৫৮}

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আগনের সামনে তাদের উপস্থিত করা হবে।

অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুর সময়ের, মৃত্যুর পরের এ সকল শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির বিষয়ে জানানো হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন, আয়ার ও নিয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতির বলে গণ্য। এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুজ্ঞিকে কবরের রাখার পরে তার ‘রহ’ তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে ‘মুনকার ও নাকীর’ নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দীন ও তারা নবী সম্পর্কে। মুমিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে নেককার মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শাস্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন। এগুলি সবই মুমিন বিশ্বাস করেন।

সাধারণভাবে এ অবস্থাকে ‘কবরের’ অবস্থা বলা হয়। তবে ‘কবর’ বলতে মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো হয়। কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কবরস্থ না হলেও সে এ সকল শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونَ لَعَلَّيْ أَعْفُلُ صَالِحًا فِيمَا
نَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ فَلَيْلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَّثُونَ.

“যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করি নি। না, এ হওয়ার নয়। এ তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে ‘বারযার’ (প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল) থাকবে পুনরুদ্ধান দিবস পর্যন্ত।”^{১৫৯}

ইংরাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وسْأَلَ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ حَقَّ كَائِنٌ فِي الْقَبْرِ، وَإِعْدَادُ الرُّوحِ إِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِي
قَبْرِهِ حَقٌّ، وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعِذَابُهُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كَلِمَهُمْ وَلِبَعْضِ عَصَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

“মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে, কবরের মধ্যে বাস্তার রহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ এবং কবরের

^{১৫৮} সূরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৪৫-৪৬ আয়াত।

^{১৫৯} সূরা (২৩) মুমিনুন: ৯৯-১০০ আয়াত।

আয়াব সত্য, কাফিররা সকলেই এ শান্তি ভোগ করবে এবং কোনোকোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে।”^{১৬০}

৪. ৫. ৮. ধৰ্মস, পুনৰুত্থান ও হাশ্র

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধৰ্মস, পুনৰুত্থান ও হাশ্র বা সমাবেশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزَّوْلَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَى
وُجُوهُهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسْبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ'ও সম্মুখে- যিনি এক, পরাক্রমশালী। সে দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।”^{১৬১}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ
شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ

“এবং শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মৃর্চিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা দণ্ডযামান হয়ে তাকাতে থাকবে।”^{১৬২}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَإِذَا نَفَخْ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَدَكَّتِ دَكَّةً
وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقْعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَّ

“যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিণ হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সে দিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ঘ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।”^{১৬৩}

^{১৬০} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৭০-১৭২।

^{১৬১} সূরা (১৪) ইব্রাহীম : ৪৮-৫১ আয়াত।

^{১৬২} সূরা (৩৯) যুমার: ৬৮ আয়াত।

^{১৬৩} সূরা (৬৯) হা�ক্কা: ১৩-১৬ আয়াত।

অন্যত্র তিনি বলেন:

يَوْمَ نَحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِزْدًا

“যে দিন দয়াময়ের নিকট মুস্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানকাপে সমবেত করব। এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহানামের দিকে খেবিয়ে নিয়ে যাব।”^{১৬৪}

৪. ৫. ৫. হিসাব ও প্রতিফল

উপরের আয়াতগুলিতে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ পুনরুত্থানের পরে হিসাব এবং প্রতিফল দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

“সে দিন আল্লাহ তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক।”^{১৬৫}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَنَا طَائِرٌ فِي عَنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا أَفْرًا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।”^{১৬৬}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَنْحًا فَمُلَاقِيهِ فَلَمَّا مَنَّ أُوتَيَ كِتَابَهُ
بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقُلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتَيَ
كِتَابَهُ وَرَأَ ظَهْرَهُ فَسَوْفَ يَدْغُو ثَيَرًا وَيَصْلِي سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
مَسْرُورًا إِنَّهُ طَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

“হে মানুষ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে। এবং

^{১৬৪} সূরা (১৯) মারযাম: ৮৫-৮৬ আয়াত।

^{১৬৫} সূরা (২৪) নূর: ২৫ আয়াত

^{১৬৬} সূরা (১৭) ইসরায়েলি ইসরাইল: ১৩-১৪ আয়াত।

সে তাহার স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাত্তিক হতে দেওয়া হবে সে অবশ্য তার ধ্বংস আহবান করিবে; এবং জুলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; সে তার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। সে ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না; নিশ্চয় ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।”^{১৬৭}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِذَا زَلَّتُ الْأَرْضُ زَلَّتِ الْهَا وَأَخْرَجْتُ الْأَرْضَ أَنْقَالَهَا وَقَالَ إِنْسَانٌ مَا
لَهَا يَوْمَنْدَ تُحْكُمُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَزْخَى لَهَا يَوْمَنْدَ يَصْنُرُ النَّاسُ أَشْتَانًا لِيَرْوَا
أَغْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ نَرَةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ نَرَةً شَرًّا يَرَهُ

“পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে, মানুষ বলবে, ‘এর কি হল?’ সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করিবেন, সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান হবে; কেউ অণু পরিমাণ সংকর্ম করলে তাও দেখবে। কেউ অণু পরিমাণ অসং কর্ম করলে তাও দেখবে।”^{১৬৮}

৪. ৫. ৬. মীয়ান

হিসাবের একটি বিশেষ দিক যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম ও জন করবেন এবং ওজনের জন্য মীয়ান বা তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَنَصْنَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

“এবং কিয়ামত - দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের পাল্লা বা তুলাদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরপে আমিই যথেষ্ট।”^{১৬৯}

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন:

وَالْوَزْنُ يَوْمَنْدِ الْحَقِّ فَمَنْ تَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ

^{১৬৭} সূরা (৮৪) ইনশিকাক: ৬-১৫ আয়াত।

^{১৬৮} সূরা (৯৯) ফিলযাল: ১-৮ আয়াত।

^{১৬৯} সূরা (২১) আবিয়া: ৪৭ আয়াত।

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَانَكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِأَيَّاتِنَا يَظْلِمُونَ

“সে দিন ওজন ঠিক করা হবে, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নির্দশনকে প্রত্যাখ্যান করত।”^{১৭০}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَلَمَّا مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّةٌ هَلْوَيَةٌ وَمَا أَنْزَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ

“তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে ‘হাবিয়া’ (গভীর গর্ত); তুমি কি জান তা কী? তা অতি উজ্জ্ঞল আগ্নি।”^{১৭১}

৪. ৫. ৭. সিরাত

সিরাত অর্থ রাস্তা বা পথ। আবিরাতের বিশ্বাসে সিরাত বলতে জাহানামের উপরে স্থাপিত রাস্তা বা সেতুকে বুঝানো হয়। মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, আবিরাতে জাহানামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা বা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহানাম অতিক্রম করে জালাতের দিকে যেতে হবে। নবীগণ, সিদ্ধীকগণ, মুমিনগণ, কাফিরগণ, হিসাব-মৃক্তগণ সকলেই এ সেতু অতিক্রম করবেন। পৃথিবীতে আল্লাহর রাস্তায় যে যেতাবে চলেছেন আবিরাতের রাস্তা বা সেতুও তিনি সেতাবেই অতিক্রম করবেন।

এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইঙ্গিত রয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَيُضْرِبُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهَرَانِيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُولِ بِأَمْتَهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِيَوْمِنِدَ أَحَدٌ إِلَّا الرَّسُولُ وَكَلَامُ الرَّسُولِ يَوْمَنِدُ اللَّهُمَّ سَلَّمَ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَابِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ... غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرُ عَظَمَهَا إِلَّا اللَّهُ تَحْكُمُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمَنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُخْرَذَلُ ثُمَّ يَنْجُو

“অতঃপর জাহানামের মধ্য দিয়ে রাস্তা বসানো হবে। তখন রাসূলগণের মধ্য থেকে আমিই প্রথম আমার উম্যাত নিয়ে তা অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না। আর রাসূলগণের কথা হবে: নিরাপত্তা

^{১৭০} সূরা (৭) আ'রাফ: ৮-৯ আয়াত।

^{১৭১} সূরা (১০১) কারিয়: ৬-১১ আয়াত।

দিন, নিরাপত্তা দিন। জাহান্নামের মধ্যে মরুভূমির 'সাঁদান' বৃক্ষের কাটার মত দেখতে অতিকায় বিশাল বিশাল আংটা বা হুক থাকবে ... যেগুলির আকৃতির বিশালত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। সেগুলি মানুষদেরকে তাদের কর্মের অনুপাতে টেনে নিবে। তাদের মধ্যে কেউ তার কর্মের কারণে ধ্বংসগ্রস্ত হবে এবং কেউ আঘাতপ্রাণ হবে এবং এরপর মুক্তিলাভ করবে।”^{১৭২}

অন্য হাদীসে আবু সাউদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيَجْعَلُ بَيْنَ ظَهَرِيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
الْجَسْرُ قَالَ مَذْخُصَةٌ مَرْلَةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَابِبٌ وَحَسَكَةٌ مَفْطَحَةٌ لَهَا
شُوَكَةٌ عَقِيقَاءُ تَكُونُ بِنَجْدِ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالْطَّرْفُ وَكَالْبَرْقِ
وَكَالرَّبِيعِ وَكَاجَارِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ فَنَاجَ مُسْلِمٌ وَتَاجَ مَخْدُوشٌ وَمَكْنُوشٌ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمْرُّ أَخْرُهُمْ يُسْخَبُ سَخْبًا

“অতঃপর সেতু আনয়ন করা হবে এবং জাহান্নামের উপরে তা স্থাপন করা হবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, সেতুটি কী? তিনি বললেন: অতিপিছিল ও পতনের স্থান, যার উপরে রয়েছে টেনে নেওয়ার জন্য আংটা এবং বিশালাকৃতির বক্র কাঁটা রয়েছে সেগুলি দেখতে নাজদের সাঁদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায়। মুসিম সে সেতুর উপর দিয়ে দৃষ্টিতে দ্রুততায়, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ শক্তিশালী ঘোড়ার ন্যায়, কেউ উষ্ণের গতিতে পার হবে, কেউ নিরাপদে অতিক্রম করবে, কেউ আগনের মধ্যে আহত ও কেউ আগনের মধ্যে জমাকৃত, এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে হিচড়ে পার করা হবে।”^{১৭৩}

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَأَرِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَفْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ افْتَوَا
وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِيتًا

“তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে (তা অতিক্রম করবে), এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।”^{১৭৪}

সাহাবী-তাবিয়ী মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

^{১৭২} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭৮, ৬/২৭০৮; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৬৪।

^{১৭৩} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৭০৭।

^{১৭৪} সূরা (১৯) মারইয়াম: ৭১-৭২ আয়াত।

৪. ৫. ৮. হাউয়

হাউয় (الحوض) অর্থ চৌবাচ্চা, পুকুর বা জলাশয়। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে একটি পবিত্র ‘হাউয়’ দান করেছেন যেখান থেকে তাঁর উম্মাত কিয়ামতের দিন পানি পান করবে। ত্রিশেরও অধিক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনু আবিল ইয়্য হানাফী শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন:

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بعض وثلاثون صحابياً، ولقد استقصى طرقها شيخنا العلامة عmad الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية

“হাউয়ের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলি বর্ণিত। আমাদের উত্তাদ আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রাহ) ‘আল-বিদ্যা ওয়ান নিহায়া’ নামক তার বৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলি একত্রিত করেছেন।”^{۱۹۴}

এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ قَدْرَ حَوْضِيِّ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةٍ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْبَيْنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَ نُجُومُ السَّمَاءِ

“ফিলিস্তিন থেকে ইয়ামানের সান্তান পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার হাউয়ের পরিমান তদুপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়।”^{۱۹۵}

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ حَوْضِيِّ أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنِ لَهُو أَشَدُّ بِيَاضَنَا مِنَ الْلَّاجِ وَأَحَدُ مِنَ الْعَسْلِ بِاللَّبَنِ وَلَا يَنْتَهِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصْدُ الرَّجُلُ إِلَيْ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَمْمَ تَرِدُونَ عَلَيَّ غَرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أُثْرِ الْوَضُوءِ

“আদান (ইয়ামান) থেকে আইলা (ফিলিস্তিন)-এর যে দূরত্ব তার চেয়ে বেশি প্রশংসনীয় আমার হাউয়ের। তার পানি বরফের চেয়েও বেশি শুরু এবং মধু মিশ্রিত দুঁফের চেয়েও বেশি মিষ্ট। তার পানপাত্রগুলি সংখ্যা আকাশের

^{۱۹۴} ইবনু আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ২২৭।

^{۱۹۵} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮০০।

তারকারাজির চেয়েও বেশি। একজন মানুষ যেমন তার হাউয় থেকে অন্য মানুষদের উট ঠেকিয়ে রাখে আমি তেমন ভাবে আমার উম্মাত ছাড়া অন্য মানুষদের ঠেকিয়ে রাখব। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমদের এমন একটি চিহ্ন রয়েছে যা অন্য কোনো উম্মাতের নেই, তোমরা আমার নিকট যখন আগমন করবে তখন ওয়ুর কারণে তোমাদের ওয়ুর অঙ্গগুলি উদ্ভায় উদ্ভাসিত থাকবে।”^{১৭৭}

সাহল ইবনু সাদ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنِّي فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مِنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبٍ وَمَنْ شَرَبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبْدًا
لَيْرَدَنْ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَغْرَفُهُمْ وَيَعْزُفُونِي ثُمَّ يَحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِي
فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَخْتَنَوا بَعْدَكَ (في روایة: إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا عَمِلُوا
بَعْدَكَ)، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي.

“আমি আগে হাউয়ে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয়) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউয়ে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব: এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে: আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী-সব নব উদ্ভাবন করেছিল। (মিতীয় বর্ণনায়: আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হয়ে যাক! তারা দূর হয়ে যাক!!”^{১৭৮}

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهَرِهِنَا إِذَا أَغْفَى إِغْدَاءَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
مُتَبَسِّمًا فَقَلَّا مَا أَصْحَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْزَلْتَ عَلَيَّ أَنْفَا سُورَةَ فَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ...)، ثُمَّ قَالَ أَنْتُرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ فَقَلَّا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهَرٌ وَعَنْهِ (أَعْطَانِيهِ) رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ
هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أَمْتَيِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّيْتُهُ عَنِّ النُّجُومِ فَيَخْتَلِجُ الْعَنْدُ مِنْهُمْ

^{১৭৭} মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৭, ৪/১৭৯৮-১৭৯৯।

^{১৭৮} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৬, ৬/২৫৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৮, ৪/১৭৯৩-১৭৯৫।

فَلَوْلُ رَبُّ إِنَّهُ مِنْ أَمْتَى فَيَقُولُ مَا نَذَرِي مَا أَحْنَثَ بَعْذَكَ

“একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তদ্বাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাঁসিমখে যাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি হাঁসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার উপরে একটি সূরা নাফিল করা হলো। অতঃপর তিনি সূরা কাউসার পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাউসার কী? আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তার রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন: কাউসার হলো একটি নদী যা মহান আল্লাহ আমাকে দেওয়ার প্রতিক্রিতি দিয়েছেন (অন্য বর্ণনায়: যা তিনি আমাকে প্রদান করেছেন)। তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এ হলো হাউয়, যেখানে আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন আমার নিকট আগমন করবে। তার পানপাত্রগুলি তারকারাজির ন্যায়। কোনো কোনো বান্দাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিগালক, এ তো আমার উম্মাতের একজন। তখন তিনি বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন করেছিল।”^{১৭৯}

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوْلَيْاهُ سَوَاءٌ وَمَأْوَاهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرْقِ (مِنَ اللَّبَنِ) وَرِيحَةُ أَطْيَبٍ مِنَ الْمِسْكِ وَكِبِيزَانُهُ كَنْجُومُ السَّنَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَطْمَئِنُ بَعْدَهُ أَبْدًا

“আমার হাউয়ের প্রশংসন্তা একমাসের পথ। এর সকল কোণ সমান। এর পানি দুধের চেয়েও (অন্য বর্ণনায় রৌপ্যের চেয়েও) শুভ এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধ। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।”^{১৮০}

৪. ৫. ৯. শাফা'আত

শাফা'আত (الشفاعة) (অর্থ সুপারিশ করা বা কারো দাবি বা আব্দারকে সমর্থন করা। শব্দটি 'আশ-শাফাউ (الشفاع) থেকে গৃহীত, যার অর্থ জোড়া বা জোড়া বানানো। শাফা'আতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আসীর (৬০৬ হি) বলেন: “হাদীসে বিভিন্ন স্থানে শাফা'আত শব্দটি এসেছে জাগতিক বা আবিরাতের বিষয়ে। এর অর্থ পাপ বা অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা।”^{১৮১}

^{১৭৯} মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩০০

^{১৮০} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৩।

^{১৮১} ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ২/৪৮৫।

আমরা দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ, খস্টানগণ ও অন্যান্য বিভাস্ত জাতি ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের শাফা'আতকে তাঁদের অধিকার ও ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে বিভাস্ত হয়েছে। তারা মনে করত যে, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে শাফা'আত করার জন্য নিঃশর্ত ও উন্মুক্ত অনুমতি, অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কাজেই তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত যে কাউকে সুপারিশ করে জান্মাতে নিতে পারবেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা তাঁদের শাফা'আত লাভের আশায় অতিভিত্তি বা শিরকে লিপ্ত হতো।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর খারিজী, মু'তায়িলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা পাপীদের জন্য নবীগণের বা অন্যদের শাফা'আত অঙ্গীকার করে। এক্ষেত্রে তাদের দলিলগুলি মূলত দু প্রকারের: (১) কুরআন কারীমের শাফা'আত অঙ্গীকার বিষয়ক আয়াতগুলি এবং (২) তাদের মতবাদ ভিত্তিক যুক্তি। তাদের মতে পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেওয়া আল্লাহর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফা'আতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে শাফা'আত বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ ব্যাখ্যা করব।

৪. ৫. ১. কুরআন কারীমে শাফা'আত

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো শাফা'আত কুরু করা হবে না, আল্লাহ ছাড়া কেউ শাফা'আতের অধিকার রাখবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শাফা'আতকারীও থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنْقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কাজে আসবেনা এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবেনা এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গ্রহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।”^{১৮২}

তিনি আরো বলেন:

وَأَنْقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا
تَقْعُدُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে

^{১৮২} সূরা (২) বাকারা: ৪৮ আয়াত।

না এবং কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্য ও পাবে না।”^{১৮৩}

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفُوْعَا مَمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْعِي فِيهِ
وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসার পূর্বে- যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।”^{১৮৪}

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

أَتَخْدُ مِنْ دُونِهِ أَلِهَةً إِنْ يُرِدُنَ الرَّحْمَنُ بِصَرًّا لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ

“আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।”^{১৮৫}

তিনি আরো বলেন:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْسِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَنْـِسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ
وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَعْقُونَ

“তুমি এ দ্বারা তাদেরকে সর্তক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না; হয়ত তারা সাবধান হবে।”^{১৮৬}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَنَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسِلَ نَفْسَ بِمَا كَسْبَتْ لَنْـِسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ

“এ দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ধ্রংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।”^{১৮৭}

^{১৮৩} সূরা (২) বাকারা: ১২৩ আয়াত।

^{১৮৪} সূরা (২) বাকারা: ২৫৪ আয়াত।

^{১৮৫} সূরা (৩৬) ইয়াসীন: ২৩ আয়াত।

^{১৮৬} সূরা (৬) আন'আম: ৫১ আয়াত।

^{১৮৭} সূরা (৬) আন'আম: ৭০ আয়াত।

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مَا فِي سَمَاءٍ أَيَّامٌ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَكِيلٍ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

“আল্লাহ তিনি আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাচীন হন। তিনি ব্যক্তীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবু ও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।”^{১৮৮}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَيَعْبَدُونَ مَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شَفَاعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ قَلْ أَتَبْتَغُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ

“তারা আল্লাহ ব্যক্তীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারণ করে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান পবিত্র এবং তাদের শিরীক করা থেকে তিনি উর্দ্ধে।”^{১৮৯}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
“বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।”^{১৯০}

উপরের আয়াতগুলিতে বাহ্যত শাফা‘আত অস্থীকার করা হয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে মু’তাফিলা ও অন্যান্য ফিরকা দাবি করে যে, কিয়ামতের দিন কারো শাফা‘আতে কোনো পাপীর ক্ষমালাভের ধারণা বাতিল ও ভিত্তিহীন।

বক্তৃত এ সকল আয়াতে মূলত শাফা‘আত বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। আমার ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওহীর জ্ঞানের সাথে কিছু কল্পনা যোগ করে আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের

^{১৮৮} সূরা (৩২) সাজদা: ৪০ আয়াত।

^{১৮৯} সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত।

^{১৯০} সূরা (৩০) যুমার: ৪৪ আয়াত।

মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা প্রিয়প্রাত্রগণ শাফা'আতের ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন। তারা তাদের ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করে মুক্তি দিতে পারবেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের এ ভাস্তু বিশ্বাস খণ্ডন করে জানিয়েছেন যে, শাফা'আতের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যান্য আয়াতে শাফা'আতের স্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি শাফা'আত করবেন তিনি যদি শাফা'আত করার জন্য মহান আল্লার অনুমতি গ্রহণ করেন এবং যার জন্য শাফা'আত করবেন তার প্রতি যদি মহান আল্লাহ সম্পৃষ্ট থাকেন তবে সেক্ষেত্রে শাফা'আত করার সুযোগ আল্লাহ প্রদান করবেন। যার প্রতি আল্লাহ সম্পৃষ্ট নন তার জন্য কেউই শাফা'আত করবে না। সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান আল্লাহর ইচ্ছা। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِأَنْهِ

“কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?”^{১৯১}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يُبَيِّنُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفَاعَةٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَإِعْنَدُهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তরু ও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?”^{১৯২}

তিনি আরো বলেন:

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

“যে দয়াময়ের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।”^{১৯৩}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنِ اتَّنَعَ لِهِ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

“দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না।”^{১৯৪}

^{১৯১} সূরা (২) বাকারা: ২৫৫ আয়াত।

^{১৯২} সূরা (১০) ইউনস: ৩ আয়াত।

^{১৯৩} সূরা (১৯) মারহিয়াম: ৮৭ আয়াত।

^{১৯৪} সূরা (২০) তাহা: ১০৯ আয়াত।

আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আরো বলেন:

وَلَا تَنْفِعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَنِّي لَهُ

“যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।”^{১৯৫}

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِّبِهِ مُشْفَقُونَ.

“তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্তুষ্ট।”^{১৯৬}

وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِي

“আকাশে কত ফিরিশ্তা রয়েছে! তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।”^{১৯৭}

উপরের আয়াতগুলি থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারি:

(১) শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শাফা'আতের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

(২) আল্লাহ অনুমতি দিলে কেউ শাফা'আত করতে পারবেন।

(৩) যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট শুধু তাকেই অনুমতি প্রদান করবেন।

(৪) আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফিরিশতাগণ সুপারিশ করবেন বলে কুরআনে স্পষ্টত বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য কারা তাঁর অনুমতিক্রমে সুপারিশ করতে পারবেন তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয় নি। হাদীস শরীফে এ বিষয়ক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(৫) যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে তার জন্যও আল্লাহর অনুমোদন পূর্বশর্ত।

(৬) যে ব্যক্তির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না।

^{১৯৫} সূরা (৩৪) সাবা: ২৩ আয়াত।

^{১৯৬} সূরা (২১) আমিয়া: ২৮ আয়াত।

^{১৯৭} সূরা (৫৩) নাজিম: ২৬ আয়াত।

৪. ৫. ৯. ২. হাদীস শরীকে শাফা'আত

অগণিত হাদীসে কিয়ামতের দিন নবীগণ ও অন্যান্য মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন আমল শাফা'আত করবে এবং তাদের শাফা'আত করুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন। হাদীসে বর্ণিত শাফা'আতের পর্যায়গুলি নিম্নরূপে ভাগ করা যায়:

(১) শাফা'আতে উয়মা (*الشفاعة العظمى*) বা মহোত্ম শাফা'আত। এদ্বারা বিচার শুরুর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা বুবানো হয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন নবী-রাসূলের নিকট গমন করে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট গমন করবেন। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শাফা'আত করবেন, মানুষদের বিচার শেষ করে দেওয়ার জন্য।

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফা'আতে মহান আল্লাহ তাঁর উম্মাতের অনেক গোনাহগারকে ক্ষমা করবেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফা'আতে অনেক পাপী মুসলিম জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

(৪) উম্মাতে মুহাম্মাদীর অনেক নেককার মানুষ শাফা'আত করবেন।

(৫) সন্তানগণ তাদের পিতামাতাদের জন্য শাফা'আত করবে।

(৬) কুরআন তাঁর তিলাওয়াতকারী ও অনুসারীদের জন্য শাফা'আত করবে।

(৭) সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত শাফা'আত করবে এবং তা করুল করা হবে।

উপরের আয়ত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পরি যে, শাফা'আতের অর্থ এই নয় যে, ফিরিশতাগণ বা অন্য কোনো বান্দা ইচ্ছামত কোনো মানুষকে সুপারিশ করবেন। কেউ যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দার নামে মানত করে, তাঁকে সাজদা করে, তাঁকে ডাকে বা তাকে 'চূড়ান্ত ভঙ্গি' করে এবং আশা করে যে, এরপ করাতে উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তাঁর জন্য সুপারিশ করবেন তবে তার এরপ আশা কুরআনের আলোতে মরিচিকার পিছে ছোটা ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যক্তির শাফা'আত লাভ তো দূরের কথা তাঁর মানত, সাজদা, ডাক বা চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভঙ্গিতে' যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা সম্মতি বোধ করেন তবে তাকেও আল্লাহ জাহান্নামে শান্তি দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে বা ঈমান বিশুद্ধ না করে এবং আল্লাহর সম্মতি অর্জনের চেষ্টা না করে কিন্তু কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবাসে, তাকে ভক্তি-সম্মান

করে বা সর্বদা তার জন্য দু'আ করে এবং আশা করে যে, উক্ত ফিরিশতা বা সমানিত বান্দা তাকে সুপারিশ করে আল্লাহর অসম্ভুষ্টি থেকে রক্ষা করবেন তবে বাতুল আশা ছাড়া কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে কেউ যদি ইমান ও তাওহীদ বিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর সম্ভুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতায় বা শয়তানের প্ররোচনায় কবীরা গোনাহে লিখে হয়ে পড়েন তবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সম্ভুষ্ট হলে তাঁর কোনো সম্মানিত বান্দাকে তার জন্য শাফা'আত করার অনুমতি প্রদান করবেন। মূল বিষয় আল্লাহর সম্ভুষ্টি। মহান আল্লাহ কোনো পাপী বান্দার তাওহীদ ও ইমানে সম্ভুষ্ট হলে তিনি নিজেই তাঁকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অথবা তাঁর কোনো সম্মানিত বান্দাকে সম্মান করে তার জন্য শাফা'আতের অনুমতি দিতে পারেন।

মু'তাযিলাগণ শাফা'আতে উয়মা স্বীকার করে; কারণ তা তাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। পাপী মুমিনের জন্য শাফা'আত বিষয়ক অন্যান্য আয়াত ও হাদীসকে তারা শাফা'আতে উয়মা বলে ব্যাখ্যা করে বা বাতিল করে দেয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সকল প্রকারের শাফা'আতেই বিশ্বাস করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই। তিনি যার উপর সম্ভুষ্ট হবেন তার জন্য তিনি দয়া করে শাফা'আতের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি যার উপর সম্ভুষ্ট থাকবেন তার জন্য তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত কেউ শাফা'আত করলে তিনি ইচ্ছা করলে তা কবুল করে গোনাহগার মুমিনকে ক্ষমা করতে পারেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা করে বলেন:

وَشَفَاعَةُ الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا ﷺ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُذْبَنِينَ
وَلِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِبِينَ الْعَقَابُ حَقٌّ ثَابِتٌ

“নবীগণের শাফা'আত সত্য। পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারিগণের জন্য, পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা হয়েছিল তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমাদের নবী (ﷺ)-র শাফা'আতও সত্য।”^{১৯৮}

৪. ৫. ১০. জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষের চৃড়ান্ত ঠিকানা ও গন্তব্যস্থল। কুরআন ও হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ রয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে,

^{১৯৮} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫৯-১৬৪।

কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই আবিরাত ও জাহানাম বিষয়ক কিছু কথা রয়েছে। এখানে দু-একটি আয়াত উল্লেখ করছি।

মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَظُ شَدَادٌ لَا يَغْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَغْتَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইঙ্গিন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মহদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।”^{১৯৯}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هُلْ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هُلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ
لِلْمُتَقْبَلِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تَوَعَّدُونَ لَكُلُّ أُوَّابٍ حَقِيقَةٌ مِنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ
بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ إِنْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
فِيهَا وَلَدِينَا مَزِيدٌ

“সে দিন আমি জাহানামকে জিজ্ঞাসা করব, ‘তুম কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ?’ জাহানাম বলবে: ‘আরও আছে কি?’ আর জাহানামকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীগণের, কোনো দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী হিফায়তকারীর জন্য। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনোদিতভাবে উপস্থিত হয়। তাদেরকে বলা হবে, ‘শান্তির সাথে তোমরা এতে প্রবেশ কর; তা অনন্ত জীবনের দিন।’ সেখায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক।”^{২০০}

তিনি আরো বলেন:

أَذْلَكَ خَيْرٌ نُزُلٌ أَمْ شَجَرَةُ الرِّزْقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَانَهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبَطْوَنَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشْوَبًا مِنْ حَمِيمٍ

“আপ্যায়নের জন্য এ-ই শ্রেয় না যাকুম বৃক্ষ? জালিমদের জন্য আমি তা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এ বৃক্ষ উদ্বিগ্ন হয় জাহানামের তলদেশ

^{১৯৯} সূরা (৬৬) তাহরীম: ৬ আয়াত।

^{২০০} সূরা (৫০) কাফ: ৩০-৩৫ আয়াত।

হতে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা তারা তা হতে ভক্ষণ করিবে, এবং উদর পূর্ণ করিবে এর দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য ফুটস্ট পানির মিশ্রণ।”^{২০১}

অন্যত্র মহান আল্লাহর বলেন:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ يُلْبِسُونَ مِنْ سُنْدَسٍ
وَإِسْتَبْرَقُ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَرَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ يَذْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ
لَا يَنْوُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى وَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ
رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“মুভাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হয়ে বসবে। এইরূপ ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়াতলোচনা হুর, সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহানামের শান্তি হতে রক্ষা করিবেন, তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। এ-ই তো মহা সাফল্য।”^{২০২}

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلوقَتُنِ الْيَوْمِ لَا تَقْنِيَانُ أَبْدًا، وَلَا تَمُوتُ الْعَيْنُ أَبْدًا، وَلَا
يَفْنِي عَقْبَ اللَّهِ تَعَالَى وَتُوْلِيهِ سَرْمَدًا.

“জান্নাত ও জাহানাম বর্তমানে সৃষ্টি অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।) জান্নাত ও জাহানাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হূরগণ কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত-চিরস্থায়ী শান্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।”^{২০৩}

৪. ৫. ১১. আর্খিরাতে আল্লাহর দর্শন

জান্নাতে মহান আল্লাহর দর্শনই হবে মুমিনগণের সর্বোচ্চ ও প্রেষ্ঠতম নিয়ামত। কুরআন কারীমের এবং অগণিত হাদীসে বারংবার এ নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বলেন:

وَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَيْ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

“সেদিন কোনো কোনো মুখ্যমুল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।”^{২০৪}

^{২০১} সূরা (৩৭) সাফ্ফাত: ৬২-৬৭ আয়াত।

^{২০২} সূরা (৪৪) দুখান: ৫১-৫৭ আয়াত।

^{২০৩} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৬৫-১৬৮।

^{২০৪} সূরা (৭৫) কিয়ামা: ২২-২৩ আয়াত।

আধিরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বহু-সংখ্যক বা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের। এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন:

إِنَّ أَنَاسًا فِي زَمْنِ النَّبِيِّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّبِيُّ نَعَمْ هُلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ وَهُلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لِلَّهِ الْبَزَرُ ضَوْءَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا

“নবী (ﷺ)-এর যুগে কিছু মানুষ বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তখন নবী (ﷺ) বলেন: হ্যা। হিপুরের সময় আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তবে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বলেন: না। তিনি বলেন: পূর্ণিমার রাতে আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তাহলে কি চাঁদ দেখতে তোমরা বাধাহস্ত হও? তারা বলেন: না।”^{২০৫}

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هُلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لَا قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا رَبَّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا هُمْ

“আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তিনি বলেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্য বা চন্দ্র দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? আমরা বললাম: না। তিনি বলেন: সেদিন তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না, ঠিক যেমন চন্দ্র ও সূর্য দেখতে অসুবিধা হয় না।”^{২০৬}

অন্য হাদীসে জরীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন:

كَمَا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لِلَّهِ يَعْنِي الْبَزَرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَا هُمْ

“আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ছিলাম। রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন: তোমরা যেভাবে এ চাঁদকে দেখছ, কোনোরূপ অসুবিধা হচ্ছে না, সেভাবেই তোমরা তোমাদের

^{২০৫} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭৭; ৪/১৬৭১; ৫/২৪০৩; ৬/২৭০৮; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৬৩-১৬৭, ৪/২২৭৯।

^{২০৬} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৭০৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৬৭।

প্রতিপালককে দেখবে।”^{২০৭}

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে সাহারীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাতের অনুসারীগণ প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতে মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দর্শন করবেন। খারিজী, মু'তাফিলী ও সমমনা কোনো কোনো ফিরকা আবিরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের কথা অঙ্গীকার করে। কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু যুক্তি তাদের দলিল। মহান আল্লাহ বলেন:

لَا تُنَزِّلُكُمْ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُنَزِّلُكُمُ الْأَطْفَالَ الْخَيْرَ

“তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সৃষ্টিদশী, সম্যক পরিজ্ঞাত”^{২০৮}

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْتَيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حِكْمَةٍ

“কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দৃত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দৃত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সম্মত, প্রজ্ঞাময়”^{২০৯}

মূসা (আ) যখন আল্লাহকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তিনি বলেন:

لَنْ تَرَانِي

“তুমি আমাকে দেখবে না।”^{২১০}

এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে তারা দবি করেন যে, মহান আল্লাহকে আবিরাতে দর্শন করা সম্ভব নয়; কারণ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। তারা আরো যুক্তি পেশ করেন যে, মহান আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে। তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো তাকে স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নন। তাঁকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও আপত্তির মাধ্যমে বাতিল করে দেন।

^{২০৭} বুখারী, আস-সহীহ ১/২০৩, ২০৯, ৪/১৮৩৬, ৬/২৭০৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৩৯।

^{২০৮} সূরা (৬) আন'আম: ১০৩ আয়াত।

^{২০৯} সূরা (৪২) শূরা: ৫১ আয়াত।

^{২১০} সূরা (৭) আরাফ: ১৪৩ আয়াত।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি গাইব বা অদৃশ্য জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে ওহীর কাছে আত্মসমর্পনই মুক্তির একমাত্র পথ। ওহীর মাধ্যমে আমরা জানি যে, পৃথিবীতে আল্লাহ কোনো নবীর সাথেও দেখা দেন না এবং তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। আবার ওহীর মাধ্যমেই আমরা জানি যে, কিয়ামতে কিছু মানুষ তাদের প্রতিপালকের দিকে তাঁকিয়ে থাকবেন এবং মুমিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখবেন। আর এতদুভয়ের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্য নেই। যা কিছু বৈপরীত্য কল্পনা করা হয় তা সবই আখিরাত বা গাইবী জগতকে পার্থিব জগতের মত কল্পনা করার ফল এবং ওহীর নিকট আত্মসমর্পন না করার পরিণতি। মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের উপর ‘কিয়াস’ করে বা মানবীয় বিশেষণের মত মনে করে দর্শন ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যেয়ে এরা বিভ্রান্তির মধ্য নিপত্তি হয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীগণ এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতির অনুসরণে সকল আয়ত ও হাদীস সমানভাবে বিশ্বাস করেন। কারণ উভয় বিষয়ই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন। আর উভয়ের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা সুস্পষ্ট বৈপরীত্য নেই। মানবীয় জ্ঞান আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব বলে গণ্য করে না। কাজেই আখিরাতের দর্শনের খুচিনাটি বিষয় মানবীয় কল্পনা দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করা বা তা অঙ্গীকার করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়।

আখিরাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:
وَالله تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَبِرَاهِ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رَؤُوسِهِمْ
بِلَا تَشْبِيهٍ وَلَا كَفِيفَةٍ

“আখিরাতে মহান আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন। জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে মুমিনগণ তাঁকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের চর্মচক্ষু দ্বারা। এই দর্শন সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে।”^{২১১}

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী বলেন: “জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহর দর্শন লাভ সত্য। তা হবে বিনা পরিবেষ্টনে এবং আমাদের বোধগম্য কোনো ধরন বা প্রকৃতি ব্যতীত। আমাদের প্রতিপালকের গ্রন্থে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে: ‘সে দিন অনেকের মুখ মন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের পানে দৃষ্টিমান থাকবে।’”^{২১২} এ বাণীর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ও তাঁর

^{২১১} ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার (খামীস-এর শারহ-সহ), পৃ. ৬৭।

^{২১২} সুরা কিয়ামাহ: ২২-২৩ আয়াত।

প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তিতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত আছে তা যেভাবে তিনি বলেছেন সে ভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং এর দ্বারা তিনি যে উদ্দেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিতে হবে। এতে আমরা নিজেদের মতামত অনুসারে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বা নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাব না। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই ভাস্তি ও পদচ্ছলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিজেকে সমর্পন করে এবং তাঁর নিকট সংশয়যুক্ত বিষয়ের সঠিক জ্ঞান এর জ্ঞাতার উপর হেঢ়ে দেয়। পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার ব্যক্তিরেকে কারো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে যা জানা তার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যার বুদ্ধি আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তুষ্ট হয় না সে খালেস তাওহীদ, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ইমান থেকে দূরে থাকবে। এমতাবস্থায়, সে কুফরী ও ইমান, সমর্পন ও অঙ্গীকৃতি এবং গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি প্রবর্ষিত, ওয়াওয়াসগ্রাহ্ণ, দিশাহারা ও সংশয়ী হয়ে দোটানায় দোদুল্যমান থেকে যায়। সে না হয় পূর্ণ সমর্পক মু'মিন এবং না হয় দুঃখ অবিশ্বাসী কাফির। জান্নাত বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ সম্পর্কে এমন লোকের ইমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে তাদের পক্ষে বিশেষ কল্পনার বিষয় মনে করবে বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এর অপব্যাখ্যা করবে। কারণ, আল্লাহর দর্শন এবং তাঁর কুরুবিয়াত সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা হলো এর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা এবং তা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা। এই নীতির উপরই মুসলিমদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর, যে ব্যক্তি (আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে) অঙ্গীকৃতি ও তুলনা করা হতে আত্মরক্ষা না করবে তার অবশ্যই পদচ্ছলন ঘটবে এবং সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে। কেননা, আমাদের মহামহিম প্রভু অনন্য অতুলনীয় গুণাবলির দ্বারা বিশেষিত এবং একত্রে বিশেষণে বিভূষিত। বিশ্বলোকের কেউ তাঁর শুণে গুণান্বিত নয়।”^{১১৩}

৪. ৫. ১২. কিয়ামতের পূর্বাভাসসময়

৪. ৫. ১২. ১. কিয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন

কিয়ামত বা মহা প্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কিয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআন কারীমে বিশ্যটি বারংবার বলা হয়েছে। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

^{১১৩} আবু জাফর তাহাবী, মাতুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১০।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجْلِيهَا
لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعثة يسألونك كأنك
حفي عندها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون

“তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিক ভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে’। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।’”^{২১৪}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُنْعَثُونَ

“বল, ‘আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাহবের (অদ্শ্যের) জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুদ্ধিত হবে।’”^{২১৫}

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ
مُنْتَهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا

“তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, ‘তা কখন ঘটবে?’ কিয়ামতের আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট। যে তা ভয় করে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।”^{২১৬}

৪. ৫. ১২. ২. কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাস

কিয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানান নি, তবে কিয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

فَهُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ الشَّرَّ أَطْهَا فَإِنَّمَا لَهُمْ إِذَا
جَاءُنَّهُمْ ذِكْرَاهُمْ

^{২১৪} সূরা (৭) আরাফ: ১৮৭ আয়াত।

^{২১৫} সূরা (২৭) নামল: ৬৫ আয়াত।

^{২১৬} সূরা (৭৯) নাফি'আত: ৪২-৪৫ আয়াত।

“তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?”^{১১৭}

কিয়ামতের বিষয়ে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীকে বিভিন্ন পূর্বাভাস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুমিন সরল অন্তরণে সহজভাবে বিশ্বাস করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ এগুলি মধ্যে কিছু বিষয়কে ‘আলামত সুগরা’ (العلمات الصغرى) অর্থাৎ ‘স্কুলতর আলামত’ বা ‘সাধারণ আলামত’ এবং কিছু বিষয়কে ‘আলামত কুবরা’ (العلمات الكبرى) অর্থাৎ ‘বৃহত্তর আলামত’ বা বিশেষ আলামত বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. ৫. ১২. ৩. আলামত সুগরা

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন। সাহল ইবনু সায়িদ আস সায়িদী বলেন:

بَعْثَتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهْدَهُ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَانِينَ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىِ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলী একত্রিত করে বলেন: “আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি”^{১১৮}

এভাবে আমরা দেখছি যে, খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের অন্যতম পূর্বাভাস। বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের আরো অনেক পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে আরব উপনিষদে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে। ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বা সম্পদ প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিঘ্ন ছড়িয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভগু নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল আলামত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ আলামতগুলি প্রকাশিত হবে।

^{১১৭} সূরা (৪৭) মুহাম্মাদ: ১৮ আয়াত।

^{১১৮} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৮৮১, ৫/২০৩১, ২৩৮৫; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৯২, ২২৬৮-২২৬৯।

৪. ৫. ১২. ৪. আলামাত কুবরা

সাহাবী হৃষাইফা ইবনু আসীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা করছ? আমরা বললাম: আমরা কিয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বলেন

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّىٰ تَكُونُ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ
بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالْخَانُ وَالْجَلَّ وَدَائِيَةِ الْأَرْضِ وَيَاجُوحُ
وَمَاجُوحٌ وَطَلْوَعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَفْرَةِ عَدَنٍ تَرْخَلُ
النَّاسُ، وَنَرْوُلٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ ...

“দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না: (১) পূর্ব দিকে ভূমিধৰ্মস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধৰ্মস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৩) আরব উপদ্বিপে ভূমিধৰ্মস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৪) ধূম্র, (৫) দাঙ্গাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজুজ-মাজুজ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) ঈসা ইবনু মরিয়াম (আ)-এর অবতরণ।”^{১১৯}

এ সকল আলামত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সহ অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। কুরআন কারীমে কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত বা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَائِيَةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِأَيْمَانِنَا لَا يُوقِنُونَ

“যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে বাহির করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এই জন্য যে, মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী।”^{১২০}

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَقُولُوهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبَّهُ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ شَكٌ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

^{১১৯} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২২৫-২২২৬।

^{১২০} সূরা (২৭) নামল: ৮২ আয়াত।

إِلَّا اتَّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتْلُوْهُ يَعْنَا بِلْ رَفْعَةُ اللَّهِ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

“আর ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারযাম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি’ তাদের (ইহুদীদের) এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ঝুশাবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সমক্ষে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সমক্ষে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।”^{২২১}

এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর পুনরাগমনের পরে তাঁর মৃত্যুর আগে সকল কিতাবীই তার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে।

ইয়াজুজ মাজুজের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

حَتَّىٰ إِذَا فُتُحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَبَّبٍ يَنْسُلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَا وَلَئِنْ كُنَّا فِي غَفَّلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا طَالِمِينَ

“এমন কি যখন যাঁজুজ ও মাঁজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিক্রিতকাল আসন্ন হলে অকস্মাত কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম’।”^{২২২}

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وَخْرُوجُ الدِّجَالِ وَيَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَطَلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَزُولُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَا وَرَدَ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيقَةُ حَقُّ كَائِنٍ

“দাজ্জালের বহিগমন, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিগমন, অন্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের

^{২২১} সূরা (৮) নিসা: ১৫৭-১৫৯ আয়াত।

^{২২২} সূরা (২১) আমিয়া: ৯৬-৯৭।

অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”^{২২৩}

এখানে ইমাম আবু হানীফ (রাহ) কিছু আলামতের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তা হলো ‘সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্বাস করা মেনে নেওয়া।’ ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: “আমরা কিয়ামতের নির্দর্শনসমূহ বিশ্বাস করি, যেমন, দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্যোদয় এবং দার্কাতুল আরয (যমীনের জীব) নামে পরিচিত এক বিশেষ জন্মের স্থীয় স্থান থেকে বর্তিগত হওয়া। আমরা কোনো গণক, জ্যোতিষী বা ভবিষ্যতব্জার কথা বিশ্বাস করি না। অনুরূপভাবে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাত ও উচ্চতে ইসলামীর ঐক্যমত্যের বিপরীত কিছু দাবী করে।”^{২২৪}

৪. ৬. তাকদীরের বিশ্বাস

৪. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ

‘কাদর’ ও ‘কাদার’ (القدرُ وَ القدْرُ) শব্দ মূলত পরিমাপ, পরিমান, মর্যদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়। তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।^{২২৫} ইসলামের পরিভাষায় ‘ঈমান বিল কাদার’ (إيمان بالقدر) অর্থ আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যূগী জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারণ বা তাকদীরে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের ভাল মন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয়না। সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারিত ‘পরিমাপ’ বা ‘কাদার’-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدْرٍ

“আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।”^{২২৬}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْزَدُّ وَكُلُّ شَيْءٍ

^{২২৩} মোস্তাফা আলী কারী, শাবহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯৩।

^{২২৪} আবু জাফর তাহাবী, মাতৃসূল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ২০।

^{২২৫} ইবনু ফারিস, মুজাম্ম মাকায়সিল লুগাহ ৫/৬২।

^{২২৬} সূরা (৫৪) কামার: ৪৯ আয়াত।

عِنْدَهُ بِعْدَارٍ

“প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাঢ়ে আল্লাহ তা জনেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।”^{২২৭}

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَانَةٌ وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِعِنْدِ مَعْلُومٍ

“আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাবার এবং আমি তা পরিভ্রান্ত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।”^{২২৮}

তাকদীরে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভাসি জন্ম নেয়। এখানে তাকদীরে বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

৪. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ নিম্নের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা:

৪. ৬. ২. ১. আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস

মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয়না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই।

৪. ৬. ২. ২. আল্লাহর শিখনে বিশ্বাস

ইসলামী বিশ্বাসের অংশ হলো যে, আল্লাহ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান ‘কিতাবে মুবীন’ (সুস্পষ্ট কিতাব) বা ‘লাওহে মাহফজে’ (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন। লিখনের প্রকৃতি আমরা জানিনা। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন:

وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلَّمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“অদৃশ্যের কুণ্ডি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না; মৃত্যুকার অঙ্ককারে এমন কোনো শস্য কণাও নেই অথবা

^{২২৭} সূরা (১৩) রাদ: ৮ আয়াত।

^{২২৮} সূরা (১৫) হি�জর: ২১ আয়াত।

রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।”^{২২৯}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَا تَكُونُ فِي شَاءْ وَمَا تَنْتَلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالٍ ذَرَةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْنَعُرْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

“তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা
আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক
যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অগু পরিমাণ ও
তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর
কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।”^{২৩০}

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَمَا مِنْ دَلَائِلَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرِئُهَا
وَمُسْتَوْدِعُهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

“ভূপ্লটে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি তাদের স্থায়ী
ও অস্থায়ী অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।”^{২৩১}

আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা অবগত
আছেন? এ সকলই আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহর নিকট সহজ।”^{২৩২}

তিনি আরো বলেন:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

“আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট
কিতাবে নেই।”^{২৩৩}

অন্যত্র তিনি বলেন:

^{২২৯} সূরা (৬) আন'আম: ৫৯ আয়াত।

^{২৩০} সূরা (১০) ইউনুস: ৬১ আয়াত।

^{২৩১} সূরা (১১) হুদ: ৬ আয়াত।

^{২৩২} সূরা (২২) হাজ্জ: ৭০ আয়াত।

^{২৩৩} সূরা (২৭) নামল: ৭৫ আয়াত।

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْ قَالُ ذَرْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْنَافٌ مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তার অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু
কিংবা অদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, বরং এসবের প্রত্যেকটিই (লিপিবদ্ধ)
আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।”^{২৩৪}

অন্যত্র মহান् আল্লাহ বলেন:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُّ مِنْ
أثْنَى وَلَا تَضْعُفُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, অতঃপর তোমাদেরকে
করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গৰ্ভধারণ করে না এবং প্রসবও
করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা
হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে ‘কিতাবে’। তা আল্লাহর জন্য সহজ।”^{২৩৫}

অন্যত্র তিনি বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে
আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লিপিবদ্ধ) থাকে; আল্লাহর পক্ষে
এ খুবই সহজ।”^{২৩৬}

তিনি আরো বলেন:

لَكُلَّ أَجْلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
“প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন আর
যা ইচ্ছা রেখে দেন, আর তার কাছেই আছে উম্মুল কিতাব বা মূল গ্রন্থ।”^{২৩৭}

৪. ৬. ২. ৩. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহাবিশ্বে
যা কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার জ্ঞানে। তাঁর ইচ্ছা ও

^{২৩৪} সূরা (৩৪) সাবা: ৩ আয়াত।

^{২৩৫} সূরা (৩৫) ফাতির: ১১ আয়াত।

^{২৩৬} সূরা (৫৭) হাদীদ: ২২ আয়াত।

^{২৩৭} সূরা (১৩) রাদ: ৩৮-৩৯ আয়াত।

জ্ঞানের বাহিরে এই মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনাও ঘটেনা।
কুরআন কারীমে বারংবার তা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا يُنْذِلُ مَنْ يَشَاءُ
فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ
সর্বজ্ঞ, প্রজাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অঙ্গরূপ করেন, কিন্তু
জালিমরা তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মস্তুদ শাস্তি।”^{২৩৮}

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“এ তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরল
পথে চলতে চায় তার জন্য। তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের
প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।”^{২৩৯}

৪. ৬. ২. ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস

মুমিন বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি ছাড়া
সবই সৃষ্টি। যানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন
স্থানে বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالقُ كُلُّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ وَكَلِيلٌ

“এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ
নেই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর; তিনি সব
কিছুর তত্ত্বা঵ধায়ক।”^{২৪০}

أَمْ جَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخْلَقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِّ اللَّهُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ

“তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির
মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভাসি ঘটিয়েছে! বল,
আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।”^{২৪১}

^{২৩৮} সূরা (৭৬) ইন্সান (দাহর): ৩০-৩১ আয়াত।

^{২৩৯} সূরা (৮১) তাকবীর: ২৭-২৯ আয়াত।

^{২৪০} সূরা (৬) আন-আম: ১০২ আয়াত।

^{২৪১} সূরা (১৩) রা�'দ: ১৬ আয়াত।

وَاللَّهُ خَلَقْتُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“এবং আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা।”^{২৪২}

৪. ৬. ২. ৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের উপরেই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় যে কর্ম করে সে শুধু তারই পুরস্কার বা শান্তি লাভ করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ বিবেক, বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে। তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। কুরআন কারীমের মহান আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে তার ফল ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَجَعَلْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا

“আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।”^{২৪৩}

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَقَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

“আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নি দু'চক্ষু? আর জিহ্বা ও দু'ওষ্ঠ? এবং আমি তাকে কি দু'টি পথই দেখাই নি?”^{২৪৪}

وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَّهَا فُجُورٌ هَا وَتَفْوَاهَا قَذْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَذْ خَابَ مَنْ نَسَاهَا

“শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুষ্ঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অস্তকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম হবে, যে নিজকে পবিত্র করবে। এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজকে কলুষিত করবে।”^{২৪৫}

তাকদীরে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর জ্ঞান ও আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা উভয়

^{২৪২} সূরা (৩৭) সাফাত: ১৬ আয়াত।

^{২৪৩} সূরা (৭৬) ইনসান/ দাহর: ২-৩ আয়াত।

^{২৪৪} সূরা (৯০) বালাদ: ৮-১০ আয়াত।

^{২৪৫} সূরা (৯১) শামস: ৮-১০।

বিশেষণে সমানভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহর তাকদীর বা নির্ধারণে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা হয়। আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাস করলে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ও করুণায় অবিশ্বাস করা হয়। এ অবিশ্বাসের শুরু মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মকে মানুষের বিশেষণ বা কর্মের মত বলে বিশ্বাস করা থেকে। আল্লাহর সকল বিশেষণ সমানভাবে প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করলে এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না।

স্তুতিত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যাবে। আল্লাহর নির্ধারণ হলো যে, বিষ মৃত্যু আনে। মানুষকে আল্লাহ বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন যে, বিষ মৃত্যু আনে। এরপরও কেউ বিষ পান করলে সে মৃত্যু বরণ করবে। তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুসারে ঘটবে। আল্লাহ তাঁর অনন্ত জ্ঞানে জানেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বা না জেনে বিষ পান করবে। তিনি তাঁর এ জ্ঞান ‘কিতাব মুবীন’ বা ‘গাওহে মাহফূয়ে’ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি হরণ করে তাকে বিষপান থেকে বিরত রাখতে পারেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে বিষপানকারীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহর জ্ঞান, লিখনি বা তাকুদীর ও নির্ধারণ অনুসারে বিষপানকারীর মৃত্যু আসবে অথবা আসবে না। এবং বিষপানকারী বিষপানে তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও কর্ম অনুসারে কর্মফল লাভ করবে।

৪. ৬. ৩. তাকদীরের বিশ্বাসের বিকৃতি

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, গাইবী বিষয়ে বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর শিক্ষাকে আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস না করে যুক্তি, তর্ক, ব্যক্তিগত অভিমত, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির আলোকে বিচার, গ্রহণ, সংযোজন ইত্যাদি করা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ। মক্কার কাফিরগণ তাকদীর বিষয়ে এরূপ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপত্তি ছিল। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا
أَبْأَوْنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُنَّ عَلَى
الرُّسُلِ إِلَّا ابْلَاغُ الْمُبِينِ

“মুশার্রিকরা বলে, ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ও আমরা; তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিবেধ করতাম না।’ তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপ করত। রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।”^{২৪৬}

^{২৪৬} সূরা (১৬) নাহল: ৩৫ আয়াত।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاوْنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ
شَيْءٍ كَذَّاكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْبَابًا قُلْ هُنَّ عَنْكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتَخْرُجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبَعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلَلَّهِ الْحَجَّةُ
الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“যারা শিরক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না।’ এ-ভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও কুফৰী করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, ‘তোমাদের নিকট কোন ‘ইলম’ আছে? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর; তোমরা শুধু ধারণাই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল। বল, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই; তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন।’”^{২৪৭}

কাফিরদের এ বিকৃতির ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি। কাফিরগণ বলেছে: “আল্লাহ চাইলে আমরা এরপ করতাম না।” এ কথা দ্বারা তারা বুঝাচ্ছে যে, আমরা যে শিরক করছি তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে এবং আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন। কাজেই এ কাজের প্রতিবাদ করা বা একে অন্যায় বলা যায় না।

মহান আল্লাহ বলেন: “তোমাদের নিকট ‘ইলম’ থাকলে তা দেখাও।” অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বিষয়ে যা বলছ তা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো ইলম বা কিভাবে থাকলে তা দেখাও। তোমরা যা বলছ তা ওহীর জ্ঞান নয়, বরং তা যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক ‘ধারণা’ মাত্র। আর প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর নামে মিথ্যা। এরপর আল্লাহ ওহীর জ্ঞানটি জানিয়ে দিলেন, তা হলো: “তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন।”

এখানে ওহীর জ্ঞান: “আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে হিন্দায়েত করতেন।” ওহীর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ: আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন এবং সৈমানকে পছন্দ করেন তা তোমাদেরকে ওহীর জ্ঞান ও বিবেকের নির্দেশনার মাধ্যমে জানিয়েছেন। তবে তোমরা তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অপব্যবহার করে কুফৰী করেছ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। তবে তোমাদের অবাধ্যতার কারণে তোমরা সে দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছ।

^{২৪৭} সূরা (৬) আন'আম: ১৪৮-১৪৯ আয়াত।

আর কাফিরদের দাবি: “আল্লাহ চাইলে আমরা পাপ করতাম না।” কাফিরদের দাবি ওহীর বিকৃতি ও ওহীকে নিজেদের মর্যি মত ব্যাখ্যার ফল। তারা ওহীর অন্য সকল নির্দেশনা বাদ দিয়ে দু একটি নির্দেশনাকে নিজেদের মর্যি মত ব্যাখ্যা করেছে। তাদের যুক্তি আমরা নিম্নভাবে সাজাতে পারি: আল্লাহ বলেছেন: ‘তিনি চাইলে আমাদেরকে হেদায়াত করতেন।’ এতে বুঝা যায় যে ‘তিনি চাইলে আমাদেরকে শিরক করতাম না।’ এতে বুঝা যায় যে, তিনি চান বলেই আমরা শিরক করি। এতে বুঝা যায় যে, আমাদের কর্মে সম্মত।” কাফিররা যে দাবি করছে হ্বহ সে কথা কোনোভাবে কোনো ওহীর শিক্ষায় নেই। তা ওহীর মনগড়া ব্যাখ্যা, যুক্তি-তর্ক নির্ভর ‘ধারণা’ এবং আল্লাহর নামে ঘির্থ্যা বলা মাত্র।

এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, এ সকল মনগড়া তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা রাসূলের দায়িত্ব নয়। বরং ওহীর হ্বহ শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়াই তাঁর দায়িত্ব।

৪. ৬. ৪. ইসলামী তাক্বুদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা

ইসলামী তাক্বুদীরে বিশ্বাস ও অন্যসমাজিক ভাগে বিশ্বাসকে অনেক সময় এক করে ফেলা হয়। অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন কর্মের কি দরকার। আমরা দেখলাম যে, এ সকল চিন্তা ওহীর বিকৃতি ও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক ‘ধারণা’ মাত্র, মুক্তার কাফিরদের ধারণার মতই একটি বিকৃত ধারণা মাত্র।

যে অবিশ্বাসী তাক্বুদীর নিয়ে বিবাদ করে, তাক্বুদীরের দোহাই দিয়ে কর্ম ছেড়ে দেয় সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে। সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়, আমার কাজ হলো আল্লাহর কাজের বিচার করা।

আর মুমিনের বিশ্বাস, আল্লাহর কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয়। তিনি কি জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছেন আর কি রেখে দেন কিছুই মানুষকে জানাননি। কারণ, এসব জানা মানুষের কোনো কল্যাণে আসবেনা। এসব কিছুই তাঁর যথান ঝুঁবিয়্যাতের অংশ। মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর রহমত ও করুণার উপরে আস্তা রেখে আল্লাহর নির্দেশ মত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উদ্বেগ বা উৎকর্ষ মনে স্থান না দেওয়া। ইসলামের তাক্বুদীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমূর্খী করে তোলে, কখনই কর্মবিমূর্খ করেনা। তাক্বুদীরে বিশ্বাসের ফলে মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুঃচিন্তা থেকে মুক্তি পায়। মুসলিম জানে যে, তার দায়িত্ব কর্ম করা, ফলাফলের জন্য দুঃচিন্তা বা উৎকর্ষ তার জীবনে অর্থহীন, কারণ ফলাফলে দায়িত্ব এমন এক

সন্তার হাতে যিনি তাকে তার নিজের চেয়েও ভাল জানেন, ভালবাসেন, যিনি দয়াময়, যিনি কাউকে জুলুম করেন না। যিনি তাঁর বান্দাকে কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে চান। তাই মুমিন উৎকর্ষ মুক্ত হয়ে কর্ম করেন।

তাকুদীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশ থেকে রক্ষা করে। তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে উঠেন। সে জানে আল্লাহর ইচ্ছায় ও রহমতেই সে সফলতা লাভ করেছে। তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। কৃতজ্ঞ হৃদয় আর অহংকারী হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে মানবিক ও পাশাবিক হৃদয়ের পার্থক্য।

অপরদিকে মুমিন ব্যর্থতায় বা পরাজয়ে হতাশ হয় না। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে জানে যে, তার প্রচেষ্টা ও কর্মের জন্য সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভ করবে। কাজেই সে হতাশ না হয়ে নিজের কর্মের ভুল দূর করে আল্লাহর নির্দেশ মত চেষ্টা করতে থাকে, ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়।

তাকুদীরে বিশ্বাসের ফল আমরা দেখতে পাই এ বিশ্বাস সর্বপ্রথম যাদের জীবনে এসেছিল তাঁদের জীবনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে। আমরা দেখেছি তাকুদীরের উপর সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মহানবী (ﷺ)-এর, আর তাই তিনি সবচেয়ে ছিলেন বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর। তিনি তার সাধ্যমত কর্ম করেছেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তার কর্ণণার জন্য, আর ফলাফলের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তার প্রতিপালকের কাছে। ঠিক তেমনি অকুতোভয় দুঃপ্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ, তাকুদীরে বিশ্বাস তাদের সকল সংশয়, ভয়, দুষ্টিত্ব দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে।

এ বিশ্বাসের জন্যই অতি নগন্য সংখ্যক বিশ্বাসী মুসলিম বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। এইরূপ অকুতোভয় শক্তিশালী তাকুদীরে বিশ্বাসী কর্মবীর মুমিনকে আল্লাহ ভালবাসেন, যার তাকুদীরে বিশ্বাস তাকে পরাজয়ের হতাশা, হা হতাশ ও গ্লানি থেকে রক্ষা করে। অতীতের পরাজয় বা ব্যর্থতা নিয়ে যিনি আফসোস বা হা-হতাশ করেন না, আবার ভবিষ্যতের পরাজয়ের দুষ্টিত্বও তাকে দিখান্বিত করতে পারে না। বরং সকল পরাজয় পায়ে দলে তাকুদীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যান। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ
احرصنْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَغْرِبْ وَإِنْ أَصْبَاكَ شَيْءٌ فَلَا تَقْلِلْ لَوْ

أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ
الشَّيْطَانِ

“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দূর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অক্ষম, দূর্বল বা হতাশ হয়ে যেওনা। যদি তোমার কিছু হয় (যদি তুমি আশানুরূপ ফল না পাও বা ব্যর্থ হও) তবে কখনো বলবেনা: হাঁয়, যদি আমি ঐ কাজ করতাম বা সেই কাজ করতাম তাহলে হয়ত এক্ষণ হতো.. (অতীতের ব্যার্থতা নিয়ে হা হতাশ করবে না) বরং (তাকুদীরের বিশ্বাসের বলীয়ান হয়ে) বলবে: আল্লাহর তাকুদীরে যা ছিল হয়েছে, আল্লাহর যা মর্জি হয়েছে তাই করেছেন। কারণ, অতীতকে নিয়ে আফসোস করে “যদি ঐ কাজ করতাম তবে হয়ত এক্ষণ হতো”-এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।”^{২৪৮}

তাকুদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। সেখানে শয়তান হতাশা বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহর আমাদের সবাইকে ঈমান দান করুন। আমাদেরকে ঈমানের শক্তিতে, কর্মের শক্তিতে, দেহের শক্তিতে, জ্ঞানের শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তাকুদীরে বিশ্বাসের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: “আল্লাহ তা’আলা দয়া ও মেহেরবানী পূর্বক যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন। বিভাস্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ করা। সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি তাওফিক প্রদান করেন না। বিষয়টি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। অনুরূপভাবে যে পাপীকে তিনি পাপা ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার পাপের কারণে শান্তি প্রদানও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ। আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর করে মুমিন বান্দা ঈমান কেড়ে নেয়। বরং আমার বলি: বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়।”^{২৪৯}

^{২৪৮} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫২।

^{২৪৯} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৬৯-১৭০।

“মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায়। অতঃপর তিনি তাদেরকে সমোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি কুফরী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্থীকার করে, সত্যকে অমান্য করে এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বাস্তিত হয়ে কুফরী করেছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্থীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে। তিনি আদমের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে সমোধন করেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন এবং কুফ্র থেকে নিষেধ করেন। তারা তাঁর কুবূবিয়্যাতের স্থীকৃতি দিয়েছে। এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে ঈমান। আদম সভানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মালাভ করে। এরপর যে কুফরী করে সে নিজেকে পরিবর্তন করে ও বিকৃত করে। আর যে ঈমান আনে এবং সত্যতার ঘোষণা দেয় সে তার প্রকৃতিগণ ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান আনতেও বাধ্য করেন নি। তিনি কাউকে মুমিন-রূপে বা কাফির-রূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাদেরকে ব্যক্তি-রূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফ্র বান্দাদের কর্ম। কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন। আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না। বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্কর্মতা- অবস্থান ও সম্ভলন সবই প্রকৃতভাবে তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা তার স্রষ্টা। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে। আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা আল্লাহর মহবত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে। সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহবত, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয়।”^{২৫০}

উপরের আলোচনা থেকে তাকদীরের বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস জানতে পেরেছি। এখানে মূল বিষয়, বান্দার নিজের দায়িত্ব অনুভব করা। মহান আল্লাহ বলেছেন, বান্দা তুমি কর্ম কর, আমি কখনোই কারো কর্মফল নষ্ট

^{২৫০} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৮২-৯৪।

করব না, কারো উপর জুলুম করব না, প্রত্যেককে তার প্রত্যেক কাজের ফল দান করব। আবার তিনি বলেছেন, বান্দা আমি জানি তুমি কি করবে, আমি ইচ্ছা করলে তোমার কর্ম পরিবর্তন করতে পারি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেতে পার না। এখন বান্দার সামনে দুটি বিকল্প: একজন বান্দা জানে যে আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তার মনে নানন প্রশ্ন। আল্লাহ যখন সবই জানেন তাহলে আর কষ্ট করে কি লাভ। আল্লাহ কাজ করতে বলেছেন বটে, তবে তাতে কী লাভ হবে? আল্লাহর ইলমে কী আছে আমার বিষয়ে? এভাবে বান্দা আল্লাহ জ্ঞান ও কর্মের হিসাব গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে। এ বান্দা মূলত আল্লাহর নির্দেশেও বিশ্বাস করে নি এবং আল্লাহর ওয়াদাতেও বিশ্বাস করেনি। সে নিজেকে আল্লাহর কাজের হিসাব গ্রহণকারী বলে মনে করেছে। নিঃসন্দেহে সে ধৰ্মসংগ্রহ করেছে।

অন্য একজন বান্দা জানে যে, আল্লাহ সবই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে জানে আল্লাহর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকৃতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার দায়িত্বও নয়। আমি আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহর ওয়াদা ও দয়ায় বিশ্বাস করি। আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি এবং আল্লাহর সাহায্য ও দয়া চাইতে থাকি। নিঃসন্দেহে এ বান্দা সফলতার পথ পেয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: “মূল তাকুদীর হলো সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা’আলার এক রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহর সাম্মান্যপ্রাপ্তি কোনো ফিরিশতাও যেমন অবগত নন, তেমনি কোনো নবী রাসূলও অবগত নন। এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা ভাবনা করার পরিনতি ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও সীমা লংঘন ব্যক্তিত আর কিছুই নয়। কাজেই, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কুমন্ত্রনা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ তা’আলা স্বয়ং তাকুদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকূল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন: “তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই আপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।”^{২৫৩} সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে

২৫৩ সূরা আমিয়া: ২৩ আয়াত।

আসলে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো। আর যে ব্যক্তি কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সে কাফিরদের অর্তভূক্ত হয়ে যায়। এ হচ্ছে ইসলামী আকীদার মোটামোটি বিষয় যার প্রতি আলোজ্জল হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ মুখাপেক্ষী। আর এটাই হচ্ছে সুগভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যায়। কারণ, জ্ঞান দু প্রকার, এক প্রকার জ্ঞানঃ যা সৃষ্টিকূলের মধ্যে বিদ্যমান (যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছে)। অতএব বিদ্যমান জ্ঞানের অঙ্গীকৃতি কুফরী কাজ এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের (ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ যা জানান নি সেরূপ গাইবী জ্ঞান) দাবীও কুফরী কাজ। প্রকৃত ঈমান কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন বিদ্যমান জ্ঞানকে বরণ করা হয় এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের অব্যবেশণ বর্জন করা হয়। (মহান আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকু এহণ ও বিশ্বাস এবং যা বলেন নি তা নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা বর্জন করা।)"^{১৫২}

^{১৫২} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১১-১২।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ঈমানের পরিচিতি সম্পর্কে বিজ্ঞানিত জানতে পেরেছি। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত ‘অবিশ্বাস’। ‘অবিশ্বাস’ সামগ্রিক বা ব্যাপক হতে পারে এবং আংশিকও হতে পারে। আমরা দেখেছি যে, ঈমান বা বিশ্বাসের বিভিন্ন রূক্তন ও বিষয় রয়েছে। কোনো অবিশ্বাসী এ সকল রূক্তন বা বিশ্বাসের সকল বিষয় ‘অবিশ্বাস’ করতে পারে। আবার অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের বিভ্রান্তি আংশিকও হতে পারে। এমন অনেক দেখা যায় যে, কোনো কোনো অবিশ্বাসী ঈমানের কিছু বিষয় বিশ্বাস করেন এবং কিছু বিষয় অবিশ্বাস করেন। সামগ্রিক বা আংশিক উভয় প্রকার অবিশ্বাসেরই বিভিন্ন কারণ ও প্রকার রয়েছে।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী বিভ্রান্তি সম্প্রদায়সমূহের বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের কারণ উল্লেখ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানের বিশুদ্ধ বিশ্বাস থেকেই অবিশ্বাস বা কুফর ও শিরক জন্ম নিয়েছে। ঈমান থেকেই কুফরী জন্মেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈমানের নামেই কুফরী প্রচারিত হয়েছে। ইহুদী, খৃস্টান ও আরবের অবিশ্বাসীগণ মূলত আসমানী কিতাব বা ওহী এবং আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলদের অনুসমানী ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন। কুরআন কারীমে এদের বিভ্রান্তির কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতির অবিশ্বাসের কারণ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এ বিষয়ক অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা অবিশ্বাসের ধরন, কারণ, প্রকরণ ও প্রকাশগুলি আলোচনা করব। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৫. ১. কুফর

৫. ১. ১. অর্থ ও পরিচিতি

আরবী ‘কুফর’ (الكُفْر) শব্দটি অবিশ্বাস, অবীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ ‘আবৃত করা’। ৪৮ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: “(কাফ, রা ও ফা) তিনি অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি

একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হলো: 'আবৃত করা বা গোপন করা'। কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফ্র' করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয়, কারণ তিনি শম্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে 'কুফ্র' বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে অবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অঙ্গীকার করাকে কুফ্র বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।”^১

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফ্র বা অবিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুক্নগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফ্র' বলে গণ্য। অঙ্গীকার, সন্দেহ, ছিদ্রা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিতি থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফ্র' বলে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অঙ্গীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শিরক বলা হয়।

৫. ১. ২. কুফ্র আক্বার ও কুফ্র আসগার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফ্রকে দু ভাগে ভাগ করা হয়: (১) কুফ্র আকবার বা বৃহত্তর কুফ্র এবং (২) কুফ্র আসগার বা ক্ষুদ্রতর কুফ্র। কুফ্র আকবার বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বোানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে। এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শান্তিভোগ। আর কুফ্র আসগার বলতে বুঝানো হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, তবে এরপ পাপে লিখ মানুষদেরকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির বলে গণ্য করা হয় না। তাদেরকে অনন্ত জাহান্নামবাসী বলেও বিশ্বাস করা হয় না। বরং তাদেরকে পাপী ও শান্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়। কুফর আসগারকে কুফর মাজাফী বা রূপক কুফরও বলা হয়।

৫. ১. ৩. কুফ্র আক্বার-এর প্রকারভেদ

কুফর আকবার বা 'বৃহত্তর কুফর'-ই প্রকৃত কুফর বা অবিশ্বাস। তাওহীদ ও আরকানুল ঈমানের আলোকে আমরা কুফ্র বা অবিশ্বাসকে আমরা নিম্নের পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

^১ ইবনু ফারিস, মু'জাম মাকাইসিল লুগাহ ৫/১৯১।

৫. ১. ৩. ১. ‘প্রতিপালনের একত্বে’ অবিশ্বাস

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের প্রথম পর্যায় তাওহীদুর কুফ্রবিয়্যাত। এ বিষয়ে কোনো প্রকার অবিশ্বাস, অস্থীকার, দ্বিধা, সন্দেহ বা আংশিক বিশ্বাস ‘কুফ্র’ বলে গণ্য। আল্লাহর অঙ্গভূতে অবিশ্বাস, তাঁর স্রষ্টাভূতে অবিশ্বাস, অন্য কোনো স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস, তাঁর প্রতিপানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কারো বিশ্ব পরিচালনা, প্রতিপালন বা মঙ্গল-অঘংগলের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস, তাঁর রিয়্ক দানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কোনো রিয়কিদাতা আছে বলে বিশ্বাস, ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্র। অনুরূপভাবে কিছু বিষয়ে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও কিছু বিষয়ে তা অবিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্র।

৫. ১. ৩. ২. নাম ও গুণাবলির একত্বে অবিশ্বাস

‘তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত’ বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব আমরা তাওহীদ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা’আলার নাম ও গুণাবলির কিছু বা সব অস্থীকার করা এ পর্যায়ের কুফ্র। এ কুফ্র দু প্রকারের:

প্রথমত: কুফরুল নাফই (কفر النفي) বা অস্থীকারের কুফ্র

এর অর্থ আল্লাহ যে সকল নাম ও গুণ তাঁর আছে বলে জানিয়েছেন তাঁর সব বা যে কোনো একটি অবিশ্বাস বা অস্থীকার করা। যেমন আল্লাহর ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (কথা), রাহমাত... ইত্যাদি যে কোনো এক বা একাধিক নাম বা গুণ অস্থীকার করা, বা তাঁর পূর্ণতা অস্থীকার করা। আল্লাহর কোনো কর্ম বা গুণ তাঁর সৃষ্টির মত বা তুলনীয় বলে বিশ্বাস করাও একই পর্যায়ের কুফ্র বা অবিশ্বাস।

দ্বিতীয়ত: কুফরুল ইসবাত (কفر الإنباث) বা দাবির কুফ্র

এর অর্থ আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্থীকার করেছেন তাঁর তা আছে বলে দাবি করা। যেমন আল্লাহর জন্য ঘূম, তন্দু, সত্তান, স্ত্রী... ইত্যাদি দাবি করা।

আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য যে সকল বিশেষণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি নিজের জন্য বা অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য সে সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক গুণ বা বিশেষণ দাবি করে তবে তাও এ প্রকারের কুফরী বলে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহর মত ইলম, হিকমত, রহমত... ইত্যাদি অন্য কারো আছে বলে দাবি করা। এরূপ দাবি স্থীকার বা বিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্র।

৫. ১. ৩. ৩. ইবাদতের একত্বে অবিশ্বাস

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের চূড়ান্ত পর্যায় তাওহীদুল উল্লিখ্যাত বা তাওহীদুল ইবাদাত। সকল নবী-রাসূল ইবাদতের তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং

আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদের ইবাদত বর্জন কর।

আল্লাহর ইবাদতের একটে অস্থীকার করা, তাঁর মাঝে হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস পোষণ করা বা অন্য কেউ কোনোরূপ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আছে বলে বিশ্বাস করা এ পর্যায়ের কুফর। আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে অধিকাংশ কাফিরই এ প্রকারের কুফরে নিপত্তি হয়েছে।

৫. ১. ৩. ৪. মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতে অবিশ্বাস

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ ও বিষয়বস্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, মহত্ব, রিসালাত, নুরুওয়াত, নুরুওয়াতের পূর্ণতা, প্রচার ও তাবলীগের পূর্ণতা, নুরুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, হায়িত্ব, সমাপ্তি, মুক্তির একমাত্র পথ ইত্যাদি কোনো বিষয়ে অস্থীকার, অবিশ্বাস বা সন্দেহ এ পর্যায়ের কুফর। মুহাম্মদ (ﷺ) যা কিছু বলেছেন তার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত বলে মনে করাও একই পর্যায়ের কুফর।

এ পর্যায়ের কুফর-এর দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমত, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ব্যক্তিত্বে সন্দেহ, দ্বিধা বা অভিযোগ

কেউ যদি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সত্যবাদিতায়, নিষ্কলুশ চরিত্রে, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বে, ইসলাম প্রচারে তাঁর পূর্ণতায়, তাঁর ধার্মিকতায়, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বা অনুরূপ কোনো বিষয়ে সন্দেহ, আপত্তি বা অভিযোগ করে তবে তা এ পর্যায়ের কুফর।

দ্বিতীয়ত, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কথা বা শিক্ষায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নুরুওয়াতের বিশ্বাসের অর্থই হলো তিনি যা বলেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন তা সবই সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি বলেছেন বলে প্রমাণিত কোনো সংবাদ, শিক্ষা, কথা বা বক্তব্যকে অসত্য বলে মনে করা বা সন্দেহ করা এ পর্যায়ের কুফরী। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন কিনা তা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। প্রমাণিত হওয়ার পরে কোনো মুমিন তার সত্যতায় সন্দেহ বা দ্বিধা করতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন বা কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে তাঁর বক্তব্য বা শিক্ষা হিসেবে প্রমাণিত। আরকানুল ঈমান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সবই এই পর্যায়ের। খাবারু ওয়াহিদ হিসেবে বর্ণিত বিষয়গুলি বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হলে তাও সাধারণভাবে বিশ্বাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তবে সাধারণভাবে খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের সহীহ

হাদীসে প্রমাণিত বিষয় অঙ্গীকার করলে তাকে বিভ্রান্ত বলা হয়, তবে কাফির বলা হয় না। এ বিষয়ে আমরা এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

কুরআন অথবা সুন্নাত ঘারা, বিশেষত মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অঙ্গীকার করাও একই পর্যায়ের কুফ্রী। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অঙ্গীকার করা, ব্যতিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অঙ্গীকার করা, সালাতের, তাহারাত, রাক'আত, সময়, সাজদা, রুকু ইত্যাদির পদ্ধতি অঙ্গীকার, ব্যতিক্রম করা ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্র। তবে অজ্ঞতার কারণে অঙ্গীকার করলে তা ওয়ার বলে গণ্য হতে পারে। কোনো ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী বিষয় অঙ্গীকার করলে তা কুফ্র বলে গণ্য হবে না।

৫. ১. ৩. ৫. সম্মতি ও অসম্মতির কুফ্র

কোনো প্রকার কুফ্রে সম্মত থাকা কুফ্র। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রতি অসম্মত থাকাও কুফ্র। এ প্রকারের কুফরের মধ্যে রয়েছে:

(ক) আল্লাহর নায়িলকৃত বিধান অপছন্দ করা বা আল্লাহর যিক্র, কুরআন, ইসলাম বা ইসলামের বিধান বলে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো কিছু প্রতি বিরক্তি বা ঘৃণা পোষণ করা, ইসলামের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা অচল, সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْنَسُوا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِإِنْهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্কল করে দিবেন।”^১

(খ) ইসলামের কোনো প্রমাণিত বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা, মক্করা বা উপহাস করা অথবা যার এক্রূপ করে তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَغْرِضْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَخْوُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسَيِّدُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয়। এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।”^২

^১ সূরা (৪৭) মুহাম্মাদ: ৮-৯ আয়াত।

^২ সূরা (৬) আন'আম: ৬৮ আয়াত।

(খ) মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের, যারা সুস্পষ্টভাবে ঈমানের কোনো রূক্ষণ বা কুরআন-হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বিষয় অঙ্গীকার করেছে, আপত্তিকর বলে বিশ্বাস করেছে বা উপহাস করেছে, যাদের কুফ্র সন্দেহাত্মীতভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত এবং যাদের কুফ্র-এর বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন তাদেরকে কাফির বলতে অঙ্গীকার করা, কাফির বলে গণ্য না করা, তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ বা দ্বিধা করা। অথবা এরপ কাফিরগণকে আন্তরিক বঙ্গ, সহযোগী ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা। তবে তাদের সাথে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রাখা ও মানবীয় সহযোগিতা নিষিদ্ধ নয়।

কুরআনে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ كُفَّارٌ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ نُقَاءً

“মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বঙ্গুরপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।”^৪

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُتَرِيدُنَّ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“হে মুমিনগণ, মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরগণকে বঙ্গুরপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?”^৫

অন্যত্র তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلَيَاءَ بَعْضُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও খ্স্টানদেরকে বঙ্গুরপে গ্রহণ করো না, তারা পরম্পরার পরম্পরার বঙ্গ। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বঙ্গুরপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হয়ে যাবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”^৬

^৪ সূরা (৩) আল-ইমরান: ২৮ আয়াত।

^৫ সূরা (৪) নিসা: ১৪৪ আয়াত।

^৬ সূরা (৫) মায়দা: ৫১ আয়াত।

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أُولَئِكَاءِ وَأَنَّقُوا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বক্ষরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে তোমারা বক্ষরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।”^১

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولَئِكَاءِ إِنِّي أَسْتَحِبُّوا الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমাদের পিতাগণ ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম।”^২

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

بَشِّرُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَاءِ مِنْ نُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبْيَتُغُونَ عِنْهُمُ الْعَزَّةُ فَإِنَّ الْعَزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِّإِذَا سَمِعْتُمْ أَيَّاتَ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“মুনাফিকগণকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তদ শান্তি রয়েছে! মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট ইয্যত-ক্ষমতা চায়? সমস্ত ইয্যত-ক্ষমতা তো আল্লাহরই। কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন, যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিঙ্গ না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতই হবে। মুনাফিক ও কাফির সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।”^৩

^১ সূরা (৫) মায়দা: ৫৭ আয়াত।

^২ সূরা (৯) তাওবা: ২৩ আয়াত।

^৩ সূরা (৮) নিসা: ১৩৮-১৪০ আয়াত।

অন্যত্র বলা হয়েছে:

لَا تَحْدُّ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّمِ الْآخِرِ يُؤْمِنُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ
وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْرَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধচারিগণকে, হোক না কেন এ সকল বিরুদ্ধচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র।”^{১০}

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنِ
بِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমারেদকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করে নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।”^{১১}

(গ) ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুসরণ করে কেউ মুক্তিলাভ করতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে বা আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।”^{১২}

وَمَنْ يَتَّسِعْ غَيْرُ الإِسْلَامِ دِينًا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”^{১৩}

৫. ১. ৮. কুফ্র আকবার-এর বিভিন্ন প্রকাশ

কুরআনের আলোকে কুফর আকবার-এর নিম্নরূপ প্রকাশ রয়েছে:

৫. ১. ৮. ১. কুফ্র তাকবীর বা মিথ্যা মনে করার কুফর

অর্থাৎ ওইর নির্দেশনাকে মিথ্যা বলে মনে করা করা। এ হলো যুগে যুগে কুফ্র বা অবিশ্বাসের প্রধান প্রকার। নবী-রাসূলগণের দাও'আতের মাধ্যমে,

^{১০} সূরা (৫৮) মুজাদালা: ২২ আয়াত।

^{১১} সূরা (৬০) মুমতাহিনা: ৮ আয়াত।

^{১২} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৯ আয়াত।

^{১৩} সূরা (৩) আল-ইমরান: ৮৫ আয়াত।

অথবা অন্যান্য প্রচারকদের মাধ্যমে, অথবা আসমানী কিতাব পাঠের মাধ্যমে যখন মানুষের কাছে ওহীর শিক্ষা উপস্থিত হয় তখন এরূপ অবিশ্বাসী ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنْبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ الْنِسَفُ فِي جَهَنَّمَ
مَنْتُوِي لِلْكَافِرِينَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?”^{১৪}

৫. ১. ৪. ২. কুফ্র ইসতিকবার বা অহঙ্কারের অবিশ্বাস

অর্থাৎ অহঙ্কার বশত ঈমানের কোনো বিষয়ের সত্যতা অনুভব করার পরেও তা অস্বীকার করা। অনেক অবিশ্বাসীই এরূপ কুফরে লিপ্ত হয়। এরূপ অহঙ্কারের কুফরে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয় ইবলীস। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَلَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ

“যখন ফিরিশতাদের বললাম ‘আদমকে সাজদা কর’, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদা করল; সে অমান্য করল এবং অহংকার করল, সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।”^{১৫}

অন্যত্র মহান আল্লাহ ফিরাউন ও অন্যান্য কাফিরদের বিষয়ে বলেন:

وَجَدَوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتُهَا أَفْسُهُمْ ظَلْمًا وَعَلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

“তারা অন্যায় ও উক্ততভাবে নির্দর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!”^{১৬}

৫. ১. ৪. ৩. কুফ্র শাক বা সন্দেহের অবিশ্বাস

ঈমানের কোনো বিষয়ে হৃদয়ে দিখা বা সন্দেহ থাকাকে সন্দেহের কুফর বলা হয়। ঈমানের অর্থ সন্দেহাতীত প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা। কাজেই কোনো বিষয়ে যদি মনে কিছু বিশ্বাস ও কিছু সন্দেহ থাকে বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বদলে অস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে তাকে কুফর বলে গণ্য করা হয়।

^{১৪} সূরা (২৯) আনকাবৃত: ৬৮ আয়াত।

^{১৫} সূরা (২) বাকারা: ৩৪ আয়াত।

^{১৬} সূরা (২৭) নামল: ১৪ আয়াত।

একজন কাফির ও একজন মুসলিমের কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَدَخَلَ جَنَّةً وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْنَ أَنْ تَبْيَدَ هَذِهِ أَنْدَانِي وَمَا أَظْنَ
السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَدَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجْلًا

“এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এ কখনো ধৰ্ম হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই (কিয়ামত যদি হয়-ই) তবে আমি নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করব।’ তদুভূতে তার বক্ষ তাকে বলল, ‘তুমি কি কুফরী করছ তাঁর সাথে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাংগ করেছেন তোমাকে মনুষ্য আকৃতিতে?’”^{১৭}

৫. ১. ৪. ৪. কুফর ই'রায বা অবজ্ঞার কুফর

দীন ও ঈমানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ না করে নিলিঙ্গ থাকা, বা ঈমানের বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করাকে কুফর ই'রায বা অবজ্ঞার কুফর বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرُوا مُغْرِضُونَ

“যারা কাফির তারা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে বে-বেয়াল বা মুখ ফিরিয়ে থাকে।”^{১৮}

৫. ১. ৪. ৫. কুফর নিফাক বা মুনাফিকীর কুফর

অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের দাবি করাকে কুফর নিফাক বলে। নিফাক বা মুনাফিকী কুফর এর একটি বিশেষ দিক যা কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্বাসের নিফাক ছাড়াও কর্মের নিফাকের একটি পর্যায় রয়েছে।

৫. ১. ৫. নিফাক: পরিচিতি ও প্রকারভেদ

আরবীতে ‘নিফাক’ শব্দের অর্থ কপটতা (hypocrisy)। শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা ইত্যাদি।^{১৯} নিফাকে লিঙ্গ মানুষকে ‘মুনাফিক’ বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দুই প্রকার: (১) বিশ্বাসের নিফাক ও (২) কর্মের নিফাক।

^{১৭} সূরা (১৮) কাহফ: ৩৫-৩৮ আয়াত।

^{১৮} সূরা (৪৬) আহকাফ: ৩ আয়াত।

^{১৯} ইবনু ফারিস, মুজাম মাকান্সিল লুগাহ ৫/৪৫৪-৪৫৫।

৫. ১. ৫. ১. বিশ্বাসের নিষ্কাক (النفاق الاعتقادي)

অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিষ্কাক বা নিষ্কাক ইতিকাদী বলা হয়। এরূপ নিষ্কাকের স্বরূপ নিম্নরূপ: (১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল শিক্ষা বা দাও'আত বা তাঁর শিক্ষার কোনো দিককে মিথ্যা বলে মনে করা, (২) তাঁকে ঘৃণা করা বা তাঁর প্রতি বিদেশ পোষণ করা (৩) তাঁর কোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করা, (৪) তাঁর দীনের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া অথবা (৫) তাঁর দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা। মূলত কুরআন-হাদীসে এরূপ নিষ্কাকের কথাই বলা হয়েছে। এরূপ নিষ্কাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিষ্কাকে লিঙ্গ ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে। এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْهَمُونَ

“তা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হরিয়ে ফেলেছে।”^{২০}

৫. ১. ৫. ২. কর্মের নিষ্কাক (النفاق العملي)

আমরা জনি যে, বিশ্বাসই মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাহ্যিক কর্ম মানুষের আভ্যন্তরীন বিশ্বাসের প্রতিফলন। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু বাহিরে বিশ্বাস দাবি করে স্বত্ত্বাতেই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, যেগুলি প্রমাণ করে যে, সে ঈমান ও তাকওয়ার দাবি করলেও বস্তুত তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত। হাদীস শরীফে এ জাতীয় কিছু কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহই ইবনু আম্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَرْبَعَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعُهَا إِذَا أُوتِمَّ خَانَ وَإِذَا حَدَثَ كَذْبٌ وَإِذَا عَاهَدَ غَدرٌ وَإِذَا خَاصَّمَ فَجَرَ

“চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বত্ত্বাব বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে: (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন সে ঝগড়া করে

^{২০} সূরা (৬৩) মুনাফিকুন: ৩ আয়াত।

তখন সে অশ্লীল কথা বলে।”^{২১}

এ সকল কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সকল কর্ম ‘কুফর’ বা অবিশ্বাসের নিফাক বলে গণ্য হবে না। বরং কুফর আসগারের ন্যায় নিফাক আমালী বা কর্মের নিফাক বলে গণ্য হবে।

৫. ১. ৬. কুফর আসগার বা ক্ষুদ্রতর অবিশ্বাস

কুফর মূলত হৃদয়ের অবিশ্বাসের নাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মের নাম নয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে যে সকল ‘পাপ কর্ম’-কে কুফর বলা হয়েছে কিন্তু যেগুলির সাথে হৃদয়ের অবিশ্বাস জড়িত নয় সেগুলিকে ‘কুফর আসগার’ বা ‘কুফরুন নি’মাহ’ (كُفْرَ النِّعْمَةِ) (অর্থাৎ নিয়ামতের অস্বীকার বা কুফর মাজায়ী) বা ‘রাপকার্থে কুফর বলে অভিহিত করা হয়।^{২২}

কুরআনে অবিশ্বাসের পাশাপাশি অকৃতজ্ঞতাকেও কুফর বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَصَرَبَ اللَّهُ مُثْلًا قَرِيبَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَدَّاهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

‘আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নির্বিচিত, যেখায় আসত সর্বদিক থেকে তার প্রচুর রিয়্ক, অতঃপর তা আল্লাহর নিয়ামতের কুফৰী করল, ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছদনের।’^{২৩}

এছাড়া আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে পাপ ও অবাধ্যতার সহ-অবস্থান না হওয়াই ঈমানের দাবি। বস্তুত বিশ্বাসের ঘাটতি ছাড়া কেউ পাপে লিঙ্গ হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি, তাঁর সিফাতসমূহের প্রতি, আখিরাতের প্রতি ও আখিরাতের শাস্তি ও পুরক্ষারের প্রতি বিশ্বাস পরিপূর্ণ থাকলে কেউ পাপে লিঙ্গ হতে পারে না। এজন্য পাপে লিঙ্গ হওয়া বিশ্বাসের ঘাটতি বা অপূর্ণতা নির্দেশ করে। তবে যতক্ষণ একুপ অপূর্ণতা পূর্ণ অবিশ্বাসে পরিণত না হয় ততক্ষণ একে ‘কুফর আসগার’ বা ‘কুফর মাজায়ী’ (রূপক কুফর) বলে অভিহিত করা হয়।

কুরআন ও হাদীসে অনেক কঠিন পাপকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে, আবার অন্যত্র এ সকল ‘কুফৰী’তে লিঙ্গ মানুষদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ

^{২১} বুখারী, আস-সহীহ ১/২১, ৩/১১৬০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৮।

^{২২} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩২০-৩২৪।

^{২৩} সূরা (১৬) নাহল: ১১২ আয়াত।

করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের সমষ্টিয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের অলিম্পণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ সকল অপরাধ ‘কুফ্র আসগার’ বা ক্ষুদ্রতর কুফ্র বলে গণ্য। এগুলি কঠিন পাপ, তবে যদি কেউ এগুলিকে পাপ ও নিষিদ্ধ জেনে, নিজেকে অপরাধী বলে বিশ্বাস করে শয়তানের প্ররোচনায় বা জাগতিক কোনো স্বার্থে এরপে পাপে লিঙ্গ হয় তবে সে পাপী মুমিন বলে গণ্য হবে, ইসলাম ত্যাগকারী বা পারিভাষিক কাফির বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ এরপে কর্ম বৈধ মনে করে, অথবা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা ঐচ্ছিক মনে করে, বা আল্লাহর এ সকল নির্দেশ বা যে কোনো নির্দেশ মান্য করা তার নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বা কোনো যুগের জন্য অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে বা অন্য কোনো ধর্মের বা সমাজের বিধান অধিকতর উপযোগী বলে মনে করে তবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।”^{২৪}

এখানে বাহ্যিক বুঝা যায় যে আল্লাহর বিধানের বাইরে চলা বা যে কোনো পাপ করাই কুফরী, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বাইরে চলে বা পাপে লিঙ্গ হয় সে মূলত তার নিজের জন্য বা অন্যের জন্য আল্লাহর বিধানের বাইরে বাইরে ফয়সালা করল। আর আল্লার নাযিলকৃত বিধানাবলির অন্যতম যে, মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে হানাহানি বা যুদ্ধে রত হবে না। ইবনু আব্বাস (রা), আবু বাকরাহ সাকাফী (রা), ইবনু উমার (রা), ইবনু মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রায় মৃতাওয়াতির হাদীসে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে বলেন:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

“তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না, যে একে অপরকে হত্যা করবে।”^{২৫}

এখানে স্পষ্টতই পরম্পরে যুদ্ধ করাকে কুফরী বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে আবুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتْلُهُ كُفَّرٌ

^{২৪} সূরা (৫) মায়দা: ৪৪ আয়াত।

^{২৫} বুখারী, আস-সহীহ ১/৫৬, ২/৬১৯, ৬২০, ৪/১৫৯৮, ১৫৯৯, ৫/২২৮২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮১-৮২।

“মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।”^{২৬}

কিন্তু অন্য আয়াতে এরূপ কর্মে রত মানুষদেরকে মুমিন বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا
عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِي إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ لِعْكُمْ تُرْحَمُونَ

“মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে ফীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমলজ্জন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মুমিনগণ পরম্পর ভাই; সুতরাং তোমরা ভাত্তগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।”^{২৭}

এখানে আমরা দেখেছি যে, পরম্পরকের যুদ্ধে রত মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবেই মুমিন বলা হয়েছে। কারণ এরূপ কর্ম কুফর আসগার বা কুফর মাজাফী হওয়ার কারণে তা ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে।

৫. ২. শিরক

৫. ২. ১. অর্থ ও পরিচিতি

ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের প্রসঙ্গে আমরা ‘শিরক’ শব্দটির অর্থ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আরবীতে শিরক (شِرْك) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate)। ইশরাক (إِشْرِيك) ও তাশ্রীক (إِشْرِيك) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে ‘শিরক’ শব্দটিকেও আরবীতে ‘অংশীদার করা’ বা ‘সহযোগী বানানো’ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লার সমকক্ষ ঘনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় ‘আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরক।’

^{২৬} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৫/২২৪৭, ৬/২৫৯২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮১।

^{২৭} সূরা (৪৯) হজুরাত: ৯-১০ আয়াত।

কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে ‘আল্লাহর সমতুল্য’ করা।
মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَلَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অতএব তোমরা জেনেওনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।”^{২৮}

অন্যএ মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُصْلِوَا عَنْ سَبِيلِهِ

“এবং তারা আল্লাহর সমতুল্য উদ্ভাবন করে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত
করার জন্য।”^{২৯}

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন,

سَأَلْتُ أُولَئِكَ مَنْ يَعْبُدُونَ إِذْنَنِ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ اللَّهَ
نَدًا وَهُوَ خَلَقَ

“আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন
পাপ কূৰী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ
বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”^{৩০}

এভাবে আমরা দেখছি যে কাউকে মহান আল্লাহর ‘নিদ’ মনে করাই
শিরক। আরবীতে ‘নিদ’ (الند) অর্থ সমতুল্য, মত, সমকক্ষ, তুলনীয় ইত্যাদি।
কাউকে মহান আল্লাহর রূবুবিয়াত, আসমা, সিফাত বা ইলাহিয়াত-এর ক্ষেত্রে
তাঁর সমতুল্য মনে করা, অথবা আল্লাহকে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহর
জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্য কাউকে প্রদান করাই শিরক।^{৩১}

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য: প্রথমত, কুফর ও শিরক
পরম্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাউকে কোনোভাবে কোনো বিষয়ে মহান
আল্লাহর সমকক্ষ বা তুলনীয় মনে করার অর্থই তাঁর একত্রে অবিশ্বাস বা
কুফরী করা। আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের দাও‘আতে অবিশ্বাস না করে
কেউ শিরক করতে পারে না। কাজেই শিরকের অর্থই তাওহীদ ও রিসালাতে
অবিশ্বাস করা। অপরদিকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ না মনে ঝোঁকানো
কোনো রূক্ন অবিশ্বাস করলে তা শুধু কুফর বলে গণ্য। যেমন যদি কেউ

^{২৮} সূরা (২) বাকারা: ২২ আয়াত।

^{২৯} সূরা (১৪) ইবরাহিম: ৩০ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ১৬৫, সূরা
(৩৪) সাবা: ৩৩, সূরা (৩৯) যুমার: ৮; সূরা (৪১) ফসলিলাত (হায়াত): ৯ আয়াত।

^{৩০} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬২৬, ৫/২২৩৬, ৬/২৪৯৭, ২৭৩৯; মুসলিম, আস-সহীহ
১/৯০-৯১।

^{৩১} তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১/১৬৩-১৬৪।

আল্লাহর অস্তিত্বে বা তাঁর প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস করেন বা মূহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাত, খাতমুন নুরুওয়াত ইত্যাদি অঙ্গীকার করেন তবে তা কুফর হলেও বাহ্যত তা শিরক নয়। কারণ এরূপ ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে দাবি করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফরের সাথেও শিরক জড়িত। কারণ এরূপ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে এ ক্ষয়িক্ষণ জড় বিশ্বকে মহান আল্লাহ মত অনাদি-অনন্ত বলে বিশ্বাস করছে, বিশ্ব পরিচালনায় প্রকৃতি বা অন্য কোনো শক্তিকে বিশ্বাস করছে।

তৃতীয়ত, কুফর বা অবিশ্বাসের অন্যতম প্রকাশ শিরক। সাধারণভাবে যুগে যুগে অবিশ্বাসীগণ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি বা তাঁর মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অঙ্গীকার করে কুফরী করে নি, বরং এগুলিতে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করেই কুফরী করেছে। এজন্য কুরআন ও হাদীসে কুফরের বর্ণনায় শিরকের কথাই বেশি বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ কল্পনা করা বা শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারি যে, দুভাবে শিরক হয়ে থাকে: (১) মহান আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অতি-সুধারণা অথবা (২) মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা বা অব-ধারণা।

শিরকে নিপত্তি মানুষেরা কখনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, নেককার মানুষ, কারামত-প্রাপ্ত মানুষ, তাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি কোনো সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তি ও মর্যাদা প্রদানে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে 'অলৌকিক শক্তি' বা ঐশ্঵রিক ক্ষমতা কল্পনা করেছে। অথবা মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেছে এবং তাঁর সন্তান, পরিষদ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কল্পনা করেছে।

কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত শিরক এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিরক পর্যালোচনা করলে আমরা মূলত এ দুটি বিষয়ই দেখতে পাই। এবং এদুটি বিষয়ও পরম্পর অবিছেদ্যভাবে জড়িত। কারো প্রতি ভক্তির অতিরঞ্জন অর্থই আল্লাহর ক্ষমতা, কুবৃবিয়্যাত ও উল্লিখিয়াতের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা।

৫. ২. ২. শিরকের হাকীকত

আল্লাহ ছাড়া কাউকে ক্ষমতায় ও সৃষ্টিতে বা সকল দিক থেকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা যেমন শিরক, তেমনি মহান আল্লাহ কাউকে নিজের শরীক বানিয়ে নিয়েছেন, বা কাউকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা, 'উল্লিখিয়াত' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করাও শিরক। তবে সাধারণত কোনো মুশরিকই কাউকে সকল দিক থেকে বা স্বকীয় ভাবে আল্লাহর সমতুল্য বলে শিরক

করে নি, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের শিরকই সর্বদা ব্যাপক।

ইতোপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ কাউকে আল্লাহর মত বা আল্লাহর সমতৃল্য স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান বা স্বকীয় ক্ষমতায় ইলাহ বা মাবৃদ হিসেবে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য বলে মনে করত না। বরং যদিন আল্লাহকেই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, মহাবিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম মালিক, রিয়্কদাতা, মৃত্যুদাতা ও সকল কিছুর পরিচালক বলে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত যে সকলেই আল্লাহর বান্দা। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর সম্মতি লাভ করে সাধারণ বান্দাদের চেয়ে উর্ধ্বে উঠেন, যাদেরকে আল্লাহ খুশি হয়ে নিজের কর্মে ও ক্ষমতায় শরীক করেছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও এদের শাফা ‘আত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তারা এদের ইবাদত করত। এভাবে আমরা দেখি যে, কিছু “আলোকিক ক্ষমতায়” এবং “ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতায়” তারা আল্লাহর কিছু বান্দাকে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য বলে বিশ্বাস করত। আর এরপ করাকেই কুরআন ও হাদীসে ‘আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য নির্ধারণ করা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: “শিরকের হাকীকত এই যে, কোনো মানুষ কোনো কোনো সম্মানিত মানুষের ক্ষেত্রে ধারণা করবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যে সকল অলৌকিক কার্য সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় তা উক্ত ব্যক্তির পূর্ণতার গুণে গুণাবিত হওয়ার কারণে। এ সকল অলৌকিক কার্য প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এরপ কিছু বিশেষ গুণ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। এরপ গুণ মূলত একমাত্র আল্লাহরই আছে। আল্লাহ যাকে ‘উলহিয়ত’ বা এরপ বিশেষভুত প্রদান করেন, অথবা ‘আল্লাহ’ যে ব্যক্তির সত্ত্বার সাথে সংমিশ্রিত হন, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর যাত বা সত্ত্বার মধ্যে ‘ফানা’ বা বিলুপ্তি লাভ করে এবং আল্লাহ সত্ত্বার সাথে ‘বাকা’ বা অস্তিত্ব লাভ করেন, বা অনুরূপ কোনো ভাবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ এরপ ক্ষমতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন তিনিই কেবল তা প্রাপ্ত হন। এভাবে মানুষের উলহিয়ত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা গুণ লাভের পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে অনেক ভিত্তিহীন কুসংস্কার বিদ্যমান। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আরবের কাফিরগণ হজ্জের ‘তালবিয়া’র মধ্যে ও কাবাঘর তাওয়াফের সময় বলত:

لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمَلُّكٌ وَمَا مَلَكَ

লাবাইকা আল্লাহম্মা লাবাইক.... আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে ছাড়। এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন ... ৩২

অন্যত্র তিনি আরবের মুশরিকদের ইবরাহীম (আ)-এর দীন থেকে বিচ্ছিন্নি ও শিরকের মধ্যে নিপত্তি হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তাদের শিরকের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন: “এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বিহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো শরীক আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই। তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক করত। কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন। তারা আরো ধারণা করত যে, একজন মহারাজ তার প্রজাগণের খুচিনাটি বিষয় নিজে সম্পন্ন বা পরিচালনা করেন না, বরং অধীনস্থ প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে এ সকল বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এ সকল কর্মকর্তার অধীনে যারা কর্ম করেন বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদের বিষয়ে এ সকল কর্মকর্তার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেন। সকল রাজার মহারাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহও অনুরূপভাবে তাঁর কিছু নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকে উপটোকন প্রদান করেছেন এবং এদের বিরক্তি ও সম্মতিকে তার অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রতাবময় করে দিয়েছেন।

এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের কর্মসূলিয়াতের ওসীলা হতে পারে। আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা'আত মহান আল্লাহর দরবারে কর্মসূলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এ ধারণা তাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রেরিত হয়ে যায়। এজন্য তাদের মন বলে যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সামনে সাজদা কর, তাদের জন্য জবাই-উৎসর্গ কর, তাদের নামে কসম কর, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে আন ও সাহায্য প্রার্থনা কর, পাথরে, তামায়, পিতলে বা অন্য কিছুতে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি একে রাখ, এদের এ সকল প্রতিকৃতি

৩২ মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৪৩; তাবারী, তাফসীর ১৩/৭৮-৭৯।

সামনে রেখে এদের রূহের (আত্মার) প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হও। ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রজন্মগুলির মানুষেরা মুর্খতার কারণে এদের এ সকল মূর্তি ও প্রতিকৃতিকেই প্রকৃত ইলাহ বা মাঝুদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে।”^{৩০}

৫. ২. ৩. শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন কারীমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক আলোচনা। হাদীস শরীফেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণও শিরক-কুফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শিরকের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) শিরক আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং (২) শিরক আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিরক। তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত শিরকী কর্মসমূহের ভিত্তিতে শিরককে অনেকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। আমরা প্রথমে তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরক আকবারের প্রকারভেদ ও শিরক আসগারের পরিচয় ও প্রকারভেদ আলোচনা করব। এরপর শিরক প্রতিরোধে কুরআন-সুন্নাহর পদক্ষেপ আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ২. ৩. ১. তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তাওহীদের বিপরীতই শিরক। এজন্য শিরককেও তিনভাগে ভাগ করা হয়:

৫. ২. ৩. ১. ১. প্রতিপালনের শিরক (الشرك في الربوبية)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিয়্ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লার রূবুবিয়াত বা রূবুবিয়াতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ এরপর বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রূবুবিয়াতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে।

৫. ২. ৩. ১. ২. নাম ও গুণাবলির শিরক (الشرك في الأسماء والصفات)

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে

^{৩০} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওয়ুল কাবীর, প. ২৪-২৫।

আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

৫. ২. ৩. ১. ৩. ইবাদতের শিরক (الشرك في الألوهية)

‘ইবাদত’-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে ‘ইবাদতের শিরক’ বলা হয়। ইবাদতের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদতের শিরক।

৫. ২. ৩. ২. শিরক আস্গার (الشرك للأصغر)

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌছে নি তাকে শিরক আস্গার বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বজার উদ্দেশ্য তা নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শিরক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার যুক্তিতে বা অন্য কোনো যুক্তিতে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার এবং ইবাদত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা, এবং তার নিকট থেকে অলৌকিক সাহায্য, দয়া, বর, আশীর্বাদ বা নেকদৃষ্টি লাভের জন্য বা তার অলৌকিক ত্রৈধ, অভিশাপ বা বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তার নিকট চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে শিরক আস্গারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রূবুবিয়াত বা উল্লিহিয়াতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি ছলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে। শিরক আসগরের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে।

শিরক আসগরের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম:

৫. ২. ৩. ২. ১. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া (الرَّبْلَاء) অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা (To act ostentatiously, make a show before people, attitudinize, to do eyeservice)। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা

বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

যুমিনের ইবাদত ধর্স করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই ‘রিয়া’। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।^{৩৪}

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ রিয়াকে ‘শিরক আসগার’ অর্থাৎ ‘ছোট শিরক’ বা ‘শিরক খাফী’ অর্থাৎ ‘লুক্সারি শিরক’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, বাস্তা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু ‘পুরক্ষার’ বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শিরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। যাহমুদ ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَافَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْنَفُ قَالُوا وَمَا الشَّرُكُ الْأَصْنَفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّبَّاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْهُمْ جَزَاءً

“আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরক্ষার পাও কি না!”^{৩৫}

অন্য হাদীসে আবু সাউদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَافٌ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ فَقَنَّا بَلَى فَقَالَ الشَّرُكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ يُصْلَى فِي زَيْنٍ صَلَاتَةً لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

“দাঙ্গালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শিরক। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর

^{৩৪} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩।

^{৩৫} আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৮২৮-৮২৯; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ১/১০২।
হাদীসটির সনদ সহীহ।

যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।^{৩৫}

এখানে লক্ষণীয় যে, বান্দা যদি ইবাদতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই মনে করে, কেবল মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে। আর যদি বান্দা কেবল মানুষের দেখানোর জন্যই ইবাদতটি করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলেও ইবাদতটি পালন করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলে ইবাদতটি পালনই করবে না।

৫. ২. ৩. ২. ২. উসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক

মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকষ্টি একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, ঝোঁকে গরম হওয়া, পানিতে ডিজলে ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। এরপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া। জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিত স্থগিত বা নষ্ট করতে পারেন। এরপ বিশ্বাস সহ মুমিন বলতে পারেন, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভাল হয়েছে, বিষের প্রভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে, ঝড়ের কারণে গাছগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ঔষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে ... ইত্যাদি। এরপ বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ঔষধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙে বা অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি তিনি পোষণ করেন তবে তা 'শিরক আকবার' বলে গণ্য হবে।

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বসের বিষয় মাত্র। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশ্বে কোনো কার্যের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যমান। অমুক কারণটি না হলে কার্যটি হতো না। যেমন একজন খৃস্টান বলতে পারেন, যীশুর ইচ্ছায় কাজটি হয়েছে, একজন হিন্দু বলতে পারেন, অমুক দেবী বা দেবতার কারণে অমুক কাজটি হয়েছে। রাশির প্রভাবে বিশ্বাসী বলতে পারেন, অমুক রাশির প্রভাবে এ কাজটি হয়েছে।

জাগতিক উপকরণ এবং বিশ্বসের উপকরণের মাধ্যমে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের

^{৩৫} ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪০৬; আলবানী, সহীলুত তারগীব ১/৮৯। হাদীসটি হাসান।

মানুষই একমত। কেউ যদি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় লোকটির পেট নষ্ট হয়েছে তবে কেউ কথাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিবেন না, তবে বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটেছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণ-ওসীলাগুলি অন্য বিশ্বাসের মানুষের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিবেন।

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। জাগতিক ভাবে যা কারণ, উপকরণ বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শিরীক আকবার বা শিরীক আসগার হতে পারে।

যেমন একজন মুমিন বলতে পারেন যে, যাকাত প্রদান না করার কারণে অনাবৃষ্টি হয়েছে, ওয়নে, পরিমানে কম বা ভেজাল দেওয়ার কারণে জীবন্যাত্ত্বার কাঠিন্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যায় বিচার না থাকাতে দেশের উপর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য বেড়েছে... যিক্র-ইসতিগফারের কারণে রিয়কে বরকত এসেছে, ঈমান ও তাকওয়ার প্রসারতার কারণে দেশে শান্তি ও বরকত এসেছে....। মুমিন এগুলি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যিকার কারণ ও উপকরণ-ওসীলা। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত এগুলিকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু মুমিন বলতে পারেন না যে, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক বিষয়টি ঘটেছে। কারণ এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কার্যকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগের তারকা পূজারী বা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারিগণ রাশি বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথাগুলি তাদেরই কথা। যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, রাশিচক্র ইত্যাদির নিজস্ব প্রভাব আছে বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সংঘটনের ক্ষেত্রে তবে তিনি শিরীক আকবারে লিঙ্গ প্রকৃত মুশরিক বলে গণ্য।

অনুরূপভাবে যদি কেউ যনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা শিরীক আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত শিরীকী কথা বলেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন। উপরন্তু তা আল্লাহর নামে কঠিন মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে। কারণ কখনো কোথাও অল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান নি যে, এগুলি এরূপ বিষয়ের কারণ।

আর যদি কেউ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে কথার মধ্যে একুপ বলে ফেলেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, এগুলির একমাত্র পরিচালক আল্লাহ, রাশিচক্র বা অনুরূপ কোনো কিছু এক্ষেত্রে কোনোরূপ দখল নেই, তবে তা ‘শিরক আসগার’ বলে গণ্য হবে, যা কঠিন কবীরা গোনাহ। কারণ তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামতকে এমন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন যার সাথে এর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। তিনি তার কথায় আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছেন।

যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, হৃদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রাত্রিকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। প্রত্যুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাতুল ফাজর আদায় করেন। সালাত শেষ করে তিনি সমবেত মানুষদের দিকে মুখ করে বলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের রকম কি বলেছেন? তাঁরা বলেন, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উত্তম জানেন’। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَالْأَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِغَضْلِ اللَّهِ
وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِنُونَ كَذَا وَكَذَا
فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

“আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ সকালে আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং কেউ আমার প্রতি কুফৰী করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা আল্লাহর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং গ্রহণক্ষণের প্রতি কাফির। আর যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা অমুক অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার প্রতি কুফৰী করেছে এবং গ্রহণক্ষণে ঈমান এনেছে।”^{৩৭}

৫. ২. ৩. ২. ৩. আল্লাহর সমকক্ষ জাগক বাক্য বলা

এ পর্যায়ের শিরক আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত ‘কারণ’-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় ‘কারণ’ সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন ‘আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে একুপ হয়েছে’, তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে। যদি বজা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাছলে

^{৩৭} বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯০, ২৫১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮৩।

এরপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে ‘আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না’ তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে।

জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন ‘এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,’ অথবা ‘আপনি যা চাইবেন তাই হবে’। যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন: ‘আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, ‘হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা শিরক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি বলেন, “হে সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপনি যা ইচ্ছা করেন...” তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে না।

এখানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষণীয়:

প্রথমত, মানবীয় ইচ্ছার পরিসর সকলেরই পরিজ্ঞাত। মানুষ তারা ইচ্ছাধীন বা কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের ইচ্ছা লৌকিক এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ‘অলৌকিক’ বা ‘অপার্থিব’। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে। তিনি ‘হও’ বললেই সব হয়ে যায়। এরপ ‘ইচ্ছা’-র অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহ। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এরপ ‘অলৌকিক’ ইচ্ছা আছে বা অন্য কাউকে মহান আল্লাহ খুশি হয়ে এরপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তবে তা শিরক আকবার এবং মহান আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ কাউকে এরপ ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে কোথাও জানান নি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, আরবের কাফিরদের শিরকের মূল ভিত্তি ছিল এরপ চিন্তা। তারা নবী-গুলীদের মুজিয়া-কারামত এবং ফিরিশতাদের দায়িত্ব ও সুপারিশগ্রহণ বিষয়ক ওহীর নির্দেশনাগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে এ সকল বিষয়কে তাদের অলৌকিক ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করত। কেউ যদি এরপ অর্থে বলে যে ‘আল্লাহ এবং আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা শিরক আকবার এবং এর সংশোধনী হলো ‘মহান আল্লাহ

একাই যা চান তাই হবে, অন্যের ইচ্ছার মূল নেই।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি মানবীয় ইচ্ছা ও মহান আল্লাহর ইচ্ছার পার্থক্য অনুধাবন ও বিশ্বাস করার পরেও মানুষের ইচ্ছাধীন কোনো বিষয়ের আলোচনায় বলেন: ‘আল্লাহ এবং আপনি যা চান’ অথবা বলেন ‘আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান’ এবং তার উদ্দেশ্য হয় যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পুরো এখতিয়ার আপনার রয়েছে, তবে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বোপরি কার্যকর, তবে তার এ কথাটি শিরক আসগর। তার বিশ্বাস সঠিক থাকলেও তার কথায় তার বিশ্বসের প্রতিফলন ঘটেনি। এক্ষেত্রে একাপ বাক্যের সংশোধনী হলো ‘আল্লাহ যা চান তাই হবে, অতঃপর আপনার ইচ্ছা’ বা অনুরূপ বাক্য।

কাতীলা বিনতু সাইফী (রা) বলেন,

إِنَّ حِنْرَا جَاءَ إِلَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ
وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ،
وَقُولُوا: وَرَبُّ الْكَعْبَةِ

“একজন ইহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলেন, আপনারা তো শিরক করেন, কারণ আপনারা বলেন: ‘আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও’ এবং আপনারা বলেন: ‘কাবার কসম’। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বলবে: ‘আল্লাহ যা চান, এরপর তুমি যা চাও’, এবং বলবে: ‘কাবার প্রতিপালকের কসম’।”^{৩৮}

হ্যাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

“তোমরা বলবে না: ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে’ বরং তোমরা বলবে: ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করে।’”^{৩৯}

তুফাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ (রা) বলেন,

إِنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ لَقِيَ رَهْطًا مِنَ النَّصَارَى فَقَالَ: إِنْكُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا
أَنْكُمْ تَرْعَمُونَ أَنَّ الْمَسِيحَ إِنَّمَا اللَّهُ فَقَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ
اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ. قَالَ ثُمَّ لَقِيَ نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: إِنْكُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ

^{৩৮} হাকিম, আল-যুসতাদরাক ৪/৩৭১; নাসাই, আস-সুনান ৭/৬; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/২৬৩। হাদীসটি সহীহ।

^{৩৯} আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৫; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২১৬; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/২৬৩-২৬৫। হাদীসটি সহীহ।

تَرْعَمُونَ أَنَّ الْعَزِيزَ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَأَتَى النَّبِيُّ فَحَدَثَهُ، قَالَ النَّبِيُّ: حَتَّىٰ بَهْذَا الْحَدِيثِ أَحَدًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتْبَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَخْاكُمْ قَدْ رَأَى مَا بَلَغُكُمْ (وَفِي روَايَةِ أَحْمَدْ: وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلْمَةً كَانَ يَمْتَعِنُّ الْحَيَاةَ مِنْكُمْ أَنْ أَهَاكُمْ عَنْهَا)، وَفِي روَايَةِ عَنْ حَذِيفَةَ: قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُهَا مِنْكُمْ) فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكُمْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

“তিনি স্বপ্নে কতিপয় খৃস্টানকে দেখে তাদেরকে বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে ‘মাসীহ আল্লাহর পুত্র’। তখন তারা বলে, ‘তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান।’ এরপর তাঁর সাক্ষাত হয় একদল ইহুদীর সাথে। তিনি বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে ‘উয়াইর আল্লাহর পুত্র’। তখন তারা বলে, ‘তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান।’ তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে অন্যদেরকে জানিয়েছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি তখন আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর শুণবর্ণনা করলেন এবং বললেন: তোমাদের ভাই (তুফাইল) যে স্বপ্ন দেখেছে তা তোমরা জেনেছ। তোমরা এরূপ কথা বলতে যা আমি অপছন্দ করতাম, শুধু লজ্জার কারণে তোমাদের নিষেধ করি নি। তোমরা বলবে না: ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান’, বরং তোমরা বলবে: ‘আল্লাহ একাই যা চান, তার কোনো শরীক নেই।’”^{৪০}

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

“তোমরা বলবে না: ‘যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) চান’ বরং বলবে: ‘যা আল্লাহ একাই চান’।”^{৪১}

^{৪০} হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৫২৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৭২, ৩৯৩; নাসাঈ, আস-সনানুল কুবরা ৬/২৪৪; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/২৬৪-২৬৬। হাদীসটি সহীহ।

^{৪১} আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ ৮/১১৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২০৮-২০৯। সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

ইবনু আবুস (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِنَبِيٍّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَتْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَجَعَلْتَنِي
وَاللَّهُ عَذْلًا؟! (أَجَعَلْتَنِي اللَّهَ نَدًا) بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন: ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।’ তখন তিনি তাকে বলেন: ‘তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে?! বরং আল্লাহর একার ইচ্ছাই চূড়ান্ত।’”^{৪১}

এখানে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে ‘আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান’ বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীসে ‘একমাত্র আল্লাহ যা চান’ বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, সাহাবীগণ ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ (ﷺ) যা চান’, অথবা ‘আল্লাহ যা চান, অতঃপর মুহাম্মদ (ﷺ) যা চান’ বলতেন তাঁর জীবন্দশায়, যখন জাগতিকভাবে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ত এবং তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন। বিশ্ব পরিচালনা বা অলৌকিক ‘ইচ্ছা’ একমাত্র মহান আল্লাহরই। আমরা ইতোপূর্বে অগণিত আয়ত ও হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি যে, কারো মঙ্গল, অমঙ্গল, বিপদ দান, বিপদ থেকে উদ্ধার, হেদয়াত করা, ঈমান আনানো, ধর্মস করা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা ঝামেলা আল্লাহ প্রদান করেন নি। এক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। এজন্য আমরা দেখি যে, তাঁর ওফাতের পরে সাহাবীগণ তাঁর রাওয়ায় যেয়ে কখনোই বলেন নি যে, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ যা চান এবং এরপর আপনি যা চান, কাজেই আপনি আমাদের এ বিপদ বা অসুবিধা থেকে উদ্ধারের বিষয়ে ইচ্ছা গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। মূলত সকল কাজে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এছাড়া মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মর্যাদা অতুলনীয়। তিনি কিছু ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ তা রক্ষা করতেন। যেমন তিনি কাবাঘরকে কিবলা হিসেবে পেতে আগ্রহ বোধ করছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ আগ্রহ পূরণ করেন এবং কাবাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আয়ত নাযিল করেন।^{৪২} কাজেই সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে- টাকা প্রদান, চাকুরী প্রদান, জমি দান, শাস্তি মওকুফ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বলা যায় ‘হে আমীর বা হে নেতা, আল্লাহ যা চান এরপর আপনি যা চান’, তেমনিভাবে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট

^{৪১} আহমদ, আল-মুসনাদ ১/২১৪, ২৮৩, ৩৪৭।

^{৪২} সূরা (২) বাকারাঃ ১৪২-১৫০ আয়াত।

কোনো বিষয়ে অনুরূপ বলায় কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এরূপ বলার অনুমতি তিনি সাহারীগণকে দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসেই ‘একমাত্র আল্লাহ যা চান’ বলতে শিখিয়েছেন তিনি।

এর কারণ, সম্ভবত, জাগতিক রাজা, বাদশাহ, আমীর, সওদাগর নেতা বা অনুরূপ ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর ইচ্ছার পরে তার নামটি উল্লেখ করলে তাতে আনন্দিত হন। পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট চিরসমর্পিত। আল্লাহর ইচ্ছা তিনি ওহীর মাধ্যমে অবগত হতেন এবং সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতেন। আর এরূপ প্রশংসা তিনি অপছন্দ করতেন।

শিরক আসগার জাতীয় এরূপ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে: আমি আল্লাহর ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি, উপরে আল্লাহ এবং নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, আমার জন্য আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ এবং আপনি না হলে কাজটি হতো না, ইত্যাদি।

এ সকল ক্ষেত্রে যদি বক্তা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছারও একইরূপ প্রভাব রয়েছে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি কথার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং বক্তা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনে সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। যেমন আল্লাহর ইচ্ছাতেই হলো আর এরপর ছিল আপনার চেষ্টা ... আল্লাহর জন্যই বেঁচে গেলাম, আর এরপর ছিল আপনার অবদান ...।

৫. ২. ৩. ২. ৪. ‘গাইরুল্লাহ’র নামে শপথ করা

যাকে মানুষ অলৌকিকভাবে পবিত্র ও অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার নামে কখনো মিথ্যা বলতে সে সম্ভত হয় না। কারণ সে জানে যে, এদের নাম নিয়ে মিথ্যা বললে এদের অলৌকিক আক্রোশ বা অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। এজন্য প্রাচীন যুগ থেকে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে শপথের সত্যতা প্রমাণ করতে এরূপ অলৌকিক পবিত্র ও ভক্তিপূর্ত নামের শপথ করা। কারো নামে শপথ করার সুনিশ্চিত অর্থ যে শপথকারী উক্ত নামের অধিকারী সন্তাকে উলুহিয়াতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। ‘গাইরুল্লাহ’ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মূলত শিরক আকবার। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, ‘কাবা ঘরের কসম’ বা কাবাঘরের নামে শপথ করাকে শিরক বলা হয়েছে এবং কাবা ঘরের প্রতিপালকের কসম করতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে আল্লাহ

ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে যদি কোনো মুমিন নও মুসলিম হওয়ার কারণে অ্যাস অনুসারে গাইরূল্লাহর নামে শপথ করে ফেলে তবে তা ‘শিরক আসগার’ বলে গণ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো আলিম।

এ বিষয়ে আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন, “কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, এদের নামগুলি পবিত্র ও সমানিত। একারণে তারা বিশ্বাস করত যে, এদের নাম নিয়ে শপথ করলে সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। এজন্য তারা এদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করত না। আর একারণেই তারা যামলা বিবাদে প্রতিপক্ষকে এ সকল কান্নানিক শরীক ‘উপাস্যে’-র নামে শপথ করাতো। ফলে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়। ইবনু উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أُوْ أَشْرَكَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শির্ক করল।”^{৪৪}

কোনো কোনো মুহাদ্দিস মতপ্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ প্রকৃত শিরক নয়, বরং এরূপ করা কঠিন অন্যায় (শিরক আসগার) বুঝাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন। আমি এরূপ ব্যাখ্যা করছি না। আমার মতে এর অর্থ এই যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামের মধ্যে ‘পবিত্রতা’ বা ‘অলৌকিকতা’ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ‘আকীদা’ পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বা মিথ্যা কসম করে তবে তা শির্ক বলে গণ্য হবে।”^{৪৫}

৫. ২. ৩. ২. ৫. অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الطَّيْرَةُ شِرَكٌ الطَّيْرَةُ شِرَكٌ

“অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক।”^{৪৬}

^{৪৪} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/১১০; আবু দাউদ ৩/২২৩। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান।

^{৪৫} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, ইজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৭-১৮৮।

^{৪৬} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/১৬০; ইবনু হিবান, আস-সহীহ ১৩/৪৯১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১৭; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৭০। তিরমিয়ী, ইবনু হিবান, হাকিম প্রযুক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ

“অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করল সে শিরক করল। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর কাফ্ফারা কী? তিনি বলেন, একথা বলবে যে, হে আল্লাহ, আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার শুভাশুভত্ব ছাড়া কোনো শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”^{৮৭}

ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ مَنْ مَنْ تَطَيِّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ أَوْ تَكْهِنَ أَوْ تُكَهِّنَ لَهُ أَوْ سَحْرَ لَهُ وَمَنْ عَدَ عَدَّةً، وَمَنْ أُتْتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

“আমাদের দলভুজ নয় (আমার উম্মাত নয়) যে ব্যক্তি শুভাশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য বা গাহীবী কথা বলে বা অথবা যার জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোনো (সুতা-তাগা ইত্যাদিতে) গিট দেয়। আর যদি কেউ কোনো গণক-জ্যোতিষী বা অনুরূপ ভাগ্য বা ভবিষ্যত্বকার নিকট গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবর্তীণ দ্বীনের সাথে কুফরী করল।”^{৮৮}

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, তিথি, সময়, বস্ত্র, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোনো প্রভাবের ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ না করেন, বরং সুন্দরভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল, মন্দ, শুভ, অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু কথাচলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে।

৫. ২. ৩. ২. ৬. ভবিষ্যত্বকা বা ভাগ্যবজ্ঞার কথায় বিশ্বাস করা

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। মহান আল্লাহ ছাড়া

^{৮৭} আহমদ, আল-মুসনাদ ২/২২০; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৫/১০৫; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৩/১৩৯, নং ১০৬৫। হাদীসটির সনদ সহীহ।

^{৮৮} হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৫/১১৭। হাদীসটি সহীহ।

কারো ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহর ইলমের বিশেষণে অন্যকে শরীক করা হয়। এজন্য ইসলামে গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারের গোপন জ্ঞানের দাবিদার বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের নিকট গমন করতে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির কথাকে সত্য বলে মনে করলে তা শিরক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি। অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا أَوْ عَرَفَ أَنَّ فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ^١

“যদি কেউ কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বজ্ঞার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবর্তীর্ণ দীনের প্রতি কৃফরী করল।”^{১১}

অন্য হাদীসে সাফিয়াহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَتَىٰ عَرَفَ أَنَّ شَيْءًَا لَمْ تَقْبِلْ لَهُ صِلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً^{১২}

“যদি কেউ কেউ কোনো গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বজ্ঞার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার সালাত করুল করা হবে না।”^{১৩}

যদি কেউ এরূপ জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, ফকীর ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবিদারকে সত্যই ‘গাইবী’ বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য। আর যদি বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না, কিন্তু কৌতুহল বশত প্রশ্ন করে তবে তা কঠিন পাপ ও শিরক আসগর।

এখানে উল্লেখ্য যে, ‘ইলম দ্বারা ঢোর ধরা’ বা অনুরূপভাবে কুরআন, বা দু’আর মাধ্যমে গাইবের কথা জানার চেষ্টা করাও ‘কাহানাত’ বলে গণ্য। কারো কিছু চুরি হলে তিনি চুরিকৃত দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য দু’আ-তদবীর করতে পারেন। কিন্তু কে চুরি করেছে বা চুরি কৃত দ্রব্য কোথায় আছে তা জানার জন্য জাগতিক উপকরণ ছাড়া ‘গাইব’ জানার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ নেই।

৫. ২. ৩. ২. ৭. রশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করা

বিভিন্ন হাদীসে তাবিজ, কবজ, রশি, সূতা, তাগা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যবহার শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীসে ঝাড়-ফুঁক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য অনেক

^{১১} আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪২৯; আলবানী, সাহীহত তারগীব ৩/৯৭-৯৮।

^{১২} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৫।

আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ দ্বারা যেমন ঝাড়ফুক বৈধ, তেমনি একপ আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ লিখে 'তাবিয' আকারে ব্যবহারও বৈধ। কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থবোধক দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুক দেওয়া বৈধ, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাবিজ ব্যবহার কোনোভাবেই বৈধ নয়, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীস শরীফে কুরআনের আয়াত বা ভাল দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুক দেওয়া বৈধ বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনেককে ফুক দিয়েছেন। তবে তিনি নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কাউকে তাবিজ লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রা) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَأْيَعَتْ سَنْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأْيَعْتَ سَنْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَادْخُلْ يَدَهُ فَقَطَعَهَا
فَبَأْيَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

“একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি বলেন, এর দেহে একটি তাবিজ আছে। তখন তিনি তার হাত চুকিয়ে তাবিজটি ছিঁড়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন: “যে তাবিজ কুলালো সে শিরক করল।”^{১০}

আন্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) স্ত্রী যাইনাব (রা) বলেন,

إِنَّ عَنْدَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَنْتَهِي إِلَى الْبَابِ تَتَحَجَّ ... وَإِنَّهُ جَاءَ
ذَاتٌ يَوْمَ فَتَحَّنَحَ قَالَتْ وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنَ الْحُمْرَةِ فَأَخْلَقَتْهَا تَحْتَ السَّرِيرِ
فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَيْيَنِي فَرَأَيَ فِي غُنْقَي خِنْطاً قَالَ مَا هَذَا الْخِنْطُ قَالَتْ قَلْتُ خِنْطُ
أَرْقِي لِي فِيهِ قَالَتْ فَأَخْدُهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَغْنِيَاهُ عَنِ الشَّرِكِ
سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرَّفِيقَ وَالْتَّمَانَ وَالْتَّوْلَةَ شَرِكٌ قَالَتْ قَلْتُ لَمْ
تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَغْنِفُ وَكَنْتُ أَخْلُقُ إِلَيْ فَلَنِ اليَهُودِيَّ يَرْقِينِي
فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ قَالَ عَنْدَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا

^{১০} আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৫৬; হাইসামী, মাজমাউয শাওয়াইদ ৫/১০৩। হাদীসটির সনদ সহীহ। আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/৮০৯।

رَقَاهَا كَفَ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يُكْفِيكَ أَنْ تَقُولَيْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ أَذْهَبُ
الْبَلَسَ رَبَ النَّاسِ اشْفَ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا

‘ইবনু মাসউদ (রা) যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন। ... একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধ আমাকে ঝাড়ফুক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে ঢোকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসউদ (রা) ঘরে চুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পান। তিনি বলেন, এ কিসের সুতা? আমি বললাম, এ ফুক দেওয়া সুতা। যাইনাব বলেন, তখন তিনি সুতাটি ধরে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি রাসূলুল্লাহ ষ্ণ্঵-কে বলতে শুনেছি: “ঝাড়-ফুক, তাবীজ-কবজ এবং মিল-মহবতের তাবীজ শিরক।” যাইনাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসউদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি পড়ত। আমি অযুক ইহুদীর কাছে যেতাম। সে যখন বেড়ে দিত তখন চোখে আরাম বোধ করতাম। তখন ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: এ হলো শয়তানের কর্ম। শয়তান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোচাতে থাকে। এরপর যখন ফুক দেওয়া হয় তখন সে খোচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য তো যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ষ্ণ্঵ যা বলতেন তা বলবে। তিনি বলতেন: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থিতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থিতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থিতা) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমন (পরিপূর্ণ) শিফা বা সুস্থিতা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থিতা অবশিষ্ট থাকবে না।’’^{১২}

তাবিয়া ঈস্মা ইবনু আবি লাইলা বলেন,

دَخَلَنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعْوَدُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعْلَقَتْ
شَيْئًا فَقَالَ أَتَعْلَقُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ تَعْلَقَ شَيْئًا وَكُلِّ إِيْنَهِ

‘আমরা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম আবু মাবাদ জুহানীকে (রা) অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। আমরা বললাম, আপনি কোনো তাবিজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বলেন: আমি তাবিজ নেব? অথচ রাসূলুল্লাহ ষ্ণ্঵ বলেছেন: যদি কেউ দেহে (তাবিজ জাতীয়) কোনো কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তাবিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়।’’^{১৩}

^{১২} আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৩৮১; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৪১। হাদীসটির সনদ সহী।

^{১৩} আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৩১০; তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/৪০৩; আবু দাউদ, আস-

তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয় যুবাইর বলেন:

نَخْلَ حُذِيقَةُ هُوَ عَلَىٰ مَرِيضٍ فَرَأَىٰ فِي عَصْدِهِ سِبْرًا فَقَطَعَهُ أَوْ انْتَرَعَهُ
ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُسْرِكُونَ

“সাহাবী হ্যাইফা (রা) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে পান। তিনি লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন”^{৪৮}, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিঙ্গ থাকে।”^{৪৯}

৫. ২. ৩. ২. ৮. কাউকে ‘শাহানশাহ’ বলা

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলা যায় না এবং যে নাম ও গুণাবলি যহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য তা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শিরক আকবার। আর কিছু নাম ও বিশেষণ রয়েছে যা জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। আমরা বিদ্যাত ও ফিরকা বিষয়ক অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ দেখতে পাব।

মহান আল্লাহই এ বিশ্বের প্রকৃত মালিক, বাদশাহ ও প্রতিপালক। তবে জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষদেরকে রাজা বলার অনুমতি ও প্রচলন রয়েছে। কুরআন কারীমে একপ ব্যবহার রয়েছে। তবে জাগতিক অর্থেও কাউকে ‘রাজাগণের রাজা’, ‘শাহানশাহ’ ইত্যাদি গালভরা উপাধিতে আখ্যায়িত করতে হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمًّا عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ (مَلِكُ الْمَلُوكِ)-
شَاهَانْ شَاهٌ - لَا مَالَكٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: أَغْيِظْ رَجُلٌ
عَلَىٰ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبُثْهُ وَأَغْيِطْهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ لَا
مَلِكٌ إِلَّا اللَّهُ

“মহান আল্লাহর নিকট ঘৃণ্যতম নাম হলো যে কোনো মানুষ নিজেকে ‘শাহানশাহ’ বা ‘রাজাগণের রাজা’ নামে আখ্যায়িত করবে, অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রাজা নেই। অন্য বর্ণনায়: কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে নিন্দিত হবে ঐ ব্যক্তি যাকে

সুনান ৩/৩০০। হাদীসটি হাসান।

^{৪৮} সূরা ইউসুফের ১০৬ নং আয়াতের উন্নতি।

^{৪৯} ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৪৯৫।

‘রাজাগণের রাজা’ বা ‘শাহানশাহ’ নামে আখ্যায়িত করা হয়, অথচ আল্লাহ ছাড়া কোনো রাজা নেই।”^{৫৬}

৫. ২. ৩. ২. ৯. কাউকে রাব্ব বা আব্দ বলা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ‘অমুকের পালনকর্তা’, মালিক বা মনিব অর্থে ‘অমুকের ‘রাব্ব’ বলা যায়। অনুরূপভাবে জাগতিক দাসত্ব অর্থে একজনকে অন্যের ‘আব্দ’ অর্থাৎ বান্দা, দাস বা চাকর বলা যায়। তবে এরূপ শব্দ ব্যবহার না করতে হাদীস শরীফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এতে শব্দের মধ্যে শিরক হয়ে যায়, যদিও বিশ্বাসে শিরক না থাকে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ أَطْعَمْ رَبَّكَ وَصَنَعَ رَبَّكَ وَلِيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايِ
وَلَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمْتَي - كُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ - وَلِيَقُلْ
فَتَانِي وَقَتَانِي وَغَلَامِي .

“তোমাদের কেউ (মালিককে ‘রাব্ব’ বলবে না), বলবে না: তোমার রাব্বকে খাবার দেও, তোমার রাব্বকে ওয় করাও, তোমার রাব্বকে পানি পান করাও। বরং সে যেন (মালিককে) সাইয়েদী অর্থাৎ আমার নেতা, মাওলাইয়া অর্থাৎ আমার অভিভাবক বলে। আর তোমাদের কেউ (নিজের দাস বা চাকরকে) ‘আমার বান্দা’ বা আমার বান্দি বলবে না, কারণ তোমরা সকলেই তো আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই তো আল্লাহর বান্দি। বরং বলবে: আমার যুবক বা ছেলে, আমার যুবতী বা মেয়ে বা আমার বালক।”^{৫৭}

এভাবে আমরা দেখছি যে, মালিককে রাব্ব বলা এবং দাস বা চাকরকে ‘বান্দা’ বলা মূলত বৈধ হলেও শব্দের শিরকের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধারণ শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও অনেক আদব ও শিরকের বিষয় রয়েছে, যা শিরক আকবার না হলেও শিরক আসগর বলে গণ্য হতে পারে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরক থেকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বদা শিরক থেকে তাওবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবু মূসা আশ’আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا السُّرُكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دِبِيبِ النَّمَلِ قَالَ لَهُ مَنْ

^{৫৬} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৯২; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮৮।

^{৫৭} বুখারী, আস-সহীহ ২/৯০১; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৬৪-১৭৬৫।

شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّبِعُهُ وَهُوَ أَحْقَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَغُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشَرِّكُ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

“হে মানুষেরা, শিরক থেকে আত্মরক্ষা কর; কারণ শিরক পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুস্থিত। তখন একব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা যদি পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুস্থিত হয় তবে কিভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন, তোমরা বলবে; হে আল্লাহ, আমরা জেনেশ্বনে আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা না জানি তা থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”^{৫৮}

৫. শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, তাওহীদের দাওআতই সকল নবী-রাসূল (আ)-এর মূল দাওআত। ক্ষমত শিরকই মানব সমাজের কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির সকল আশা চিরতরে নস্যাত করে দেয়। এজন্য শয়তান সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে সকল মানুষকে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপত্তি করতে। নবী-রাসূলগণের দাওআতের মাধ্যমে যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে এবং বিশেষকরে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে তাদেরই নামে শিরকে লিঙ্গ করেছে শয়তান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহুদী, খ্স্টান এবং আরবের মুশরিকগণ। এরা সকলেই নবী-রাসূলগণের হেদায়েত প্রাপ্ত মানুষদের উত্তরসূরী ও অনুসারী। যুগের পর যুগ এরা বৎশ পরম্পরায় নবী-রাসূলগণের হেদায়াত বহন করেছেন এবং তাদের দীন পালন করেছেন। কিন্তু এরই মাঝে শয়তান এদের মধ্যে শিরক-এর প্রচলন করতে সক্ষম হয়।

মহান আল্লাহর সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনীন শরীয়ত ও দাওয়াত হিসেবে ইসলামে শিরক প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অন্যতম হলো মূল ওহীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং একে সর্বজনীন করা। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মাতদের মধ্যে শিরক প্রবেশের মূল কারণগুলির অন্যতম ছিল (১) ওহী ভূলে যাওয়া বা ওহীর বিকৃতি ঘটা এবং (২) ওহীর পরিবর্তের মানুষদের মতামত, ব্যাখ্যা ও পছন্দকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

এ সকল মানুষ ওহীর ব্যাখ্যা ও দীনের নামে বিভিন্ন শিরক, কুফর ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলন করে এবং এগুলিকেই মূল তাওহীদ ও দীন বলে

^{৫৮} আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৪০৩; মাকদিসী, আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ ১/১৫০; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ১০/২২৩-২২৪; আলবানী, সাহীহত তারগীব ১/৯। হাদীসটির সনদ হাসান।

দাবি করে। মূল ওহী বিকৃত, বিলুপ্ত বা আংশিক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এদের মতের অসারতা প্রমাণের পথ থাকে না। ফলে এদের মতামতই দীন বলে পরিগণিত হয়। মুসলিম উম্মার মধ্যে শিরকে প্রচলন বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখে যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রচলনের জন্য শয়তান ও তার শিষ্যরা একইভাবে চেষ্টা করেছে। তবে মূল ওহী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণে তাদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি যে, তাওহীদের প্রচার ও শিরক অপনোদনই কুরআন-হাদীসের মূল আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও শিরকই কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসে শিরক প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে (১) মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাস ও কর্মগুলি উল্লেখ করা, যেন মুমিনরা কখনো সেগুলিতে লিপ্ত না হয়, (২) শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা, যেন মুমিনগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, (৩) শিরকের অমৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা, (৪) শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা এবং (৫) শিরকের পথগুলি বন্ধ করা। আমরা এখানে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর তাওফীক ও করুণিয়াত প্রার্থনা করছি।

৫. ৩. ১. মুশরিকগণের পরিচিতি

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুশরিকগণের একটি সুন্দর শ্রেণীভাগ করেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি ‘হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ গ্রন্থে তিনি মুশরিকদেরকে তিন শ্রেণীতে এবং ‘আল-বালাগুল মুবীন’ গ্রন্থে মুশরিকদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেণীভাগ নিম্নরূপ:

৫. ৩. ১. ১. জ্ঞাতিয়ি, প্রকৃতিপূজারী বা নক্ষত্র পূজারিগণ

এরা দাবি করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। এদের ইবাদত করলে পৃথিবীতে উপকার পাওয়া যায়। মানুষের প্রয়োজন বা হাজত এদের কাছে পেশ করা সঠিক। তারা বলে, আমরা গবেষণা করে উদ্ঘাটন করেছি যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ব্যক্তির সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান সত্তা আছে যার ভিত্তিতে তারা যাত্রা ও চলাচল করে। এরা এদের পূজারীদের বিষয়ে অচেতন নয়। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামে মন্দির তৈরি করেছে এবং তাদের ইবাদত করে।

৫. ৩. ১. ২. মুশরিকগণ

এরা মুসলিমদের সাথে তাওহীদুর রূপবিয়জ্ঞাতের অধিকাংশ বিষয়ে একমত। তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষমতা

একমাত্র আল্লাহরই। এছাড়া যে বিষয়গুলি তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্য কাউকে কোনো এখাতিয়ার বা ক্ষমতা প্রদান করেন নি সে সকল বিষয়ও তিনি পরিচালনা করেন। অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলিমদের সাথে একমত নয়। তারা দাবি করে যে, তাদের পূর্ববর্তী নেককার বুজুর্গগণ আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ‘উল্হিয়াত’ বা ‘উপস্যত্ব’ প্রদান করেন। এভাবে তারা অন্যান্য বান্দাদের ‘ইবাদত’ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যেমনভাবে রাজাধিরাজ মহারাজের খাদিম বা সেবক তার সেবা ও ভক্তি করে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় তখন মহারাজ সেই খাদিমকেও রাজত্ব উপচৌকন প্রদান করেন বা তাকে একটি বিশেষ এলাকার ‘সামন্ত’ রাজা বানিয়ে দেন। তখন সে রাজত্বের পরিচালনার দায়ভার এ সামন্ত রাজার উপরেই বর্তায়। আর উক্ত রাজ্যের প্রজাদের দায়িত্ব হয়ে যায় এ রাজার আনুগত্য করা।

তারা বলে, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা করুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি উর্ধ্বে। তার নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তাঁর ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুজুর্গের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন। তারা বলে, এ সকল বুজুর্গ শুনেন, দেখেন, তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

এ সকল দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে তারা এসকল বুজুর্গের নাম পাথরে খোদাই করে রাখে এবং তাদের নাম বিজড়িত পাথর সামনে রেখে তাদের ইবাদত করে। প্রথম যুগের মুশরিকদের তিরোধানের পরে পরবর্তী প্রজন্মের মুশরিকগণ মূল বুজুর্গ উপাস্য ও তাদের স্মৃতিতে বানানো মুর্তি বা স্তম্ভের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা মনে করে এ সকল মুর্তি বা স্তম্ভই বুঝি উপাস্য। এজন্য মহান আল্লাহ এ সকল মুশরিকদের দাবি দাওয়া রদ করে কখনো বলেছেন যে, বিশ্ব পরিচালনা, রাজত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র তারই। কখনো তিনি বলেছেন যে, তারা যাদের ইবাদত করে তারা জড় পদার্থ মাত্র।

৫. ৩. ১. ৩. খৃষ্টানগণ

খৃষ্টানগণ দাবি করে যে, ইস্রায়েলীয় (আ)-এর সাথে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। কাজেই তাকে ‘আব্দ’ অর্থাৎ দাস বা ‘বান্দা’ বলা উচিত নয়। কারণ তাকে ‘আব্দ’ বা ‘বান্দা’ বললে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান বানিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ করা তাঁর মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী। সর্বোপরি এতে আল্লাহর সাথে তার যে বিশেষ নৈকট্যের সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয়।

এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য তাকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলতে পছন্দ করেন। তাদের যুক্তি এই যে, পিতা তার পুত্রকে বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাকে প্রতিপালন করেন। আর সাধারণ দাস বা চাকরদের চেয়ে পুত্র অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়। এজন্য ‘পুত্র’ পদটিই তাঁর মর্যাদার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাকে ‘আল্লাহ’ বলতে শুরু করেন। তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে অবস্থান করছেন। আর এজন্যই তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানানো ইত্যাদি মানুষের অসাধ্য অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম হন। কাজেই তাঁর কথাই আল্লাহর কথা এবং তাঁকে ইবাদত করা অর্থ আল্লাহকে ইবাদত করা।

পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্যে ঈসা (আ)-কে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলার এ সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বিরাজ করে। ফলে তারা ‘আল্লাহর পুত্রত্ব’ বলতে প্রকৃত পুত্রত্বই বুঝতে থাকে। কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি প্রকৃতই ‘আল্লাহ’। এজন্য আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে কখনো বলেছেন যে, তাঁর কোনো স্তু নেই, কখনো বলেছেন যে, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

এ তিন দলেরই মতামত প্রমাণের জন্য অনেক লম্বা চওড়া যুক্তি তর্কের বহর রয়েছে। কুরআন কারীমের শেষের দু দলের শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তিকর দালিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।^{৫৯}

অতঃপর তিনি বলেন: “শিরুক রোগে আক্রান্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদা ভুলে গিয়েছে। সে কেবল শরীকগণেরই ইবাদত করে এবং কেবলমাত্র তাদের কাছেই নিজের হাজত-প্রয়োজন পেশ করে। আল্লাহর কাছে সে নিজের প্রয়োজন জানায় না বা আল্লাহর দিকে সে দৃষ্টিপাতও করে না। যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানে ও মানে যে এই মহাবিশ্বের অনাদি-অনন্ত স্রষ্টা আল্লাহই। মুশরিকদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই নেতা, প্রভু এবং বিশ্বের পরিচালক। কিন্তু তিনি তাঁর ‘উল্লিখিয়াত’-এর কিছু মর্যাদা তার কোনো কোনো বান্দাকে দিয়ে থাকেন এবং তাদের সুপারিশ করুল করেন। তাদেরকে তিনি কিছু বিশেষ বিষয়ে পরিচালনার বা কার্যনির্বাহের দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন মহারাজ বা

^{৫৯} শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৭-১৭৯।

রাজাধিরাজ তার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে ‘সামন্ত’ রাজা নিয়োগ করেন এবং তাকে উক্ত এলাকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বৃহৎ বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ সকল বিষয় পরিচালনা ও কার্য নির্বাহ করার দায়িত্ব এ সকল ছোট রাজাদের উপর অর্পিত হয়। এরপ বিশ্বাস পোষণকারী মুশরিক আল্লাহর এ সকল বিশেষ বান্দাদেরকে ‘আল্লাহর বান্দা’, ‘আল্লাহর দাস’ বা আল্লাহর আবদ’ বলতে দ্বিধাবোধ করে; কারণ এতে ‘এ সকল খাস বান্দাকে অন্য সব ‘আম’ বান্দার সমর্পণায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্য সে এরপ খাস বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা না বলে ‘আল্লাহর পুত্র’ বা ‘আল্লাহর মাহবূব’ (আল্লাহর প্রিয়) বলে। আর নিজেকে সে এরপ ‘খাস বান্দাদের’ বান্দা বলে নামকরণ করে। যেমন ‘আব্দুল মাসীহ’, আব্দুল উয্যা, ইত্যাদি। ইহুদী, খুস্টান, সাধারণ মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনের অনুসারী সীমালজ্বনকারী মুনাফিকদের অধিকাংশই এই রোগে আক্রান্ত।”^{৬০}

৫. ৩. ১. ৪. কবর পূজারিগণ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থে বলেন: “মুশরিকগণের চতুর্থ দলটি হইল কবর পূজারীদের দল। তাহাদের দাবী হইল যখন আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা ইবাদত বন্দেগী সাধন-ভজন দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোআ করুল হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরপে পরিগণিত হইয়াছেন, এইরপ ব্যক্তির ইন্তিকালের পর তাহার আত্মা বিরাট শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে। সুতরাং যে লোক এমন বুয়ুর্গের আকৃতি ও চেহারার ধ্যান করে অথবা তাহাদের থাকার স্থান এবং কবরকে খুব বিনয়, ন্যূনতার এবং ভক্তি সহকারে সিজদাহ করে, তাহার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুয়ুর্গের আত্মা অবহিত হইয়া যায়; দুনিয়া ও পরকালের তাহার মনোবাঞ্ছ পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহার জন্য সুপারিশকারী হয়। উল্লেখিত শিরক ও বিদআতীদের বাতিল মতবাদ প্রচার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন...।

... ইহা আমাদের ভালভাবে বুঝা উচিত যে, উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের যে ইবাদত বন্দেগী এই পৃথিবীতে করা হয় এবং তাহাদের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করা হয় ত্রি সব আত্মা ও দেহসমূহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাহারা বলিবে আমরা এই সম্বন্ধে অবগত নহি। পূজারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য

^{৬০} শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইজজাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৮২-১৮৩।

শাফায়াত করা তো দূরের কথা, তাহাদের কাজকে আদৌ স্বীকৃতি দিবে না।^{৬১}

৫. ৩. ২. শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ

কোন্ত কোন্ত বিশ্বাস বা কর্ম করে অন্যান্য জাতির মানুষেরা মুশরিকে পরিণত হয়েছে তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেন কোনো মুঘল কোনোভাবে এরূপ কর্মের মাধ্যমে শিরকে লিঙ্গ না হয়। আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী জাতিগণের শিরক ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইবাদতে। তাওহীদুর রূবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক ছিল কম। আমরা এখানে বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৫. ৩. ২. ১. প্রতিপালনের শিরক

শিরক ফির রূবুবিয়াহ বা প্রতিপালনের শিরক ছিল আরবের মুশরিকদের মধ্যে কিছু প্রচল্ন। সাধারণভাবে তারা মহান আল্লাহর রূবুবিয়াতের একত্ব একবাক্যে স্বীকার করত। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহ দয়া করে কিছু বান্দার প্রতি খুশি হয়ে তাদেরকে বিশ্বের পরিচালনা বা নিষ্ট-অনিষ্টের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এজাতীয় আরো কয়েক প্রকার শিরক তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

৫. ৩. ২. ১. ১. প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের কাফিরগণ মহান আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টি ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করত। কিন্তু তাদের অনেকেই আধিরাতে বিশ্বাস করত না। তাদের বিশ্বাস অনেকটা এরূপ ছিল যে, মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন, মানুষ যুগের আবর্তনে মরে শেষ হয়ে যায়। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এদের বিভাসি আলোচনা ও অপনোদন করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْتَىٰ وَمَا يُهْكِنُّا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظْلَمُونَ

“তারা বলে, ‘একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদের ধৰ্মস করে।’ বন্ধুত্ব এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে।”^{৬২}

আমরা আগেই বলেছি যে, এরূপ কুফরী বা অবিশ্বাসও শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা যুগের আবর্তনকেই ‘রাব’ বা মহান আল্লাহর রূবুবিয়াতের গুণধারী বলে বিশ্বাস করছে।

^{৬১} শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৫৯-৬১।

^{৬২} সূরা (৪৫) জাসিয়াহ: ২৪ আয়াত।

৫. ৩. ২. ১. ২. আল্লাহর সাথে আজীয়তার দাবি

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যাদেরকে ‘আল্লাহর বিশেষ বান্দা’ বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর কল্যা বা আল্লাহ পুত্র বলে আখ্যায়িত করত। প্রাচীনকাল থেকেই মুশরিকগণ বিভিন্ন যুক্তিতে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে ‘আল্লাহর সত্তান’, ‘আল্লাহর পুত্র’, ‘আল্লাহর কল্যা’, ‘আল্লাহর বংশধর’ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করত। যেমন মুশরিকগণ মালাইকা বা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কল্যা বলে বিশ্বাস করত এবং জিন্নদেরকে আল্লাহর সাথে আজীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত। এছাড়া কোনো কোনো ইহুদী ‘উয়াইর’ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। আর খ্স্টিনগণ ঈসা মাসীহ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। সাধারণত পুত্রত্ব বা সত্তানত্ব দ্বারা তারা একটি বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতো যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। এগুলি সবই মহান আল্লাহর মর্যাদার পরিপূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক শিরকী বিশ্বাস। কুরআন কারীমে বারংবার এগুলির প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এরপ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৫. ৩. ২. ১. ৩. আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক

মুশরিকদের শিরকের অন্যতম একটি প্রকাশ ছিল মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কারো ‘ইলমুল গাইব’ অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের অন্যতম দিক তাঁর অনন্ত-অসীম অতুলনীয় ও সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। তাঁর অন্যতম সিফাত হলো ‘আলিমুল গাইব’ বা ‘অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী’ এবং ‘আলিমুল গাইব ওয়াশ শাহাদাহ’ বা ‘দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী’। কুরআন কারীমে একথা বলা হয় নি যে, মহান আল্লাহর মত গাইবী ইলম কারো নেই, বরং বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞানই আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে গাইবের জ্ঞান তার নবী-রাসূলদের প্রদান করেন। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলসহ সমগ্র সৃষ্টিকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

বান্দার জ্ঞান উপকরণের অধীন। জাগতিক বা আজীক উপকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি, ওহী ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দা জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য জাগতিক উপকরণ সকল মানুষের জন্য সমান। আর ওহী, ইলহাম ইত্যাদি মহান আল্লাহ দয়া ও পছন্দ করে কোনো বান্দাকে দিতে পারেন। এগুলি একান্তই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, বান্দার ইচ্ছাধীন নয়।

ইলমুল গাইবে শিরক করার বিভিন্ন দিক রয়েছে:

(১) আল্লাহ ছাড়া কারো উপকরণ ছাড়া কোনো বিশেষ বা সকল গাইবের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

(২) ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে কোনো গাইব বা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অদ্য কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা। জ্যোতিষী, গণক, যাদুকর ও জিন্দের বিষয়ে আরবের মুশরিকগণ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত।

(৩) আল্লাহর সকল ইলমু গাইব তিনি তাঁর কোনো বাদাকে জানিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা। এতে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা অঙ্গীকার করা হয়। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টির সকল জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্যুর্ঘাত ভাষায় বারব্বার বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের সময়, আগামীকাল মানুষ কি করবে, কোথায় মরবে ইত্যাদি কিছু বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এজন্য কাউকে আল্লাহ এরূপ সকল ও সামগ্রিক গাইব জানিয়েছেন বলে দাবি করাও কুরআনের নির্দেশনা অঙ্গীকার করা বলে গণ্য। খৃস্টানগণ ঈসার (আ) বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে।

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করে যে, ঈসা মাসীহ (আ) মহান আল্লাহর যতই সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কারণ তিনি মহান আল্লাহর যাতেরই অংশ। প্রচলিত ও বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও যীশুর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, তিনি গাইব জানতেন না। কিন্তু খৃস্টানগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ সকল আয়াত বাতিল করে দেয়। প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে সুস্মাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াতে কিয়ামতের বিষয়ে যীশু বলেছেন: “কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দৃতগণও (ফিরিশতাগণ) জানেন না, পুত্রও (যীশু স্বয়ং) জানেন না, কেবল পিতা জানেন।” ত্রিত্বাদী খৃস্টানদের জন্য এ কথাটি কঠিন চপটায়াত। তারা জালিয়াতির মাধ্যমে বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে কথাটি গোপন করতে বা বাতিল করতে চেষ্টা করেছে। জালিয়াতির একটি নমুনা এই যে, তারা ‘পুত্রও জানেন না’ কথাটুকু বাইবেল থেকে মুছে দেয়। বর্তমানে ‘অথোরাইয়ড ভার্সন’ নামে প্রচলিত কিং জেমস ভার্সন-এ উপরের আয়াতটির নিম্নরূপ: “But of that day and hour knoweth no man ‘no, not the angels of heaven, but my Father only.’” এখানে পাঠক দেখছেন যে, ‘পুত্রও জানেন না (neither the Son) কথাটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই প্রায় হাজার বৎসর যাবত এ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আলোকে জালিয়াতি ধরা পড়ার কারণে আধুনিক সংস্করণগুলিতে কথাটি

সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া বাইবেলের মধ্যে আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, ঈসা মাসীহ কখনোই ওহীর অতিরিক্ত কোনো গাইবের কথা জানতেন না বা জানার দাবি করেন নি। তবে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটি এবং এ জাতীয় সকল আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ বাতিল করে দেয় এবং যীশুর জন্য সামগ্রিক ইলমুল গাইব দাবি করে।

৫. ৩. ২. ২. ইবাদতের শিরক

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের শিরকেরই বেশি লিঙ্গ হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে। বস্তুত মানুষের মূর্খতা ও মানবীয় দুর্বলতা তাকে প্ররোচিত করে বিপদে আপদে ‘মৃত’, ‘দৃশ্যমান’ বা হাতের নাগালে পাওয়া কারো কাছে নিজের অসহায়ত্ব পেশ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন করা। মানুষ বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকৃতি জানায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরচিন্তাএ এভাবে অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না। কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তান এরূপ অস্থিরচিন্তাও দুর্বলতার সুযোগে মানুষকে প্ররোচিত করে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ‘দৃশ্যমান’, বা ‘হাতের নাগালে পাওয়া যায়’ এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে। বাদ্দা তাবে এতে হয়ত দ্রুত তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে তার এরূপ কর্মকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চায়।

এরূপ ব্যক্তি কখনোই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে স্রষ্টা, প্রতিপালক বা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না, বরং মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে ভক্তির অর্ঘ্য, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এভাবেই ইবাদতের শিরক যুগে যুগে বিভিন্ন আসমানী ধর্মের অনুসারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি জেনেছি। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য পালন করত। কুরআন ও হাদীসে এগুলি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে এ সকল ইবাদতের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ৩. ২. ২. ১. গাইরুল্লাহর সাজ্দা

সাজ্দা করা ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। চূড়ান্ত ভক্তি বা অলৌকিক ভক্তির প্রকাশ হিসেবেই শুধু সাজ্দা করা হয়। চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা,

ইত্যাদি সকল উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদত করে মুশরিকগণ। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বলেন:

لَا سَجَدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّا هُوَ تَعْبُدُونَ

“তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর না।”^{৬৩}

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সাজদা, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্যও ‘দু’আ’ বা ‘ডাকা’। যাকে ডাকা হচ্ছে বা যার কাছে অলৌকিক প্রর্থনা করা হচ্ছে তিনি যেন খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া দেন সেজন্যই সাজদা। এজন্য মহান আল্লাহর বলেন:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَذْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“এবং এই যে, সাজদা করার কর্মসংগ্রহ বা সাজদার স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।”^{৬৪}

৫. ৩. ২. ২. ২. গাইরমুহার জন্য উৎসর্গ জবাই মানত

উৎসর্গ করা (sacrifice) ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। জীব জানোয়ার উৎসর্গ করা হলে আমরা সাধারণত কুরবাণী দেওয়া, বলি দেওয়া বা জবাই করা বলি। খাদ্য, ফসল, ফুল ইত্যাদী উৎসর্গ করা হলে সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের মুসলিম পরিভাষায় মান্তব্য, সদকা ইত্যাদি বলা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা আল্লাহকে বা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে খুশী করার জন্য, তাদের বর, আশীর্বাদ বা করুণা পাওয়ার জন্য বা তাদের প্রতি অভ্যরের ভক্তি প্রকাশের জন্য জীব জানোয়ার, ফল-ফসল, ফুল-ফল খাদ্য ইত্যাদী উৎসর্গ করেছেন, বলি দিয়েছেন বা ভেট দিয়েছেন এবং এখনো দেন। উৎসর্গ কখনোও সাধারণভাবে করা হয়, কোন রূপ শর্ত (precondition) ছাড়াই একজন ভক্ত তাঁর ভক্তির প্রকাশ হিসাবে উৎসর্গ দান করেন। কখনো বা তা মানত হিসাবে পেশ করা হয়, অর্থাৎ একজন ভক্ত উপাসক সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁর নির্দিষ্টমনোবাসনাপূর্ণ হলে তিনি তাঁর উপাস্যর জন্য কিছু উৎসর্গ করবেন।

সর্ব যুগের মুশরিকদের মত আরবের মুশরিকরাও জীব জানোয়ার, ফসল খাদ্য ইত্যাদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতো এবং তাদের অন্য সকল উপাস্যের জন্যও উৎসর্গ করত। এ শিরকের বিষয়ে মহান আল্লাহর বলেছেন:

^{৬৩} সূরা (৪১) ফুস্মিলাত: ৩৭ আয়াত।

^{৬৪} সূরা (৭২) জিন্ন: ১৮ আয়াত।

وَجَعَلُوا اللَّهَ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَغْهِمْ
وَهَذَا لِشَرْكَائِهِمْ فَمَا كَانَ لِشَرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ
إِلَى شَرْكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তনুধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের অন্যান্য উপাস্যের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পেঁচে; তারা যা মিমাংসা করে তা নিকুঠি।’”^{৬৫}

উৎসর্গ বিষয়ক শিরকের বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ تَالَّهُ لِنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

“আমি তাদেরকে যে রিয়্যাক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর, তোমরা যে যথিথা উদ্ভাবন কর সে সমস্কে তোমাদেরকে প্রশং করা হবেই।”^{৬৬}

কুরবানী বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার নির্দেশনা দিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ أَمْرَتُ وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ বা কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহরই নিমিত্ত, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, তার কোন শরীক নেই। এজন্যই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি সর্বাগ্রে আরসমর্পণ করছি।”^{৬৭}

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সম্মোধন করে বলেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং জবাই-কুরবানী কর।”^{৬৮}

এ জাতীয় শিরক আলোচনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেন: মুশরিকগণ মুর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ-নক্ষত্রের করুণা ও নৈকট্য লাভের জন্য

^{৬৫} সূরা (৬) আনআম : ১৩৬ আয়াত।

^{৬৬} সূরা (১৬) নাহল: ৫৬ আয়াত।

^{৬৭} সূরা (৬) আনআম : ১৬২-১৬৩ আয়াত।

^{৬৮} সূরা (১০৮) কাওসার: ২ আয়াত।

তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত। এজন্য তারা জবাইদের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত। অথবা তাদের উদ্দেশ্যে বানানো বিশেষ বেদি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে নিয়ে পশু জবাই করত। কুরআনে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন^{৫৫}:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَانَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ

“বাহীরাহ, সায়িবা, ওয়সীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেন নি; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলক্ষ্মি করে না।”^{৫৬}

৫. ৩. ২. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা ত্রাণ প্রার্থনা

দু'আ (الدعا) অর্থ আহ্�বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। ডাকা বা আহ্বান করা এবং প্রার্থনা করা পরম্পর জড়িত। কারো কাছে প্রার্থন করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং সাধারণত কারো ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

দু'আ বা প্রার্থনার বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু'আকে অনেক সময় ‘ইসতি’আনাহ (الاستغاثة) অর্থাৎ ‘আওন’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ‘ইসতিম্দাদ’ (الاستمداد), অর্থাৎ ‘মদদ’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ‘ইসতিগাসাহ’ (الاستغاثة) অর্থাৎ ‘গাউস’ বা ত্রাণ বা উদ্ধার প্রার্থনা ইত্যাদি বলা হয়। সবকিছুরই মূল ‘দু'আ’।

প্রার্থনা করা বা ডাকার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া, মাথার বোৰা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত। জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা ডাকা অলৌকিক বা অপার্থিব। জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ

^{৫৫} সূরা (৫) মায়দা: ১০৩ আয়াত।

^{৫৬} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৭।

জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো “ধর্মের অনুসারী” বা “বিশ্বাসী” করেন। “বিশ্বাসী” কেবলমাত্র ‘আল্লাহ’, ‘ঈশ্বর’ বা সর্বশক্তিমান বলে যাকে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে ‘ইশ্বরের’ বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে ‘ঐশ্বরিক’ ক্ষমতা আছে, তার কাছেই একুপ প্রার্থনা করেন বা তাকেই এভাবে ডাকেন।

দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রার্থনা বা ডাকাই ইবাদত-এর সর্বজনীন প্রকাশ। সকল যুগে সকল ধর্মের মানুষই মূলত তার আরাধ্য বা উপাস্যকে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা করে অপার্থিব ও অলৌকিক সাহায্য লাভের জন্য। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নবর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু'আর জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্ত্র এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। এভাবে আমরা দেখছি যে দু'আই হলো ইবাদত-এর সর্বজনীন ও সর্বপ্রধান প্রকাশ।

নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী ﷺ বলেন :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত।” একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন^{১১}:

وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْغُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي
سَيَذْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَآخِرِينَ

“তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে) তারা শীত্রেই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবে।”^{১২}

দু'আ, কেন্দ্রিক শিরকের বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) বলেন: “মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত। অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থিতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের নিকট প্রার্থনা করত। এ সকল উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত করত। তারা আশা করত যে, এ সকল মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে। তারা

^{১১} সুরা গাফির (মুমিন) : ৬০।

^{১২} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২১১; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৭৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৫৮; ইবনু হির্বান, আস-সুনান ৩/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদুরাক ১/৬৬৭। হাদীসটি সহীহ।

বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম পাঠ করত। একারণে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সালাতের মধ্যে বলবে:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ

“আমরা শুধু তোমরই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।”^{১৩}

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَذْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“সুভরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেক না।”^{১৪}

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে ‘ডাকা’ অর্থ ‘ইবাদত’ করা। তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। স্পষ্টতই ‘ডাকা’ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন^{১৫}:

بِلْ إِنَّهُ تَذَعَّونَ فَيَكْشِفُ مَا تَذَعَّونَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ وَتَسْوَنَ مَا تُشْرِكُونَ

“(বল, তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শান্তি তোমাদের উপর আপত্তি হলে, অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও?) বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে তোমাদের সে বিপদ তিনি দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে তোমরা ভুলে যাবে।”^{১৬}

যেহেতু দু’আই ইবাদতের মূল প্রকাশ এবং এক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি শিরকে লিঙ্গ হয় মানুষ, সেহেতু কুরআনে এই ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে বা একমাত্র তাঁরই কাছে দু’আ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কোথাও মুশারিকরা যে তাদের উপাস্যদের ডাকত বা তাদের কাছে দু’আ করার মাধ্যমে শিরক করত তা বারংবার বলা হয়েছে। কুরআনে দু’শতাধিক স্থানে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে।

একটি উদাহরণ থেকে আমরা লৌকিক ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকা এবং শিরকী ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকার মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করি। মনে করুন

^{১৩} সূরা (১) ফাতিহা: ৪ আয়াত।

^{১৪} সূরা (৭২) জিল্লা: ১৮ আয়াত।

^{১৫} সূরা (৬) আনআম: ৪০-৪১ আয়াত।

^{১৬} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৫।

আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে। আমি সামনে কোনো মানুষ দেখে বা কোনো মানুষ থাকতে পারে মনে করে চিন্তার করে বললাম, তাই, আমার গরুটি একটু ধরে দেবেন! অথবা আমি পথ চিনতে পারছি না, তাই কোনো মানুষকে দেখে অথবা কোনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে মানুষ আছে অনুমান করে চিন্তার করে বলছি, তাই আমুক স্থানে কোন দিক দিয়ে যাব একটু বলবেন!

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। এই মানুষের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিক শুণ কল্পনা করছি না। এই ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়ও আমার কাছে কোনো শুরুত্ব বহন করে না। আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে বা উক্ত স্থানের একজন বাসিন্দা স্বাভাবিকভাবে পথটি চিনিবে বলে আশা করা যায়। এজন্য আমি তার থেকে এই লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

যদি কোথাও এই প্রকারের জাগতিক সমস্যা হয় এবং সেখানে কোনো মানুষজন না থাকে তাহলে উপস্থিত অদৃশ্য ফিরিশতাগণের নিকটও সাহায্য চাওয়া যেতে পারে বলে একটি দুর্বল সনদের হাদীস থেকে জানা যায়। মুমিন জানেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতাগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়া অদৃশ্য সৃষ্টি জীবনের বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে। উপরের পরিস্থিতিতে যদি কোনো দৃশ্যমান মানুষকে না দেখে তিনি অদৃশ্য ফিরিশতা বা জিনের কাছে লৌকিক সাহায্য চান তাহলে তা জায়েয় হবে। কারণ তিনি কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা অলৌকিকত্ব কল্পনা করছেন না। তথায় কোন ফিরিশতা আছেন বা কোন জিন রয়েছেন তাও তিনি জানেন না বা জানা তার কাছে কোনো শুরুত্ব বহন করে না। তিনি জানেন যে, এখানে কোনো ফিরিশতা বা জিন থাকতে পারেন। আল্লাহর অন্য কোনো বান্দাকে দেখছি না, কাজেই এখানে উপস্থিত আল্লাহর অদৃশ্য বান্দাদের কাছে একটু সাহায্য চেয়ে দেখি কী হয়। ইবনু মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجْلَ مَلَائِكَةُ سَوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ مِنْ وُرْقِ الشَّجَرِ فَإِذَا
أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضٍ فَلَا يُفْتَنَادُ أَعْيُنُهُ أَعْيُنُوا عِبَادُ اللَّهِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى

“বান্দার সাথে তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ ছাড়াও আল্লাহর অনেক ফিরিশতা আছেন যারা সারা বিশ্বে কোথায় কোন গাছের পাতা পড়ছে তাও লিখেন। যদি তোমাদের কেউ কোনো নির্জন প্রান্তেরে আটকে পড়ে বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে সে ডেকে বলবে: হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের রহমত করুন।”^{১১}

^{১১} ইবনু আবী শাইখা, আল-মুসান্নাফ ৬/১১, আবু ইয়ালা, আল-মুসন্নাফ ১/১৭, তাবারানী,

এ প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা শিরক হবে। যেমন, কারো রিকশা উল্টে গেছে বা গাড়িটি খাঁদে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক লৌকিক কর্ম যে, সে কাউকে দেখতে পাক বা না পাক, সে চিন্কার করে সাহায্য চাইবে: কে আছ একটু সাহায্য কর। এখানে সে লৌকিক সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু যদি সে এ সময়ে সেখানে অনুপস্থিত কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে ডাকতে থাকে তাহলে সে শিরকে লিঙ্গ হবে। কারণ সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমৃক ব্যক্তি সদা সর্বাদা সবত্র বিরাজমান বা সদা সর্বাদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত। কাজেই, তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার মতো “অলৌকিক” ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকেকত্তু, ঐশ্঵রিক শক্তি বা মহান আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করে শিরকে নিপত্তি হয়েছে। এছাড়াও সে মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে ছেট বলে মনে করেছে।

এ প্রার্থনাকারী বা আহ্বানকারী ঐ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা কল্পনা করেছে তা একাত্তভাবেই মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ প্রার্থনাকারী এই গুণাবলীকে শুধুমাত্র আল্লাহর বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এই ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহর শরীক আছে। এই ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমৃক ব্যক্তিরও আছে। তবে সে সম্ভবত তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতাকে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে বেশি বা দ্রুত বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে। এক্ষেত্রে মুশরিকদের দাবি যে, এ সকল খাজা বাবা, সাঁই বাবা, মা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জিন্দেরকে আল্লাহই ক্ষমতা প্রদান করেছেন। ক্ষমতা মূলত আল্লাহরই, তিনি এদেরকে কিছু বা সকল ক্ষমতা প্রদান করেছেন। শিরকের হাকীকাত বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ)-এর বক্তব্যে আমরা তা দেখেছি।

৫. ৩. ২. ২. ৪. গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা

তাওয়াক্কুল অর্থ নির্ভরতা (to rely, depend, trust)। সাধারণভাবে বাংলায় নির্ভরতা বলতে আমরা যা বুঝি তা লৌকিক ও অলৌকিক দু প্রকারেই হতে পারে। জাগতিকভাবে একজন মানুষ অন্যের

আল-মু'জামুল কাদীর ১০/১১৭, ১৭/১১৭, বাইহাকী, ও'আবুল ঈমান ১/১৩৮, ৬/১২৮, হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ১০/১৩২, মুনাবী, ফাইয়ুল কাদীর ১/৩০৭, শওকানী, তুহফাতুয় যাকিরীন, পৃ. ১৫৫, আলবানী, যায়ীফাহ ২/১০৮-১১০, নং ৬৫৫, যায়ীফুল জামিয়, পৃ. ৫৫, ৫৮, নং ৩৮৩, ৪০৪। হাদীসটির সনদ যায়ীফ।

শক্তি, ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ভরকারী ব্যক্তি নির্ভরকৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা অপার্থিবত্ত্ব কল্পনা করে না, বরং স্বাভাবিক মানবীয় আঙ্গ বা নির্ভরতা প্রকাশ করে। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ নির্ভরতা প্রকাশ করে।

অলৌকিক নির্ভরতা কোনো অবিশ্বাসী বা নাস্তিক মানুষ করেন না। কেবলমাত্র বিশ্বাসী মানুষ যে ব্যক্তি বা সত্ত্বার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বা জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অপার্থিব বা অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ করার বা তা রোধ করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তার অলৌকিক সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করে। মনের এরূপ প্রগাঢ় নির্ভরতাকেই ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াকুল বলা হয়।

মানুষ যার বা যাদের উপাসনা করে, অন্তরের গভীরে তার বা তাদের অতিথাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের আশা করে এবং এই সাহায্যের উপর তার নির্ভরতা থাকে। সে তার উপস্যের নাম নিয়ে বা তার উপস্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তার কর্ম শুরু করে। এই নির্ভরতা এক প্রকার ইবাদত। কেউ যদি কারো নাম নিয়ে বা কারো অতিথাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অন্তরের আঙ্গ বা নির্ভরতা নিয়ে কর্ম শুরু করেন, তাহলে তিনি তার উপাসক হিসাবে গণ্য হবেন। এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াকুল করা, কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, কারো নামে পাড়ি জমানো... ইত্যাদি শিরক। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বা তাওয়াকুল করতে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ

‘আর মুমিনগণ একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করুক।’^{৭৮}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

‘এবং আপনি আল্লাহর উপরে নির্ভর করুন, উকিল বা কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।’^{৭৯}

অন্যত্র বলা হয়েছে:

إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

^{৭৮} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১২২ ও ১৬০ আয়াত; সূরা মায়দা: ১১ আয়াত, তাওবা: ৫১ আয়াত; ইবরাহীম: ১১ আয়াত; মুজাদালাহ: ১০ আয়াত; তাগাবুন: ১৩ আয়াত।

আরো দেখুন : ইউসুফ : ৬৭, ইব্রাহীম : ১২, যুমার : ৩৮ আয়াত।

^{৭৯} সূরা নিসা : ৮১ আয়াত ও সূরা আহ্�মাব: ৩ আয়াত।

“তোমরা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আল্লাহর
কাছে আরসমর্পণকারী হও তবে শুধু তারই উপরে নির্ভর কর।”^{৮০}

আল্লাহ আরো বলেছেন :

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَإِلَيْهِ مَنَابٌ

“বল, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য
নেই, আমি একমাত্র তার উপরেই নির্ভর (তাওয়াকুল) করেছি এবং তার দিকেই
আমার প্রত্যাবর্তন।”^{৮১}

৫. ৩. ২. ৫. ভয় ও আশাৰ শিরক

তাওয়াকুল-এর সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত আশা ও ভয়। তাওয়াকুলের ন্যায়
ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা দুই প্রকারে: প্রাকৃতিক বা বৈষয়িক ও
অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক। সাধারণ প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার
সৃষ্টি হয় দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন বস্তুগত ও বৈষয়িক কারণে। আমরা হিংস্র বা
বিষাক্ত জীব, ধারাল অস্ত্র, জালিয় মানুষ ইত্যাদি দেখলে ভয় পাই। পার্থিব
জীবনে একে অপরের বিভিন্ন ধরণের উপকারীর আশা করি। এ ধরণের পার্থিব
ও বৈষয়িক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা মানুষ ও মানবের জীব জানোয়ারের
মধ্যে বিরাজমান এবং তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়। এরূপ ভয় বা আশা
কোনো ‘বিশ্বাসের’ সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং ‘মানবীয় প্রকৃতির’ সাথে সম্পৃক্ত।
নাস্তিক, আন্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ ভয় ও আশা করেন।

পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোন ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তিকে ‘চূড়ান্ত বা
অলৌকিকভাবে ভক্তি করে’ অর্থাৎ ইবাদত করে, স্বাভাবিক মানবীয় বা
প্রাকৃতিক শক্তির উর্ধ্বে তাকে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে
যে, তিনি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলেই জাগতিক
উপকরণ ছাড়াই অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ, উপকার বা ক্ষতি
করতে পারেন, তখন ঐ মানুষের মনে ঐ ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তির প্রতি ভয় ও
আশার সংঘার হয়। এরূপ ভয় বা আশার ভিত্তি ‘বিশ্বাস’। যে যাকে
অলৌকিক শক্তিময় বলে বিশ্বাস করেন তাকেই এরূপ ভয় করেন বা তার
অলৌকিক সাহায্যের আশা করেন। এজন্যই একজন মানুষ একটি মাটির
চিলার মতই বিনা দ্বিধায় একটি মুর্তি, কবর বা উপাসনালয় একজন ভেঙ্গে
ফেলতে পারেন, পক্ষান্তরে অন্য একজন মানুষ উক্ত মুর্তি, কবর বা
উপাসনালয়ে প্রতি সামান্যতম অভক্তির কথা কল্পনা করতেও ভয় পান।

এই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা ইবাদত

^{৮০} সূরা ইউনুস: ৮৪ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা মায়েদা: ২৩ আয়াত।

^{৮১} সূরা রাদ: ৩০ আয়াত।

বলে গণ্য, যা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত নির্ধানিত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِبْرَاهِيمَ فَارْهَبُونَ

এবং তোমরা কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর।^{৮২}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَذْعُونَنَا رَغْبَنَا وَرَهْبَنَا وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ

“তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।”^{৮৩}

কোনো মানুষ যদি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে একুপ ভয় করে বা অন্য কারো মধ্যে কোনোরূপ অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা, মঙ্গল-অঙ্গল করা বা তা রোধ করার অলৌকিক ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী মনে করে কাউকে ভয় করে তবে তবে তা শিরক হবে। কিন্তু জাগতিক বা পার্থিব ভয় করলে তা শিরক হবে না। আল্লাহ বলেন:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْدِيهِ وَتَخْسِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَأَ

“তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি মানুষদেরকে ভয় করছ, অথচ আল্লাকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।”^{৮৪}

কেউই কল্পনা করবেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ভয় করে শিরকে লিখ হয়েছিলেন। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواً أَيْدِيكُمْ وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفِتْلَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْسُونَ النَّاسَ كَحْشِيَّةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ حَشِيشَةً

“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক।”^{৮৫}

এখানে কেউই বলবেন না যে, সাহাবীগণ মানুষদেরকে আল্লাহর মত বা তার চেয়েও বেশি ভয় করে শিরকে নিপতিত হয়েছিলেন। কারণ, তাদের

^{৮২} সূরা বাকারা: ৪০ আয়াত ও নাহল: ৫১ আয়াত।

^{৮৩} সূরা (২১) আর্বিয়া: ৯০ আয়াত।

^{৮৪} সূরা আহ্মাব, ৩৭ আয়াত।

^{৮৫} সূরা নিসা, ৭৭ আয়াত।

ভয় ছিল মানবীয়, মানুষদেরকে তারা আল্লাহর মত ক্ষমতার অধিকারী মনে করে ভয় পান নি।

মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে ভয় পায়। এতে শিরক হয় না। এমনকি মানুষের ভয়ে বা প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করাকেও কেউ শিরক বলবেন না। সর্বোপরি মানুষের ভয়ে জীবন বাঁচাতে সুস্পষ্ট শিরক করলেও তাকে শিরক বলে গণ্য করা হবে না। জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া ইচ্ছা করলেই অলৌকিকভাবে অমঙ্গল করার ক্ষমতা আছে বলে কাউকে অলৌকিক বা অতিথ্রাকৃতিক ভয় করা ইবাদত।

৫. ৩. ২. ২. ৬. ভালবাসার শিরক

তাওয়াক্তুল, ভয় ও আশাৰ মতই একটি ইবাদত ‘ভালবাসা’ (الحب و المحبة)। ভালবাসার ক্ষেত্রেও উপরের জাগতিক ও ঈমানী দুটি পর্যায় আছে। জাগতিক ভালবাসা ইবাদত নয়, তবে জাগতিক ভালবাসা যদি আল্লাহর বিধান পালনের বিপরীতে দাঁড়ায় তবে তা পাপ। পিতামাতা, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, উপকারী মানুষ ও অন্যান্য বিভিন্ন মানুষকে মানুষ জাগতিকভাবে ভালবাসে। এরূপ ভালবাসার উৎস জাগতিক সম্পর্ক, মেলামেশা, দেখাশুনা ইত্যাদি।

ঈমানী ভালবাসার তিনটি দিক রয়েছে: (১) আল্লাহকে ভালবাসা (الله), (২) আল্লাহর জন্য ভালবাসা (الحب لـ الله) এবং (৩) আল্লাহর সাথে ভালবাসা (الحب مع الله)। আল্লাকে ভালবাসা হয় কেবলমাত্র তাঁরই জন্য আর কারো জন্য নয়। আর এ ভালবাসার সাথে থাকে গভীর অলৌকিক ভয়, আশা ও অসহায়ত্বের ও ভক্তির প্রকাশ। এরূপ ভালবাসাই ইবাদত। আল্লাহর জন্য ভালবাসতে হয় যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর সাথে ভালবাসা হলো শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর জন্য নয়, বরং তার নিজের কারণে ভালবাসা বা অলৌকিক ভক্তি, ভয় ও অসহায়ত্বের সাথে ভালবাসা শিরক। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।”^{৮৬}

^{৮৬} সূরা (২) বাকারা: ১৬৫ আয়াত।

মুশরিকগণ দাবি করত যে, তারা তাদের উপাস্যদেরকে ভালবাসত ‘আল্লাহর প্রিয়’ হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে এ সকল উপাস্যের প্রেমই ছিল মূল। এদের মর্যাদায়, প্রশংসায় কিছু বললে তারা খুশিতে উঘেলিত হয়ে উঠত। পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহর মর্যাদা, প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলে তারা বিরক্ত হতো। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّنُونَ

“একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আবিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিত্তঞ্চায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।”^{৮৭}

৫. ৩. ২. ২. ৭. আনুগত্যের শিরক

আল্লাহর কুরুবিয়াতের একটি বিশেষ দিক তাঁর ‘হাকামিয়াত’ বা হৃকুম, বিধান বা ফয়সালা দানের অধিকার ও ক্ষমতা। আল্লাহর মহান নামগুলির অন্যতম ‘আল-হাকাম’ অর্থাৎ বিচারক বা বিধানদাতা। যিনি প্রতিপালক তাঁরই অধিকার তার প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্য বিধান প্রদান করার। মানুষ যেমন আপেক্ষিক অর্থে অন্যের রাবর বা প্রতিপালক হতে পারে, তেমনি আপেক্ষিক অর্থে বিধানদাতা, বিচারক ইত্যাদি হতে পারে। মহান আল্লাহর দেওয়া নির্দেশের আওতায় বা যেখানে তিনি মানুষের অধিকার দিয়েছে সেখানে মানুষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রশাতীত ও সামগ্রিক অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর। একমাত্র সৃষ্টি ও সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী প্রতিপালক হিসেবে তিনিই জানেন সৃষ্টির কল্যাণ কিসে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্তজাতিক সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে একমাত্র হাকাম বা বিচারক ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা তাওহীদুর কুরুবিয়াতের অংশ। আর তাঁর উলুহিয়াতের দাবি যে, বান্দা তাঁর হৃকুমের আনুগত্য করবে। এজন্য আনুগত্য ইবাদতের অন্যতম প্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفْغِنْرَ اللَّهُ أَبْنَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُصَلَّا

বল, ‘তবে কি আমি আল্লাহ ব্যর্তীত অন্যকে হৃকুমদাতা মানব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবর্তীণ করেছেন।’^{৮৮}

^{৮৭} সূরা (৩৯) যুমার: ৪৫ আয়াত।

^{৮৮} সূরা (৬) আন'আম: ১১৪ আয়াত।

অন্যত্র তিনি বলেন:

أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ

“তারা কি জাহলীয়গের বিধিবিধান কামনা করে? দৃঢ়প্রত্যয়ী বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কে?”^{৪৯}

আল্লাহর বিধানবালি তাঁর রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তিনি যে বিধান প্রদান করেন তাই আল্লাহর বিধান। কাজেই তাঁর সকল বিধান সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই সৌমান। আল্লাহ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بِيَنْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلِمُوا تَسْلِيمًا

“কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিস্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পন না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।”^{৫০}

তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ও ভালবাসার ন্যায় আনুগত্যেরও সৌক্ষ্ম ও অলৌকিক দৃটি পর্যায় রয়েছে। ‘অলৌকিক বিশ্বাসজাত আনুগত্য’ একমাত্র মহান আল্লাহরই নিমিত্ত। অন্য কাউকে এক্রূপ আনুগত্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন;

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونُ إِلَيْ أُولَئِنَّهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطْعَمُهُمْ إِنْكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই ভক্ষণ করো না। তা অবশ্যই পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্রয়োচনা দেয়; যদি তোমর তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।”^{৫১}

এখানে কাফিরদের আনুগত্য করাকে শিরক বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

اتَّخُذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

^{৪৯} সূরা (৫) মায়দা: ৫০ আয়াত।

^{৫০} সূরা (৪) নিসা:

^{৫১} সূরা আন-আম, ১২১ আয়াত।

“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রক্ষ-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!”^{১২}

ইহুদী-খ্স্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বিভিন্নভাবে তারা আলিম ও দরবেশদেরকে ‘রাব’ হিসেবে গ্রহণ করেছে:

(১) তারা বিশ্বাস করত যে, আলিম, দরবেশ, সাধু বা সেন্টগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষত মৃত্যুর পরে তারা অলৌকিক কল্যাণ, অকল্যাণ ও বিশ্ব পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন। এজন্য তারা এ সকল সেন্ট, সাঙ্গা বা সাধুদের মৃত্যি তৈরি করত, তথায় মানত, নয়র বা স্টে প্রদান করত, তাদের কবরের নিকট ইবাদতগাহ তৈরি করত এবং তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে ‘বরকত’ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকত। তাদের ধর্মীয় ইতিহাস এবং বিভিন্ন হাদীস থেকে বিষয়গুলি জানা যায়।

(২) তারা পোপ-পাদরিগণ ও সাধুদের ‘ইসমাত’ বা অভ্রান্ততায় (infallibility) বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত ও করে যে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তারা কাশফ, ইলহাম ও ইলমু লাদুনী লাভ করেন। সেগুলির আলোকে তারা ধর্মের যে বিধান প্রদান করেন তাই চূড়ান্ত। তাদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না। সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন বা ধর্মীয় বিধান জানা সম্ভব নয়। ‘বাইবেলে’ কি আছে বা নেই তা বড় কথা নয়। পোপ বা ধর্মগুরুগণ কি ব্যাখ্যা বা নির্দেশ দিলেন তাই বড় কথা। এ সকল পোপ-পাদরি কখনোই সরাসরি ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অস্বীকার করত না। সাধারণত তারা ‘ইল্লাত’ ও ‘হিকমাত’ বা কারণ ও দর্শন দেখিয়ে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত ও করে। এ বিষয়টি অমুক কারণে ফরয বা হারাম করা হয়েছে, কাজেই অমুক বা তমুক কারণে তা তোমার জন্য বা সকলের জন্য এখন হালাল বা হারাম। সাধারণ অনুসারীরা তাদের এরূপ বিধানকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিত।

এভাবে তারা রূবুবিয়াত বা প্রতিপালনের বিষয়ে আলিম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর শরীক বানাতো। আর প্রতিপালনের শিরক আবশ্যক্তিবীভাবে ইবাদতের শিরকে নিপত্তি করে। তাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাসের কারণে তারা তাদেরকে ডাকত ও তাদের জন্য মানত উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদত করত। অনুরূপভাবে তাদের ‘ইসমাত’ ও

^{১২} সূরা তাওবা, ৩১ আয়াত।

হাকামিয়্যাতের বিশ্বাসের কারণে তারা তাদের চূড়ান্ত ও নিঃশর্ত আনুগত্য করত। কুরআনের বক্তব্য থেকে তাদের এ দু প্রকারের শিরকই সুস্পষ্ট। আয়াতের প্রথমে তাদের রূবুবিয়্যাতের শিরকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষে ইবাদতের শিরকের কথা বলা হয়েছে। একটি যরীফ সনদের হাদীস থেকে তাদের এ শিরকের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়।

গুতাইফ ইবনু আইউন (غطيف بن أعين) নামক দ্বিতীয় শতকের একজন অজ্ঞাত-পরিচয় তাবি-তাবিয়ী বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুসআব ইবনু সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (১০৩ হি) তাকে বলেছেন, সাহাবী আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ (أَتَخْنَوْا أَخْبَارَهُمْ
وَرَفِيقَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُنُوا يَعْتَذِرُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا
إِذَا حَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلُوهُ وَإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَمُوهُ

“আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ শুরূ তাওয়ায় পাঠ করছেন: ‘তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রক্ষ-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে’। তিনি বললেন, ইহুদী-খ্স্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের) ইবাদত করত না বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।”^{১৩}

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে গুতাইফের সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ:

قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَسَنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ أَلِيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَ اللَّهُ
فَتُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ فَتَحْلُونَهُ؟ قَالَ قُلْتَ بَلَى قَالَ فَتَنَكَ عَبَادُهُمْ

“রাসূলুল্লাহ শুরূ-কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না! তিনি বলেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা তোমাদের জন্য হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে গ্রহণ কর না? আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এ-ই হলো তাদের ইবাদত করা।”^{১৪}

^{১৩} তিরিমিয়ী, আস-সুনান ৫/২৭৮। তিনি বলেন, “হাদীসটি গরীব ... গুতাইফ ইবনু আইউন হাদীস বর্ণনায় পরিচিত নয়।

^{১৪} তাবারী, তাফসীর ১০/১১৪।

হ্যাইফা (রা), ইবনু আবুস (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন যে, ইহুদী খ্স্টানদের পশ্চিত-দরবেশগণ যখন আল্লাহর বিধান উল্টে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত তখন তারা তা মেনে নিত। আর এই আনুগত্যই ছিল তাদের 'রক্র' মান।^{১০}

এখানে লক্ষণীয় যে, 'আনুগত্য'ও ভয়, ভালবাসা ইত্যাদির মত স্বাভাবিক কর্ম। সাধারণভাবে তা ইবাদত নয়। এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত শিরক হলেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য অবৈধ নয়। ইসলামী নির্দেশের বিপরীত নয় এমন বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ইসলামে বৈধ বরং নির্দেশিত। কুরআন-হাদীসে পিতামাতা, শাসক-প্রশাসক, আলিম-উলামা প্রমুখের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীনের বিধান না জানলে আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী নির্দেশের বিপরীত কোনো মানুষের আনুগত্য করলে তাতে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পাপ হবে, তবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ হবে না। যদি মানবীয় ভালবাসা, ভয়, লোভ ইত্যাদি কারণে কারো নির্দেশ মত আল্লাহর বিধানের বিরোধী কাজ করে তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না। আমরা দেখেছি যে, একই ভয়জনিত আনুগত্যের ভিত্তিতে শিরক বা কুফরী কর্মে লিঙ্গ হলেও তা শিরক-কুফর বলে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে কাউকে প্রশ়াতীত চূড়ান্ত আনুগত্যের যোগ্য বলে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করলেই শুধু তা শিরক বলে গণ্য হবে। যেমন মনে করা যে, কুরআন-হাদীসে যা-ই থাক, অমুক যেহেতু বলেছেন যে, এ কর্মটি আমার জন্য হালাল কাজেই তা আমার জন্য হালাল হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নির্দেশে যাই থাক না কেন, অমুক ব্যক্তি, আলিম, রাজা বা পার্লামেন্ট যা হালাল বলেছে তা প্রকৃতই হালাল এবং যা নিষিদ্ধ করেছে তা প্রকৃতই হারাম তাহলেও তা শিরক হবে। এক্ষেত্রেও মূলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয়।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, আনুগত্যও শিরক হতে পারে, যদি তা ইবাদত পর্যায়ের বা 'চূড়ান্ত বিনয়-ভঙ্গি' হিসেবে হয়। ইহুদী খ্স্টানদের আনুগত্য ছিল এ পর্যায়ের আনুগত্য। শয়তানের বন্ধু বা মুশরিকদের আনুগত্যের বিষয়টিও একইরূপ। এখানে আনুগত্য কর্মে নয়, বিশ্বাসে। এখানে আনুগত্য হলো মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

আনুগত্যের শিরকের বর্ণনা দিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ) বলেন: মুশরিকগণ তাদের আলিমগণ ও নেককার আবিদগণকে রাব্ব বা মালিক ও

^{১০} তাবারী, তাফসীর ১০/১১৪-১১৫।

প্রতিপালন হিসেবে গ্রহণ করত। এর অর্থ এই যে, তারা এ আকীদা পোষণ করত যে, এ সকল আলিম বা বুজুর্গ যা হালাল বলেন তা প্রকৃতপক্ষেই হালাল ও বৈধ। আর যা কিছু এ সকল আলিম ও বুজুর্গ হারাম করেন তা প্রকৃতই নিষিদ্ধ, হারাম ও শান্তিযোগ্য অপরাধ। ... এর রহস্য এই যে, কোনো বিষয়কে হালাল বা বৈধ করা এবং হারাম বা অবৈধ করার অর্থ সৃষ্টির রাজত্বে একপ কার্যকর নিয়ম সৃষ্টি করা যে, অমুক কাজটি করলে তাতে শান্তি পেতে হবে এবং অমুক কাজটি করলে তাতে শান্তি পেতে হবে না। একপ সৃষ্টি ও পরিচালনা একমাত্র আল্লাহরই বিশেষণ এবং তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, কিভাবে একথা বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমুক বিষয় হালাল করেছেন বা হারাম করেছেন? দ্বিতীয়ত, কিভাবে বলা হয় যে, অমুক ইমাম বা মুজতাহিদ একে হালাল বা হারাম বলেছেন?

এর উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য বা নির্দেশনা আল্লাহর নির্দেশনা জানার সুনিষ্ঠিত প্রমাণ। যখন তিনি বলেন যে, অমুক বিষয় হালাল বা হারাম তখন নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা হালাল বা হারাম করেছেন। আর মুজতাহিদদের বিষয় হলো, তাঁরা আল্লাহর ওহী থেকে বা ইজতিহাদের মাধ্যমে হালাল হারামের বিধানটি অবগত করান মাত্র।

এখানে উল্লেখ্য যে, যখন আল্লাহ কোনো রাসূল প্রেরণ করেন এবং মুজিয়ার মাধ্যমে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব প্রমাণিত হয় এবং তাঁর জবানীতে আল্লাহ পূর্ববর্তী শরীয়তের কোনো হারাম বিষয় হালাল করেন তখন যদি কারো অন্তরে বিধানটি গ্রহণ করতে দ্বিধা ও আপত্তি দেখা যায় তবে তা দুটি কারণে হতে পারে। প্রথম কারণটি একপ হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তির অন্তরে নতুন বিধানটি প্রামাণ্যতায় সন্দেহ থাকবে। এক্ষেত্রে সে উক্ত রাসূলের রিসালতে অবিশ্বাসকারী বা কাফির বলে গণ্য হবে।

একপ দ্বিধা ও আপত্তির দ্বিতীয় কারণটি একপ হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, অথবা যে হারামের বিধানটি দেওয়া হয়েছিল তা রহিত বা পরিবর্তন করা যায় না। কারণ যে ব্যক্তির মাধ্যমে বিধানটি পাওয়া গিয়েছিল সে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ ‘উল্লিখিয়াত’ বা ‘ইশ্বরত্বের’ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। অথবা তিনি মহান আল্লাহর মধ্যে ফানা বা বিলুপ্ত হয়েছিলেন এবং তারই সাথে ‘বাকি’ বা অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি যে কাজটি নিষেধ করেছেন, অথবা অপচন্দ করেছেন তার বিরোধিতা করলে সম্পদ বা সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। একপ ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত। কারণ সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সন্তা বা ব্যক্তির ‘পবিত্র ক্রোধ ও বিরক্তি’ আছে বলে বিশ্বাস

করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তা ‘পবিত্র বা অলজ্ঞনীয়’ হালাল বা হারামের বিধান দিতে পারেন।^{১৬}

৫. ৩. ২. ২. ৮. হজ্জ বা যিমারতের শিরুক

হজ্জ ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে আরবের মানুষদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাবাগৃহের হজ্জ আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে যখন শিরকের প্রসার ঘটে তখন কাবাগৃহের হজ্জ ছাড়াও বিভিন্ন উপাস্যের সন্তুষ্টি, আশীর্বাদ, বর বা বরকত লাভের জন্য মুশরিকগণ আরো অনেক ‘পবিত্র’ স্থানে গমন করত বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। এগুলির মধ্যে ছিল ইয়ামানের ‘রিয়াম’ নামক মন্দির এবং খাস ‘আমদের ‘যুল খুলাইসা’ নামক মন্দির।^{১৭}

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবী বলেন: মুশরিকদের একপ্রকার শিরুক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ। এর স্বরূপ এই যে, এরূপ মুশরিকগণ তাদের ‘উপাস্য-শরীকদের’ স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কিছু স্থানকে বরকতময় বলে বিশ্বাস করে এবং সে সকল স্থানে গমন ও অবস্থান এ সকল শরীকের নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে। ইসলামী শরীয়তে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন^{১৮}:

لَا تُشَدِّدُ الرَّحْلَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ الْحَرَامِ وَمَسَجِدِ الرَّسُولِ
وَمَسَجِدِ الْأَقْصَى (مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الرسول)

“তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না: মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ (মাসজিদে নববী) ও মাসজিদুল আকসা।”^{১৯}

৫. ৩. ২. ২. ৯. তাবারুকের শিরুক

তাবারুক অর্থ বরকত অনুসন্ধান করা বা বরকত আশা করা। আরবের মুশরিকদের শিরকের একটি দিক ছিল তাবারুক বা বরকত লাভের জন্য কোনো স্থান বা দ্রব্যের প্রতি ভক্তি প্রকাশ। তারা কাবা ঘরের পাথর ইত্যাদি বরকতের জন্য কাছে রাখত, তাওয়াফ করত বা সম্মান করত। এ সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার “সীরাতুন্নবী” গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন: ইসমাইলের বৎশে আরবদের মধ্যে শিরুক

^{১৬} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৬-১৮৭।

^{১৭} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১১০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯২৫-১৯২৬; তাবারী, তাফসীর ২৬/১৫৫।

^{১৮} বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৯৮, ৪০০, ২/৬৫৯, ৭০৩; মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০১৪-১০১৫।

^{১৯} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৮।

প্রচলনের কারণ ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি করত। তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না। যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা সাথে করে কাবাঘরের তাষীমের জন্য কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন। তারা যেখানেই যেতেন সেখানে এই পাথরগুলি রেখে তার তাওয়াফ করতেন ও সম্মান করতেন। পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায়। পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো বিভিন্ন পাথর পূজা করতে শুরু করে।^{১০০}

কাবাগৃহের পাথর ইত্যাদি ছাড়া আরো অনেক কিছু তারা ‘তাবারুকের নামে’ ভক্তি করত, আর আমরা দেখেছি যে, চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদত। এভাবে তাবারুকের নামে তারা শিরকের মধ্যে নিপত্তি হতো। তাদের এ সকল ভক্তিকৃত দ্রব্যের মধ্যে ছিল ‘যাত আনওয়াত’ নামক একটি বৃক্ষ।

আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা) বলেছেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حَنْيَنَ (خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حَنْيَنَ وَنَحْنُ حَدَّيْنَا عَهْدَ بَكْفَرٍ، وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ) مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمَشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعْلَقُونَ عَلَيْهَا أَسْلَحَتَهُمْ (سَذْرَةٌ يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا وَيَعْلَقُونَ بِهَا أَسْلَحَتَهُمْ فَقَالُوا (قُلْنَا) يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَحْمَلُ اللَّهُ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

“মঙ্কা বিজয়ের পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি। তখন আমরা নও মুসলিম। মঙ্কা বিজয়ের সময়েই কেবল আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। চলার পথে তিনি মুশরিকদের একটি (বরই) বৃক্ষের নিকট দিয়ে যান, যে গাছটির নাম ছিল ‘যাতু আনওয়াত’। মুশরিকগণ এ গাছের কাছে বরকতের জন্য ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। আমাদের কিছু মানুষ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের যেমন ‘যাতু আনওয়াত’ আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি ‘যাতু আনওয়াত’ নির্ধারণ করে দেন। আমরা যখন এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, তিনি বললেন, আল্লাহ! আকবার! আল্লাহর কসম, মুসার কওম যেরূপ বলেছিল: মুশরিকদের মৃত্যুর মতো আমাদেরও মৃত্যুর দেবতা দাও^{১০১};

^{১০০} ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবীয়াহ ১/৯৪-৯৫।

^{১০১} সূরা (৭) আ'রাফ: ১৩৮ আয়াত।

তোমরাও সেইরূপ বললে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।”^{১০২}

ইহুদী-খ্রিস্টানদের এরূপ তাবারকুক বিষয়ক যে শিরকের কথা হাদীস শরীফে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নবী ও অলীগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা কবর মাজার থেকে বরকত লাভের চেষ্টা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাঁর উম্মাতকে এরূপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অনেক সাহাবী থেকে এ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ অর্থের কয়েকটি হাদীস আমরা ইতোপৰ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় ও জীবনী বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি, এরূপ এক হাদীসে তিনি বলেন, “তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিষ্কয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এ কাজ থেকে।” ...

এখানে লক্ষণীয় যে, কবর বা কবরস্থের পূজা নয় বা মৃতের কাছে চাওয়া নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদি-নাসারাদেরকে কঠিন ভাষায় অভিশাপ করেছেন। মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক সকল কর্ম আল্লাহর ইবাদত। অর্থে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তিনি ঐসব জাতিকে লান্ত করলেন, শুধুমাত্র কবরের কাছে এই ইবাদতগুলি পালন করার কারণে। মসজিদ আল্লাহর ইবাদতের জন্য। মসজিদে সালাত, দু’আ ইত্যাদি যা কিছু করা হয় সবই আল্লাহর জন্য। মৃতের জন্য কিছুই নয়। কবরের নিকট মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্য কবরবাসীর জন্য সালাত আদায় নয়, বরং আল্লাহর জন্য সালাত আদায়ে নেককার মানুষের সাহচর্য ও বরকত লাভ মাত্র। কিন্তু এরূপ তাবারকুকের চিন্তাই শিরকের অন্যতম পথ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোরভাবে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

৫. ৩. ৩. শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী মুশরিক সম্প্রদায়গুলি জীবিত, মৃত ও জড় বিভিন্ন সৃষ্টির ইবাদত করত। জীবিতদের মধ্যে তারা ফিরিশতা ও জিন্নগণের ইবাদত করত। আর মৃতদের মধ্যে তারা বিভিন্ন নবী, রাসূল ও নেককার মানুষদের ইবাদত করত। মৃতদের ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত কিছু সামনে রেখে তাঁদের ডাকত। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, তাদের সমাধি, মৃত্তি, স্মৃতিবিজড়িত

^{১০২} ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৩৭; তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/৪৭৫। হাদীসটি সহীহ।

দ্রব্য বা স্থান ইত্যাদি। এ সকল বস্তুকে সামনে রেখে এ সকল মৃতদের আত্মার জন্য তারা উৎসর্গ, ভেট, জবাই, সাজদা ইত্যাদি পেশ করত এবং তাদের সাহায্য, সুপারিশ, নেক-নজর ইত্যাদি কামনা করত। যুগের আবর্তনে সাধারণ অনেক মুশরিক এ সকল মূর্তি, পাথর, কবর, বৃক্ষ ইত্যাদিকেই ‘প্রকৃত উপাস্য’ বলে মনে করত। তবে তাদের মধ্যকার পশ্চিত ও ধর্মগুরুগণ দাবি করত যে, এ সকল দ্রব্য প্রকৃত উপাস্য নয়, বরং এগুলির সাথে জড়িত মূল ব্যক্তির আত্মাই প্রকৃত ভক্তির পাত্র। এগুলি ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। এছাড়া চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির ইবাদতও বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এগুলিকে তারা স্ফটোর শক্তির প্রকাশ বা উৎস হিসেবে এবং কেউ বা প্রকৃত মঙ্গল-অমঙ্গলের আধার হিসেবে ইবাদত করত।

এ সকল মুশরিকের অধিকাংশই পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষালাভ করার পরেও বিভিন্ন কারণে কুফর-শিরকের মধ্যে নিপত্তি হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ, ইহুদীগণ, খ্সটানগণ এবং এরূপ অন্যান্য জাতির অনেকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান, ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, আধিরাতের প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান ইত্যাদি দাবি করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিরকে লিঙ্গ ছিল। এ সকল মুশরিক আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করত। ঈসা (আ), উয়াইর (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাইল (আ) ও অন্যান্য নবীগণ ও ফিরিশতাগণের ইবাদত করত। এছাড়া কঠিত অনেক ‘আল্লাহর প্রিয় বান্দার’ ইবাদতও তারা করত। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তাদের এ বিভাসির কারণসমূহ নিম্নরূপ:

৫. ৩. ৩. ১. বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভাসি

তাদের দাবি ছিল যে, এ সকল বান্দা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং এদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে সম্পর্কের কারণে তারাও বিশেষ ভক্তি বা ইবাদতের পাওনাদার হয়েছেন। এ সকল মানুষের মুজিয়া, কারামত বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা তাদের উল্লিখিত বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। তাদের মতে, মহান আল্লাহই এদেরকে সে মর্যাদা দিয়েছেন কাজেই এদের ইবাদত করলে স্বয়ং আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ইবাদত করলে এরাই মানুষদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেন। তাদের এ দাবি বা ‘যুক্তি’ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِءِ مَا نَعِدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بِيَنْهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَافِرٌ
“আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) এহন

করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেবে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিঙ্গ রয়েছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির আল্লাহ তাকে সংপথে পরিচালিত করেন না।”^{১০৩}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন: “মহান আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে তারা ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে ভালবাসে ও ইবাদত করে এবং বলে, হে আমাদের উপাস্যগণ, আমরা তো তোমাদের একমাত্র এজন্যই ইবাদত করছি যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও মর্যাদা পাইয়ে দেবে এবং আমাদের হাজত প্রয়োজনের বিষয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।... প্রসিদ্ধ তাবারী মুফাসিসির মুজাহিদ ইবনু জাব্র (১০৪ হি) বলেন: কুরাইশ তাদের মুর্তিগুলিকে এ কথা বলত এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ ফিরিশতাগণকে তা বলত, ঈসা ইবনু মরিয়মকে (আ) তা বলত এবং উয়াইর (আ)-কে তা বলত।”^{১০৪}

আমরা দেখেছি যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) তাদের এ যুক্তির ব্যাখ্য করেছেন। তাদের এ দাবির সারমর্ম হলো, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা করুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি উর্ধ্বে। তার নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তার ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুজুর্গের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন।

৫. ৩. ৩. ২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভাগি

মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা ‘দলিল’ ছিল সুপারিশের দলিল। তারা স্থীকার করত যে, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তবে এ সকল বান্দাকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালবাসেন, কাজেই এদের সুপারিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَصْرُفُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ
شُفَاعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ قَلْ أَتَبْتَبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سَبْعَانَةً وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারণ করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফায়াতকারী)। বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন

^{১০৩} সূরা (৩৯) যুমার:৩ আয়াত।

^{১০৪} তাবারী, তাফসীর (বায়ানুল কুরআন) ২৩/১৯১।

কিছু জানাচছ যা তিনি জানেন না আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুবহান, সুপুরিত্ব এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধ্বে।”^{১০৫}

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কাফিররা একথা অস্মীকার করত না যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সকল উপাস্যের কোন ক্ষমতা নেই। এরা শুধু সুপারিশ করতে পারে। আল্লাহ যদি কোন কল্যাণ অকল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তা রোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَذَعُونَ مِنْ نُونَ اللَّهِ إِنْ أَرَانِي اللَّهُ بَصَرٌ هُنْ كَاسِفَاتُ ضُرُّهُ أَوْ أَرَانِي بِرَحْمَةِ هِلْ هُنْ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ

“যদি এদেরকে জিজ্ঞাসা কর: আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? এরা উভয়ের অবশ্যই বলবে: আল্লাহ। বল: তোমরা বল তো, যদি আল্লাহ আমার কোনো অনিষ্ট করতে চান তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকছ তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান তাহলে কি তারা সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকরীগণ! তার উপরই নির্ভর করে।”^{১০৬}

অর্থাৎ কাফিররা মেনে নিচ্ছে যে আল্লাহর ইচ্ছা রোধ করার ক্ষমতা এদের নেই। তার পরও তারা এদের ইবাদত করত, শুধুমাত্র এ যুক্তিতে যে, এরা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মেটাবে এবং এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হবেন, কারণ এরা আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ এখানে এবং কুরআনের সর্বত্র এই অস্তৃত যুক্তির অসারতা বর্ণনা করেছেন। এদের যখন কোন ক্ষমতাই নেই এবং সব ক্ষমতাই যখন আল্লাহর তখন আল্লাহকে না ডেকে এদেরকে ডাকার মত বোকায়ি আর কি হতে পারে।

তাদের এরূপ কর্মের অসারতা ও স্ববিরোধিতা ধরিয়ে দিলে সকল যুক্তিতে পরাস্ত হলে তারা প্রচলনের দোহায় দিত। সকল ধর্মে করছে, যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষরা করে এসেছেন, তারা ইবরাহীম (আ), ইসমাইল (আ) ও অন্যান্য নবী থেকেই তো ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাদের কর্ম কিভাবে ভুল হতে পারে। একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে এটা একটি অস্তৃত নতুন কথা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব কথা বলা হচ্ছে, যা আমরা আগে কখনো শুনিনি। এ বিষয়ক কিছু আয়াত

^{১০৫} সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত।

^{১০৬} সূরা (৩৯) যুমার: ৩৮ আয়াত।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

কুরআনের বর্ণনার আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের পথে তাদের পদক্ষেপগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সকল ক্ষমতার মালিক। তাদের এ বিশ্বাস সঠিক ছিল।

(২) তারা বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ নবীগণ ও অন্যান্য কিছু মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালবাসেন। ফিরিশতা ও নবীগণের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস সঠিক ছিল, তবে অন্যান্যদের বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল।

(৩) তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারেন। তাদের এ বিশ্বাসটি ছিল সত্য ও মিথ্যার সমন্বিত রূপ। মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ফিরিশতাগণ বা আল্লাহ প্রিয় বান্দাগণ সুপারিশ করবেন, তবে তা তাদের ইচ্ছামত নয়। বরং সুপারিশ বা শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন তিনি সুপারিশ করবেন কেবলমাত্র তার জন্য যার বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যার উপরে আল্লাহ নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন। কাজেই সুপারিশের কল্পনা করে তাদের ইবাদত করা যাবে না। বরং আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তার জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন।

(৪) তারা বিশ্বাস করত যে, এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন এবং এরাও সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজনগুলি আল্লাহর নিকট থেকে আদায় করে দেন। এ বিশ্বাসটি ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

৫. ৩. ৩. শয়তানের প্রতারণা

শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَائِكَةَ أَهُؤُلَاءِ إِنَّكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا
سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِنْ دُونِهِمْ بِلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

“যেদিন তিনি এদেরকে সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিঞ্জাসা করবেন, ‘এরা কি তোমাদেরকেই ইবাদত করত?’ ফিরিশতারা বলবে, ‘তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো ইবাদত করত জিন্নদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।’”^{১০৭}

^{১০৭} সূরা (৩৪) সাবা: ৪০-৪১ আয়াত।

অন্যত্র মহান আল্লাহর বলেন:

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرْكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَاءُ شُرْكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا
نَذِعُوا مِنْ دُونِكُ فَلَقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

“মুশরিকগণ যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল (কিয়ামদের দিন) যখন তারা তাদেরকে দেখবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তখন তাদের কথার প্রতি-উত্তরে তারা বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।”^{১০৮}

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ সকল উপাস্যের বেশ ধরে এদের নিকট প্রকাশিত হতো, এদেরকে স্পন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত যে, তারা ফিরিশতাদেরই ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত।

সাধারণভাবে শয়তান ধার্মিক মানুষদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নেককার বুজুর্গদের বিষয়ে ভক্তির মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে শিরকের মধ্যে নিপত্তি করার জন্য প্ররোচনা দেয় বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। নৃহ (আ)-এর জাতির কুফ্র সম্পর্কে মহান আল্লাহর বলেছেন:

وَقَالُوا لَا تَذَرْنَ أَهْنَكُمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا بَغْوَثَ وَبَعْوَقَ وَنَسْرًا

তারা বলল, ‘তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের ইলাহদেরকে (উপাস্যদেরকে), পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া’আ, যাগুস, যাউক ও নাস্র-কে।’^{১০৯}

হাদীস শরীফে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম। আদম (আ)-এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল। এরপর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয়। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগুলো, তাফসীরে তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের ঘূষে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর - এই পাঁচ ব্যক্তি খুব

^{১০৮} সূরা (১৬) নাহল: ৮৬ আয়াত।

^{১০৯} সূরা (৭১) নৃহ: ২৩ আয়াত।

নেককার বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাঁদের বিলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোনো কোনো অনুসারী শয়তানের ওয়াওয়াসায় বলেন: আমরা এদের মাজলিস বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে এদের জন্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা স্মৃতিস্তুতি তৈরি করে রাখি। আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে। এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি। তারা তো এদের 'ভক্তি' করত এবং এদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত। তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল।^{১১০}

৫. ৩. ৩. ৪. বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অঙ্গ-অনুসরণ

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের অন্যতম কারণ পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অঙ্গ-অনুসরণ। আমরা ইতোপূর্বে আরবের কাফিরদের প্রসঙ্গে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের শিরকের সকল যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতেন তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি হিসেবে সমাজের প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত এবং শিরক পরিত্যক করতে অস্বীকার করত।

ইহুদী-খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাদের নিকট বিদ্যমান বিকৃত 'বাইবেল' সুস্পষ্টরূপে তাদের শিরকের অসারতা প্রমাণ করে। বাইবেলের অগণিত আয়াত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির, মুর্তির বা প্রতিকৃতির পূজা ও উপাসনা কঠিনভাবে নিষেধ করে। বাইবেলের কোথাও ত্রিতৃবাদ এবং ঈসা (আ)-এর ইবাদত করার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। এ সকল বিষয় তাদের কাছে সুস্পষ্ট করার পরেও তারা তাদের শিরক পরিত্যাগ করতে রাজি হন না। মূলত তাদের যুক্তি একটিই, পৌল ও তার অনুসারী মুশরিকদের প্রতি তাদের ভক্তি এবং হাওয়ারী বা শিষ্যগণের নামে প্রচলিত কিছু মিথ্যা কথার ভিত্তিতে তাদেরকেও এরূপ মুশরিক মনে করে তাদের অনুসরণের দাবি। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
فَذَلِكُمْ بَلٌ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

^{১১০} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৮৭৩, তাবারী, তাফসীর ২৯/৯৮-৯৯।

“বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং সে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।”^{১১১}

৫. ৩. ৩. ৫. নেতৃবৃন্দের অঙ্গ আনুগত্য

অনেক সময় ব্যক্তি মানুষ নিজের বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দের অনুকরণ-প্রিয়তা বা তাদের বিরোধিতার অনাথহ তাকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

একজন সাধারণ মূল্যবিক যখন কুরআনের যুক্তিগুলি নিয়ে চিন্তা করে তখন শিরকের অসারতা ও তাওহীদের আবশ্যিকতা বুঝতে পারে। মহান আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাজেই তাকে ছাড়া অন্যকে ডাকার, সাজাদা করার, মানত করার, নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করার দরকার টা কি? আমরা দাবি করছি যে, মহান আল্লাহ কোনো কোনো বান্দাকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু এ দাবি আমরা ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারছি না। তিনি কাউকে কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন বলে কোথাও বলেন নি। তিনি তার কোনো নবী বা প্রিয় বক্তৃত্বকে ডাকতেও নির্দেশ দেন। তিনি কোথাও বলেন নি যে, অমুক নবী, ফিরিশতা বা অমুক ব্যক্তিকে ডাক এবং তার কাছে সাহায্য চাও, মানত কর, ভেট দাও, তাহলে আমি খুশি হব। বরং তিনি বারংবার বলছেন যে, আমাকে ছাড়া কাউকে ডেক না। কেবল আমাকেই ডাক আমিই সব প্রয়োজন মেটাতে পারি। কাজেই আমি কেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকব বা তার ইবাদত করব? সকল যুক্তি ও বিবেকের দাবি তো এই যে, আমি শুধু মহান আল্লাহরই ইবাদত করব।

এভাবে একজন সাধারণ তার নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে শিরকের অসারতা বুঝতে পারে। কিন্তু সে তার এ চিন্তা ধর্মগুরু বা সমাজপতির মতামতের বিরুদ্ধে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে অথবা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। অথবা এরূপ ধর্মগুরু বা সমাজপতির কাছে তার চিন্তা প্রকাশ করলে তারা বলে, আরে বাদ দে ওসব কথা! যারা পিতাপিতামহদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন কথা বলছে তাদের মত বেয়াদবদের কথায় কান দিবি না। যুগ যুগ ধরে সকলেই করছে, কেউ কিছু বুঝল না আর তুমি বেশি বুঝলে। অমুক, অমুক, তমুক বুজুর্গ, পাদরি, যাজক, ধর্মগুরু এরূপ বলেছেন ও করেছেন, তাদের কথা তোমার ভাল লাগে না! এরূপ করে অমুক এত কিছু পেয়েছেন,

^{১১১} সূরা (৫) মায়দা: ৭৭ আয়াত।

বেয়াদবি করে অমুক অমুক শাস্তি পেয়েছে, কাজেই সাবধান!! ... ইত্যাদি বিভিন্ন যুক্তির কাছে দুর্বল চিন্তা মানুষের বিবেক খেই হারিয়ে ফেলে। সে নিজের বিবেকের ডাক প্রত্যাখ্যান করে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে।

এদের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন:

إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَنَقَطَعْتُ بِهِمُ
الْأَسْبَابَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَةً فَنَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا نَبَرَّعُوا مِنْا

“যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারিগণ সমস্কে দায়িত্ব প্রহণে অঙ্গীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, ‘হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল।’”^{১১২}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَنْ رِبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ
الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْنَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَلَوْلَا أَنْتَمْ لَكُمْ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْنَفُوا أَنْخَنْ صَدَّنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَغْدَ إِذْ
جَاءَكُمْ بِلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْنَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِلْ مَكْرُ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا

“তুমি যদি দেখতে জালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাদেরকে দণ্ডযান করা হবে, তখন তারা পরম্পর বাদ-প্রতিবাদ করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদপীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। যারা ক্ষমতাদপী ছিল তারা দুর্বলদেরকে বলবে, ‘তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে বিবৃত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই ছিলে অপরাধী। দুর্বলরা ক্ষমতাদপীদেরকে বলবে, ‘প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিখ ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি।’”^{১১৩}

৫. ৩. ৩. ৬. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভাস্তি

ইতোপূর্বে আমরা খ্স্টানদের শিরকের বিষয়েও কুরআনের বিশ্লেষণ

^{১১২} সূরা (২) বাকারা: ১৬৬-১৬৭ আয়াত।

^{১১৩} সূরা (৩৪) সাবা: ৩১-৩৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১৪) ইবরাহীম: ২১ আয়াত।

আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ওহীর সাথে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসে পরিণত করে তারা শিরকে নিমজ্জিত হয়। তাদের শিরকের ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিতৃবাদ ও ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব ছাড়াও তারা ঈসা (আ)-এর মাতা মারিয়াম (আ)-কে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرِيْمٍ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْخُذُونِي وَأَمِّي إِلَيْهِينِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ

“আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারিয়াম তনয় ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহুরপে গ্রহণ কর?...”^{১১৪}

খৃস্টান ধর্মগুরুণ দাবি করেন যে, সাধারণ খৃস্টানগণ কখনোই মরিয়ামকে ত্রিতৃবাদের অংশ বা ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করেন না। বরং তারা তাকে মানুষ ও যৌন মাতা হিসেবে ‘ভক্তি’ করেন, তার নামে মানত করেন, ভক্তির প্রকাশ হিসেবে তার নামে উৎসর্গ করেন বা তার মুর্তি তৈরি করে রাখেন। কিন্তু কখনোই তারা তাকে ‘ঈশ্বর’ বলে মনে করেন না, ঈশ্বরের কোনো অংশ বলেও মনে করেন না।^{১১৫}

বক্তৃত ‘ইবাদতের’ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদের এ সকল প্রলাপের কারণ। প্রকৃতপক্ষে তারা ‘ভক্তি’, ‘শ্রদ্ধা’ ইত্যাদির নামে তারা ‘মরিয়ম’ (আ)-এর ইবাদত করত। আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের অর্থ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, অলৌকিক বা অপার্থিব প্রার্থনাই ইবাদতের মূল ও প্রধান প্রকাশ। আর প্রার্থনা বা দু'আর কবুলিয়াতের জন্য মানত, নয়, উৎসর্গ, সাজদা ইত্যাদি করা হয়। খৃস্টানগণ এভাবেই মারিয়াম (আ)-এর ইবাদত করে। তারা তাঁকে আল্লাহ বা স্বষ্টি বলে দাবি করে না। তবে ‘ঈশ্বরের মাতা’ বা ‘আল্লাহর বিশেষ করুণা-প্রাপ্ত মানুষ হিসেবে’ ফিলিস্তিনে তাঁর কবরে এবং সকল গীর্জায় তাঁর মুর্তি তৈরি করে মুর্তির সামনে তাদের হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য অলৌকিক সাহায্যের আশায় তাঁরা কাছে প্রার্থনা করে। আর প্রার্থনা যেন ‘মা-মেরী’ তাড়াতাড়ি পূরণ করেন সে আশায় তার নিকট মানত, নয় ইত্যাদি পেশ করে বা সাজদা করে পড়ে থাকে।

^{১১৪} সূরা (৫) মায়দা: ১১৬ আয়াত।

^{১১৫} Geoffrey Parrinder, Jesus in the Quran, pp 19, 62, 94, 133-141.

৫. ৩. ৪. শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা

কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই বিভিন্নভাবে মুশারিকদের বিভাস্তি খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের কর্মের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল যুক্তি ও আলোচনা বিভাগিত জানতে হলে অর্থ অনুধাবন-সহ কুরআন পাঠই আমাদের মূল করণীয়। এখানে অতি সংক্ষেপে কুরআনের এ বিষয়ক আলোচনার কয়েকটি দিক উল্লেখ করব।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআনে অধিকাংশক্ষেত্রে দু শ্রেণীর মুশারিকের আকীদা খণ্ডন করা হয়েছে: (১) আরবের মুশারিকগণ এবং (২) ইহুদী-খ্রিস্টানগণ।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, প্রথম দলের মুশারিকগণ একবাকে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই একমাত্র স্বষ্টা ও সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম মালিক এবং তিনি কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ফয়সালা দিলে তা রোধ করার ক্ষমতা কোনো উপাস্যেরই নেই। তবে সাধারণ অবস্থাতে এরা কিছু কল্যাণের ক্ষমতা রাখে যে ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহই ভালবেসে দিয়েছেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলেন না।

এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা ফিরিশতা, জিন্ন, পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবী-রাসূল এবং অনেক প্রতিমা-যুক্তি ও প্রতিকৃতির ইবাদত করত।

দ্বিতীয় দলের মানুষেরাও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করত। খ্রিস্টানগণ ইসা (আ)-এর বিষয়ে বিভিন্ন অতিভিত্তিমূলক বিশ্বাসের কারণে শিরক করত। এছাড়া মরিয়ম (আ)-এর ও ইবাদত করত। উপরন্ত অনেক সাধু, সেন্ট বা সান্তার ভক্তির নামে তারা তাদের ইবাদত করত।

এদের শিরকের অযৌক্তিকতা বর্ণনায় কুরআনের যুক্তির মধ্যে রয়েছে:

৫. ৩. ৪. ১. যিনি একমাত্র রাক্ষ তিনিই একমাত্র ইলাহ

রূব্বিয়্যাত যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সেহেতু অন্যের ইবাদত একেবারেই অযৌক্তিক। যার মধ্যে চূড়ান্ত রূব্বিয়্যাতের বা প্রতিপালন, সংহার, সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষমতা নেই তার নিকট চূড়ান্ত ভক্তি বা বিনয় প্রকাশের মত পাগলামি আর কি হতে পারে। আমরা কুরআনের এ বিষয়ক কিছু যুক্তি ও আলোচনা ইতোপূর্বে দেখেছি।

মুশারিকদের সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। যুক্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, নবী, ওলী, জিন্ন বা অন্য সকলের ক্ষেত্রেই মুশারিকগণ একবাকে স্বীকার করত যে, এরা কেউ স্বৃষ্টা নন, একটি মাছিও এদের কেউ সৃষ্টি করেন নি এবং সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একক ক্ষমতা আল্লাহরই।

৫. ৩. ৪. ২. মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না

কোথাও কোথাও মানবীয় যুক্তিতেই তাদের দাবির অসারতা ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। মুশরিকগণও স্বীকার করে এবং করত যে, যদের তারা ডাকে তারা আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর মালিকানাধীন, তবে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, ফলে তারা আল্লাহর মাহবুব, প্রিয় বা ওলৈ। কাজেই মহান আল্লাহ তাঁর অলৌকিক বিশ্বপরিচালনা শক্তি তাদেরকে দান করেছেন।

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন, তাদের এ চিন্তাটিই মূলত অসার, অলীক ও অযৌক্তিক। আল্লাহর প্রিয়গণ বা মাহবুবগণ তার চাকর। একজন মানুষ বস্তুর সাথে অন্য মানুষ বস্তুর যে সম্পর্ক এখানে সেৱন সম্পর্ক নয়। বরং একজন ভাল চাকরের সাথে একজন মালিকের যে সম্পর্ক এখানে সেৱন সম্পর্ক। মালিক চাকরকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু নিজের সম্পদের মালিকানা বা অধিকার দিবে কেন?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي
رِزْقُهُمْ عَلَىٰ مَا ملَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْبِنْعَمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“আল্লাহ রিয়কের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রিয়ক বস্টন করে দেয় না যে তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করে?”^{১১৬}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا ملَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شَرِكَاءِ
فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَإِنَّمَا تَخَافُونَهُمْ كَحِيفُكُمْ أَنفُسُكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন: তোমাদের আমি যে রিয়ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেৱন ভয় কর যেৱেন তোমরা নিজেদেরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নির্দেশনাবলি বিবৃত করি।”^{১১৭}

^{১১৬} সূরা (১৬) নাহল: ৭১ আয়াত।

^{১১৭} সূরা (৩০) রূম: ২৮ আয়াত।

মানুষ নিজেই যখন নিজের কোনো ক্রীতদাসকে নিজের সম্পত্তির বা ক্ষমতার শরীক করে না, তখন কেন আল্লাহ সর্বশক্তিমান তার কোনো সৃষ্টি দাসকে তার শরীক বানাবেন? যাদেরকে আল্লাহর বদলে ডাকা হয় তাদের ক্ষমতা ও অধিকার যদি আল্লাহর ইচ্ছাধীনই হয় তবে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকার দরকার কি?

৫. ৩. ৪. ৩. ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন?

যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া হতো যে, মহান আল্লাহ প্রতিপালনক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান হলেও অন্য কারো কারো অল্প সম্ভাৱনা কিছু ক্ষমতা আছে তবুও যুক্তির দাবি হত যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আর যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের ইবাদত করা বা তাদের কাছে ভয়-ভক্তি মিশ্রিত চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও বিনয় প্রকাশ করার চেয়ে পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না। এ বিষয়ক অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَّهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَّهُ
مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ

“আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুন্ধ করতে চাইলে তা উন্মুক্ত করার মতও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”^{১১৮}

৫. ৩. ৪. ৪. আল্লাহ কোনো বাদাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি?

আমরা দেখেছি যে, কাফিরগণ সবকিছু স্বীকার করার পরেও দাবি করত যে, মহান আল্লাহ এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এদের ইবাদতে খুশি হয়ে তিনি এদেরকে কিছু ক্ষমতা-অধিকার দিয়েছেন, যেমন রাজা-মহারাজা তার প্রিয় খাদেম বা দাসকে অনেক সময় খুশি হয়ে আঞ্চলিক শাসক বানিয়ে দেন বা কিছু ক্ষমতা দিয়ে দেন। কুরআন কারীমের বিভিন্নভাবে কাফিরদের এ দাবির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কোথাও তাদের কাছে দলিল চাওয়া হয়েছে, তোমরা ওইর আয়াত থেকে প্রমাণ দেখাও, কবে, কোথায় কোন ফিরিশতা, নবী, ওলী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন? এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ অর্থের এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

^{১১৮} সূরা (৩৫) ফাতির: ২ আয়াত।

قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَذَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاًذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُنِي بِكِتَابٍ مِنْ قِبْلَةٍ هَذَا أَوْ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কী সূচি করেছে আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'^{১১৯}

শুভাবতই তারা একুপ কোনো দলিল উপস্থাপনের অক্ষম ছিল। এক্ষেত্রে তারা অমুক বলেছেন, সমাজের সকলেই বলে, সকলেই করে, পিতাপিতামহগণ করেছেন ইত্যাদিকে দলিল হিসেবে পেশ করত। এমনকি খৃস্টানগণও কখনো তাদের প্রচলিত বাইবেল থেকে একটি দ্যুর্ঘাত্মক দলিলও পেশ করতে পারে নি, যাতে ঈসা মসীহ (আ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত করবে, বা আল্লাহকে পেতে হলে আমার ইবাদত করতে হবে, অথবা আমার মধ্যকার যে পুত্রসন্তা আছে তোমরা তার ইবাদত করবে। তিনি সর্বদা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন।

৫. ৩. ৪. ৫. আল্লাহ কাউকে কোনোক্ষণ ক্ষমতা প্রদান করেন নি অন্যত্র মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ও দ্যুর্ঘাত্মক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কখনোই কাউকে একুপভাবে ক্ষমতা দেন নি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْذُّلُّ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا

“বল, ‘প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁরা ক্ষমতায়-রাজত্বে কোনো শরীক নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে- কারণে তাঁর অভিভাবকের বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্মতে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।’^{১২০}

এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ مُنْقَالٌ نَرَأَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

^{১১৯} সূরা (৪৬) আহকাফ: ৪ আয়াত।

^{১২০} সূরা (১৭) বানী ইসরাইল: ১১১ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (১৮) কাহাক: ২৬ ও সূরা (১৩) রাদ: ৪১ আয়াত।

“বল, ‘তোমরা আস্তান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (ইলাহ) মনে করতে, তারা আকাশ-মঙ্গলী এবং পৃথিবীতে অনুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ মহান আল্লাহর সহায়কও নয়।”^{১২১}

এ বিষয়টি সকল মুশরিকের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, তারকা, ফিরিশতাগণ, নবীগণ, ওলীগণ, জিন্নগণ বা অন্য যাদেরই ইবাদত করত মুশরিকগণ সকলের ক্ষেত্রেই উত্তর একই। তাঁরা কেউই আসমানের বা যমিনের এক অনুপরিমাণ মালিকানা রাখেন না। আসমান-যমিনের কোথাও তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং মহান আল্লাহ তাদের কারো সহযোগিতার প্রত্যাশী নন, কেউ তাকে কোনোরূপে সাহায্য সহযোগিতা করেন না। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلَكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ

“তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব-মালিকানা তাঁরই। এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁচির আবরণেরও মালিক নয়।”^{১২২}

বৃষ্টানগণ ঈসা মাসীহ (আ)-কে মহান আল্লাহর যাত বা সন্তান অংশ ও ‘অবতার’ (God incarnate) হিসেবে ইবাদত করে। এ ছাড়া তারা মরিয়ম (আ)-কে ‘সাত্তা’ বা মহান আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্তি ‘ওলী’ হিসেবে ইবাদত করে। তার মুর্তিতে বা ফিলিষ্টিনে বিদ্যমান তার কবরে সাজদা করে, মানত করে, তার আশীর্বাদ ও বর প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা বিশ্বাস করে। মহান আল্লাহ তাদের মানবত্ব ও অক্ষমতা বর্ণনা করে বলেন:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ فَذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْهُ صَدِيقَةٌ
كَانَا يَأْكُلُنَّ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نَبِيُّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قَلْ
أَتَعْبَثُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“মরিয়ম-তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরণ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরো দেখ, তারা

^{১২১} সূরা (৩৪) সাবা: ২২ আয়াত।

^{১২২} সূরা (৩৫) ফাতির: ১৩ আয়াত।

কিভাবে সত্য বিমুখ হয়! বল, 'তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি করার বা উপকার করার? আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'^{১২৩}

৫. ৩. ৪. ৬. সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে

ক্ষমতার বিষয়টি মুশরিকদের মধ্যে এমনভাবে আসন গেড়েছিল যে, সবকিছুর পরেও তারা দাবি করত আমাদের উপাস্যদের কিছু ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টির একত্রে বিষয়টি উল্লেখ করে বারংবার বলেছেন যে, যারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাদের তো কোনো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না। তাদের কোনো ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় কোনো ভাবেই তারা মহান আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। কাজেই কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকতে হবে? কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمْنَ لَا يَخْلُقُ أَفْلًا تَذَكَّرُونَ

“সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?”^{১২৪}

ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ, নবীগণ, ওলীগণ, মৃতি-প্রতিমা, বৃক্ষ, জড় পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু মুশরিকগণ উপাসনা করত সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তারা সকলেই স্বীকার করত যে, এ সকল উপাস্যের কেউই কোনো কিছুর স্মষ্টা নন। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ أَمْوَاتَ غَيْرِهِ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْنَ يَبْغُونَ

“তারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত জীবন-বিহীন এবং পুনরুত্থান কখন হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই।”^{১২৫}

প্রথম যুক্তি মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আয়াতটি ফিরিশত, সৈসা (আ), জিন্নগণ বা অনুরূপ জীবিত উপাস্য ছাড়া মুশরিকদের অধিকাংশ উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

^{১২৩} সূরা (৫) মায়দা: ৭৫-৭৬ আয়াত।

^{১২৪} সূরা (১৬) নাহল: ১৭ আয়াত।

^{১২৫} সূরা (১৬) নাহল: ২০-২১ আয়াত।

أَمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَنْتُمْ مَعَ اللَّهِ بِلَّهِ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

“বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আর্দ্ধ তদ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচুঃত হয়।”^{১২৬}

এ বিষয়টিও মুশরিকদের জীবিত, মৃত ও জড় সকল উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার সৃষ্টির একত্ব উল্লেখ করে শিরকের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৫. ৩. ৭. এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এ সকল উপাস্যের অসহায়ত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ نَذْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَا يَسْمَعُوا مَا إِسْتَجَابْنَا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرِكَكُمْ وَلَا يَتَبَّعُنَّ مَثَلَّ خَبِيرٍ

“তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ কিয়ামতের দিন তারা তা অঙ্গীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।”^{১২৭}

মুশরিকগণ যাদের ডাকে তাদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বর্ণনা করে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ دُعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
كَفَنِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَتَلْعَبْ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافَرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

“সত্যের আহ্বান তাঁরই (আল্লাহরই)। যারা তাকে ব্যক্তিত আহ্বান করে অপরিকে, তাদেরকে কোনো সাড়াই দেয় না তারা। তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছাবে-এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে পানির দিকে, আর এভাবে কখনোই পানি তার মুখে পৌছাবে না। কাফিরদের দু'আ- আহ্বান নিষ্কল।”^{১২৮}

^{১২৬} সূরা (২৭) নাম্বল: ৬০ আয়াত। আরো দেখুন ৬১-৬৪ আয়াত।

^{১২৭} সূরা (৩৫) ফাতির: ১৪ আয়াত।

^{১২৮} সূরা (১৩) রা�'দ: ১৪ আয়াত।

অন্যত্র মহান আল্লাহর বলেন:

وَمَنْ أَضْلَلُ مِنْ يَدْعُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَغْنَاءَ وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

“সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং তারা তার প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে তাদের শক্তি এবং তারা তাদের ইবাদত অস্মীকার করবে।”^{১২৯}

এ বিষয়টিও মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, জিল্ল, নবী, ওলী ও অন্যান্য সকল মাবুদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি সত্য। যারা আল্লাহকে ছেড়ে বিপদে আপনে ঈসা মাসীহ, ইবরাহীম, ইসমাইল, উয়াইর, জিবরাইল, আখরাইল (আলাইহিমুস সালাম) বা কোনো সত্যিকার ওলী বা মনগড়া আল্লাহর পুত্রকন্যা বা প্রতিমা লাভ, মানাত বা অন্য কাউকে ডাকছে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা বলা হয়েছে। এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, জিবরাইল, ইসমাইল, অন্য কোনো ফিরিশতা, নবীগণ বা ওলীগণকে ডাকলে হয়ত শুনতে পান। কাউকেই আল্লাহ কোনো অলৌকিক বা গাহিবী শ্রবণের ক্ষমতা দেন নি। সবই মুশরিকদের কল্পনা মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা যে, এরা কেউই তাদের অনুসারী বা ভক্ত নামধারীদের ভঙ্গি বা ইবাদতে খুশি নন এবং এদের জন্য কোনো সুপারিশ তাঁরা করবেন না।

৫. ৩. ৪. ৮. মালিককে রেখে চাকরকে মাবুদ বানানো চূড়ান্ত বোকামি

সকল মুশরিকই স্বীকার করছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র মালিক, রাজা এবং সর্বশক্তিমান প্রতিপালক। পাশাপাশি তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তার সাথে যাদেরকে তারা ইবাদত করছে তারা সকলেই মহান আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই রান্দা। এ কথা স্বীকার করার পরে মহান মালিককে ছেড়ে চাকরবাকরদের ইবাদত করা বা তাদের নিকট নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করার মত বোকামি আর কি হতে পারে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বলেন:

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أُولَئِكَ إِنَّا أَعْنَدْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نَزَّلَ

^{১২৯} সূরা (৪৬) আহকাফ: ৫-৬ আয়াত।

“যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে ওলী-অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহানাম।”^{১৩০}

৫. ৩. ৯. মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না

আমরা দেখেছি যে, শিরকের মূল হলো মহান আল্লাহর বিষয়ে কু-ধারণা বা “অব-ভক্তি” এবং বান্দার বিষয়ে ‘অতি-ধারণা’ বা ‘অতিভক্তি’। আর এর অন্যতম কারণ মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা। মুশরিকদের যুক্তিই ছিল পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণের নিকট আবেদন করতে যেমন মন্ত্রী, খাদেম, দারোয়ান, সামন্তরাজা বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে না কেন। দুনিয়ার সাধারণ একজন রাজা এত আমত্য-পরিষদ রাখেন আর সকল রাজার মহারাজা মহান আল্লাহ তা রাখবেন না কেন? ইত্যাদি।

কুরআনে এরূপ তুলনা করতে বারংবার নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা যায় না। একজন মানুষ মহারাজা তার সেনাপতি, খাদেম, সামন্ত শাসক বা কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী, তিনি নিজে সবকিছু দেখতে, শুনতে বা জানতে পারেন না। তিনি অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, অথবা মূল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, তাই সংশ্লিষ্ট অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সব কিছু নিজে জানা ও বিচার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহকে এরূপ মানুষ মহারাজার সাথে তুলনা করার অর্থ তার রূবুবিয়াতের সাথে কুফরী করা ও তাঁর বিষয়ে ‘কু-ধারণা’ পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْتَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“সুতরাং আল্লাহর জন্য কোনো তুলনা-উদাহরণ স্থাপন করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।”^{১৩১}

৫. ৩. ১০. আল্লাহর মাহবুব বান্দারা মুশরিকদের উপর অসম্মতি

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, শয়তানের প্ররোচনা, প্রবন্ধনা এবং বিভিন্ন মিথ্যা অপঠনারের কারণে মুশরিকগণ বিশ্঵াস করত যে, ফিরিশতাগণ ও আল্লাহর অন্যান্য শ্রিয় বান্দা তাদের ইবাদত পেয়ে খুশি হন এবং তাদের জন্য

^{১৩০} সূরা (১৮) কাহাফ: ১০২ আয়াত।

^{১৩১} সূরা (১৬) নাহল: ৭৪ আয়াত।

আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান ফিরিশতাগণের কল্পিত রূপে বা অন্যান্য নবী, ওলী বা কল্পিত মা'বুদদের বেশ ধরে তাদেরকে এরূপ ধারণা প্রদান করত, যেমন ভারতীয় হিন্দু পূজারীদের সামনে স্বপ্নে বা জাগরণে কালী, গণেশ, মহামায়া ইত্যাদি রূপে 'প্রকাশিত' হয়ে তাদের শিরককে সঠিক বলে ধারণা দেয়। মুসলিম সমাজে যারা শিরকে লিঙ্গ তাদেরকেও এভাবে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান প্রতারিত করে।

এজন্য কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত প্রিয় বান্দাগণ কিয়ামতের দিন এসকল মুশরিকের প্রতি তাদের প্রকৃত বিরাগ প্রকাশ করবেন। বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত ইতোপূর্বে আমার দেখেছি। মুশরিকগণ ফিরিশতা, নবী, ওলী বা কল্পিত 'আল্লাহর প্রিয়' বলে যাদেরকে ডাকে তারা কিয়ামতের দিন এ সকল মুশরিকের সাথে শক্রতা করবেন এবং মুশরিকগণ মূলত শয়তানদের ইবাদত করত বলে ঘোষণা করবেন বলে আমরা দেখেছি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ক আরো কিছু আয়াত আমরা দেখব।

অন্যত্র মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, কোনো নবী-রাসূল কখনোই আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করার কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ ছাড়া কোনো ফিরিশতা বা কোনো নবীকে ইলাহ তো দূরের কথা 'রাক' বা প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণের কথাও তিনি বলতে পারেন না। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, তবে আপেক্ষিক লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের অর্থে 'রাক' বলা যায়। কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সত্যিকার ধার্মিক মানুষ কোনো ফিরিশতা বা নবীকে ইবাদত করা তো দূরের কথা তাদের তত্ত্বাবধানের বা বিশ্ব-পরিচালনার কোনোরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেও তারা বলতে পারেন না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَنْزَهُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنُّبُيُّونَ أَرْبَابًا أَيْأَمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নুরুওয়াত প্রদান করার পর তার জন্য শোভন নয় যে, সে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও', বরং সে বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা-রাকবানী হয়ে যাও,

যেহেতু তোমরা কিভাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। আর সে তোমাদের নির্দেশ দিবে না যে, তোমরা ফিরিশতাগণ এবং নবীগণকে আল্লাহর পরিবর্তে রাবু হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরে কি সে তোমাদেরকে কৃফরীর নির্দেশ দিবে?”^{১৩২}

অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দাও যদি কোনোভাবে নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করে বা কোনো মানুষের ইবাদত বা চূড়ান্ত ভঙ্গি গ্রহণে আগ্রহী হয় তবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلْ عَبَادٌ مَكْرُمُونَ لَا يَسْقِفُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَسْقِفُونَ إِلَّا لِمَنِ
إِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِّيَّهِ مُشْفَقُونَ . وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ
نَجْزِيهُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

“তারা বলে, ‘দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রাস। তাদের মধ্যে যে বলবে ‘আমিই ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত’, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহানাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।”^{১৩৩}

৫. ৩. ৪. ১১. মুশরিকগণ নেককারগণের শাফা‘আত পাবে না

আমরা দেখেছি যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রকৃত বা কল্পিত প্রিয় বান্দাগণের শাফা‘আত লাভ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছাই শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে শাফা‘আতের আশায় তার শিরক করত তা যে তারা পাবে না। বারংবার কিয়ামতের দিবসে মুশরিকদের চরম অসহায় ও বান্ধবহীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আমরা জানি যে, যীশুখ্রস্টের বা ঈসা মাসীহের (আ) প্রতি ভঙ্গির সর্বোচ্চ প্রমাণ দিতে তাঁর নামে নিজেদের নামকরণ করেছে খ্রস্টানগণ বা মাসীহীগণ। ঈসা (আ)-এর ভঙ্গির নামে তাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে

^{১৩২} সূরা (৩) আল-ইমরান: ৭৯-৮০ আয়াত।

^{১৩৩} সূরা (২১) আমিয়া: ২৬-২৯ আয়াত।

তাঁরা। তাদের একটিই দাবি যে, ঈসা (আ) তাদের আবিরাতের কাঞ্জারী, মুক্তিদাতা বা আণকর্তা (savior)। অনুরূপভাবে আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণকে, জিন্নগণকে, কোনো কোনো নবীকে এবং মনগড়া অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা সন্তানকে ইবাদত করেছে। তাদেরও বিশ্বাস যে, এরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে, এরা কেউই এদের জন্য শাফা'আত করবেন না। এর অর্থ এ নয় যে, নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা অন্যান্য নেক বান্দা শাফা'আত করবেন না। তাঁরা শাফা'আত করবেন শুধু তাদের জন্য যারা শিরক থেকে মুক্ত ছিল, যাদের ন্যনতম তাওহীদে মহান আল্লাহ খুশি ছিলেন এবং যাদের বিষয়ে শাফা'আত করতে মহান আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দিবেন।

এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ অর্থে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِّسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ

“যেদিন কিয়ামত হবে সে দিন অপরাধিগণ হতাশ হয়ে পড়বে। তাদের শরীকগণের (উপাস্যগণের) মধ্য থেকে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের শরীকগণকে অস্বীকার করবে।”^{১৩৪}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَى الدِّينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كَنَّا
نَذْعُوا مِنْ دُونِكَ فَلَقُوا النَّهِيَّ الْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَقُوْنَا إِلَيْهِ يَوْمَنِ السَّلَامِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

“মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল তাদেরকে যখন তারা দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা ডাকতাম তোমার পরিবর্তে। অতঃপর তদুন্তরে তারা (শরীকগণ বা উপাস্যগণ) বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সে দিন তারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করবে এবং যে মিথ্যা তারা উত্তোলন করেছিল তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে।”^{১৩৫}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

^{১৩৪} সূরা (৩০) রূম: ১২-১৩ আয়াত।

^{১৩৫} সূরা (১৬) নাহল: ৮৬-৮৭ আয়াত।

وَقَيْلَ اذْعُوا شُرْكَاءِكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوهُمْ لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْلَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

“তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমাদের শরীকদেরকে ডাক’, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত!”^{১৩৬}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرْكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوهُمْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْنِقاً

“যে দিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।”^{১৩৭}

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ النَّفَرُ أَضْلَلْتَنِي عَبَادِي هُوَلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلَّوْا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُوتْيَاءِ وَلَكِنْ مَتَّعْنَاهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسْوَاهُ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورَا

“এবং যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, এবং তিনি তাদের এ সকল উপাস্যকে বলবেন: তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিদ্রোহ করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভৃষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে, ‘পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। তুমই তো এদেরকে এবং এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলে, পরিণামে তারা ওহী বিস্ম্য হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।’”^{১৩৮}

কুরআন কারীমে আরো অনেক স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৩৯}

৫. ৩. ৪. ১২. অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবি অস্থীকারের পরিণতি

সম্মানিত পাঠ্যক সম্মত অনুভব করছেন যে, এ সকল কথার পরে তো আর কারো মধ্যেই শিরক থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তি বা বিবেকে

^{১৩৬} সূরা (২৮) কাসাস: ৬৪ আয়াত।

^{১৩৭} সূরা (১৮) কাহাফ: ৫২ আয়াত।

^{১৩৮} সূরা (২৫) ফুরকান: ১৭-১৮ আয়াত।

^{১৩৯} দেখুন: সূরা (৭) আ'রাফ: ৩৭ ও সূরা (১০) ইউনুস: ২৮-২৯ আয়াত।

নয়, অঙ্ক আবেগ ও মোহ হেদায়াতের পথে বড় বাধা। সকল যুক্তি এখানে শেষ হয়ে যায়। আগের কথাগুলিই ঘুরে ফিরে চলে আসে। এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র কাজেই এদের ইবাদতের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য পেতে হবে। এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলেন না, কাজেই এদেরকে ডাকতে হবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তার ইচ্ছার বাইরে এরা কেউ কিছু করতে পারে না ইত্যাদি সবই ঠিক। তিনি কাউকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সুস্পষ্ট বলেন নি তাও ঠিক। অন্য কাউকে তিনি ডাকতে বলেন নি একথাও ঠিক। একমাত্র তাকেই ডাকতে বলেছেন এ কথাও ঠিক। তবুও এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। এদেরকে আল্লাহ ভালবেসে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে সরাসরি জানান নি। তবে যুক্তিতে তো বুঝা যায়। যুগ্ম্যুগ ধরে সকলেই বলছে। নবী-রাসূলগণ থেকে পিতা-পিতামহের মাধ্যমে প্রাণ্ত এ নিয়ম ভুল হতে পারে না। ... এভাবেই সকল যুক্তি ও বিবেকের বাণীকে তারা অস্বীকার করেছে। সকল যুক্তি অঙ্ক আবেগ এবং দীর্ঘদিনের কর্মের ও বিশ্বাসের প্রতি অঙ্ক ভালবাসার কাছে হেরে গিয়েছে। মুশারিকদের এরপ অঙ্ক আবেগ ও অযৌক্তিক বিবেকবিরোধী আচরণে কষ্ট পেতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضْلِلُ مِنْ يَشَاءُ وَهُدِيَ
مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“যার অপকর্মকে তার জন্য সৌন্দর্যময় করে দেখানো হয়েছে ফলে সে তা ভাল বলে মনে করেছে, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।”^{১৪০}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمْنَ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

“যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের অপকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?”^{১৪১}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُنَّ نَنْتَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَخْسِبُونَ صَنْعًا

^{১৪০} সূরা (৩৫) ফাতির: ৮ আয়াত।

^{১৪১} সূরা (৪৭) মুহাম্মাদ: ১৪ আয়াত।

“বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দিব যারা কর্মে সবচেয়ে
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা তো সে সকল মানুষ, দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্ম বিভান্ত
হয়েছে কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।’”^{১৪২}

৫. ৩. ৫. শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা

শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে
বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস
থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম:

৫. ৩. ৫. ১. ভয়ঙ্করতম পাপ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর
মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَنْلِ مَا حَرَّمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لَا شَرِيكُوا بِهِ شَيْئًا

“বল, ‘এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ
করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই: তা এই যে, তোমরা তাঁর কোনো
শরীক করবে না।’”^{১৪৩}

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে,
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “জগন্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর
সমতূল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عَقُوقُ الْوَالِدِينِ وَ قَوْلُ الزُّورِ
أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

“সবচেয়ে বড় কৰীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ
হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ
দেওয়া।”^{১৪৪}

৫. ৩. ২. কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না

তাওবা বা অনুত্পন্ন হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে
মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার
করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা

^{১৪২} সূরা (১৮) কাহাফ: ১০৩-১০৪ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৭) আ'রাফ: ৩০
আয়াত।

^{১৪৩} সূরা (৬) আন'আম: ১৫১ আয়াত।

^{১৪৪} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫১৯, ২৫৩৫।

করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِلَيْهَا عَظِيمًا

“আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।”^{১৪৫}

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।”^{১৪৬}

৫. ৩. ৫. ৩. শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বন্দ্ব করে

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْخَبِطَنَ عَمَلَكَ
وَلَكَوْنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, ‘তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।’”^{১৪৭}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”^{১৪৮}

মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, নৃহ, দাউদ, সুলাইমান,

^{১৪৫} সূরা (৪) নিসা: ৪৮ আয়াত।

^{১৪৬} সূরা (৪) নিসা: ১১৬ আয়াত।

^{১৪৭} সূরা (৩৯) যুমার: ৬৫ আয়াত।

^{১৪৮} সূরা (৫) মায়দা: ৫ আয়াত।

আইউব, ইউসূফ, মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ইসা, ইলহিয়াস, ইসমাইল, ইলহিয়াসা, ইউনুস, লৃত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ بِهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَهُبَطَ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

“এ হলো আল্লাহর দেদায়াত, শ্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত।”^{১৪৯}

৫. ৩. ৫. ৪. শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শান্তির কারণ

শিরক মুক্ত সকল পাপে লিঙ্গ মানুষ আবিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফা'আতের কারণে বা শান্তি ভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীই মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিঙ্গ মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পছীদের আবাসস্থল। এজন্য মহান আল্লাহ শিরকে লিঙ্গদের জন্য তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقْدَ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنصَارٍ

“কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিয়দের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।”^{১৫০}

আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ لَفِتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَفِتَنِي بِمِثْلِهِ مَغْفِرَةً

“যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সম্পরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব।”^{১৫১}

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَأَهْوَنَ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
شَيْءٍ كُنْتَ تَفْنِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقْدَ سَأْلَتَكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي

^{১৪৯} সূরা (৬) আন'আম: ৮৮ আয়াত।

^{১৫০} সূরা (৫) মায়দা: ৭২ আয়াত।

^{১৫১} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬৮।

صَلْبٌ أَدَمْ لَا شُرِكَ بِي فَأَبْيَتْ إِلَى الشَّرِكَ

“জাহানামে সবচেয়ে কম শান্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি পেতে তবে কি জাহানাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে: হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না।”^{১৫২}

৫. ৩. ৬. শিরকের উৎস-সমূহ বন্ধ করা

শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের বিশেষ ব্যবস্থার অন্যতম শিরকের উৎসগুলি বন্ধ করা। আমরা দেখেছি যে, শিরক মূলত দুটি বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়: (১) মহান আল্লাহর প্রতি অব-ভক্তি বা কু-ধারণা এবং (২) বান্দার প্রতি অতিভক্তি বা অতি-ধারণা। আর এ দুটি বিষয় পরম্পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহান আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি কু-ধারণা না হলে কেউ কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণের অর্থই হলো মহান আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি অব-ধারণা পোষণ করা।

কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে এ বিষয়গুলি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ব্যাপক পরিসরের প্রয়োজন। এখানে অতি-সংক্ষেপে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করছি।

৫. ৩. ৬. ১. মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের প্রথম, প্রধান ও অন্যতম আলোচ্য বিষয় মহান আল্লাহর মর্যাদা, ক্ষমতা ও তাঁর তাওহীদ। বারংবার বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, সকল কর্তৃত্বের অধিকারী, বিশ্ব পরিচালনার অধিকার, ক্ষমতা, কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই। কেউ কিছু করতে পারে না, দিতে পারে না। তিনি দিলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কারো কোনো ইচ্ছার কোনা মূল্য নেই। তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা, অনুমতি ও মর্যাদার বাইরে কারো সুপারিশ, শাফা'আত বা দু'আ গ্রহণ করেন না। একমাত্র তাঁকেই ডাক, তাঁরই সাহায্য চাও, তিনিই তোমার ভাকে সাড়া দিবেন। আর তিনি না দিলে অন্য কেউ কোনোভাবে দিতে পারে

^{১৫২} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৩।

না। এভাবে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর মহত্ত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তাঁর মর্যদা ও মহত্ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মুমিন অর্জন করতে পারেন। এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

৫. ৩. ৬. ২. ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যে সকল বান্দার বিষয়ে অতিভক্তির কারণে শিরক করেছে তাদের অন্যতম ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রিয় নেককার বান্দাগণ। এ ছাড়া মুশরিকগণ অনেক বানোয়াট বা কল্পিত ব্যক্তিত্বকে ‘আল্লাহর প্রিয়’ বা ‘আল্লাহর সন্তান’ নাম দিয়ে শিরক করেছে। আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের সুপারিশ-শাফা‘আত লাভের আশায় তাদের ইবাদত করত। কুরআন কারীমে তাদের এ অতিভক্তি রোধ করতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দা মাত্র। তাঁরা শাফা‘আতের সুযোগ পাবেন বটে, তবে তা তাদের ইচ্ছাধীন নয়, বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির অধীন। কাজেই শাফা‘আতের আশায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত ভয়ঙ্কর পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। এ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. ৩. ৬. ৩. নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, ইহুদী, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকগণ ইবরাহীম, ইসমাঈল, উয়াইর, সৈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবী-রাসূলের বিষয়ে অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে শিরকে নিপত্তি হয়। এজন্য কুরআন কারীমের বারংবার নবী-রাসূলগণের আবদিয়্যাত বা বান্দাত্ব, বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো অলৌকিক নির্দেশন দেখানোর অক্ষমতা, গাইব সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তাঁদের অনুসারী ও মুমিনগণ তাঁদের প্রতি অবিচল ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁদের তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন। এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, মর্যাদা প্রদান ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণের নির্দেশনাবলিও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৫. ৩. ৬. ৪. খলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

আমরা দেখেছি যে, নেককার বা ওলী-আল্লাহগণের বিষয়ে অতিভক্তি

ছিল মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অতিভিত্তির পথ রোধ করা হয়েছে:

প্রথমত, ঈমান ও তাকওয়াকে বেলায়াত বা ওলীত্বের ভিত্তি ধরা হয়েছে। ওলীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে অলৌকিকতা, কারামাত ইত্যাদির কোনোরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। তাকওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয় তবে তা মহান আল্লাহর দেওয়া সম্মাননা বা কারামত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কারো অলৌকিক কার্য দেখে তাকে ওলী বলে মনে করার কোনোরূপ সুযোগ ইসলামে নেই। যেন মুমিন কারো অলৌকিক কর্ম দেখে তাকে নিশ্চিত ওলী বলে ধারণা না করে।

দ্বিতীয়ত, অলৌকিক কার্য দেখে তো কাউকে ওলী বলা যাবে না, এমনকি কুরআন-হাদীসে যাকে বেলায়াতের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ঈমান ও তাকওয়া দেখেও কাউকে সুনিশ্চিত ওলী বলে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কারণ, ‘ঈমান’ ও ‘তাকওয়া’ উভয়ই মূলত হৃদয়ের অভ্যন্তরের লৃক্ষিত বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। মুমিনের কর্ম তার ঈমান ও তাকওয়ার আলামত মাত্র, যা দেখে ঈমান ও তাকওয়ার বিদ্যমানতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সকল মুমিনই আল্লাহর ওলী। যারা তাকওয়া ও নেক-আমল যত বেশি সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিতভাবে ওলী বলে চিহ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। নির্ধারিতভাবে কাউকে ‘ওলী’ বলে নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, ওহীর নির্দেশানা বাইরে কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী বলতেও আপন্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে উসমান ইবনু মায়উন (রা) বিষয়ক হাদীসটি ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَنْ يُنْخَلِّ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَا أَنَا

إِلَّا أَنْ يَعْمَدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ

“কোনো ব্যক্তিকেই তার নিজের আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও নন? তিনি বলেন, না, আমিও নই, যদি আল্লাহ আমাকে মহানুভবতা ও রহমত দিয়ে আবৃত করে না নেন।”^{১৫৩}

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামে মানুষের বাহ্যিক নেক কর্মের ভিত্তিতে সম্মান করতে ও ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হলেও, কোনো বাহ্যিক কর্ম বা কারামাতের ভিত্তিতে কাউকে সুনিশ্চিত ওলী তো দূরের কথা জান্নাতী বলার কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। সর্বোপরি কোনো ওলীকে আল্লাহ কোনো অলৌকিক

^{১৫৩} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৪৭, ২৩৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৬৯-২১৭১।

ক্ষমতা দিয়েছেন বা দেন এরপ কোনো কল্পনা করার সুযোগ ইসলামে নেই। কুরআন বা হাদীসে কোথাও এরপ কিছু বলা হয় নি। এমনকি সাহারীগণ নেককার বৃজুর্গদের নিকট দু'আ চাওয়ার বিষয়েও বাড়াড়ি পরিহার করতে পরামর্শ দিতেন। সাধারণভাবে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদের জন্য দু'আ করতে। সাহাবায়ে কেবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'আ চাইতেন। তাঁরা একে অপরের কাছেও দোয় চেয়েছেন কখনো কখনো। এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: উমর (রা.) উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন: আমাদেরকেও তোমার দু'আর মধ্যে মনে রেখ, ভুলে যেও না।^{১৫৪}

তাবেরীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দু'আ চাইলে তাঁরা দু'আ করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা.) -এর কাছে এসে দু'আ চায়। তিনি বলেন: “আল্লাহহ্যা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।” (অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) এই ব্যক্তি বার বার দু'আ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।^{১৫৫}

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দু'আ করতেন না, কারণ এতে মানুষ দু'আ চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে ঢিঠি লিখে দু'আ চায়। তিনি উত্তরে লিখেন:

إِنِّي لَسْتُ بِنَبِيٍّ، وَلَكِنْ إِذَا أَقِيمْتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ لِذَنْبِكِ

“আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দু'আ করব বা আমার দু'আ করুল হবেই), বরং যখন সালাত কায়েম করা হবে, তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।”^{১৫৬}

সাদ ইবনু আবী উয়াক্কাস (রা) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলেন: আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দু'আ চান। তখন তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের

^{১৫৪} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫৫৯; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৮০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৯৯৬; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৩/২২১; আলবানী, যায়ীফু সুনানি ইবনু মাজাহ পৃ: ২৩৫। হাদীসটিকে তিরমিয়ী হাসান সহীহ ও হাইসামী যয়ীফ বলেছেন।

^{১৫৫} শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০০-৫০১।

^{১৫৬} শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০১।

ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী? (যে সবার জন্য দু'আ করব বা আমার দু'আ করুল হবেই)।^{১৫৭}

৫. ৩. ৬. ৫. মৃত্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, যুগে যুগে সকল সমাজের মুশরিকদেরই ধারণা যে, নেককার মানুষ মৃত্যুর পরে আরো বেশি অলৌকিক ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে। তারা দেহের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে পুরো আত্মিক আধিপত্য ও ক্ষমতা অর্জন করে। এজন্য জীবিত নেককারদের চেয়ে মৃত নেককারদের ইবাদত করা বা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বাননোর প্রবণতা সব মুশরিকদের মধ্যেই বেশি।

আমরা দেখেছি যে, বিপদে আপদে মৃত্তি কিছুকে আকড়ে ধরে নিজের মনের আবেগ জানানো এবং বিপদ থেকে আণ প্রার্থনা করার আগ্রহ শিরকের অন্যতম কারণ। দুর্বল চিন্তা মানুষ অদৃশ্য কোনো কিছুর কাছে প্রার্থনা করে পুরো তৃষ্ণি পায় না। মৃত্তি কিছুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। এজন্য মৃত মৃত নেককার ব্যক্তির ইবাদত করা বা তার প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশের জন্য মুশরিক ব্যক্তি একটি মৃত্তি কিছু সন্ধান করে। এজন্য মূল বাহন (১) উক্ত ব্যক্তির সমাধি বা কবর, (২) উক্ত ব্যক্তির ছবি, মৃত্তি বা প্রতিকৃতি এবং (২) উক্ত ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা দ্রব্য। সাধারণত এগুলিকে কেন্দ্র করেই শিরক আবর্তিত হয়।

ইসলামে শিরকের এ সকল উপকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন কোনোভাবে মানবীয় দুর্বলতা বা শয়তানের প্রবৃষ্টিনার কারণে কোনো মুমিন এগুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে যেয়ে শিরকে নিপত্তি না হয়। ছবি, প্রতিকৃতি, মৃত্তি ইত্যাদি তৈরি, সংরক্ষণ ইত্যাদি কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থানের বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনা ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি। কবর যেন মানুষের অতিভক্তির বিষয়ে পরিণত না হয় সে জন্য কবর কেন্দ্রিক মসজিদ ও ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি কবর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচু করা, পাকা করা, চুনকাম করা, কবরের উপরে কিছু লেখা ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। মৃত্তি, ছবি ও প্রতিকৃতির পাশাপাশি উচু কবর ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে খলীফা আলীর (রা) পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন:

فَالْيَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثْتَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا

^{১৫৭} শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০১।

نَدْعُ تِمْتَالاً إِلَى طَمْسَتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَى سَوَيْتَهُ ... وَلَا صُورَةً إِلَى طَمْسَتَهَا

“আলী (রা) আমাকে বলেন: আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন: যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।”^{১৫৮}

আবু মুহাম্মাদ আল-হ্যালী আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدْعُ بَهَا وَشَا إِلَى كَسْرَةَ وَلَا قَبْرًا إِلَى سَوَاهَ وَلَا صُورَةً إِلَى لَطْخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْطَلَقَ فَهَبَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ عَلَيْيَ فَقَالَ أَنَا أَنْطَلَقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَنْطَلَقَ فَأَنْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُدْعُ بَهَا وَشَا إِلَى كَسْرَةَ وَلَا قَبْرًا إِلَى سَوَيْتَهُ وَلَا صُورَةً إِلَى لَطْخَتَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَادَ لِصُنْعَةِ شَيْءٍ مِّنْ هَذَا فَقَذَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .

“একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানায় (মদীনার বাইরে) ছিলেন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আছ যে মদীনার অভ্যন্তরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব বিচূর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে, এবং যত ছবি পাবে সব মুছে বা নষ্ট করে দেবে। তখন একজন সাহাবী বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। কিন্তু তিনি মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী (রা) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যাও। তখন আলী চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে বললেন: আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি কেউ পুনরায় এসকল কাজের কোনো একটি করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফ্রী করল।” হাদীসটির সনদ হাসান।^{১৫৯}

যাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন :

نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْعَصَنَ الْقَبْرُ وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبَتَّى عَلَيْهِ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং

^{১৫৮}মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৬৬।

^{১৫৯}আহমদ, আল-মুসন্নাদ ১/৮৭, ১৩৮; আহমদ শাকির, মুসন্নাদ আহমদ ২/৬৮-৬৯, ২৭৪-২৭৫।

কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।^{১৬০}

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَا أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।^{১৬১}

এ অর্থে উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।^{১৬২}

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় মোট ৫টি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন: কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে লেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা।^{১৬৩}

৫. ৪. মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের প্রেক্ষাপট

৫. ৪. ১. মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা দেখেছি যে, সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের সবচেয়ে বড় বিষয় তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষদেরকে তাওহীদের পথ দেখিয়েছেন। শয়তান ও তার অনুসারিগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে আবার তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিপতিত করতে। মানবীয় দুর্বলতা, তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ওহাইর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় মুমিনকে শয়তানের ক্ষপ্তরে পড়তে সাহায্য করেছে।

তাওহীদের বিশ্বজনীন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাওয়াত। কুরআন ও সুন্নাহে তাওহীদকে সমুন্নত রাখার ও শিরক-কুফর প্রতিরোধ করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা দেখেছি। কিন্তু শয়তানের প্রচেষ্টা তাতে থেমে যায় নি। শয়তান তার অনুসারীদের নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ করাতে। বিশেষ করে যখনই কোনো মুসলিম বাস্তি বা সমাজ কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখনই শয়তানের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সফলতা লাভ করেছে।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তাঁর উম্মাতের মধ্যেও অনুরূপভাবে

^{১৬০} মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৬৭।

^{১৬১} ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৪৯৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫২৫। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলেছেন।

^{১৬২} আহমাদ, আল-মুসনাদ ৬/২২৯।

^{১৬৩} ইবনুল আসীর, জামিউল উস্লুল ১১/১৪৫-১৪৬।

একই প্রকৃতির বিভাসি প্রবেশ করবে। এ বিষয়ক কিছু হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ বিষয়ক অনেক হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ। এ সকল হাদীস থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ইহুদী, খ্রিস্টান, পারস্যের অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য বিভাসি জাতি যেভাবে আসমানী হেদায়াত পাওয়ার পরেও শিরক-কুফর ও বিভাসির মধ্যে নিপত্তি হয়েছিল অবিকল সেভাবে মুসলিম উম্মাহর অনেকে শিরক-কুফর ও বিভাসির মধ্যে নিপত্তি হবে। পার্থক্য এই যে, মুসলিম উম্মাহর মূল দীন বিনষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ এর মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে বিশুদ্ধভাবে হেফায়ত করবেন এবং উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ সর্বদা হক্কের উপর থাকবেন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হ্রবহ অনুসরণ করবেন।

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে শিরক থেকে সতর্ক থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পিপিলিকার পদচারণার মত সন্তর্পনে তা মুমিনের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। এমনকি মুর্তিপূজার মত বিষয়ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে ঘটবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَضْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءٌ دُونِنِ حَوْلٍ ذِي الْخَلْصَةِ

وَكَانَتْ صَنِعًا تَعْبُدُهَا دُونَسْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَلَّةِ

“কিয়ামতের পূর্বেই দাওস গোত্রের নারীদের নিতম ‘যুল খালাসাহ’-র আশেপাশে আন্দোলিত হবে”, যুল খালাসাহ ছিল তাবালায় অবস্থিত দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা যা তারা জাহিলী যুগে ইবাদত করত।^{১৬৪}

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أَمْمَيِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّىٰ تَعْبُدَ

قَبَائِلُ مِنْ أَمْمَيِ الْأُوتَانِ

“কিয়ামতের পূর্বেই আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় মুশারিকদের সাথে যিশে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় ‘ওয়াসান’ ‘পৃজিত দ্রব্যের’ ইবাদত করবে।”^{১৬৫}

ওয়াসান (الوشن) বলতে মুর্তি, প্রতিমা ও যে কোনো প্রকার পৃজিত দ্রব্য বা বস্তু বুঝানো হয়। আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন:

^{১৬৪} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬০৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৩০।

^{১৬৫} আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/৯৭; ইবনু মাজাহ ২/১৩০৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪৯৬। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

أَنْبَتُ النَّبِيُّ ۝ وَقَيْ عَنْقِي صَلَّى مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيًّا اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ

“আমি যখন রাসুলুল্লাহ ৷-এর নিকট আগমন করলাম তখন আমার গলায় ছিল একটি স্বর্ণের ত্রুশ। তিনি আমাকে বলেন, তোমার গলা থেকে এ ‘ওয়াসান’ বা পূজিত বস্তুটি ফেলে দাও।”^{১৬৬}

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুর্তিপূজা, দ্রব্য পূজা, স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বা বস্তু পূজার মত শিরকও মুসলিম উম্মাতের কারো কারো মধ্যে প্রবেশ করবে। বাস্তব অবস্থাও তাই সাক্ষ্য দেয়।

৫. ২. ইহুদী স্বর্ডযন্ত্র ও শীয়া মতবাদ

ক্ষত্রিত মুসলিম সমাজের সকল শিরক, কুফর ও বিভাসির মূল ইহুদী আন্দোলন, যেমন খ্স্টান ধর্মের বিকৃতির মূল কারণ ইহুদী আন্দোলন। ইহুদী পৌল যেমন কাশক, কারামত ইত্যাদির দাবি করে খ্স্টান সেজে ত্রমাঘৰ্যে খ্স্টান ধর্মকে বিকৃত করে, তেমনি আবুল্লাহ ইবনু সাবা মুসলিম সেজে ত্রমাঘৰ্যে মুসলিম বিশ্বাস বিকৃত করে। পৌল যিরুশালেমের হাওয়ারী ও ইসরায়েলীয় খ্স্টানদের মধ্যে সুবিধা করতে না পেরে ‘পরজাতিদের’ নিকট গমন করে। ইবনু সাবা যদীনা-মকায় সুবিধা করতে না পেরে কুফা, বসরা, মিসর ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের নও মুসলিমদের নিকট গমন করে। উভয়েরই দাবি দাওয়ার ভিত্তি ‘অতিভজি’র মাধ্যমে মুক্তি। তবে পৌল খ্স্টধর্মের মূল উৎসগুলি বিকৃত করতে সক্ষম হয়, ফলে মূল খ্স্টধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইবনু সাবা এরপ কিছু করতে সক্ষম হয় না। সে অগণিত যিথ্য কথা প্রচার ও প্রসার করে যায় এবং কুরআন ও সুন্নাহ যেন কেউ গ্রহণ না করে তার ব্যবস্থা করে যায়। তবে সে মূল কুরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত করতে পারে নি।

মুসলিম উম্মাহর সকল শিরক-এর উৎস আবুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ। দ্বাদশ ইমাম পছ্চী শীয়া এবং বিশেষ করে বাতিনী শীয়া, কারামিতা, নুসাইরিয়াহ, দুরুষ ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শিরক-কুফর মুসলিম সমাজে ছাড়িয়েছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভাসি দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। বাগদাদে মূল কেন্দ্রে বনৃ বুওয়াইহিয়া শীয়াগণ ক্ষমতা দখল করে। কারামাতিয়া, বাতিনীয়া, হাশার্শিয়া, ফাতিমীয়া বিভিন্ন শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামান, কুফা, বসরা, নজদ, খুরাসান, ভারত, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরা সাধারণ সরলপ্রাণ ‘সুন্নী’ মুসলিম, সূফী,

^{১৬৬} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২৭৮। তিরমিয়ী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

দরবেশ ও ইলম-হীন নেককার মানুষদের মধ্যেও এদের শিরক প্রসার করতে সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরকের উৎস মূলত এখানেই।

৫. ৪. ৩. ইমানের উৎসের বিচ্ছিন্নতি ও অভিভূতি

ইনশা আল্লাহ, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শীয়া মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল এ মতবাদে আকীদার উৎস সম্পর্কে বিভাজ্ঞি এবং ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে অভিভূতি।

তারা বিশ্বাসের উৎস ওহীর মধ্যে বা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি। বরং ওহীর তাফসীরে তাদের ‘আলিম’ বা ইমামদের ব্যাখ্যাকেই ওহীর মর্যাদা দিয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে ইমাম, ইমামগণের খলীফা বা ফকীহ নামে বিভিন্ন মানুষের মতামতকেও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এভাবে মূলত তারা কুরআন বা ওহীর কার্যকরিতাই অস্থীকার করেছে। তাদের মতে কুরআনের অর্থ বুঝা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কুরআনের সরল যে অর্থ বুঝা যায় তাও কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বরং কুরআনের তাফসীরে ইমামগণ বা তাদের প্রতিনিধি বুজুর্গগণ যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত। এছাড়া তারা প্রচার করে যে, ইমামগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণ কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এ জ্ঞানই মূলত দীনের মূল। তাদের কথা ও ব্যাখ্যার আলোকেই কুরআনের নির্দেশাবিল গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

পাশাপাশি তারা দাবি করে যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ ও তাদের বরপ্রাণি ওলীআল্লাহগণ গাইবী বিষয়ের জ্ঞান ও ক্ষমতা রাখেন। বিশ্ব পরিচালনা ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা তাদেরই হাতে দিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। কাজেই তাদের কাছে প্রার্থনা করা, গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন। তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়া উচিত নয় ...।

স্বভাবতই তারা এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন থেকে কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। সহীহ হাদীস তো দূরের কথা তাদের মধ্যে প্রচলিত হাদীস থেকেও তারা কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন ইমামের নামে প্রচলিত জাল কথা, কুরআনের তাফসীর নামে প্রচলিত বিভিন্ন আলিমের মতামত, বিভিন্ন আলিমের কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদিকে তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। বস্তুত, ইমানের উৎস থেকে একবার মুমিনকে বিচুত করতে পারলে তাকে সবই গেলানো সম্ভব।

শীয়াগণের প্রভাবাধীন সমাজগুলিতে বসবাসরত ‘সুন্নী’ মুসলিমও

তাদের এ সকল আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতার আক্রমনের পরে ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজে ইলম ও আলিমগণের ক্ষমতির কারণে এ সকল শিরকী আকীদা প্রসার লাভ করতে থাকে।

৫. ৪. ৪. একজন শীয়া আলিমের অভিভ্যুক্তি

যুগে যুগে শীয়াগণের মধ্যে, বিশেষত মূলধারার দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়াগণের মধ্যে অনেক আলিমের আবির্ভাব ঘটেছে যারা কুরআন কারীমের উপর নির্ভর করে শীয়াদের বিভিন্ন বিভাস্তি সংশোধন করতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বভাবতই সাধারণ মানুষদের অভিভ্যুক্তি, অজ্ঞতা, পেটপূজারী আলিমদের বিরোধিতা ইত্যাদি কারণে তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। আধুনিক যুগের এমন একজন সুপ্রসিদ্ধ শীয়া আলিম ইমাম ড. মুসা আল-মূসাবী। তিনি তার লেখা ‘আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ’ অর্থাৎ ‘শীয়াগণ ও সংক্ষার’ নামক গ্রন্থে শীয়াদের মধ্যে প্রচলিত অভিভ্যুক্তি ও শিরক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। ‘আল-গুলু’ বা অভিভ্যুক্তি শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বলেন:

অভিভ্যুক্তি বা সীমালজ্বন শুরু হয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় কর্মের মধ্য দিয়ে। বিশ্বাসের সীমালজ্বন হলো একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের বিষয়ে ধারণা করবে যে, সাধারণ মানুষ যা পারে না এমন কারামত, মুজিয়া বা অলৌকিক কাজ সে করতে সক্ষম। যেমন জীবিত বা মৃত কোনো মানুষের বিষয়ে বিশ্বাস করা যে, তিনি অন্য কোনো মানুষের জীবনে দুনিয়াতে বা আবিরাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল এনে দিতে পারেন অথবা ভাল বা মন্দ কোনো প্রভাব রাখতে পারেন।

বিশ্বাসের সীমালজ্বনের মূল সূত্র আমাদের শীয়া মতাবলম্বীদের হাদীসের গ্রন্থাবলি এবং জীবনী ও গল্পমূলক গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখ কৃত গল্প-কাহিনীসমূহ। এ সকল গল্পে আমাদের ইমামগণ, আওলিয়ায়ে কেবাম ও পীর-মাশাইখের নামে অঙ্গুৎ অঙ্গুত অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলিই কর্মের সীমালজ্বনের প্রবণতা তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষেরা ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের কবর-মাথারে যেয়ে তাদের সামনে নিজেদের দাসত্ব, অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করে এবং তাদের নামে নথর-মানত পেশ করে, সরাসরি তাদের নিকট হাজত মেটানোর আবদার পেশ করে এবং আরো অগণিত এ জাতীয় কর্ম করে। এ সকল কর্মের কারণ ও উৎস এ সকল গল্প-কাহিনী।

অভিভ্যুক্তি বা সীমালজ্বনের মানবীয় প্রবণতা অমুসলিমদের মধ্যেও রয়েছে। শীয়া ছাড়া অন্যান্য মুসলিম ফিরকা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তাদের ইমাম ও ওলীগণের ক্ষেত্রে একপ অভিভ্যুক্তি ও সীমালজ্বন বিদ্যমান। ... তবে এ ক্ষেত্রে শীয়াগণই অগ্রগামী এবং তারাই এ সব কিছুর সূচনা করেছে।

এর কারণ হলো আমাদের পুস্তকগুলিতে যাচাই বাছাই না করে সব গল্প-কাহিনী সংকলন করা হয়েছে এবং আমাদের আলিম ও ফকীহগণ এগুলির বিষয়ে কোনো সমালোচনা বা যাচাই বাছাই মূলক কথা বলেন না। ... এ সকল গল্প-কাহিনী বিশুদ্ধ না বানোয়াট সে বিতর্কে না যেয়েও সুনিশ্চিত বলা যায় যে, এগুলি সবই বৃদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক।....

ইমামগণ ও ওলীগণের নামে যে সকল উত্তর কাহিনী বানানো হয়েছে সেগুলি শুনে সন্তানহারা মায়েরও হাসি পায়। ইমাম ও ওলীদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এগুলি বানানো হলেও এগুলি মূলত তাদের মর্যাদাহাস করে।....

আমাদের আলিমগণ ইমামদের ইসমাত বা নিষ্পাপত্তি ও নির্ভুলত্ব দাবি করেন। তাঁরা তাঁদের ইলম লাদুন্নী দাবি করে। আমি বৃদ্ধি না এগুলির মাধ্যমে কিভাবে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? একজন মানুষ কোনো পাপ করার বা ভুল করার ক্ষমতাই রাখে না। অথবা বিনা কষ্টে ইলম লাদুন্নী লাভে কিভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? মানুষের মর্যাদ তো বাড়ে নিজের চেষ্টায় পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের চেষ্টায় ইলম অর্জন করায়। উপরন্তু তাঁরা দাবি করেন যে ইমামগণ সকল গাইবী বিষয়ে জানেন। যে কুরআন মুমিনদের জন্য ন্র ও জ্যোতিরূপে নাযিল হয়েছে সে কুরআনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি গাইব জানতেন না। তাহলে আমাদের মনগুলি কিভাবে সায় দেয় যে, আমাদের ইমামদের জন্য এমন বিশেষণ দাবি করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষণের চেয়েও বড়?

ইমাম ড. মুসাবী বলেন: শীয়াদের মধ্যে ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে যে অতিভিত্তি ও সীমালঙ্ঘন বিদ্যমান তার অন্যতম দিগন্তগুলি নিম্নরূপ:

- (১) তাঁদের ইসমাত (عصمة) বা নিষ্পাপত্তি ও নির্ভুলত্ব দাবি করা
- (২) তাদের ইলম লাদুন্নী দাবি করা
- (৩) তাদের ইলহাম-ইলকা দাবি করা
- (৪) তাদের মুজিয়া ও কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করা
- (৫) তাদের গাইবী ইলম দাবি করা
- (৬) মাধ্যারে চুমু খাওয়া এবং প্রয়োজন মেটানোর আদ্দার করা

তিনি বলেন, সর্বশেষ বিষয়টি অতিভিত্তি ও সীমালঙ্ঘনের ব্যবহারিক ও কর্মগত প্রকাশ। এরা ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের কবরে যেয়ে তাদের নিকট দুনিয়া ও আবিরাতের হাজত-প্রয়োজন পেশ করছে এবং তা মেটানোর আদ্দার করছে, সরাসরি তাদের নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করছে। এছাড়া এ সকল মাজারে চুমু খাওয়ার বিষয়টিও খুবই ব্যাপক। মাজারে চুমু খাওয়ার বিষয়ে আমাদের ফকীহ ও আলিমগণের সাথে আলোচনা ও তর্ক করতে করতে

আমি সত্তাই বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। তারা একই কথা বারবার বলে একুশ কর্মের ওজর পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ত্ত্ব হাজার আসওয়াদ বা কাবাগৃহের কাল পাথরে চুম্ব খাওয়ার সাথে তারা কবর চুম্ব খাওয়ার তুলনা করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাজারে আসওয়াদে চুম্ব খাওয়া হলো বিশেষ স্থানে ও বিশেষ ইবাদতের সুন্নাত, এটি কোনো সাধারণ অনুমোদন বা কর্ম নয়। এ বিষয়ে খলীফা উমার ইবনুল খাত্বাবের (রা) বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি হাজারে আসওয়াদের সামনে দাড়িয়ে বলেন: “ হে পাথর, আমি জানি যে, তুমি পাথর ছাড়া কিছু নও, তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে চুম্বন করেছেন তাই তোমাকে চুম্বন করছি।”

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে তাঁর হস্ত চুম্বন করতে দেন নি। বরং তিনি মুসাফাহা করতেন। এছাড়া আমরা কোথাও পড়ি নি যে, ইমাম আলী (রা) কাউকে তাঁর হস্ত বা পরিধেয় চুম্বন করতে দিয়েছেন। একব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিকের লাঠি চুম্বন করে; কারণ লাঠিটি ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর। এতে রাগন্ধিত হয়ে ইমাম জাফর সাদিক বলেন: “... যা তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না কেন তাকে চুম্বন করছ? ”

ইমাম মুসাবী বলেন: আমি অনেক মুসলিম দেশে আওলিয়ায়ে কেরামের মায়ারে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি যে, আমাদের দেশের শীয়াগণ ইমামগণের মায়ারে যা করে তারাও তথায় একই কর্ম করে। আমি বিশেষ অনেক দেশে খৃস্টানদের গীর্জায় গিয়েছি। সেখানেও দেখেছি যে তারা একইরূপ কর্ম করে। অবিকল একইভাবে তারা ঈসা মাসীহের (আ) প্রতিকৃতি স্পর্শ করে বা মরিয়ম (আ)-এর পায়ের কাছে বসে বরকত গ্রহণ করছে। এরা মহান আল্লাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে ঈসা মসীহ ও মরিয়ম (আ) এর নিকট দুনিয়া ও আধিরাত্রের হাজত পেশ করছে এবং সাহায্য প্রার্থনা করছে। আমি বৌদ্ধদের, শিনটোদের, হিন্দুদের এবং শিখদের মন্দির বা ধর্মালয়ে গিয়েছি। মুসলিম সমাজের মায়ারে এবং খৃস্টানদের গীর্জায় যা দেখেছি এ সকল মন্দিরে বা ধর্মালয়েও তাই দেখেছি। এরা সকলেই একই ভাবে মায়ার বা প্রতিকৃতির সামনে নয়র-মানত বা উৎসর্গ পেশ করছে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার আন্দার করছে। মায়ার-প্রতিকৃতিতে চুম্বন করছে, মাথা ঝুকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে এবং এগুলির সামনে বিনয়, ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে।

এভাবে আমি দেখেছি যে, অলীক কল্পনা ও মিথ্যা ধারণার মধ্যে সাতার কাটছে মানবতা। ...অথচ কুরআন এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। একদিকে বারবার উল্লেখ করেছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কোনো গাইবী ইলম বা ক্ষমতার মালিক নন, অপরদিকে বারবার বলা হয়েছে

যে, একমাত্র মহান আল্লাহই সব জানেন এবং সব ক্ষমতার মালিক এবং কেবলমাত্র তাঁর কাছেই তোমরা সাহায্য চাও। আল্লাহ বলেছেন:

(১) “বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অঙ্গভূত করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গাইব জানতাম তাহলে প্রভৃতি কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোন অঙ্গভূত আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবলমাত্র তয়প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।”^{১৬৭}

(২) “বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাঙ্গারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না য, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় তারই অনুসরণ করি।”^{১৬৮}

(৩) “বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”^{১৬৯}

(৪) “আমার বান্দাগণ যখন আমর সমক্ষে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।”^{১৭০}

(৫) “আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধর্মনী অপেক্ষাও নিকটতর।”^{১৭১}

ড. মুসাবী বলেন, এ ঘৃণ্য অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের (শীয়া সম্প্রদায়ের) আলিমদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং আমাদের পুস্ত কগুলিকে যাচাই বাছাই করে অশুল্ক ও জাল কাহিনীগুলি বাদ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ক বিভিন্ন মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।^{১৭২}

৫. ৪. ৫. শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা

আমরা দেখেছি যে, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ ও প্রকৃত বা কাল্পনিক ওলীগণের ইবাদত করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল বান্দাকে মহান আল্লাহ কিছু ‘ক্ষমতা’ প্রদান করেছেন।

^{১৬৭} সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত।

^{১৬৮} সূরা (৬) আনআম: ৫০ আয়াত। আরো দেখুন (সূরা ১১ হৃদ: ৩১ আয়াত)

^{১৬৯} সূরা (২৭) নাম্ল: ৬৫ আয়াত।

^{১৭০} সূরা (২) বাকারাঃ: ১৮৬ আয়াত।

^{১৭১} সূরা (৫০) কাফ: ১৬ আয়াত।

^{১৭২} ইমাম ড. মুসা আল-মুসাবী, আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসবীহ, পৃ. ১০৯-১২০।

এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হয়। এদের সুপারিশ আল্লাহ শুনেন। এরপ রহবিয়াতের শিরকের ভিত্তিতে তারা ইবাদতের শিরক করত। তারা সাধারণ বিপদ আপদ ও প্রয়োজনে এদেরকে ডাকত, এদের কাছে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করত, এদের নামে মানত, নথর, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি করত, এদের মুর্তি বা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে সাজনা করত, এদের উপর তাওয়াকুল করত, ভয়, ভালবাসা, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা শিরক করত।

ইহুদী মুঢ়যন্ত্রকারী এবং তাদের অনুসারী এ সকল বিভ্রান্ত শীয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা অবিকল একই যুক্তিতে এবং একই প্রকারের শিরক মুসলিম সমাজে প্রচলন করে। তবে স্বভাবতই তারা তাদের অনুসারীদের বুঝান যে, এ সকল বিষয় কখনোই শিরক নয়। বরং এগুলি নবী, নবী বংশের মানুষদের ও ওলীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন মাত্র। আর যারা এভাবে নবী-পরিবার, ইমামগণ বা ওলীগণের বিষয়ে ‘শুভধারণা’ পোষণ করে না, তাদের ডাকে না বা তাদের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি আল্লাহকে ডাকে তারা বেয়াদব ও নবী-বংশের অবমাননাকারী।

ক্রমান্বয়ে সাধারণ মুসলিম সমাজেও এদের যুক্তিশুলি প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। সাধারণত শিরকের দ্বারা যারা জাগতিক ভাবে লাভবান হন সে সকল মানুষেরা এবং অনেক সরলপ্রাণ নেককার মানুষ ও আলিম বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এ সকল শিরককে বৈধতা প্রদান করতে থাকেন। তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাতকে প্রশংসা করেছেন এবং সর্বোত্তম উম্মাত বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত হক্কের উপর থাকবে। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ উম্মাতের মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ করবে না। তৃতীয় অধ্যায়ে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমাকে পৃথিবীর ভাগ্নারসমূহের চাবিশুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিশুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা পৃথিবীর ভাগ্নারসমূহ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিঙ্গ হবে।”

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْنَدَ الْمُصْلِحُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْتَهُمْ

“শয়তান নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে মুসাল্লীগণ তার ইবাদত

করবে। তবে তাদের মধ্যে শক্রতা ও হানাহানি থাকবে।”^{১৭৩}

তারা দাবি করেন যে, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রবেশ করবে না। বক্তৃত এসকল সাধারণ ফর্যালত জাপক আয়াত বা হাদীসের অর্থ সাধারণভাবে উম্মাতের র্যাদাপ্রকাশ করা। উম্মাতের মধ্যে কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক থাকবে না, কেউ কুফরী, শিরক বা নিফাকে লিঙ্গ হবে না এবং কথা এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণ করা একান্তই বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। অন্যান্য অগণিত হাদীসে বিভ্রান্তির কথা জানানো হয়েছে। এছাড়া ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, ভও নবীগণ, মুরতাদগণ ও বিভিন্ন বিভ্রান্ত সম্প্রদায় আরব উপনিষদে ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই শয়তানের ইবাদত করেছে এবং শিরক-কুফরে লিঙ্গ হয়েছে।

শিরকী কর্মগুলির পক্ষে তাদের কেউ বলতে থাকেন যে, আল্লাহকে যতক্ষণ রাবুল আলামীন বা একমাত্র সুষ্ঠা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করছে ততক্ষণ তাকে মুশরিক বলা যায় না। কেউ বলেন, নবী-বংশের ইমামগণ বা ওলীগণকে তো এরা সুষ্ঠা বা প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে না, এরা স্বয়ং কোনো ক্ষমতা রাখেন তাও বলে না। বরং তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর ক্ষমতাতেই তারা ক্ষমতাবান এবং আল্লাহই তাদের এরূপ ক্ষমতা দিয়েছেন। কাজেই এ বিশ্বাস শিরক নয়। আমরা দেখেছি যে, এগুলি যদি শিরক না হয় তবে ইহুদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকদেরকেও মুশরিক বলা যায় না। তারা সুস্পষ্টভাবেই মহান আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত এবং শরীকগণকে আল্লাহই ক্ষমতা দিয়েছেন বলে দাবি করত। কিন্তু কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রচলিত বিভিন্ন মতামতের প্রাধান্যের কারণে অনেকেই এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনেকে বলেছেন যে, এরা যখন ইমামগণ বা ওলীগণকে ডাকে বা তাদের কাছে গাইবী সাহায্য চায় তখন মূলত আল্লাহর কাছেই চায়, এ সকল নেক ঘানুমের নাম নিয়ে মূলত এদের ওসীলা দিয়ে তারা আল্লাহর কাছে চায়। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আর কারো কাছে চাওয়ার মধ্যে আসমান ও জরিনের পার্থক্য। কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ, আলী (রা) বা অমুকের ওসীলায় আপনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন, তবে সে মূলত আল্লাহর নিকটেই চাচ্ছে, ওসীলা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। আর যে বলছে, হে আলী, হে আবুল খামীস, হে আবুসামা, হে অমুক আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন,

^{১৭৩} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৬৬।

সে মূলত তার আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করছে তার ইবাদত করছে।

৫. ৬. সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ

সবচেয়ে বড় কথা যে, এ সকল বিশ্বাস ও কর্মের প্রয়োজন কী? কুরআনে কি এরূপ বিশ্বাস বা কর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন? কুরআনে ও হাদীসে যতটুকু আছে তার অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার কী? সাহাবীগণ কি এরূপ করতেন? নবী, ওলী, কারামত, আহলু বাইত ইত্যাদির বিষয়ে সাহাবীগণ কি বলতেন? কি করতেন? কিভাবে তাঁরা ভক্তি প্রকাশ করতেন? অবিকল তাঁদের মত বিশ্বাস ও কর্ম নিয়ে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সকল কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়? যদি সম্ভব হয় তবে অন্য কিছুর প্রয়োজন কী?

বক্তৃত, মুঘলের নাজাতের একটিই পথ, তা হলো, কুরআন ও সুন্নাতের পথে ফিরে আসা। বিশ্বাসে, কর্মে ও কথায় সুন্নাত ও সাহাবীগণের হ্বহু অনুসরণই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ। সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ৭. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবীর অভিযন্ত

শীয় সমাজগুলিতে এবং অন্যান্য সমাজে প্রচলিত শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে শীয়া ইমাম ড. মুসা আল-মুসাবীর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। ‘সুন্নী’ সমাজগুলির মধ্যে প্রচলিত শিরকের উন্নেষ ও প্রচলন সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভীর (রাহ) কিছু বক্তব্য আমরা আলোচনা করব।

তিনি তাঁরা ‘আল-ফাওয়ুল কাবীর’ গ্রন্থে তিনি আরবের মুশরিকদের শিরক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: “শিরক হলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোনো বিশেষণ বা গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করা। যেমন নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টিজগতের পরিচালনার ক্ষমতা, যে ক্ষমতাকে ‘হও বললে হয়ে যাওয়া’ বলা হয়, অথবা নিজস্ব ইলম বা জ্ঞান, যে জ্ঞান চেষ্টা করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত নয়, জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বা স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমেও প্রাপ্ত নয়, বা অনুরূপ ইন্দ্রিয়গায় বা আত্মাক কোনো সূত্র বা মাধ্যম ছাড়া নিজস্ব সন্তানগত জ্ঞান, অথবা অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার ক্ষমতা, অথবা কারো উপর অলৌকিক ক্রোধ বা অভিশাপের ক্ষমতা, যে ক্রোধ বা অভিশাপের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র, অসুস্থ বা হতভাগ্য হয়ে যাবে, অথবা কোনো ব্যক্তিকে করুণা করার বা তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা যে করুণা বা সন্তুষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধনী, সুস্থ বা সৌভাগ্যবান

ও নিরাপদ হয়ে যাবে। এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বিহুৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো শরীক আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই। তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক করত। কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন।

... এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাণী বান্দাদের নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের করুণিয়াতের ওসীলা হতে পারে। আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা'আত মহান আল্লাহর দরবারে করুণিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। হে পাঠক, মুশরিকদের আকীদা ও কর্ম সম্পর্কে এ সকল বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে যদি আপনি নিশ্চিত হতে চান তবে এ যুগের কুসংস্কারগত্ত ও বিভ্রান্ত মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। বিশেষ করে যার মুসলিম দেশের প্রান্তে বা সীমান্তে বসবাস করে। লক্ষ্য করে দেখুন যে, ওলী বা বেলায়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? তারা প্রাচীন ওলীগণের বেলায়াতের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বর্তমানে আর এভাবে ওলী হওয়া তারা সম্ভব বলে মনে করে না। তারা কবর ও ওলীদের দরজায় যেয়ে পড়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক, বিদ'আত ও ভিত্তিহীন কুসংস্কারের মধ্যে তারা নিম্ন।

আরবের মুশরিকগণ যেভাবে ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিকৃত করেছিল এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করেছিল অনুরূপ বিকৃতি ও তুলনার মধ্যে এরা আকর্ষ নিমজ্জিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করবে।”^{১৭৪} এ হাদীসটি এদের বিষয়ে পুরোপুরিই খাটে। পূর্ববর্তী মুশরিকগণ যত প্রকারের বিভ্রান্তি বা ফিতনায় নিপত্তি হয়েছিল সেগুলির সবই মুসলিম নামধারী কোনো না কোনা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান। তারা এসকল শিরকের গভীরে নিমজ্জিত রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।”^{১৭৫}

^{১৭৪} হাদীসটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

^{১৭৫} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওয়ুল কাবীর, পৃ. ২৪-২৬।

এরপর তিনি কুরআনের আলোকে ইহুদীদের বিভাসি আলোচনার পর বলেন: “সর্বাবস্থায়, পাঠক যদি ইহুদীদের এ সকল বিভাসির নয়না মুসলিম উম্মাহর মধ্য দেখতে চান তবে অসৎ আলিমগণ এবং দুনিয়ার স্বার্থের অনুসন্ধানকারীদের দিকে তাকান। পিতা-পিতামহদের অঙ্গ অনুকরণ এদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়কর্ম। মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর মহান রাসূলের $\ddot{\text{س}}$ সুন্নাত এরা ততটা গুরুত্ব দেয় না। আলিমগণ নিজস্ব মতামত, যুক্তিতর্ক, অকারণ বাড়াবাড়ি ও গভীরতার নামে সে সকল মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলিই তাদের দলিল, অথচ কুরআন ও সুন্নাতে এ সকল মতামতের কোনোরূপ সূত্র বা ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরা রাসূলুল্লাহ $\ddot{\text{س}}$ -এর প্রমাণিত ও সহীহ বাণী বাদ দিয়ে জাল, বানোয়াট বা মাউয়ু হাদীসের উপর নির্ভর করে এবং ভিত্তিহীন বাজে ব্যাখ্যা ও তাফসীরের পিছনে দৌড়ায়।”^{১৭৬}

এরপর তিনি কুরআনের আলোকে খৃষ্টানদের বিভাসি আলোচনা করে বলেন: “আপনি যদি এ সকল বিভাস পথভৰ্তদের নয়না নিজের কাওমের মধ্যে দেখতে চান তবে আপনার সমাজের ‘ওলী-আল্লাহ’দের সন্তানদের অনেকের দিকে তাকান। তাদের বিষয়ে এদের ধারণা ও আকীদা পর্যালোচনা করুন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কোন্ পর্যায়ে এরা পৌছেছে। ‘আর আচিরেই জালিমগণ জানবে যে, তাদের কি পরিণতি হবে’^{১৭৭}।”^{১৭৮}

৫. ৫. মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-কুফর

ইতোপূর্বে আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎকালীন আরব ও ইহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত কুবৃবিয়্যাত ও উলৃহিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এরপর আর সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকে না। কারণ এগুলির আলোকে সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা খুবই সহজ। তা সত্ত্বেও এখানে শীয়াগণ এবং সমমনা মানুষদের প্রচারিত বিভিন্ন শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক ও কুরুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

৫. ৫. ১. কুবৃবিয়্যাতের শিরক

আমরা ইতোপূর্বে কুবৃবিয়্যাতের তাওহীদ এবং কুবৃবিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কুবৃবিয়্যাতের বা প্রতিপালনের

^{১৭৬} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওয়ুল কাবীর, পৃ. ৩৪।

^{১৭৭} সূরা (২৬) ও’আরা: ২২৭ আয়াত।

^{১৭৮} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওয়ুল কাবীর, পৃ. ৩৬।

তাওহীদের মূল হলো, যে এ বিশ্ব পরিচালনা, সৃষ্টি, বিনাশ, ধ্বংস, রিয়্ক, সম্পদ, সুস্থিতা, অসুস্থিতা, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সকল কিছুর ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহরই । এ ক্ষমতায় কেউ তার শরীক নয় এবং তিনি নিজেও কাউকে কখনো তাঁর এ ক্ষমতায় শরীক করেন নি । আল্লাহর নবীগণ, ওলীগণ, ফিরিশতাগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা । আল্লাহ এ সকল বান্দাকে ভালবাসেন, দয়া করে তাঁদের দু'আ ইচ্ছা করলে কবুল করেন, তাঁদেরকে ইচ্ছা করলে সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন, ইচ্ছ করলে তাঁদের সুপারিশ কবুল করতে পারেন, তবে কাউকে কোনো ক্ষমতা দেন নি, তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই । আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদেরকে কোনো ক্ষমতা দেন নি । আর কোনো মানুষকে তিনি কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব কিছুই দেন নি ।

আর এ পর্যায়ের শিরকের মূল হলো মুজিয়া, কারামত, শাফা'আত বিষয়ক আয়াত, আল্লাহর মাহবুবিয়্যাত বিষয়ক কথা ইত্যাদিকে পূজি করে একথা মনে করা যে, আল্লাহর কোনো বান্দা কোনো বিশেষ কর্মের কারণে বা বিশেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহ থেকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা, বিশ্পরিচালনায় হস্তক্ষেপ বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা লাভ করেছেন, করেন বা করবেন । এ বিষয়ে বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও যুক্তি এবং কুরআন-হাদীসের বক্তব্য আমরা দেখেছি । এখন আমরা এ বিষয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু বিষয় আলোচনা করব ।

৫. ৫. ১. ১. ক্ষমতা বিষয়ক শিরক

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহানামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থিতা, অসুস্থিতা, রিয়্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের শিরক । আরবের মুশরিকগণ এ সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করত, তবে আল্লাহ তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে এরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়েছে বলে বিশ্বাস করত । শীয়াদের মধ্যে আলী (রা), তাঁর বংশের ইমামগণ, ইমামগণের খলীফাগণ, তাদের মধ্যকার ওলী-আল্লাহগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে এমন অগণিত উন্নত কল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, এ সকল মানুষ এরূপ কিছু ক্ষমতা রাখেন ।

শীয়াদের প্রভাবে সুন্নী সমাজেও একপ শিরকী বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরের পরে, কুসেড ও তাতার আক্রমণ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়গুলিতে লেখা আওলিয়াগণের জীবনী, তাঁদের নামে প্রচলিত অনেক কথাবার্তা থেকে একপ অনেক বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের মধ্যে জন্মেছে। মূলত এ সকল গল্প, কাহিনী ও এ সকল যুগের কোনো কোনো আলিমের কথাই এ সকল শিরকের পক্ষের ‘দলীল’।

আমরা জানি যে, ইবাদতের শিরক বা কর্মের শিরকের উৎস হলো কুবুবিয়াতের শিরক বা আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো কল্যাণ বা অকল্যানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। একপ বিশ্বাসই মানুষকে একপ ক্ষমতাধরকে ইবাদত করতে বা তাঁকে ‘চূড়ান্ত ও অলৌকিকভাবে ভঙ্গি করতে ও তাঁর কাছে নিজের চূড়ান্ত বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ’ করতে উন্মুক্ত করে। এজন্য কুরআন কারীমে এ বিষয়ক বিভ্রান্তি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দূর করা হয়েছে। বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিষয়েও বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁর দায়িত্ব প্রচার ও দীন প্রতিষ্ঠা। কারো হেদায়াত, ভাল, মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির কোনোরূপ দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতার ঝামেলা মহান আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেন নি। কুরআন কারীমের এ বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি।

কুরআন কারীম ও তদসঙ্গে প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলির পাঠ ও অধ্যয়নের অভাবই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একপ শিরকের প্রসারের মূল কারণ। এজন্য এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে যারা প্রচার করেন তারা কখনোই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ থেকে একটি সুস্পষ্ট দ্ব্যুর্থীন বক্তব্যও পেশ করতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ অমুক আয়াতে বলেছেন বা অমুক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে বিশ্ব পরিচালনা বা কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা প্রদান করেন বা করেছেন, অথবা অমুক পর্যায়ে যে ব্যক্তিই পৌছাবে সে ব্যক্তিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অমুক পর্যায়ের ক্ষমতা লাভ করবে....। এ বিষয়ে যা কিছু ‘দলীল’ পেশ করা হয় সবই ইসলামের বরকতময় যুগগুলির পরে শীয়াদের প্রভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জনশ্রুতি, গল্প-কাহিনী, বিভিন্ন বুজুর্গের নামে প্রচারিত কথাবার্তা ও পরবর্তী যুগগুলির কোনো কোনো আলিমের মতামত যাত্র, যা সবই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে,

অসংখ্য সহীহ মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্যুর্থইন বজ্জব্যের বিপরীতে কথিত এ সকল ভিত্তিহীন বানোয়াট কথার উদ্ধৃতি দেওয়া, আলোচনা করা বা খণ্ডন করাও পাগলামি বলে মনে হয়। যেমন তারা বলেন: “আল্লাহ বলেছেন: হে মুহাম্মাদ (ﷺ), সবাই আমার স্তুষ্টি তালাশ করে, আর আমি আপনার স্তুষ্টি তালাশ করি, আমি আরশ থেকে ফারাশ পর্যন্ত আমার সকল রাজত্ব আপনার জন্য উৎসর্গ করেছি। আপনার হৃকম চন্দ্র ও সূর্যের উপর কার্যকর; আপনার পুত্র আব্দুল কাদির জীলানীকে সালাম না দিয়ে সূর্য উদিত হতে পারে না। ...।”

সম্মানিত পাঠক, এ কথাগুলির বিষয়ে আপনি কী বলবেন? মহান আল্লাহ এ কথাগুলি বলেছেন তা আমরা কিভাবে জানলাম? আমরা জানি যে, কাশক, ইলহাম, শ্বপ্ন ইত্যাদি ইসলামের কোনো দলীল নয় এবং আকীদার ভিত্তি নয়। নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে ছাড়া আল্লাহর কোনো কথা আমরা জানতে পরি না। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপরে যে ওহী নায়িল করেছেন- কুরআন ও হাদীস- তার মধ্যে এ কথা কোথাও নেই। তাহলে কি তাঁরা মনে করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কোনো নবীর নিকট এ কথাগুলি আল্লাহ ওহী করে জানিয়েছিলেন? না হলে আমরা কিভাবে জানলাম? বিশেষত কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ যা কিছু বলেছেন সব কিছুর সাথে সাংঘর্ষিক এ কথাগুলি। কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর হৃকুমে চাঁদ-সূর্য ও সকল কিছু চলে, যহাবিশ্বের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে ভালমন্দ বা বিশ্ব পরিচালনার কোনো ঝামেলা প্রদান করেন নি। এমনকি বদদোয়া করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এ সকল কথার বিপরীতে এ কথাগুলি মহান আল্লাহর নামে যারা বলতে পারেন তাঁদের সাথে আপনি কি কথা বলবেন? এ বিষয়ে ও অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁদের সকল বজ্জব্য ও সকল দলীলেরই অবস্থা এই।

এমনকি কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকেও এ সকল কথার কোনোরূপ সামান্যতম সমর্থন পাওয়া যায় না। মুসলিম উম্মাহর ফিতনার যুগে কোনো ভাল বা খারাপ মানুষ এগুলি বলেছেন। এর বিপরীত, এর সাথে সাংঘর্ষিক, এগুলি খণ্ডন করে, এগুলি সমর্থন করে অথবা এর চেয়েও অনেক বাড়াবাঢ়ি কথা তাঁদের মত আরো অনেক ভাল ও মন্দ মানুষে বলেছেন। যারা বলেছেন তাঁদের জন্য আমরা সুধারণা পোষণ করতে পারি, ওজর সম্ভান করতে পারি, কিন্তু কখনোই কুরআন ও হাদীসের অগণিত সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এ সকল কথাকে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি বানাতে পরি না।

৫. ৫. ১. ২. ইলম বিষয়ক শিরক

ইলমুল গাইবের দাবি কখন ও কিভাবে শিরক বা কুফর বলে গণ্য তা আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। ইহুদী আন্দুল্লাহ বিনু সাবা এবং তাঁর অনুসারীদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে শীয়াগণ আলী (রা), তাঁর বংশের ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইথের বিষয়ে ইলমুল গাইবের বিশ্বাস পোষণ করে। এ বিষয়ে শীয়া ইমাম ড. মুসাবীর বক্তব্য আমরা উপরে দেখেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলম বিষয়ক আলোচনায় এবং এ অধ্যায়ে রূবুবিয়াতের শিরক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করেছি। এ সকল সুস্পষ্ট ও দ্যৰ্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে শীয়াগণ এবং তাদের সমমন্বয়ে ও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত সুন্নী সমাজের এ শ্রেণীর মানুষেরা যা কিছু বলেন তা সবই উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্যের মত আজগুবি ও বানোয়াট কথাবার্তা, গল্প কাহিনী, কাশক বা স্বপ্নের কথা এবং কোনো কোনো আলিমের মতামত ও ব্যাখ্যা মাত্র। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট অন্য কোনো নির্দেশনা আলোচনা করা ও সমন্বয় করা যায়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে এরূপ গল্প-কাহিনী, স্বপ্ন, কাশক বা আলিমগণের মতামত আলোচনা করা মূলত কুরআন-হাদীসের সাথে বেয়াদবী এবং সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলমুল গাইব আছে বলে বিশ্বাস করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন:

تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر، لقوله تعالى (فَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ)...

“ভবিষ্যদ্বকা বা গণক-জ্যোতিষী গাইবী বিষয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফ্রী; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন^{১৯}: “বল: আল্লাহ ব্যতীয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”^{২০}

তিনি আরো বলেন:

اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علمهم الله أحياناً. وذكر الحنفية تصرحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي ﷺ بعلم الغيب؛

^{১৯} সূরা (২৭) নাম্বল: ৬৫ আয়াত।

^{২০} মোল্লা আলী কারী: শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৪৯।

لِمَعْرِضَةِ قُولِهِ تَعَالَى: (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِإِلَهِ)

“জেনে রাখ, নবীগণ (আ) অদ্য বা গাইবী বিষয়ে আল্লাহ কথনো কথনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই জানতেন না। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ করা কুফরী, কারণ তা আল্লাহর এ কথার সাথে সাংঘর্ষিক^{১৮১}: “বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”^{১৮২}

৫. ৫. ১. ৩. ওসীলা বিষয়ক শিরক

ওসীলা বিষয়ে অনেক বিভাগি ও অস্পষ্টতা সমাজে বিদ্যমান। ওসীলা কথনো ইসলাম নির্দেশিত বা সুন্নাত-সম্মত কর্ম, কথনো সুন্নাত বহির্ভূত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম এবং কথনো তা আল্লাহর রূবীয়ত্বাতে বা উলুহিয়ত্বাতে শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। এজন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান শুণাবলি, তাঁর পবিত্র নামসমূহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমানের ওসীলা দিয়ে সকাতরে আর্জি করি যে, তিনি যেন সঠিকভাবে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার এবং ব্যাখ্যা করার তাওফীক আয়াকে প্রদান করেন।

‘ওসীলা’ শব্দটির বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা এর অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন। ভাষাতত্ত্বের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে। সময়ের আবর্তনের কারণে একই ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আবার এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গমনের কারণেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন বাংলা ভাষায় এক শতাব্দী আগে ‘সন্দেশ’ শব্দটির অর্থ ছিল সংবাদ। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন। কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত আরবী ভাষায় ‘লাবান’ অর্থ দুধ। কিন্তু বর্তমানে আরব দেশে ‘লাবান’ অর্থ ঘোল।

ভাষাতত্ত্বের কারণে অর্থের পরিবর্তন খুবই বেশি। আরবীতে ‘জিন্স’ অর্থ শ্রেণী বা লিঙ্গ, কিন্তু বাংলায় ‘জিনিস’ অর্থ এগুলির কিছুই নয়, বরং বাংলায় এর অর্থ দ্রুব্য বা বস্তু। আরবীতে ও ফাসীতে নেশা বা নাশওয়া অর্থ ‘মাতলামী’ বা মাদকতা। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অর্থ মাদকতা হয় আবার অভ্যন্তরালে হয়। একারণে অনেক সময় আমরা অস্পষ্টতার মধ্যে পড়ে যায়। কেউ বলেন, নেশা হারাম। উন্নরে অন্যে বলেন, ভাত, চা ইত্যাদিও তো

^{১৮১} সূরা (২৭) নাম্ব্র: ৬৫ আয়াত।

^{১৮২} মোল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫০।

নেশা? বস্তুত বাংলা ‘নেশা’ বা অভ্যন্তর হারাম নয়, বরং ফার্সী নেশা বা মাতলামী ও মাদকতা হারাম। অভ্যন্তর হারাম বা হালাল হবে অভ্যাসের বিষয়ের বিধান অনুসারে, আর মাদকতা সর্বাবস্থায় হারাম।

৫. ৫. ১. ৩. কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ওসীলা

‘ওসীলা’ শব্দটির অর্থের মধ্যে একটি বিবর্তন ঘটার কারণে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। ফলে সুন্নাত ও ইসলাম সম্মত ব্যবহার থেকে ওসীলা শব্দটি কখনো কখনো শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। এজন্য এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত প্রাচীন আরবী ভাষায় ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য। পরবর্তীকালে আরবী ভাষাতেই ওসীলা শব্দটির অর্থ হয় ‘যদ্বারা নৈকট্য ঢাওয়া হয়’ বা ‘নৈকট্যের উপকরণ’। আধুনিক যুগে আরবীতে এবং বিশেষ করে বাংলায় ওসীলা শব্দটি ‘উপকরণ’, মধ্যস্থতা, যত্ন, হাতিয়ার, দৃত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের পরিবর্তনের কারণে শব্দটির বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন: “ওয়াও, সীন ও লাম: দুটি পরম্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশ করে: প্রথম অর্থ: আগ্রহ ও তালাশ। ... দ্বিতীয় অর্থ চুরি করা।”^{১৮৩}

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ও ভাষাবিদ রাগিব ইসপাহানী (৫০৭) বলেন: “ওসীলা: অর্থ আগ্রহের সাথে কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘তোমরা তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর’। আল্লাহর দিকে ওসীলার হাকীকাত হলো ইলম ও ইবাদতের মাধ্যমে এবং শরীয়তের মর্যাদাময় বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ হলো নেক আমল বা নৈকট্য।”^{১৮৪}

আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, মহান আল্লাহ তাঁকে ‘ওসীলা’ প্রদান করবেন। স্বত্বাবতই এখানে ওসীলা অর্থ উপকরণ বা মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং ওসীলা অর্থ নৈকট্য। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ নৈকট্য ও নিকটতম মর্তবা প্রদান করবেন।

‘ওসীলা’ শব্দটি কুরআনে দু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلِ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْكُونُ كَشْفَ الضرُّ عَنْكُمْ وَلَا

^{১৮৩} ইবনু ফারিস, মুজামু মাকায়িসুল লুগাত ৬/১১০।

^{১৮৪} রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত পৃ. ৫২৩-৫২৪।

تَخْوِيلًا أَوْنَكَ الَّذِينَ يَذْعُونَ بِيَتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبٌ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

“বল, ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।’ তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।”^{১৮৫}

এখানে আরবী জাত পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, ‘তারা ওসীলা সন্ধান করে কে কত নিকটতর’, এ কথটির মধ্যে প্রথমে ‘ওসীলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরে ‘কুরবাহ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে কুরআনের ব্যবহার থেকেই সুস্পষ্ট যে, ওসীলা ও ‘কুরবাহ’ শব্দদ্বয় সমার্থক এবং ওসীলা সন্ধানের অর্থ নৈকট্য লাভের চেষ্টা।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর এবং তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”^{১৮৬}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (৩১০ হি) বলেন: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَقُولُ وَاطْلِبُوا الْقَرْبَةَ إِلَيْهِ وَمَعْنَاهُ بِمَا يُرْضِيهِ وَالْوَسِيلَةُ
হি ফعلিয়া মন কুল কানাল তুস্লত এ ফলন বক্তা বক্তা মুনাহ বিপ্রিয় নুরিয়ত এ হি

“তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর। এর অর্থ: তাঁর দিকে নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করে। ওসীলা শব্দটি ‘তাওয়াস-সালতু’ কথা থেকে ‘ফার্যালাহ’ ওয়নে গৃহীত ইসম। বলা হয় ‘তাওয়াস-সালতু ইলা ফুলান বি-কায়া, অর্থাৎ আমি অমুক কাজ করে অমুকে নিকটবর্তী হয়েছি।”^{১৮৭}

এরপর ইমাম তাবারী বিভিন্ন জাহিলী কবিতা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে, ওসীলা শব্দটির অর্থ নৈকট্য। অতঃপর তিনি সাহাবী ও তাবিয়ীগণ

^{১৮৫} সূরা (১৭) ইসরায়েলী বানী ইসরাইল: ৫৬-৫৭ আয়াত।

^{১৮৬} সূরা (৫) মায়িদা: ৩৫ আয়াত।

^{১৮৭} তাবারী, তাফসীর (আমিউল বায়ান) ৬/২২৬।

থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের মতামত সনদ সহ উদ্ধৃত করেন। সাহাবী আবুল্ফাহ ইবনু আকবাস (রা), তাবিয়ী আবু ওয়ায়িল, আতা ইবনু আবি রাবাহ, কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ, মুজাহিদ ইবনু জাবর, হাসান বাসরী, আবুল্ফাহ ইবনু কাসীর, সুনী আল-কাবীর, ইবনু যাইদ, প্রমুখ মুফাস্সির থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, সকলেই বলেছেন 'তাঁর ওসীলা সন্ধান কর' অর্থ তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য ও রেয়ামন্দিমূলক নেককর্ম করে তাঁর নৈকট্য ও মহবত লাভে সচেষ্ট হও।^{১৮৮}

এ আয়াতটি মূলত মুমিনের সফলতার মূল কর্মশূলি বর্ণনা করেছে: (১) ঈমান, (২) তাকওয়া, (৩) অতিরিক্ত নেককর্ম ও (৪) জিহাদ। নিজের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত অর্জন করা। তাকওয়া মূলত ফরয পালন ও হারাম বর্জনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এরপর অতিরিক্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রতিযোগিতা করতে হবে। সর্বোপরি সমাজ, জাতি ও মানবতার জন্য দীন প্রচার, প্রসার, সংরক্ষন ও জিহাদ করতে হবে। ইতোপূর্বে আমরা বেলায়াত সংক্রান্ত হাদীসে বিষয়টি দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত লাভ হয়। আর অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়াত, নৈকট্য বা ওসীলা লাভের বা মাহবুবিয়াত অর্জনের ক্ষেত্রে মুমিনগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

উপরের বিষয়গুলি খুবই স্পষ্ট এবং এ অর্থে বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বা ওসীলা সন্ধান করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু পরবর্তীকালে, ওসীলা শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন মতভেদ বা বিভাসি সৃষ্টি করে। সেগুলির অন্যতম: (১) দু'আর মধ্যে 'ওসীলা', (২) পীর-মাশাইখের 'ওসীলা' ও (৩) উপকরণ বা মধ্যস্থতাকারী অর্থে ওসীলা।

৫. ৫. ১. ৩. ২. দু'আর মধ্যে ওসীলা

মহান আল্লাহর কাছে দু'আর সময় কোনো কিছুর 'দোহাই' দেওয়াকে 'ওসীলা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দু'আর মধ্যে 'বা' (وَ) অব্যয়টি ব্যবহার করে দু'আ চাওয়া বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে। এ অব্যয়টির অর্থ দ্বারা, সাহায্যে বা কারণে। যেমন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আয় বলা হয়েছে: হে আল্লাহ, আপনার মহান নামগুলির দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন। আমি আপনার নামগুলি দ্বারা আপনার কাছে দু'আ করছি। আমার অমুক কর্মের দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন... ইত্যাদি। তবে এ অর্থে "হে আল্লাহ, অমুকের

^{১৮৮} তাবারী, তাফসীর ৬/২২৬-২২৭ ও ১৫/১০৪-১০৬।

ওসীলায় (بوسيلة) কথাটি কোনো হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি। এ অর্থে আরবীতে ‘বিহাকি’ অর্থাৎ ‘অমুক কর্ম বা ব্যক্তির অধিকারের কারণে বা দ্বারা’ এবং ‘বিলুরমাতি’ অর্থাৎ ‘অমুকের সম্মানে’ কথাও ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হিসেবে এক্ষেত্রে ‘ওসীলা’ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় কোনো কিছুর দোহাই বা বা ওসীলা দেওয়া কয়েকভাবে হতে পারে:

(১) মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির দোহাই দেওয়া।

(২) নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া।

(৩) কারো দু'আর দোহাই দেওয়া।

(৪) কারো ব্যক্তিগত মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া।

প্রথমত: মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির দোহাই দেওয়া।
যেমন বলা যে, হে আল্লাহ, আপনার রহমান নামের শুণে, বা গাফ্ফার নামের ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। এরপ দোহাই দেওয়া কুরআন-হাদীসের নির্দেশ এবং দু'আ কবুল হওয়ার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

“এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ; কাজেই তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে।”^{১৮৯}

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০’র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{১৯০}

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো মাসন্নূন দু'আগুলি পাঠ করলে আমরা সেগুলির মধ্যে এরপ অনেক দু'আ পাই, যাতে আল্লাহর পবিত্র নাম বা গুণাবলির দোহাই দিয়ে দু'আ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এরপ বিশেষ নাম বা গুণাবলির দোহাই দিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এরপ একটি দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন:

أَسْأَلُكُ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِّيَّتْ بِهِ نَفْسِكَ أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْتَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

^{১৮৯} সূরা আ'রাফ : ১৮০।

^{১৯০} বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৮১; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬৩।

আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সকল নাম ধরে বা নামের ওসীলা দিয়ে, যে নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাখিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন, অথবা যে নাম আপনি গাইবী জ্ঞানে আপনার একান্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (সকল নামের ওসীলায় আমি আপনার কাছে চাচ্ছি যে,) ...।^{১৫১}

আমার লেখা ‘রাহে বেলায়ত’ পুস্তকে পাঠক এরূপ অনেক মাসন্ত দু’আ দেখতে পাবেন।

দ্বিতীয়ত, নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া

নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই বা ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু’আ করলে কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতীত যুগের তিনজন মানুষ বিজন পথে চলতে চলতে বৃষ্টির কারণে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রবল বর্ষণে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে গুহাটি তাদের জীবন্ত করে পরিণত হয়। এ ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তারা দু’আ করতে মনস্ত করেন। তারা একে অপরকে বলেন:

اَدْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ مُلْتَمِسٌ

“জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ যে আমল করেছ তাদ্বারা (তার ওসীলা দিয়ে) আল্লাহর কাছে দু’আ কর বা তার দোহাই দিয়ে আল্লাহকে ডাক।”

তখন তাদের একজন তার জীবনে সন্তানদের কষ্ট উপেক্ষা করে পিতামাতার খেদমতের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُمِّي فَعُلِّمْنِي بِذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنِّي فُرْجَةً نَرَى
مِنْهَا السَّمَاءَ

“হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেয়ামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে আপনি পাথরটি একটু সরিয়ে দেন যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই।”

ঘনান আল্লাহ তৎক্ষণাত তার দু’আ কবুল করে পাথরটি একটু সরিয়ে দেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর এক সুন্দরী প্রেমিকার সাথে ব্যভিচারের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে পাপ পরিত্যাগ করার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন:

^{১৫১} ইবনু হিবান, আস-সহীহ ৩/২৫৩, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৯০, আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৩৯১, ৪৫২, হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ১০/১৩৬, ১৮৬।

فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُخْ عَنَّا فُرْجَةً

“হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেয়ামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে (ওসীলায়) আপনি পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিন।”

মহান আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি দু-ত্তীয়াংশ সরে যায়। তখন ত্তীয় ব্যক্তি নিজের অসুবিধা ও স্বার্থ নষ্ট করে একজন শ্রমিকের বেতন ও আমানত পরিপূর্ণরূপে আদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُخْ عَنَا

“হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেয়ামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে (ওসীলায়) আপনি পাথরটি সরিয়ে দিন।”^{১৯২}

আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি একেবারে সরে যায়।^{১৯৩}

নিজের ঈমান, মহৱত ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়াও এ প্রকারের ওসীলা প্রদান। বুরাইদাহ আসলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আ করছে নিম্নের কথা দিয়ে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأْنِي أَشْهَدُ أَنِّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

“হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, এ ওসীলায় (এদ্বারা) যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মাঝে নেই। আপনিই একক, অমৃতাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।”

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ
وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

“যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, নিচয় এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমু আ'য়ম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।”^{১৯৪}

^{১৯২} বুখারী, আস-সহীহ ২/৮২১, ৩/১২১৮, ৫/২২২৮; যাসলিয়, আস-সহীহ ৪/২০১৯।

^{১৯৩} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫১৫; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৭৯; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৬৭; ইবনু হিব্রান, আস-সহীহ ৩/১৭৪, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৮৩, ৬৮৪, আলবানী, সহীহ সুনানুত তিরমিয়ী ৩/১৬৩। হাদীসটি সহীহ।

এখানে আমরা দেখছি যে, ঈমান ও শাহাদতের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে একুশ দু'আ করা যায়, যেমন: “হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমি অমুক কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, সেই ওসীলায় আমার প্রার্থনা কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য নেক আমল নেই যে, যার ওসীলা দিয়ে আমি আপনার পবিত্র দরবারে দু'আ চাইব। শুধুমাত্র আপনার হাবীব নবীয়ে মুসতাফা ঝুঁক্কি-এর নামটি ঈমান নিয়ে মুখে নিয়েছি, এর ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমার কিছুই নেই, শুধুমাত্র আপনার নবীয়ে আকরাম ঝুঁক্কি-এর সুন্নাতের মহবত্তুকু হৃদয়ে আছে, সেই ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি কিছুই আমল করতে পারিনি, তবে আপনার পথে অগ্রসর ও আমলকারী নেককার বান্দাদেরকে আপনারই ওয়াস্তে মহবত করি, তাদের পথে চলতে চাই, আপনি সেই ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন...।” ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: কারো দু'আর দোহাই দেওয়া

কারো দু'আর ওসীলা দেওয়ার অর্থ এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ, অমুক আমার জন্য দু'আ করেছেন, আপনি আমার বিষয়ে তাঁর দু'আ কবুল করে আমার হাজত পূরণ করে দিন। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, নেককার মুস্তাকী মুমিনদের নিকট দু'আ চাওয়া সুন্নাত সম্মত রীতি। একুশ কারো নিকট দু'আ চাওয়ার পরে মহান আল্লাহর দরবারে উক্ত নেককার ব্যক্তির দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার বিষয়টি একটি হাদীস থেকে জানা যায়। উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন,

أَنْ رَجُلًا ضَرَبَرِ الْبَصَرَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِنِي قَالَ إِنْ
شَتَّى دَعَوْتُ وَإِنْ شَتَّى صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُمْ قَالَ فَامْرَأْهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ
فِيْخَسِنْ وَضْوَءَهُ (فِيْحَسِنْ رَكْعَتِينْ) وَيَدْعُ عَبْدَهَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
وَأَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدَ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، (بِاِمْرَأْهُ) إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى
رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَعْصِيَ لِي (بِاِمْرَأْهُ) إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى اللهِ أَنْ يَعْصِيَ
حَاجَتِي (فِيْجَلِي لِيْ عَنْ بَصَرِي) اللَّهُمَّ فَشْفَعْنَاهُ فِيْ (وَشْفَعْنِي فِيهِ) (اللَّهُمَّ شَفْعَنَاهُ
فِيْ وَشْفَعْنِي فِيْ نَفْسِي)

“একজন অঙ্ক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ঝুঁক্কি-এর নিকট আগমনে করে বলে, আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে সুস্থিতা দান করেন। তিনি বলেন: তুমি যদি চাও আমি দু'আ করব, আর যদি চাও তবে সবর কর,

সেটাই তোমার জন্য উত্তম। লোকটি বলে: আপনি দু'আ করুন। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন, সে যেন সুন্দর করে ওয়ু করে (অন্য বর্ণনায়: এবং দু রাকাত সালাত আদায় করে) এবং এই দু'আ করে: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফিরাছি (মনোনিবেশ করছি) আপনার নবী মুহাম্মাদের দ্বারা, যিনি রহমতের নবী, হে মুহাম্মাদ, আমি মুখ ফিরাছি (মনোনিবেশ করছি) আপনার দ্বারা আমার প্রতিপালকের দিকে আমার এ প্রয়োজনটির বিষয়ে, যেন তা মেটানো হয়। (অন্য বর্ণনায়: যেন তিনি তা মিটিয়ে দেন, যেন তিনি আমার দৃষ্টি প্রদান করেন।) হে আল্লাহ আপনি আমার বিষয়ে তার সুপারিশ করুল করুন (অন্য বর্ণনায়: আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ করুল করুন এবং তাঁর জন্য আমার সুপারিশ করুল করুন। অন্য বর্ণনায়: আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ করুল করুন এবং আমার বিষয়ে আমার নিজের সুপারিশও করুল করুন।)”^{১৯৪}

এ হাদীসে অঙ্ক লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'আ চেয়েছে। তিনি দু'আ করেছেন এবং তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর দু'আর ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে নিজে দু'আ করতে। লোকটি সেভাবে দু'আ করেছে। তিরমিয়ীর বর্ণনায় দু'আর ফলাফল উল্লেখ করা হয় নি। তবে অন্যান্য সকল বর্ণনায় রাবী বলেন যে, দু'আ আল্লাহ করুল করেন এবং লোকটি তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে পায়, যেন সে কখনোই অঙ্ক ছিল না।

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا إِسْتَسْقَى بِالْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَّا نَنْوَسْلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَنَسِقْنَا وَإِنَّا نَنْوَسْلُ إِلَيْكَ بِعَصْمِ
نَبِيِّنَا فَاسْقَنَا قَالَ فَبِسْقُونَ

“উমার (রা) যখন অনাবৃষ্টিতে আক্রমণ হতেন তখন আবাস ইবনু আব্দুল মুতালিবকে (রা) দিয়ে বৃষ্টির দু'আ করাতেন, অতঃপর বলতেন: হে আল্লাহ আমরা আমাদের নবী (ﷺ)-এর ওসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করতাম ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আমাদের নবী (ﷺ)-এর চাচার ওসীলায়, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা) বলেন, তখন বৃষ্টিপাত হতো।”^{১৯৫}

^{১৯৪} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৫৬৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৭০০, ১/৭০৭; নাসাই, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১৬৮-১৬৯। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

^{১৯৫} বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৪২, ৩/১৩৬০।

আকবাস (রা) নিম্নের বাক্যগুলি বলে দু'আ করলে আল্লাহ বৃষ্টি দিতেন:
 اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزَلْ بِلَاءً إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يَكْشِفْ إِلَّا بِتُورَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِسِيَّ
 لِمَكَانٍ مِّنْ نَبِيِّكَ وَهَذَا أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتُّورَةِ فَاسْقُنَا بِالْغَيْثِ

“হে আল্লাহ, পাপের কারণ ছাড়া বালা-মুসিবত নাথিল হয় না এবং
 তাওবা ছাড়া তা অপসারিত হয় না। আপনার নবীর সাথে আমার সম্পর্কের
 কারণে মানুষেরা আমার মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এ আমাদের
 পাপময় হাতগুলি আপনার দিকে প্রসারিত এবং আমাদের ললাটগুলি তাওবায়
 আপনার নিকট সমর্পিত, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।”^{১৯৬}

এ হাদীসেও স্পষ্ট যে, আকবাস (রা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন উমার
 (রা) আকবাসের (রা) দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন। তাঁর কথা থেকে
 বুঝা যায় যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত ছিলেন, ততদিন খরা বা অনাবৃষ্টি
 হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'আ চাইতেন এবং সে দু'আর ওসীলায়
 আল্লাহ তাদের বৃষ্টি দান করতেন। তাঁর ওফাতের পরে যেহেতু আর তাঁর কাছে
 দু'আ চাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু তাঁর চাচা আকবাসের (রা) কাছে দু'আ চাচ্ছেন
 এবং দু'আর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

চতুর্থত: কোনো ব্যক্তি, তাঁর মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া

আল্লাহর কাছে দু'আ করার ক্ষেত্রে ‘ওসীলা’ বা দোহাই দেওয়ার চতুর্ত
 পর্যায় হলো, কোনো ব্যক্তির, বা তাঁর মর্যাদার বা তাঁর অধিকারের দোহাই
 দেওয়া। যেমন জীবিত বা মৃত কোনো নবী-ওলীর নাম উল্লেখ করে বলা: হে
 আল্লাহ অমুকের ওসীলায়, বা অমুকের মর্যাদার ওসীলায় বা অমুকের অধিকারের
 অসীলায় আমার দু'আ করুন। এরপ দু'আ করার বৈধতার বিষয়ে
 আলিমদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। অনেক আলিম এরপ দু'আ করা
 বৈধ বলেছেন। তাঁরা সাধারণভাবে উপরের দুটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ
 করেন। বিশেষত তাবারানী ও বাইহাকী অক্ষ ব্যক্তির হাদীসটির প্রসঙ্গে একটি
 বর্ণনা উন্মুক্ত করেছেন। তাদের বর্ণনার সার-সংক্ষেপ যে, খ্লীফা উসমান (রা)-
 এর সময়ে এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে একটি প্রয়োজনে যায়। কিন্তু খ্লীফা তার
 প্রতি দৃকপাত করেন না। লোকটি উসমান ইবনু হানীফের (রা) নিকট গমন
 করে তাকে খ্লীফা উসমানের নিকট তার জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ করে।
 তখন উসমান ইবনু হানীফ লোকটিকে অক্ষ লোকটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দু'আটি
 শিখিয়েছিলেন সে দু'আটি শিখিয়ে দেন। লোকটি এভাবে দু'আ করার পরে
 খ্লীফা উসমান (রা) তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।^{১৯৭}

^{১৯৬} ইবনু হাজার, ফাতহল বারী, ২/৪৯৭।

^{১৯৭} তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১/৩০৬; আল-মু'জামুস সাগীর ১/৩০৬; বাইহাকী,

এ থেকে বুঝা যায় যে, শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর ওসীলাই নয়, উপরন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরেও তাঁর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, সাহাবী, তাবিয়া বা ওলী-আল্লাহর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার কোনো কথা কোনো হাদীসে বা সাহাবী-তাবিয়াগণের বজ্বে পাওয়া যায় না। তবে এ মতের আলিঙ্গণ সকলকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত ও তাঁর সাথে তুলনীয় ধরে এরূপ যে কারো নামের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয় বলেছেন।

কোনো কোনো আলিম কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিসত্ত্বার ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা জায়েয় বলেছেন। অন্য কারো ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া নাজায়েয় বলেছেন। তাঁদের মতে, কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর ওসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয় বলার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বাদ দিয়ে অন্য কারো ওসীলা দিয়ে দু'আ করা তাঁর সাথে বেয়াদবী ছাড়া কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে অন্য অনেক আলিম কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির, তাঁর মর্যাদার বা তাঁর অধিকারের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা অবৈধ ও নাজায়েয় বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এরূপ কোনো জীবিত বা মৃত কারো ব্যক্তিসত্ত্বার ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার কোনোরূপ নথির কোনো সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বা সাহাবী-তাবিয়াগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। এছাড়া নবীগণ ও যাদের নাম মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন তাঁরা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যায় না যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বা আল্লাহর কাছে তাঁর কোনো বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার আছে। সর্বোপরি তাঁরা উপরে উল্লেখিত উমার (রা) কর্তৃক আবাসের ওসীলা প্রদানকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যদি কারো দু'আর ওসীলা না দিয়ে তাঁর সত্ত্বার ওসীলা দেওয়া জায়েয় হতো তবে উমার (রা) ও সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বাদ দিয়ে আবাস (রা)-এর ওসীলা পেশ করতেন না।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবী তাঁর 'আল-বালাগুল মুবীন' গঠে উমার (রা)-এর হাদীসটি উক্ত করে বলেন: “এই ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে অসিলা করা শরীয়ত বিরোধী। যদি শরীয়ত সিদ্ধ হইত হ্যরত ওমর (রা) হ্যুর (ঈশ্বর)-কে অসিলা করিয়াই দোআ করিতেন। কারণ, মৃত বা জীবিত যে কোন ব্যক্তির চেয়েই হ্যুর (ঈশ্বর)-এর ফর্মাত সীমাহীন-অনন্ত। তাহই হ্যরত ওমর (রা) এই কথা বলেন নাই যে, হে আল্লাহ, ইতি পূর্বে তো

দালাইলুন নুবুওয়াত ৬/৩৫৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৭৯। এ বর্ণনাটির বিশেষতা সম্পর্কে মুহাম্মদসগণের মধ্যে আপত্তি ও মতপার্থক্য আছে।

আমরা তোমার নবীকে অসীলা করিয়া দোআ করিতাম। কিন্তু এখন তিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই তাই আমরা তাঁহার রহস্য মোবারককে অসীলা করিয়া তোমার কাছে আরযী বেশ করিতেছি। তাই কোন মৃত ব্যক্তিকে অসীলা করা মোটেই বৈধ নহে।”^{১৯৮}

ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) সকলেই একমত যে কারো অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া মাকরহ। আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْدَّاعِيُّ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فَلَانٍ ،
أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرَسُلِكَ ، وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَالْمَشْعُرِ الْحَرَامِ ، وَتَحْفُزُ تَلَكَ

“ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় বলেছেন: ‘আমি অমুকের অধিকার বা আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকার, বা বাইতুল হারামের অধিকার বা মাশ’আরুল হারামের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাছিঃ বা প্রার্থনা করছিঃ’ বলে দু'আ করা মাকরহ।”^{১৯৯}

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি) বলেন:

وَيَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرَسُلِكَ وَبِحَقِّ فَلَانٍ
لَأَنَّهُ لَا حَقٌّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ...

“আমি আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাছিঃ এবং অমুকের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাছিঃ বলে দু'আ করা মাকরহ; কারণ মহান আল্লাহর উপরে কারো কোনো অধিকার নেই।”^{২০০}

কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা শিরক নয়; কারণ, এতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না বা দু'আ করা হয় না; একমাত্র আল্লাহকেই ডাকা হয়। এ বিষয়ক বিতর্ক জায়েন্য-নাজায়েরের মধ্যে সীমিত। কাজেই শিরক প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ক বিতর্কের বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না।

পঞ্চমতঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওসীলার কাছেই চাওয়া

ওসীলা বিষয়ক চূড়ান্ত শিরক হলো ওসীলার নামে ওসীলার কাছেই দু'আ করা বা ত্রাণ, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা। উপরে ওসীলা বলতে যা কিছু বলা হয়েছে তা হলো কারো ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা। এর বিপরীতে আরেকটি কর্ম হলো, যাকে ওসীলা বলে

^{১৯৮} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৩১।

^{১৯৯} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ২৩৭।

^{২০০} কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ৫/১২৬।

মনে করা হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি তাকেই ডাকা। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট শিরক। পরবর্তীতে আমরা তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ১. ৩. পীর-মাশাইখের ওসীলা

আমরা উপরে দেখেছি যে, আল্লাহ তাঁর ওসীলা বা নৈকট্য সঙ্কান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী সকল মুফাস্সির একমত যে, নেক আমল হলো ওসীলা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে অন্য কোনো মতামত প্রচারিত হয় নি। এরপর কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, ‘পীর-মাশাইখ’-ও ওসীলা। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার প্রেক্ষাপট বুঝা যায়। তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এরপর মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় প্রশাসন, শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে স্থিরতা আসে। বিশাল মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি রাজধানী বাদ দিলে সর্বত্র অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, বাতিলী শীয়াগণের প্রভাব ইত্যাদি কারণে শিরক-কুফর প্রবল হয়ে উঠে। উম্মাতের এ দুর্দিনে সরলপ্রাণ প্রচারবিমুখ সুফী, দরবেশ ও পীর-মাশাইখ আম-জনগনের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা বিত্তারে নিরলস চেষ্টা করে যান। তাদের সাহচার্যে যেয়ে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, ইসলাম ও ইসলামের হৃকুম আহকাম কমবেশি শিক্ষা লাভ করত এবং আত্মসন্দৰ্ভে চেষ্টা করত। সাধারণ মানুষদের ঈমান, ইসলাম ও আখলাক গঠনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো আলিম মতামত পেশ করেন যে, পীর-মাশাইখের সাহচার্যও একটি বিশেষ নেক আমল যা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এবং স্বার্থান্বেষীদের যিথ্যা প্রচারণার কারণে একথাটি ক্রমান্বয়ে শিরকী অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আরবের মুশরিকগণ যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফিরিশতা, নবী, ওলী ও অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করত, ঠিক তেমনি অনেকে পীর-মাশাইখের ইবাদত করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে মনে করতে থাকে। কেউ বা ওসীলা বলতে ‘মধ্যস্থতাকারী’ বা উপকরণ বলে মনে করতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, পীর-মাশাইখ আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রহমত পেতে পারে না। এরূপ অনেক শিরকী ধারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ক ধারণাগুলি নিম্নরূপ:

(১) পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একটি ওসীলা মনে করা

এ ধারণাটি মূলত ইসলাম-সম্মত। কুরআন ও হাদীসে নেককার মুমিন-মুভাকীগণের সাহচার্য গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে,

ওসীলা অর্থ নেক আমল। আর কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে একপ মুস্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণ, সাক্ষাত করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে ভালবাসা এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেক-আমল বা ওসীলা।

তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, ‘পীর’ বলে কোনো বিশেষ পদমর্যাদা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। বরং আলিম, সত্যবাদী, মুস্তাকী, নেককার, সৎকর্মশীল, ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী, সুন্নাতের অনুসারী ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। পীর নামধারী ব্যক্তির মধ্যে যদি এ সকল বাহ্যিক গুণ বিদ্যমান না থাকে তবে তার সাহচার্য গ্রহণ আল্লাহর নৈকট্য নয়, বরং শয়তানের নৈকট্যের অন্যতম ওসীলা, যদিও একপ ব্যক্তি পীর, মুরশিদ, ওলী, বা অনুরূপ কোনো নাম ধারণ করে। আর যদি কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত উপর্যুক্ত বাহ্যিক গুণবলি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তিনি ‘পীর’ নাম ধারণ করুন আর নাই করুন তার সাহচার্য মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের ওসীলা বলে গণ্য।

কুরআন, হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মধারার আলোকে পীর-মুরিদীর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সুন্নাত-সম্যত পদ্ধতি, ভূল-ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘এহইয়াউস সুনান’ ও ‘রাহে বেলায়াত’ গ্রন্থে। সম্মানিত পাঠককে পৃষ্ঠাকদৃষ্টি পাঠ করতে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয়ত, মূলত মুসিমের নিজের কর্মই তাঁর অসীলা, অন্য কোনো মানুষ বা তার কর্ম নয়। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেককার মানুষদের সাহচর্য গ্রহণই নেককর্ম ও অসীলা। ইসলামী অর্থে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ‘ওসীলা’ হতে পারে না, কেবলমাত্র মুসিমের নিজের কর্মই তাঁর ওসীলা। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তির জন্য ওসীলা হবেন না যতক্ষণ না সে তাঁর উপর ইমান গ্রহণ করবে এবং তাঁর শরীয়ত পালন করবে। এক্ষেত্রে মূলত মুসিমের ইমান ও শরীয়ত পালনই ওসীলা। এর কারণে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা‘আত, জান্নাতের সাহচার্য ইত্যাদি নসীব করে দিতে পারেন।

(২) পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা মনে করা

অসীলা বিষয়ক বিভ্রান্তির ধারণার একটি হলো, পীরের সাহচার্যকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের একমাত্র ওসীলা বলে মনে করা। অগণিত নফল মুস্তাকী নেক কর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক-কর্ম হলো নেককার বান্দাদের সাহচার্য গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে ইমান ও ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি আহকাম মেনে চলাই মূল দীন। নেক-সাহচার্য এ সকল ইবাদত পালনে সহায়ক। সর্বদা কুরআন তিলাওয়া ও

অধ্যয়ন করা, হাদীস, সীরাত, শামাইল পাঠ করা, সাহাবীগণের জীবনী পাঠ করার মাধ্যমেও প্রকৃত সাহচার্য গ্রহণ করা যায়।

(৩) পীরের কর্মকে নিজের ওসীলা বলে মনে করা

এ বিশয়ক অন্য বিভিন্ন হলো, পীরের বেলায়াতকে নিজের নাজাতের উপকরণ বলে বিশ্বাস করা। এরপ বিশ্বাসের কারণে অনেকের ধারণা, আমার নিজের কর্ম যাই হোক না কেন, পীর সাহেব যেহেতু অনেক বড় ওলী, কাজেই তিনি আমাকে পার করিয়ে দিবেন। এরপ বিশ্বাস কুরআন-হাদীসের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, কে বড় ওলী তা নিশ্চিত জানা তো দূরের কথা কে প্রকৃত ওলী বা কে জাল্লাতী তাও নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা বাহ্যিক আমলের উপর নির্ভর করে ধারণা পোষণ করি এবং সাহচার্য গ্রহণ করি। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলেছেন যে, তাঁর সত্তান, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবী বা অন্য কাউকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ত্রাণ করতে পারবেন না। প্রত্যেককে তাঁর নিজের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নাজাত লাভ করতে হবে। মূলত মুমিনের নিজের কর্মই তাঁর নাজাতের ওসীলা। পীরের সাহচর্য থেকে মুমিন আল্লাহর পথে চলার কর্ম শিক্ষা করবেন, প্রেরণা লাভ করবেন এবং নিজে আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন।

এ বিশ্বাসের ভিত্তি হলো যে, মহান আল্লাহ কাউকে ‘শাফা’আত করার উন্মুক্ত অনুমতি বা অধিকার দিয়েছেন বা দিবেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত কাফির-মুশরিক, ফাসিক-খোদদোহী যাকে ইচ্ছা ত্রাণ করবেন। বস্তুত কারো সুপারিশ আল্লাহ শুনবেনই বা আল্লাহ তাকে ইচ্ছামত সুপারিশ করা অধিকার দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর কৃবৃবিয়্যাতের ক্ষমতায় শিরক করা। এ বিশ্বাসটি মূলত আরবের মুশরিকদের ‘শাফা’আত’ বিশয়ক বিশ্বাসের মত।

(৪) ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা

ওসীলা বিশয়ক আরেকটি বিভিন্ন হলো ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা। আমরা ইতোপূর্বে ওসীলা শব্দটির অর্থ ও তাঁর বিবর্তন আলোচনা করেছি। কুরআনে মুমিনকে নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর পথে কোনো অতিরিক্ত উপকরণ তালাশ করতে বলা হয় নি। উপকরণ দু প্রকারের: জাগতিক ও ধর্মীয়। জাগতিক উপকরণ সকলেই জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানে। যেমন ভাত সিদ্ধ হওয়ার উপকরণ পানি ও আঙুল, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার উপকরণ মাটি, পানি ও আলো। আর ধর্মীয় উপকরণ একমাত্র ওহীর মাধ্যমে জানা যায়। যেমন ওয়ূ করা সালাত কবুল হওয়ার উপকরণ, ইমান বিশুদ্ধ হওয়া নেক আমল কবুল হওয়ার উপকরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও মানুষের উপকার করা।

রিয়ক বৃদ্ধির উপকরণ। পীরের সাহচর্য লাভ, মুরীদ হওয়া ইত্যাদি কোনো নেক আমল কবুল হওয়া, দু'আ কবুল হওয়ার উপকরণ নয়। কারণ কুরআন-হাদীসে কোথাও তা বলা হয় নি। একপ ধারণা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা এবং তা পরবর্তী শিরকী বিশ্বাসগুলি পথ উন্মুক্ত করে।

(৫) পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী মনে করা

ওসীলা বিশ্বাক শিরকী বিশ্বাসের অন্যতম হলো পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করা। দুভাবে এ বিশ্বাস ‘প্রমাণ’ করা হয়: প্রথমত কুরআনের অর্থ বিকৃত করা এবং দ্বিতীয়ত আরবের মুশারিকদের মত ‘যুক্তি’ পেশ করা। প্রথম পর্যায়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে এরা সাধারণত বলে থাকে ‘আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ওসীলা ধরে তাঁর কাছে যেতে, কাজেই সরাসরি তাকে ডাকলে হবে না। আগে ওসীলা ধরো।’ এভাবে তারা কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করেন। বিকৃতির মূল ভিত্তি ওসীলা শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে। কুরআনের ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য এবং অসীলা সন্ধানের অর্থ যুমিনের নিজের নেক কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান। আর এরা বুঝান ওসীলা অর্থ মধ্যস্থতাকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এরা যুক্তি দেন যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ, মধ্যস্থতা ও রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন, তেমনিভাবে আল্লাহর দরবারেও পীর বা ওলীগণের রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন। পীর, বা ওলীর সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোনো দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না। বান্দা যতই আল্লাকে ডাকুক বা ইবাদত করুক, যতক্ষণ না তা ‘যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে’ অর্থাৎ পীরের রিকমেন্ডেশন সহ তাঁর দরবারে যাবে ততক্ষণ তা গ্রহণ করা হবে না। অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারে পীর ও ওলীগণ উকিল-ব্যারিষ্টার করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন। এ জাতীয় ধারণাগুলি সবই আরবের মুশারিকদের বিশ্বাসের অনুরূপ এবং সুস্পষ্ট শিরক। এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(ক) অসমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এগুলি সবই আরবের মুশারিকদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ছিল তাদের সকল শিরকের মূল।

(খ) এ সকল চিন্তা সবই মহান আল্লাহর নামে মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ কোথাও ঘূনাক্ষরেও বলেন নি যে, তাঁর কাছে যেতে বা দু'আ কবুল হতে কখনো কারো সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন লাগবে। বরং বারংবার বলেছেন যে, তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে এবং বান্দা ডাকলেই তিনি শুনেন ও সাড়া দেন।

(গ) জাগতিক রাজা-বাদশাহর দরবারে বাইরের অপরিচিত কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ দরকার হয়, তার নিজের দরবারের বা চাকরদের কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ বা অনুমতির দরকার হয় না, কারণ তিনি নিজেই তাকে ভালভাবে চেনেন। আল্লাহর সকল বান্দাই তাঁর দরবারের আপনজন। কাজেই এক চাকরকে দরবারে যেতে আরেক চাকরের অনুমতি বা সুপারিশ লাগবে কেন?

(ঘ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ তার দেশের সবাইকে চেনেন না। যে ব্যক্তি তার দরবারে কিছু প্রার্থনা করতে চায়েছে সে কি প্রতারক, মিথ্যবাদী না সত্যবাদী তা তিনি জানেন না। এজন্য তাকে আমলাদের সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয়। মহান আল্লাহ কি এরপ? কোনো বান্দার বিষয়ে কোনো পীর, ওলী কি মহান আল্লাহর চেয়ে বেশি জানেন?

(ঙ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ ক্রেধ-বশত হয়ত প্রজার উপর কঠোরতা করতে পারেন, এক্ষেত্রে মন্ত্রী-আমলাদের সুপারিশ তার ক্রেধ সম্বরণ করতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ কি তদ্দপ? মহান আল্লাহর দয়া বেশি না পীর-ওলীগণের দয়া বেশি?

(চ) জাগতিক বিচারালয়ে বিচারক জানেন না যে, সম্পত্তি কার পাওনা। উকিল-ব্যারিষ্টার সত্য বা মিথ্যা যুক্তি-তর্ক ও আইনের ধারা দেখিয়ে বিচারককে বুঝাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ কি তদ্দপ? উকিল সাহেবেরা কি মহান আল্লাহকে অজানা কিছু জানাবেন? নাকি তাকে ভুল বুঝিয়ে মামলা খারিজ করে আনবেন? কুরআন কারীয়ে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, উকিল হিসেবে তিনিই যথেষ্ট (কফি بـالله وـكـبـلـا)^{২০১} এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উকিল ধরতে নিষেধ করেছেন (أـلـا تـخـذـنـوـا مـنـ دـونـيـ وـكـبـلـا)^{২০২}। এরপরও কি তাঁর কাছে অন্য কাউকে উকিল ধরার দরকার আছে?

(ছ) মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে বা মানবীয় রাজা-বাদশাদের সাথে তুলনা করা সকল শিরকের মূল। মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা ছাড়া এগুলি কিছুই নয়।

(৬) মধ্যস্তুতাকারীকে উলুহিয়াতের হক্কদার মনে করা

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর সম্মতি লাভের নামে ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের ইবাদত করা হলো আরবের মুশরিকদের অন্যতম শিরক যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভঙ্গি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। এরপ অনুভূতি নিয়ে পীর-ওলীকে সাজদা করা, তাঁর

^{২০১} সূরা (৪) নিসা: ৮১, ২৩২, ১৭১; সূরা (৩৩) আহ্যাব: ৩, ৪৮।

^{২০২} সূরা (১৭) ইসরায়েল: ২ আয়াত।

নাম যপ করা, বিপদে আপদে দূর থেকে তাঁকে ডাকা, তার কাছে ত্রাণ চাওয় ইত্যাদি এ পর্যায়ের শিরক।

৫. ৫. ১. ৪. আল্লাহর হৃকুম প্রদানের ক্ষমতায় শিরক

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের একটি দিক যে, তিনি তাঁর প্রতিপালিতদের জন্য হৃকুম, আহকাম বা বিধিবিধান প্রদান করেন। একমাত্র তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত এবং তাঁর নির্দেশই প্রকৃত হালাল বা হারাম অর্থাৎ বৈধতা ও অবৈধতা প্রদান করে। তাঁর বিধান অন্যান্য করার বৈধতায় বিশ্বাস, তাঁর কোনো বিধানের গ্রহণযোগ্যতায় অবিশ্বাস অথবা তিনি ছাড়া অন্য কেউ বিধান প্রদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি তাঁর প্রতিপালনের তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক কুফর ও শিরক। সমাজে প্রচলিত এ পর্যায়ের শিরকের বিভিন্ন দিক রয়েছে। সেগুলির অন্যতম:

৫. ৫. ১. ৪. ১. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা

কোনো কর্ম যদি কুরআন-হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা পাপ হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে সে পাপকে হালাল বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা বা হাসি-মক্ষরা করাও কুফর। মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন:

استحلل المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إذا ثبتت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الاستهانة بها كفر ... وكذا الاستهزاء بالشريعة الغراء كفر.

“কোনো পাপ তা সঙ্গীরা হোক বা করীরা হোক, তা যদি সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে পাপ বলে প্রমাণিত হয় তবে তা বৈধ বা হালাল মনে করা কুফর। অনুরূপভাবে কোনো পাপকে হালকা বা গা-সওয়া বলে অবহেলা করাও কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তকে নিয়ে উপহাস বা মক্ষরা করাও কুফর।”^{২০৩}

এখানে কুফর ও শিরক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারণ বাস্তা আল্লাহর বিধান দানের সার্বভৌম ক্ষমতা ও তাঁর বিধানের অলজ্জনীয়তা অস্থীকার করেছে এবং সাথে সাথেই সে নিজেকে বা অন্য কাউকে বিধান বিচারের বা বিধান প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছে।

৫. ৫. ১. ৪. ২. আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা বা উপহাস

মহান আল্লাহর কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা বা তাঁর মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তাঁর উপর আরোপ করা এই পর্যায়ের কুফর ও শিরক।^{২০৪} সমাজে প্রচলিত এ সকল কুফরের মধ্যে

^{২০৩} মোল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৪।

^{২০৪} মোল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৫।

রয়েছে, পর্দা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, বিভিন্ন ইসলামী আইন, চুরির শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি, মদপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডের বিধান, তালাকের বিধান বা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত শরীয়তের কোনো বিধানকে নিয়ে উপহাস করা, তামাশা করা, এরূপ কোনো বিধান অচল, অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক বা অনুপযোগী বলে মনে করা, এগুলির প্রতি অন্তরের বিরক্তি বা আপত্তি অনুভব করা, বা এগুলি ইসলামের মধ্যে না থাকলে ইসলাম আরো উন্নত ধর্ম বলে প্রমাণিত হতো বলে মনে করা। এরূপ সকল বিশ্বাস ও ধারণাই উপরের বিশ্বাসের মত কুফর ও শিরক।

৫. ৫. ১. ৪. ৩. আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের বৈধতায় বিশ্বাস

আমরা আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিশ্বাসসহ যদি কেউ তার ব্যতিক্রম করে বা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তবে তা পাপ বলে গণ্য হয়, কুফর বলে গণ্য হয় না। কিন্তু এরূপ কর্মে লিপ্ত মানুষ যদি এরূপ ব্যতিক্রম করাকে বৈধ বলে মনে করে তবে তা কুফর ও শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ এতে মহান আল্লাহর কুরুবিয়্যাত, বিধানদান ও তাঁর বিধানের অলঙ্গণীয়তা অঙ্গীকার করা হয় এবং অন্য কারো আল্লাহর বিধানের পর্যালোচনা বা বাতিল করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

সমাজে এ পর্যায়ের শিরক-কুফরের দৃটি প্রকাশ আছে:

প্রথমত: কুসৎস্কারাছন অঙ্গ মানুষদের মধ্যে ফকিরী মত সংশ্লিষ্ট অতিভক্তি। এরূপ মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, কোনো মানুষ মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে করতে এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে, তারপর আর তাঁর শরীয়তের বিধিবিধান পালন করা জরুরী থাকে না এবং তাঁর জন্য শরীয়ত লঙ্ঘন করা বৈধ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে কুফর ও শিরক। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী যদি নিজে শরীয়ত পালন করেন তবুও তিনি কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য হবেন।

আমরা দেখেছি যে, সমাজে শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনধারা সম্পর্কে অঙ্গতা এবং পরবর্তী যুগের আওলিয়ায়ে কেরামের নামে প্রচলিত অগণিত সত্য-মিথ্যা বানোয়াট ও আজগুবি কাহিনীর প্রাদুর্ভাব। এ সকল গল্প কাহিনীকে ‘দলীল’ করে এজাতীয় শিরক বিশ্বাসকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক শিক্ষিত অর্থচ ইসলাম সম্পর্কে অঙ্গ মানুষদের ইসলামী আইন বিষয়ক অনুভূতি। অনেক শিক্ষিত মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও এবং ইসলামের কিছু বিধান পালন করা সত্ত্বেও ইসলামী বিধিবিধান, এগুলির বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে অঙ্গতা

এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের গত হাজার বছরের মিথ্যা প্রচারণার কারণে অনেক সময় ইসলামের কোনো কোনো বিধানকে সময়ের জন্য অনুপোয়োগী অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করেন, অথবা অন্য ধর্মের বা সমাজের প্রচলিত বিধানকে উভয় মনে করেন। এরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর বিধানের ব্যতিক্রম বিচার ফয়সালা প্রদানকে বৈধ এবং কোনো অপরাধ নয় বলে মনে করেন। এরূপ ধারণা কুফর ও শিরক। কেউ যদি ব্যক্তিগত দুর্বলতা, লোভ, অসহায়তা, অজ্ঞতা বা অনুরূপ কোনো কারণে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেন বা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে বিধান বা ফয়সালা প্রদান করেন তবে তা পাপ বলে গণ্য, কুফর বা শিরক নয়। কিন্তু যদি কেউ এরূপ করাকে বৈধ বলে মনে করেন বা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে বলে মনে না করেন তবে তা কুফর ও শিরক বলে গণ্য।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।”^{২০৫}

এ আয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয়্য বলেন: “এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। তা হলো, আল্লাহ যা নায়িল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিধান বা ফয়সালা প্রদান কুফর বলে গণ্য হতে পারে, যে কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধর্মচূর্ণ বা মূরতাদ বলে গণ্য হবে, আবার তা কবীরা বা সগীরা গোনাহ বা পাপ বলে গণ্য হতে পারে, এক্ষেত্রে তা কুফর আসগার অর্থাৎ ক্ষুত্রতর কুফর বা রূপক কুফর বলে গণ্য হবে। বিষয়টি নির্ভর করবে বিচারক বা ফয়সালাকারীর অবস্থার উপরে। বিধানটি যে আল্লাহ প্রদান করেছেন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ যা নায়িল করেছেন সে অনুসারে বিধান বা ফয়সালা প্রদান তার জন্য জরুরী নয়, অথবা সে আল্লাহর নির্দেশিত বিধানটিকে অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে তবে তা কুফর আকবার বা পারিভাষিক কুফর ও ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নায়িলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা প্রদান জরুরী এবং বিচার্য বিষয়ে আল্লাহর নায়িলকৃত বিধানও সে

^{২০৫} সূরা (৫) মায়দাঃ ৪৪ আয়াত। তাওরাত বিষয়ে আরো দেখুন: সূরা বাকারা : ৫৩, ৮৭; আল ইমরান: ৩, ৪৮, ৬৫, ৯৩; নিসা: ১৫৩; মায়দা: ৪৩, ৬৮, ১১০; আন'আম: ১১, ১৫৪; আ'রাফ: ১৫৪, ১৫৭; তাওরা ১১১; হুদ: ১৭, ১১০; সূরা বনী ইসরাইল: ২; আমিয়া: ৪৮; মুমিনুন: ৪৯; কাসাস: ৪৩; সাজাদা: ২৩; গাফির/মুমিন: ৫৩; ফুস্সিলাত: ৪৫; আহকাফ: ১২; ফাতহ: ২৯; সাফুর: ৬; জুম'আ: ৫ আয়াত।

জানে, কিন্তু সে উক্ত বিধান পরিত্যাগ করে অন্য ভাবে ফয়সালা দান করে এবং স্বীকার করে যে এরূপ করার কারণে সে শান্তি পাওয়ার যোগ্য, তবে সে পাপী। এরূপ পাপী ব্যক্তিকে রূপক অর্থে বা কুফর আসঙ্গের অর্থে কাফির বলা হয়।

আর যদি সে উক্ত বিষয়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার সাধ্যমত বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে সে ভুল করে তবে সেক্ষেত্রে সে ভুলকারী বলে বিবেচিত। সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করার করণে সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে এবং তার ভুলের অপরাধ ক্ষমা করা হবে।”^{২০৬}

৫. ৫. ২. ইবাদতের শিরক

আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশাৰ সাথে কারো সামনে নিজেৰ চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ কৰা। আমরা জানি যে, ইসলামে নবীগণ, আলিমগণ, বয়স্কগণ, নেককার মানুষগণ, পিতামাতা বা শাসক-প্রশাসককে ভালবাসতে, শ্ৰদ্ধা কৰতে ও আনুগত্য কৰতে নির্দেশ দিয়েছে। এদেৱ ভালবাসা, শ্ৰদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ কৰতে গেলে ভক্তি ও বিনয় আসবেই। পাশাপাশি চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব একমাত্ৰ মহান আল্লাহ ছাড়া কারো সামনেই প্রকাশ কৰা যাবে না। এ দুটি বিষয়েৰ মধ্যে সীমাবেষ্টি রক্ষা কৰা না গেলে ইবাদতেৰ শিরকেৰ মধ্যে নিপত্তি হওয়াৰ সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এ বিষয়ক শিরক আলোচনা আগে এ বিষয়ে কয়েকটি মূলনীতি সংক্ষেপে উল্লেখ কৰছি।

(১) রূবুবিয়াতেৰ শিরক থেকেই ইবাদতেৰ শিরকেৰ উৎপত্তি। কারো মধ্যে ‘আলৌকিক’ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস কৰলেই তার প্রতি ‘আলৌকিক’ ভক্তি প্রদর্শনেৰ প্ৰবণতা জন্ম নেয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে বারংবাৰ উল্লেখ কৰা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনোৱুপ কল্যাণ-অকল্যাণেৰ ক্ষমতা আৱ কারো নেই এবং আল্লাহ কখনো কোনোভাবে কাউকে তা দেন না। শাফ‘আত, কারামাত, মুজিয়া, দু‘আ কৰুল সবই মহান আল্লাহৰ ক্ষমতা ও তাৱই ইচ্ছাধীন। সৰ্বদা কুরআন ও হাদীস অৰ্থসহ অধ্যয়নেৰ মাধ্যমে তাওহীদেৱ এ বিশ্বস সুদৃঢ় কৰাই ইবাদতেৰ শিরক থেকে বাঁচাৰ উপায়।

(২) হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ পিতামাতার দু‘আ কৰুল কৱেন এবং আৱো জানি যে, তিনি তাঁৰ নেককার প্ৰিয় বান্দাদেৱ বা ওলীদেৱ দু‘আ কৰুল কৱেন। দুটি বিষয়ই হাদীসে একইভাবে উল্লেখ কৰা হয়েছে। কিন্তু কখনোই আমরা দেখব না যে, কোনো মানুষ তার পিতামাতার

^{২০৬} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

কাছে দু'আর জন্য চূড়ান্ত ভঙ্গি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে একজন 'ওলী'-র সামনে বা তার মাজারের সামনে সে 'চূড়ান্ত ভঙ্গি, বিনয় ও অসহায়ত্ব' প্রকাশ করছে। এর কারণ সে তার পিতামাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জানে যে, পিতামাতার দু'আ আল্লাহর কবুল করেন, তবে করা না করা আল্লাহ ইচ্ছ। আর 'ওলী'র ক্ষেত্রে তার ধারণা যে তাঁর দু'আ কবুল করা আর সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন নেই, বরং তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ তাঁকে এত ভালবাসেন যে, তাঁর দু'আ তিনি ফেলতে পারবেন না.... ইত্যদি। আর এরপ ধারণাই শিরকের উৎস।

(৩) কে কার পিতা ও মাতা তা সকলেই সুনিশ্চিতভাবে জানে। পক্ষান্তরে কে ওলী তা কেউই সুনিশ্চিতভাবে জানে না। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শীয়াদের মতামত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাহলে দেখুন! একজন নিশ্চিত জানেন যে; এ ব্যক্তি তার পিতা বা মাতা এবং নিশ্চিত জানেন যে, পিতা ও মাতার দু'আ আল্লাহর কবুল করেন। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভঙ্গি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন না। অথচ তিনিই একজন মানুষকে 'ওলী' বলে ধারণা করছেন, যদিও সে ব্যক্তি সত্যই আল্লাহর ওলী কিনা তা কোনোভাবেই তিনি বলতে পারেন না, তারপর তিনি তার বিশেষ অধিকারের ধারণা করছেন এবং এ দুটি 'ধারণা'র ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট নিজের চূড়ান্ত ভঙ্গি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন।

(৪) ভালবাসা ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে ইসলামী অনুভূতি ও শিরকী অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। শিরকী বিশ্বাসে মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি 'ওলী', সাধু, 'সাই বাবা', 'অবতার' বা অনুরূপ কিছু। এ ব্যক্তি হাতে আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের সকল বা কিছু ক্ষমতা আছে। একে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অথবা তার একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে, যাতে তার সুপারিশ তিনি ফেলতে পারবেন না। তাঁকে সম্মান ও ভঙ্গি করে তাঁর একটু সুনজর লাভ করতে পারলেই তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাঁকে ভঙ্গি করলে তিনি আমাকে পরকালে আমার কাণ্ডারী হবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে কোনোভাবে একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

পক্ষান্তরে "ওলী"-র তা'ফীয়ের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের চিন্তা হলো, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভালো বান্দা। তিনি আমার মালিকের অনুগত গোলাম।

আমার মালিকের গোলামিতে তিনি অহসর বলেই আমি তাঁকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, যেন আমার মালিক আল্লাহ খুশি হন। আমি আল্লাহর গোলামিকে ভালবাসি। আর তাঁর গোলামিতে যে ভালো তাকেও ভালবাসি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালবাসি। তাঁর অনুসারীকেও আমি নিঃশর্তে ও নিষ্পার্থে ভালবাসি। আমার এই ভক্তি ও ভালবাসা একান্তই আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এই ব্যক্তির কাছে আমার কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই। কোনো ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে লিঙ্গ মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশি হন, তাই ভালবাসি। এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে তাঁদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও সম্মতি অর্জন করে ধন্য হতে চাই।

(৫) ইতোপূর্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে শিরকী কর্মগুলির বর্ণনায় আমরা ইবাদতের শিরকে প্রকারগুলি দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, সাজদা, কুরবাণী, উৎসর্গ, জবাই, মানত, দু'আ, ডাকা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ভালবাসা, আনুগত্য, যিয়ারত, তাবাররুক ইত্যাদি বিষয় শিরকের মূল। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করা, উৎসর্গ, জবাই বা মানত করা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভাবে ডাকা বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কারো উপর হস্তয়ের প্রগাঢ় ভয় ও ভালবাসাসহ চূড়ান্ত ভক্তিময় তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নিয়ে পথে বের হওয়া, নদীতে ঝাপ দেওয়া, যাত্রা শুরু করা, বাণিজ্য শুরু করা বা যে কোনোভাবে অলৌকিক নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুল প্রকাশ করা শিরক। একইভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালবাস শিরক। এছাড়া আল্লাহ ছাড়া কারো চূড়ান্ত ও প্রশ়াতীত আনুগত্য করা শিরক। যদি কেউ মনে করেন যে, পোপ, পাদরি, পীর, শুরু, সাঁই বাবা, খাজা বাবা, পিতামাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয় তবে কাজটি শরীয়তে পাপ হলেও আমার জন্য তা জায়েয হয়ে যাবে, অথবা এরপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নির্দেশ দেন তবে শরীয়ত বিচার না করে তা পালন করাকে জরুরী হবে, তিনি কোনো কিছুকে বৈধ বললে তা বৈধ হয়ে যাবে, তিনি যদি বলেন এখন থেকে তোমার আর অমুক ফরয ইবাদত করা লাগবে না তাহলে আমার জন্য উক্ত ইবাদতটি অনাবশ্যক হয়ে যাবে ... তাহলে নিঃসন্দেহে তা আনুগত্যের শিরক বলে গণ্য হবে।

(৬) আরবের কাফিরদের জন্য এবং ইহুদী-খ্স্টানদের জন্য যেমন তা শিরক, তেমনি মুসলিম নামধারী কেউ যদি কোনো নবী, ওলী, মাজার, কবর, স্মৃতিময় দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম করে তবে তাও একইরূপ শিরক বলে গণ্য হবে। অজ্ঞতার কারণে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, আরবের মুশরিকগণ এ সকল ইবাদত মৃতি বা প্রতিমার জন্য করত বলেই কুরআনে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। নবীগণ ও ওলীগণ তো আর অঙ্গুষ্ঠ প্রতিমা নন, বরং তাঁর সক্ষম আল্লাহর প্রিয় বাস্ত্ব, তারা সব শোনেন, দেখেন এবং সুপারিশ করেন, কাজেই তাদেরকে ডাকলে, তাদের উপর তাওয়াক্তুল করলে বা তাদের জন্য মানত করলে অসুবিধা কোথায়। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার কারণেই এরূপ কথা বলা হয়। প্রথমত, যারা মৃত্যুজ্ঞা করেন তারা কখনোই মনে করেন না যে, মাটি বা পাথরের মৃত্যুটি তাদের ডাক শোনে বা প্রয়োজন মেটায়। বরং তারা মনে করেন যে, এ মৃত্যুটি যার, সে ব্যক্তির আত্মাই তাদের ডাক শোনে এবং প্রয়োজন মেটায়। শুধু তার স্মৃতি হিসেবে ঘৃতিকে তারা সামনে রাখে। আমাদের দেশের যে কোনো হিন্দু পঞ্চিতকে জিজ্ঞাসা করলেও তা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মৃতি ইত্যাদি জড় পদার্থের পূজা ছাড়াও আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও জিন্নগণেরও ইবাদত করত, খ্স্টানগণ সিসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-এর ইবাদত করত, ইহুদীগণ উষাইর (আ)-এর ইবাদত করত। কুরআন ও হাদীসে এদেরকে ডাকা, আগ চাওয়া, এদের জন্য মানত, জবাই, উৎসর্গ, তাওয়াক্তুল ইত্যাদি কর্মকে একইভবে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে। উপরে ওসীলা বিষয়ক কুরআনের আয়তে আমারা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: “বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।’ তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।”^{২০৭}

সাহাবীগণ উল্লেখ করেছেন যে, কাফিররা যে সকল ফিরিশতা ও জিন্নদের ইবাদত করত তাদের বিষয়ে এ কথা বলা হয়েছে। এ সকল ফিরিশতা বা জিন্ন জীবিত ছিলেন, তারা আল্লাহর নেক বাস্ত্ব ছিলেন, কিন্তু কুরআনে তাদের ডাকাকে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে এবং স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, বিপদ কাটানোর বা আগ করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই।

^{২০৭} সূরা (১৭) ইসরায়েল/ বানী ইসরাইল: ৫৬-৫৭ আয়াত।

উপরের আলোচনা থেকে সমাজে প্রচলিত ইবাদত বিষয়ক শিরকী কর্মশূলি আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তারপরও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিছু শিরকের বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। নিম্নে এ জাতীয় কিছু কর্মের আলোচনা করছি।

৫. ৫. ২. ১. গাইরুল্লাহর জন্য সাজদা

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে সুস্পষ্টত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল আলিম একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা করাই শর্ক। কারণ, ইবাদত ছাড়া বা চূড়ান্ত ভঙ্গির প্রকাশ ছাড়া কেউ কাউকে সাজদা করে না। জাগতিক ভয়, ভীতি, সম্মান ইত্যাদির জন্য একজন আরেকজনের পাজড়িয়ে ধরতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একমাত্র অলৌকিক ও অপার্থিব ভঙ্গি ও বিনয়ের অর্ঘ্য ছাড়া কেউ কারো জন্য সাজদা করে না।

আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন:

والسجود أصل لانه شرع عبادة بلا قيام كسجدة التلاوة، والقيام لم يشرع
عبادة وحده، حتى لو سجد لغير الله تعالى يكفر بخلاف القيام.

“সাজদাই হলো মূল; কারণ সাজদা কেবলমাত্র ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে নির্ধারিত, কিয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়া অন্দুপ নয়, দাঁড়ানো কেবলমাত্র ইবাদত হিসেবে শরীয়তে নির্ধারিত নয়। এজন্য যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে, দাঁড়ানোর বিষয়টি অন্দুপ নয়।”^{২০৮}

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা যাইলায়ী বলেন: “ইমাম মুহাম্মাদের ‘যিয়াদাত’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালাতের মধ্যে সাজদাই মূল, কিয়াম বা দাঁড়ানো হলো দাঁড়ানো থেকে সাজদায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ... এর কারণ সাজদাই হলো মাটির উপর কপাল রেখে আল্লাহর জন্য চূড়ান্ত ভঙ্গি-বিনয় প্রকাশ করা। এজন্য যদি কেউ মাটিতে কপাল রেখে আল্লাহ ছাড়া কারো সাজদা করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য দাঁড়ানো বা রুক্ন করলে কাফির বলে গণ্য হবে না।”^{২০৯}

হানাফী ফিক্‌হের অন্যতম ইমাম আল্লামা সারাখসী তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেন: “...এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে তায়ীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাজদা করা কুফ্রী।”^{২১০}

^{২০৮} ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদিল মুহতার ১/৪৮০, ৬/৪২৬।

^{২০৯} যাইলায়ী, তাবয়ীনুল হাকায়িক ২/৩২৫।

^{২১০} সারাখসী, আল-মাবসূত ২৭/৪২২; যাইলায়ী, তাবয়ীনুল হাকাইক ১৬/৮০০।

মুসলিম উম্মাহর অনেক আলিম সাজদাকে দুভাগে ভাগ করেছেন: (১) সুজূদু তাহিয়াহ (সجود تحييَة) বা সালামের সাজদা এবং (২) সুজূদু ইবাদাত (সجود عبادة) বা ইবাদতের সাজদা। তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের সাজদা করা সরাসরি শির্ক। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালাম-জ্ঞাপক সাজদা করা হারাম ও কঠিন গোনাহের কাজ, তবে তা সরাসরি শির্ক বলে গণ্য হবে না। যদি কেউ এরূপ হারাম কাজকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে তবে তা কুফ্র বলে গণ্য হবে।

কুরআন থেকে জানা যায় যে, ফিরিশতাগণ আদমকে সাজদা করেন এবং ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও আত্মগণ তাঁকে সাজদা করেন। তাদের এ সাজদা কিরূপ ছিল তা নিয়ে মুফাস্সিরগণের মতভেদে রয়েছে। কেউ বলেছেন তারা মাটিতে মাথা রেখে পরিপূর্ণ সাজদা করেন এবং কেউ বলেছেন যে, তারা ঝুকুর মত মাথা ঝুকিয়ে সালাম করেন, আর ঝুকু করাকেও কুরআন কারীমে সাজদা বলা হয়েছে।^{১১১} সর্বাবস্থায় এরূপ সালাম জ্ঞাপক সাজদা বা ‘প্রণাম’ করা পূর্ববর্তী শরীয়তে বৈধ ছিল, তবে ইসলামে তা হারাম করা হয়েছে, যেমন ভাইবোনে বিবাহ, দুর্বোনকে একত্রে বিবাহ, মদপান ইত্যাদি বিষয় পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল কিন্তু ইসলামী শরীয়তে হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সম্মান জ্ঞাপক বা সালাম জ্ঞাপক সাজদা করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আবু হুরাইরা, মু'আয ইবনু জাবাল, সুহাইব, যাইদ ইবনু আরকাম, আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাস, সুরাকা ইবনু মালিক, আয়েশা, ইসমাহ, আনাস ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা, কাইস ইবনু সাদ (^{رض}) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।^{১১২} এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ فِي نَفْرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعْرَةً
فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْنَابَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحَنُ أَحَقُّ أَنْ
تَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْتَبُوا رِبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاهُمْ وَلَوْ كُنْتُ لَمَرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
لَا مَرْنَتُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَفِي حِدِيثِ أَخْرِ: لَا يَتَبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ
لِأَحَدٍ ... وَفِي حِدِيثِ أَخْرِ: لَا يَصْلَحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ

^{১১১} সূরা (২) বাকারা ৫৮; সূরা (৪) নিসা: ১৫৪; সূরা (৭) আ'রাফ: ১৬১ আয়াত।

^{১১২} তিরিয়ী, আস-সুনান ৩/৪৬৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৯৫; ইবনু হিরান, আস-সহীহ ৯/৪৭০, ৪৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/২০৬, ৪/১৮৯-১৯০; যিয়া আল-মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৫/২৬৬, ৬/১৩১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৩০৬-৩১১, ৯/৮-৯।

يَسْجُدُ لِبَشَرٍ لِأْمَرْتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবীর সাথে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উট এসে তাঁকে সাজদা করে। তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ সকল অবলা জীব-জানোয়ার ও বৃক্ষলতা আপনাকে সাজদা করে, কাজেই আমাদেরই অধিকার বেশি যে আমরা আপনাকে সাজদা করব। তখন তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং তোমাদের ভ্রাতাকে সম্মান কর। আমি যদি কাউকে অন্যের সাজদা করতে বলতাম তবে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে। অন্য হাদীসের বর্ণনায় তিনি বলেন: “কারো জন্য বৈধ নয় অন্যকে সাজদা করা”, অন্য হাদীসে: কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয় অন্য মানুষকে সাজদা করা; যদি কোনো মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সাজদা করা বৈধ হতো, তবে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে।^{১১৩}

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন:

إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَخْبَارِهِمْ وَعِلْمَانِهِمْ وَفَقَهَائِهِمْ فَقَالَ أَلَيْ شَيْءٌ تَقْعِلُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا تَحْيَةُ الْأَنْبِيَاءِ قُلْنَا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا فَلَمَّا قَمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مَعَاذُ؟ قَالَ إِنِّي أَتَيْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَقَسِيسِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَبَطَارِقِهِمْ وَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَخْبَارِهِمْ وَفَقَهَائِهِمْ وَعِلْمَانِهِمْ قَلْتُ لِأَلِيْ شَيْءٌ تَصْنَعُونَ هَذَا وَتَقْعِلُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا تَحْيَةُ الْأَنْبِيَاءِ قُلْنَا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: إِنَّهُمْ كَذَّبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَقُوا كِتَابَهُمْ (في رواية ابن ماجه: لَا تَفْعَلُوا) لَوْ أَمْرَتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأْمَرْتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“তিনি সিরিয়া গমন করেন। তথায় তিনি দেখেন যে, খৃস্টানগণ তাদের নেককার বুজুর্গগণ ও আলিমদেরকে সাজদা করে। তিনি বলেন, তোমরা কেন এরূপ কর? তারা উত্তরে বলে: এ হলো নবীগণের তাহিয়াহ বা সালাম। আমরা বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার আমাদের বেশি। তিনি যখন নবী (ﷺ)-এর নিকট প্রত্যাগমন করলেন তখন তিনি তাঁকে সাজদা করলেন। তিনি বলেন: হে মু'আয, এ কি? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করে দেখলাম যে, খৃস্টানগণ তাদের পাদরি, দরবেশ ও বিশপদের সাজদা করে এবং

^{১১৩} হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৩১০; ইবনু হিবান, আস-সহীহ ৯/৪৭০-৪৭৯; মাকদ্দিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৫/২৬৬। হাদীসটির সনদ সহীহ।

ইহুদীগণ তাদের আলিম ও বুজুর্গ ও ফকীহদের সাজদা করে। আমি বললাম, তোমরা এ কি কর? তারা বলে বলে, এ হলো নবীগণের সালাম। আমি বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার তো আমাদের বেশি। তখন নবীউল্লাহ (ﷺ) বলেন, ওরা ওদের নবীগণের নামে যিথ্যা বলেছে, যেমন ওরা নবীগণের কিতাব বিকৃত করেছে। তোমরা এরূপ করো না। আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম।”^{১৪৪}

অন্য হাদীসে কাইস ইবনু সাদ (রা) বলেন:

أَتَيْتُ الْحِيْزَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ قَلْتُ رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ
أَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَلَيْتَنِي رَسُولُ اللهِ قَلْتُ أَنِّي أَتَيْتُ الْحِيْزَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ
لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ، فَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ
بِغَيْرِي أَكْنَتْ سَجْدَةً لَهُ قَلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعِلُوا لَوْ كَنْتَ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ
لِأَحَدٍ لَمَرَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ

“আমি (পারস্যের সীমান্তবর্তী) হীরা নামক স্থানে গমন করি। আমি দেখলাম যে, তারা তাদের একজন নেতাকে সাজদা করছে। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকার বেশি যে তাঁর জন্য সাজদা করা হবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলি, ‘আমি হীরা গমন করে দেখলাম যে, তারা তাদের একজন নেতাকে সাজদা করছে। আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনারই অধিকার বেশি যে আপনার জন্য সাজদা করা হবে। তিনি বলেন, তুমি বলতো, তুমি যদি আমার কবরের নিকট গমন কর, তখন কি তুমি কবরকে সাজদা করবে? আমি বললাম: না। তিনি বলেন, তোমরা এরূপ করবে না, আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের সাজদা করতে অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীগণকে অনুমতি দিতাম তাদের স্বামিগণকে সাজদা করতে।’^{১৪৫}

উপরের হাদীসগুলি আলোচনা করে আল্লামা কুরতুবী বলেন:

وَهَذَا السُّجُودُ الْمُنْهَى عَنْهُ قَدْ أَخْذَهُ جَهَالُ الْمُنْصَوِفَةِ عَادَةً فِي سَمَاعِهِمْ وَعَنْ
خُولِهِمْ عَلَى مُشَايِخِهِمْ وَأَسْتَفَارِهِمْ فَيْرَى الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا أَخْذَهُ الْحَالُ بِرَعْسِهِ يَسْجُدُ
لِلْأَقْدَامِ لِجَهْلِهِ سَوَاءً أَكَانَ لِلْقُبْلَةِ أَمْ غَيْرَهَا جَهَالَةً مِنْهُ ضَلَّ سَعِيهِمْ وَخَابَ أَمْلَهُمْ

^{১৪৪} হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৯০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৯৫; হাইসামী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৪/৩০৯-৩১০। হাদীসটির সনদ সহীহ।

^{১৪৫} হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/২০৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।

“এ সকল হাদীসে যে সাজদা নিষেধ করা হয়েছে সে সাজদা জাহিল সূফীগণ তাদের রীতিতে পরিণত করেছে তাদের সামার মাজলিসে এবং তাদের পীর-মাশাইখের নিকট প্রবেশের সময়ে এবং তাদের দু'আ-ইসতিগফারের সময়ে। তাদেরকে আপনি দেখবেন যে, তাদের দাবিমত যখন তাদের কারো হাল এসে যায় তখন পায়ের কাছে সাজদায় পড়ে যায় কিবলামুখি অথবা অন্যমুখি হয়ে। তাদের মূর্খতার কারণেই তা তারা করে। তাদের কর্ম বিপ্রাত হয়েছে এবং তাদের আশা বিনষ্ট হয়েছে।”^{২১৬}

ইবাদতের বা ‘তায়িমের’ সাজদা ও তাহিয়াহ বা সালাম-সন্তানগুলক সাজদার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তাহিয়া বা সালামের সাজদা জাগতিক, লৌকিক ও মানবীয় সাধারণ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তা চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভঙ্গি নয়, বর সাধারণ ও লৌকিক ভঙ্গি। অলৌকিক ভয়, ভালবাসা বা ভঙ্গির কারণে মানুষ তা করে না, বরং লৌকিক শিষ্টাচারের অংশ হিসেবে তা করে। এর প্রচলন যে সমাজে রয়েছে সে সমাজের বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সকল মানুষই তার পিতা, মাতা, শিক্ষক, সমাজপতি বা রাজাকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন অন্য সমাজে দাঁড়িয়ে, মাথা ঝুকিয়ে বা স্যালুট দিয়ে এরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয়। এরূপ সাজদা পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল এবং ইসলামে তা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইবাদতের সাজদা হলো চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভঙ্গি। মানুষ যাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার কাছে নিজের চূড়ান্ত সর্বপৰ্ণ, অসহায়ত্ব ও অলৌকিক ভঙ্গি প্রদর্শনের জন্য এরূপ সাজদা করে। পিতা, মাতা, সমাজপতি, রাজা বা সাধারণ মানবীয় ক্ষমতা বা মর্যাদার অধিকারীকে কেউ এরূপ সাজদা করে না, বরং স্রষ্টা, স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বা সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য, ব্যক্তি বা ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থানেই সে এরূপ সাজদা করে। সকল শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এরূপ সাজদা করা সরাসরি শর্করক ও কুফ্র।

আল্লামা শাহীখ মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন ইবনু আলী আত-তুরী আল-কাদেরী আল-হানাফী (মৃ. ১১৩৮ হি) ‘তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক’ গ্রন্থে বলেন: “রাজা-বাদশার সামনে যে সাজদা করা হয় তা হারাম। যে করে এবং যে এরূপ কর্মে রায়ি থাকে উভয়েই পাপী। কারণ এ কর্ম মূর্তিপূজকদের অনুকরণ। সাদর শহীদ উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ সাজদার কারণে কাফির বলে গণ্য হবে না, কারণ সে শুধু সালাম বা সম্মান প্রদর্শনের

^{২১৬} কুরতুবী, জামি লি আহকামিল কুরআন ১/২৯৪।

উদ্দেশ্যে একৃপ করেছে। শামসুল আয়িম্মা সারাখসী বলেন: তায়ীম বা সম্মানপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো সাজদা করা কুফরী।”^{১১৭}

আল্লামা শামী তাঁর হাশিয়াতু রান্দিল মুহতার গ্রন্থে বলেন:

تَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَرَأَمُوا وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ أَشْمَانٌ
لَا يُشْبِهُ عِبَادَةَ الرَّوْثَنِ وَهُلْ يَكْفِرُانِ: عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالْعَظَمَيْمِ كُفَّرٌ وَإِنْ عَلَى وَجْهِ
الْتَّحْيَةِ لَا وَصَارَ أَنَّمَا مُرْتَكِبًا لِكَبِيرَةٍ

“আলিম ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে ভূমি-চূম্বন বা জমিন-বুসী করা হারাম। যে ব্যক্তি তা করে এবং যে তাতে রাজি থাকে উভয়েই পাপী; কারণ তা মৃত্তিপূজার অনুকরণ। এখন প্রশ্ন হলো: একৃপ ভূমি-চূম্বন-কারী এবং তাতে সন্তুষ্ট ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে কিনা? যদি ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তা করে তবে তা কুফর বলে গণ্য। আর যদি সালাম বা সম্ভাষণ প্রদানের জন্য করে তাবে কুফর হবে না, তবে একৃপ ব্যক্তি কবীরা গোনাহে লিঙ্গ বলে গণ্য হবে।”^{১১৮}

লক্ষণীয় যে, পিতা, মাতা, সমাজপতি, রাজা ও অন্যান্য জাগতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তাহিয়ার সাজদা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সালাম জ্ঞাপক সাজদার কল্পনা করা গেলেও নবী, ওলী বা অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত কারো ক্ষেত্রে বা কারো কবর-মায়ারের ক্ষেত্রে তাহিয়ার সাজদা কল্পনা করা যায় না। কারণ মানুষ যখন তার মাতা, পিতা, শিক্ষক বা রাজাকে সাজদা করে তখন সে কোনো অলৌকিক বা অপার্থিত ভয় বা ভক্তি নিয়ে তা করে না, বরং একান্তই জাগতিক ভয়, ভক্তি বা শিষ্টাচার হিসেবে তা করে। পক্ষান্তরে অলৌকিক ব্যক্তিত্বদেরকে কখনোই কেউ লৌকিক শিষ্টাচার হিসেবে সাজদা করে না, বরং অলৌকিক ও চূড়ান্ত ভক্তি হিসেবেই সাজদা করে। এজন্য চাঁদ, সূর্য, কবর, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিচিহ্ন, প্রতিকৃতি, মৃতি, পূজনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্যকে সাজদা করলে তা ব্যাখ্যাতীভাবে শিরক বলে গণ্য হবে।

আরো লক্ষণীয় যে, তাহিয়াহ বা শিষ্টাচারের সাজদার অস্তিত্ব মূলত ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুসলিম সমাজে ইবাদত হিসেবে আল্লাহকে সাজদা করা ছাড়া অন্য কোনো একৃপ সাজদার প্রচলন থাকে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মে ও সমাজেও মূলত অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, মৃতি, বন্ধু ইত্যাদিরই সাজদা করা হয়ে থাকে। এজন্যই মুসলিম উম্যাহর অধিকাংশ আলিম উভয় প্রকারের সাজদার মধ্যে কোনো একৃপ পার্থক্য না করেই আল্লাহ

^{১১৭} মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন তৃতীয়, তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক ৮/৩৬৪।

^{১১৮} ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রান্দিল মুহতার ৬/৩৮৩।

ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা সরাসরি কুফর বা শিরক বলে গণ্য করেছেন। আর যারা পার্থক্য করেছেন তারা একমত যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে তাহিয়ার সাজদা করা হারাম এবং এরপ হারাম কর্মকে বৈধ বলে মনে করা কুফর।

৫. ৫. ২. ২. গাইরস্ত্বাহর জন্য তাওয়াফ

কোনো কিছুর চারিদিকে আবর্তন করাকে তাওয়াফ বলা হয়। সাজদা ও সালাতের মতই তাওয়াফ একটি ইবাদত। সালাত-সাজদা ও তাওয়াফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশ্বের যে কোনো স্থানে থেকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে আল্লাহর জন্য সালাত ও সাজদার ইবাদত আদায় করা যায়। পক্ষান্তরে আবর্তন বা তাওয়াফের ইবাদত একমাত্র কাবা গৃহের চারিদিকে আবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য এ ইবাদত পালন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلْيَطْوُفُوا بِالنِّبْتِ الْعَنْبِقِ

“এবং তারা তাওয়াফ করুক প্রাচীন গৃহের।”^{২১৯}

কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা দুভাবে হতে পারে:

প্রথমত, মহান আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালবাসা ও ভয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি প্রকাশের জন্য, অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা। এরপ করা কঠিন হারাম ও নিষিদ্ধ, যেমন মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। কেউ যদি কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর ইবাদত হিসেবে তাওয়াফ করা বৈধ মনে করে তবে তা শিরক ও কুফর বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য কোথাও তাওয়াফ করা। এরপ করা সুস্পষ্টতই শিরক, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তা'য়ীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাকে সামনে রেখে তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। লক্ষণীয় যে, শুধু আল্লাহকে খুশি করতে এবং তাঁরই প্রতি ভক্তি জানাতে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে কেউই তাওয়াফ করে না। যারা কোনো কবর, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা অন্য কিছুর তাওয়াফ করেন তারা আল্লাহর ইবাদতের কথা বললেও পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁর নেক-নজর লাভেরও উদ্দেশ্য তাদের থাকে। নইলে কাবা ঘর বাদ দিয়ে অন্যত্র তাওয়াফ করবেন কেন?

^{২১৯} সূরা (২২) হাজ্জ: ২৮ আয়াত।

৫. ৫. ২. ৩. গাইরস্থাহকে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা

আমরা ইতোপূর্বে দু'আ, সাহায্য প্রার্থনা, আগ প্রার্থনা ইত্যাদির লৌকিক ও অলৌকিক পর্যায়গুলি আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য উপস্থিতি কোনো মানুষ, জিন্ন বা ফিরিশতার কাছে লৌকিক ও জাগতিক সাহায্য ও আগ প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু অলৌকিক আগ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যায় না। দূরে অবস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে লৌকিক বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া শিরক।

আমরা আরো দেখেছি যে, ইহুদী, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকগণের অন্যতম শিরক ছিল সাধারণ বিপদে আপদে ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ, ওলীগণ বা অন্যান্য কাল্পনিক দেব দেবীদের ডাকা ও তাদের কাছে সাহায্য ও আগ প্রার্থনা করা। তারা সকলেই বিশ্বাস করত যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান প্রতিপালক এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার নেই। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল বান্দাকে আল্লাহ কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আল্লাহ এদের সুপারিশ শুনেন এবং এদের ডাকলে তিনি খুশি হন। অবিকল একইরূপ বিভ্রান্তির কারণে মুসলিম সমাজেও এ ধরনের শিরক প্রসার লাভ করেছে। শাহ ওয়ালি উল্লাহর বক্তব্যে আমরা তা দেখেছি।

অগণিত মিথ্যা কল্প-কাহিনী, জনক্ষতি ও শেষ যুগের কোনো কোনো আলিম নামধারী ব্যক্তির মতামতই এরূপ শিরকে লিঙ্গ মানুষদের একমাত্র দলীল। এগুলির বিপরীতে একমাত্র আল্লাহকে ডাকার জন্য কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনার কোনো মূল্যই তারা দেন না। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভী বলেন: “কবর পূজারিগণ যে সমস্ত কারণে কবর পূজা করিয়া থাকে উহাদের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হইল নিজেদের কুকর্মের সমর্থনে মিথ্যা হাদীস সৃষ্টি করা নিজেদের মনগড়া এই জাতীয় হাদীস প্রচার করিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়া আল্লাহর পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। কবর পূজারী সম্পন্দায় তাহাদের কুকর্মের সমর্থনে যে সমস্ত অলীক ও মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে উহা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। যেমন তাহারা বলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়িয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। মুক্তির কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অমুক দরবেশের মাজারে গিয়া বিপদযুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। কি আশ্চর্য! সেই দরবেশ তাহাকে দুই-একদিনের মধ্যে সমস্ত বিপদাপদ দূর করিয়া দেয়। অমুক ব্যক্তি আসমানী বালায় নিপতিত হইলে অনেন্যপায় হইয়া অমুক

কবরের দরবেশকে একাধিতার সাথে স্বরণ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে আসমানী বালা দূর হইয়া যায়। এমনকি কেহ কেহ নিজের কথাও বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক বিপদে পতিত হইয়া শেষ চেষ্টা স্বরূপ অমুক পীরের মাজারে নয়র-নেওয়াজ লইয়া গিয়া তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দেয়.....

নাউয়বিল্লাহ! আল্লাহ আমদের সকলকে এই শিরক ও বিদআত হইতে নিরাপদ রাখুন।... ঘর হইতে পা বাড়াইলেই যে আল্লাহর খালেছ ইবাদতখানা মসজিদ সেখানে যাওয়ার কষ্টটুকু ইহারা স্বীকার করিতে চায় না। অথচ মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন ইঠিয়া গিয়া কবরের নিকট ধর্ণ দিয়া পড়িয়া থাকাকেই শ্ৰেয় মনে করে।... ইহারা যদি কবরে না গিয়া রাস্তাঘাট, হাট-বাজার অথবা গোসলখানায় বসিয়াও এমন কাকুতি-মিনতি ও একাধিতার সাথে কান্নাকাটি করিয়া যুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিত তবুও আল্লাহ তাদের দোআ করুল করিতেন, তাহাদের দু'আ ব্যর্থ হইত না। সুতরাং এই অবস্থায় কবরের বুঝগী ও প্রভাব মনে করা অজ্ঞতা ও কুসং্ক্ষণ ব্যতীত কিছই নহে। আল্লাহ বিপদাপন্নের দোআ যে সকল সময়ই করুল করিয়া থাকেন ইহা এই অঙ্গেরা বুঝিতে চায় না। এমন কি কাফেরেও যদি আল্লাহর নিকট একাধিতার সাথে দোআ করে আল্লাহ তাহাও করুল করিয়া থাকেন।...।”^{২২০}

কেউ কেউ এরূপ শিরককে ‘ওসীলা ধরা’ বলে চালাতে চান। তারা বলেন যে, যারা বিপদে আপদে ওলীগণের নাম ধরে ডাকেন ও সাহায্য চান, তাঁরা মনে করেন না যে, ওলীগণের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, বরং সকলেই জানে যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান। তবে তারা আল্লাহর কাছে ওসীলা হিসেবে এদের ডাকেন। আমরা দেখেছি যে আরবের মুশরিকগণও ঠিক একইরূপ যুক্তি পেশ করত। কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আর অনুপস্থিত কারো কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়ার মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য। প্রথম কর্ম শিরক নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি সুস্পষ্ট শিরক।

প্রসিদ্ধ তাফসীর-ঘৃত ‘রহুল মা’আনী’র প্রণেতা আল্লামা শিহাব উদ্দীন মাহমুদ আল আলুসী আল-হানাফী (১২৭০ হি) তাঁর তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিরকের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي يُسِرِّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَقِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
بِرِيحٍ طَبِيعَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءُنَّهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءُهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ أَحْيَطُ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ لِنَّمِنْ أَنْجَيْتُمَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونُنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ

^{২২০} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগ্ত মুবীন, প. ৪৪-৪৭।

“তিনিই তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমন করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলি আরোহী লয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেশিষ্টত হয়ে পড়েছে বলে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে: তুমি আমাদেরকে আগ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।”^{২২১}

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী (রাহ) বলেন: “এ আয়াত প্রমাণ করে যে, এরূপ অবস্থায় মুশরিকগণ মহান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকত না। আর আপনি ভালই অবগত আছেন যে, আজকাল মানুষেরা কি করে! জলে বা স্থলে যখন কোনো কঠিন বিপদ বা বড় কোনো সমস্যার মধ্যে তারা নিপত্তি হয় তখন তারা এমন ব্যক্তিদেরকে ডাকে যারা কোনো ক্ষতি করেন না এবং উপকারও করেন না, যারা দেখেনও না এবং শুনেনও না। তাদের কেউ খিয়ির এবং ইলিয়াসকে ডাকে। আর কেউ আবুল খামিস এবং আবুস (আ)-কে ডাকে। কেউ বা কোনো একজন ইমামকে ডাকে। কেউ বা উস্মাতের বুজুর্গ-মাশাইথের মধ্য থেকে কারো কাছে আকৃতি আবেদন পেশ করে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখবেন না যে শুধু তার মালিক-মাওলাকে ডাকছে এবং শুধু তাঁর কাছেই আকৃতি আবেদন পেশ করছে। সম্ভবত তার মনের কোনে একবারও এ চিন্তা উকি দেয় না যে, যদি সে একমাত্র আল্লাহকে ডাকত তবে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত। হে পাঠক, আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার মুশরিকগণ এবং বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কোন দল অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত? উভয় প্রার্থনাকারী ও আহ্বানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর সত্য? আল্লাহর নিকটেই মনোবেদন জ্ঞাপন করছি এমন এক যুগে, যে যুগে অজ্ঞতার প্রবল ঘূর্ণিঝড় সকলকে আচ্ছন্ন করেছে, বিভ্রান্তির প্রবল চেউ বিশাল আকৃতি নিয়ে আছড়ে পড়েছে, শরীয়তের নৌকার রশি ছিন্ন হয়েছে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য ও আগ প্রার্থনাকেই মুক্তির ওসীলা রূপে গণ্য করা হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য সৎকাজে আদেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নানপ্রকারের বিপদ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।”^{২২২}

৫. ৫. ২. ৪. গাইরুল্লাহর জন্য মানত-নথর বা উৎসর্গ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, উৎসর্গ, জবাই, কুরবানী ইত্যাদি শিরক। জীবিত বা মৃত কোনো

^{২২১} সূরা (১০) ইউনুস: ২২ আয়াত।

^{২২২} আলুসী, রুহুল মাআনী ৭/৪৭১।

পীরের নামে, বাবার নামে, ওলীর নামে, তাঁর মাধ্যারের নামে মানত করা, জবাই করা, মানত বা উৎসর্গের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পোষণ করা এ পর্যায়ের শিরক।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (১০৮৮ হি) আদ-দুরুরুল মুখ্যতার গ্রন্থে বলেন:

وَاعْلَمُ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقْعُدُ لِلْأُمَّوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّيْعَةِ
وَالزَّيْنَتِ وَتَحْرِرُهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأُولَئِيَّةِ الْكَرَامِ تَقْرُبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ باطِلٌ وَحَرَامٌ مَا
لَمْ يَقْصِدُوا صِرْفَهَا لِفَقَرَاءِ الْأَنَامِ وَقَدْ أَبْلَغَتِ النَّاسُ بِذَلِكَ ، وَلَا سِيمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ

“জেনে রাখ, মৃতদের জন্য নয়-মানত যা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ করে থাকে এবং আওলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যার-কবরের জন্য যে সব টাকাপয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য তা সবই বাতিল ও হারাম বলে ইজমা হয়েছে। যদি না তারা দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য তা ব্যয় করার মানত করে। মানুষেরা এরূপ নিষিদ্ধ নয়-মানতের মধ্যে নিপত্তি হয়েছে, বিশেষত বর্তমান যুগে।”^{২২৩}

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী (১২৫২ হি) “হাশিয়াতু রাদিল মুহতার” গ্রন্থে বলেন:

قُولُهُ (تَقْرُبًا إِلَيْهِمْ) كَانَ يَقُولُ يَا سَيِّدِي فُلَانْ إِنْ رَدَّ غَائِبِي أَوْ عَوْفِي مَرِيضِي أَوْ
قُصْبَيْتَ حَاجَتِي فَلَكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفَضَّةِ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ الشَّيْعَةِ أَوْ الزَّيْنَتِ ... ()
قُولُهُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ) لَوْجُوهَ: مِنْهَا أَنَّهُ نَذْرٌ لِمَخْلُوقٍ وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ
عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيْتَ وَالْمَيْتُ لَا يَمْتَكَ. وَمِنْهَا
أَنَّهُ إِنْ طَنَّ أَنَّ الْمَيْتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأَمْوَالِ نُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِقَادَهُ ذَلِكَ كُفْرٌ

“আওলিয়া কেরামের মাধ্যারে তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য মানত করার ধরন এই যে, মানতকারী বলবে, হে অমুক হজুর বা অমুক বাবা, যদি আমার হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে বা আমার অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় বা আমার হাজত পূর্ণ হয় তবে তোমার জন্য অমুক পরিমান স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, মোমবাতি বা তেল দেব। এ প্রকারের মানত বাতিল ও হারাম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে:

প্রথমত, তা মাখলুক বা সৃষ্টির জন্য নয়-মানত করা, আর কোনো সৃষ্টির জন্য মানত-নয়র জায়েয় নয়। কারণ মানত-নয়র ইবাদত এবং কোনো মাখলুকের বা সৃষ্টির ইবাদত করা যায় না।

^{২২৩} ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদিল মুহতার ২/৪৩৯-৪৪০।

দ্বিতীয়ত, যার জন্য মানত করা হয়েছে তিনি মৃত । আর মৃত ব্যক্তি কোনো মালিকানা লাভ করতে পারে না ।

তৃতীয়ত, এরূপ মানতকারী ধারণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া মৃত মানুষও কাজে কর্মে বা দুনিয়ার পরিচালনায় কিছু করতে পারেন, আর তার এ আকীদা কুফর ।^{২২৪}

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি) ‘আল-বাহরুর রায়িক’ গ্রন্থেও একই কথা বলেছেন ।^{২২৫}

যারা কবরে, ম্যারে আউলিয়ায়ে কেরামের নামে মানত বা জবাই করেন তাদের অনেকে মনে করেন যে, আমরা তো একমাত্র আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করছি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত করছি, কেবলমাত্র পন্ডটাকে বাবার বা ওলীর মায়ারে এনে জবাই করছি, যেন তিনি সাওয়াব পান । এখানে প্রশ্ন হলো, যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত বা জবাই করা হয় তাহলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে জবাই করেই তো নিয়াত করা যেত যে, আল্লাহ এ সাদকার সাওয়াবটি অমুককে পৌছে দিন, এত কষ্ট করে পন্ডটি মায়ারে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? মাজার ময়লা করতে?

বাহ্যত এ কষ্টের কারণ হলো, পৃথিবীর যে কোনো স্থানে জবাই করলে তো আল্লাহ পাবেন, কবরস্থ ওলী বা ‘বাবা’ সরাসরি পাবেন না, আল্লাহর মাধ্যমে পাবেন । আর ম্যায়ারে নিয়ে জবাই করলে এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে, আল্লাহর প্রতি ভক্তিও প্রকাশ করা হবে এবং কবরস্থ ‘বাবার’ প্রতি ভক্তিও প্রকাশ করা হবে । যদিও দ্বিতীয়টিই মূল উদ্দেশ্য এবং সে জন্যই এত কষ্ট করা, তবে আল্লাহকে শরীক রাখলে অসুবিধা নেই, এতে ‘বাবা’ নারায় হবেন না!!

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলসী বলেন: “মহান् আল্লাহ বলেছেন^{২২৬}: ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না...।’” যারা আল্লাহর ওলীগণের বিষয়ে বাড়াবাঢ়ি করে এখানে তাদের নিন্দার প্রতি ইশারা করা হয়েছে; কারণ তারা বিপদে আপদে তাদের নিকট ত্রাণপ্রার্থনা করে এবং মহান আল্লাহর নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করা থেকে গাফিল থাকে এবং এ সকল ওলীর জন্য তারা ন্যর-মানত করে । তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা বলে, এ সকল ওলীরা হলেন আল্লাহর নিকট আমাদের ওসীলা । এবং বলে যে, আমরা আল্লাহর জন্যই ন্যর-মানত

২২৪ ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রান্দিল মুহতার ২/৪৩৯ ।

২২৫ ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ২/৫২০ ।

২২৬ সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৩ আয়াত ।

করি এবং এর সাওয়াব ওলীর জন্য প্রদান করি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাদের প্রথম দাবির বিষয়ে তারা মৃত্তিপূজকদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মৃত্তিপূজকদের মতই, যারা বলত^{২২৭}: আমরা এদের ইবাদত করি তো এজন্যই যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে।'

তাদের দ্বিতীয় দাবিটি আপত্তিকর হবে না, যদি তারা এরূপ মানতের মাধ্যমে ওলীগণের নিকট থেকে তাদের অসুস্থ্যজ্ঞদের সুস্থতা, তাদের হারানো মানুষের প্রত্যাবর্তন বা অনুরূপ কোনো হাজত প্রার্থনা না করে। কিন্তু তাদের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে যে, তারা এদের নিকট মানতের দ্বারা এরূপ কিছুই প্রার্থনা করে। এর প্রমাণ এই যে, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর জন্য মানত কর এবং এর সাওয়াব তোমাদের পিতামাতার জন্য দান কর, কারণ এ সকল ওলী-আউলিয়ার চেয়ে তোমাদের পিতামাতাগণেরই সাওয়াবের প্রয়োজন বেশি, তবে তারা তা করবে না। আমি এদের অনেককে দেখেছি যে, তারা ওলীগণের কবরের পাথরের বেদিমূলে সাজদা করছে।

এদের অনেকে দাবি করে যে, সকল ওলীই তাদের কবরে বসে দুনিয়া পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন, তবে তাদের বেলায়াতের মর্তবী অনুসারে তাদের ক্ষমতার কমবেশি রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বিশ্ব পরিচালনা এরূপ ক্ষমতা ৪ বা ৫ জন কবরবাসীর জন্য সীমাবদ্ধ করেন। তাদের নিকট যদি প্রমাণ চাওয়া হয় তবে তারা বলেন, কাশফ দ্বারা তা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ এদের ধৰ্ম করুন! এরা কত বড় জাহিল!! আর এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি কত ব্যাপক!!!

তাদের মধ্যে অনেকে দাবি করে যে, এ সকল ওলী-আউলিয়া তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করেন। তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বলে, এ সকল ওলীর রূহ প্রকাশিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায় এবং কখনো কখনো তারা বাঘ, সিংহ, হরিন বা অনুরূপ প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে। এ সবই ভিত্তিহীন বাতিল কথা। কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাতের প্রথম যুগে ইমামগণের কথার মধ্যে এর কোনো অঙ্গিত নেই। এ সকল মিথ্যাচারী মানুষে দীন-ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে। ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য বাতিল ও বিকৃত ধর্মের মানুষদের নিকটেও এরা হাসি-মক্ষরার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি বাতিল মতবাদ ও নাস্তিকতার অনুসারীরাও এদের নিয়ে হাস্যকৌতুক করে। আমরা আল্লার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।"^{২২৮}

^{২২৭} সূরা (৩৯) যুমারের ৩ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

^{২২৮} আল-সূরা, রুহুল মা'আনী ১৩/১৫৫।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী তাঁর 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে বলেন: "কবর পূজারীদেরকে পীর পুরস্ত বা পীর পূজারীও বলা হয়। কবর পূজারী সম্প্রদায় কবর পূজাকে ফরয ইবাদত তথা নামায, রোয়া, হজু, যাকাত ইত্যাদি হইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সুন্নত ইবাদত ও অযৌক্ষা করার চেয়ে কবর পূজাকে অধিক ফাঈলতপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ মনে করে। তাই তাহারা কবর পূজাকে যে কোন প্রকার ইবাদতের পরিবর্তে করিয়া থাকে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত তারা কিন্তু কবর পূজার পরিবর্তে আল্লাহর কোন ইবাদতকে গুরুত্ব দেয় না এবং উহাকে যথেষ্ট মনে করে না। যখন কোন বুয়র্গের উরশ বা মেলা ইত্যাদি হয় তখন সেখানে বহু দূর দূরান্ত হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। এই ক্ষেত্রে কবর পূজারীরা সেই মেলায় উপস্থিত হওয়া ফরয ইবাদত মনে করে এবং অন্যান্য ফরয অর্জনকরার চেয়ে এটাকেই অধিক প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে।"

কবর পূজারীদের আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জঘন্যময় কাজ হইল যাবতীয় পাথির বিপদাপদ ও সঙ্কটময় কাজের সমাধান হওয়ার জন্য কবরের নিকট গিয়া এমন বিনয়তা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে যে, মসজিদে বা অন্য কোথাও আল্লাহকে হায়ির নায়ির মনে করিয়া উহার শত ভাগের এক ভাগও করে না। কবরে শায়িত বুয়র্গের নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকে এবং দোআ করে এবং তাহার নিকট জীবিকা ও সন্তানাদি কামনা করে। অত্যন্ত বিনয় ও মনযোগের সহিত মাথানত (করিয়া) কাপড়ের গেলাফ এবং চাদর লাগায়; কবরের উপর সুগন্ধি ছড়ায়। পৃষ্ঠ্যের কাজ মনে করিয়া লোবান, আগর বাতি জুলায় এবং কবরকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে। এই অথথা কাজে পীরের আত্মাকে খুশী করার নিয়তে তাহার সানিধ্য লাভের চেষ্টা করে। আপাতৎস্মৃতি দেখা যায় যে হিন্দু ও মুশরিক সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার জন্য যেভাবে অর্চনা করিয়া থাকে ঠিক সেই ভাবেই এই কবর পূজারিগণও সেই সমস্ত কাজকে পুণ্যময় মনে করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।"^{২২৯}

৫. ৫. ২. ৫. তাবারুক বিষয়ক শিরক

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকদের মধ্যে তাবারুক বিষয়ক শিরক বিদ্যমান ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো নেককার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রুব্য বা স্থানকে স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শিরক নয়। তবে যখন মানুষ উক্ত স্মৃতি বিজড়িত দ্রুব্য বা স্থানকে বরকরতে উৎস বলে মনে

^{২২৯} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ১৮।

করে, তার সামনে 'চূড়ান্ত ভঙ্গি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে', উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের মালিকের আত্মা থেকে কোনো নেক নয়র আশা করে তখন তা শিরকে পরিণত হয়। তাবারুক্কের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বিদ'আত বা খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে তাবারুক্ক করলে তা থেকে শিরকের ঘাধ্যে নিপত্তিত হওয়ার সম্মত সম্ভাবনা থাকে।

তাবারুক্কের সুন্নাত পদ্ধতি আমরা জানতে পারি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের কর্ম থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সবচেয়ে মূল্যবন ও বরকতময় স্মৃতি ছিল পবিত্র কাবা ঘর এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাজার আসওয়াদ, রুক্ন ইয়ামানী, মাকাম ইবরাহীম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার আসওয়াদে চুম্বন করেছেন। এ চুম্বন আল্লাহর নির্দেশ ও ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের চুম্বন, পাথর থেকে, বা পাথরের কারণে ইবরাহীম (আ) থেকে কোনো বরকত, দু'আ, কল্যাণ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য নয়। সাহাবীগণও কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ও সুন্নাত পালনের জন্যই তা চুম্বন করেছেন, পাথর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। উমার (রা) হাজার আসওয়াদ চুম্বন কালে বলেন:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَلْتَكَ

“আমি জানি যে, তুমি পাথর মাত্র, কোনো ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না, যদি না আমি দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে চুম্বন করেছেন, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।”^{১৩০}

‘মাকামে ইবরাহীম’ ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত বরকতময় পাথর। কুরআন কারীমে একে সুস্পষ্ট নির্দেশ বলা হয়েছে এবং এর পিছনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ কখনোই সালাত আদায় করা ছাড়া কোনো ভাবে এ পাথরকে সম্মান করেন নি। কখনোই একে চুম্বন করেন নি, পানি দিয়ে ধূয়ে তা পান করেন নি বা অন্য কোনোভাবে একে সম্মান প্রদর্শন করেন নি।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর দেখেন যে, তাবিয়া যুগের কিছু নও মুসলিম মাকামে ইবরাহীমে হাত বুলাচ্ছেন। তাঁরা এভাবে বরকতময় স্মৃতি-বিজড়িত দ্রব্যটিকে সম্মান করছিলেন। তখন তিনি বলেন:

لَمْ تُؤْمِرُوا بِهَذَا إِنَّمَا أَمْرِتُمْ بِالصَّلَاةِ

“তোমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র সালাত

^{১৩০} বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৭৯; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯২৫।

আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”^{১৩১}

সুন্নাত নির্দেশিত স্থানগুলি-হাজার আসওয়াদ ও রুকন ইয়ামানী ছাড়া পবিত্র কাবাগৃহের অন্য কোনো স্থান চূম্বন, হাত বুলানো বা অন্য কোনোভাবে তাঁরা ‘তাবাররুকের’ চেষ্টা তাঁরা কখনো করেন নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ওয়ুর পানি, গায়ের ঘাম, কফ, খুতু, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা তাঁর দেওয়া যেকোনো উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের এসকল কাজে বাধা দেননি, অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুজুর্গ ও রাসূল-প্রেমিক মুসলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো দ্রব্যের প্রতি তাঁদের হন্দয়ের আবেগ ও ভালবাসা কখনো গোপন করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সাহাবীগণ কোনো সাহাবীর বা অন্য কোনো বুজুর্গের বা পূর্ববর্তী কোনো নবী-গুলীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্যের প্রতি এধরনের আচরণ করেননি। তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণও কখনো কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেননি। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবুআস, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, বেলাল, ইবনু মাসউদ (رض) বা অন্য কোনো সাহাবীর কোনো স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ী তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরপভাবে, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী বুজুর্গগণের ক্ষেত্রেও তাঁরা এ ধরনের কোনো আচরণ করেননি।^{১৩২}

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য যেকোন মু'মিনের ভালবাসা ও ভক্তির বিষয়, তেমনি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি ও মু'মিনের ভক্তি ও ভালবাসার স্থান। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ শয়ন করা, যেখানে তিনি ইস্তিখ্রা করেছেন সেখানে ইস্তিখ্রা করা। এমনি যেখানে তিনি ফরয সালাত আদায় করেছেন সেখানে তাঁরা নফল সালাত আদায় করতেন না, বরং তিনি যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন তাই সেখানে আদায় করার চেষ্টা করতেন। এমনকি তিনি হজ্জ-উমরার সফরে যেখানে সালাত আদায় করেছেন, সেখানে তাঁরা হজ্জ-উমরার সফরেই শুধু সালাত আদায় করতেন, অন্য সময়ে শুধু সেখানে সালাত আদায় করার জন্য যেতেন না। অর্থাৎ সাহাবীগণ

^{১৩১} ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৪১৬।

^{১৩২} দেখুন: শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৪৮১-৪৮৫।

তাবারকুক করতেন ছবছ অনুকরণের মাধ্যমে। এ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি আমার এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শুধু দ্ব্যা বা স্থানকে ভক্তি করা বা তার প্রতি অলৌকিক ভক্তি প্রকাশের প্রবণতা তাঁরা কঠোরভাবে আপত্তি করতেন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারকু (রা) তাঁর খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা সবাই একটি স্থানের দিকে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? তাঁকে বলা হয়: ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, এখানে একটি মসজিদ বা নামাযের স্থান আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেছিলেন, এজন্য এরা সেখানে যেয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি বলেন :

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا، يَتَبَعُونَ آثَارَ أَبْيَانِهِمْ فَيَنْخُذُونَهَا
كَنَاسٍ وَبَيْعًا. مَنْ أَذْرَكَنَّهُ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلَيُصِلَّ، وَمَنْ لَا، فَلَيَمْضِ،
وَلَا يَتَعَدَّهَا.

“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তো এই ধরনের কাজ করেই ধৰ্মস হয়েছে। তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি খুঁজে বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও ইবাদতখানা তৈরি করে নিত। যদি কেউ যাত্রা পথে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত) এসব মসজিদে নামাযের সময়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে। আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সে না থেমে চলে যাবে। বিশেষ করে এসকল মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না।”^{১৩০}

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবী (রাহ) উমার (রা)-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: “হ্যারত ওমার (রা)-এর বর্ণনা মতে প্রমাণিত হয় যে, এই যুগে মানুষ যে সমস্ত নকশাকৃত পাদুকা এবং হাতের ছাপ মারা পাথর বা এই জাতীয় কিছু কোন একস্থানে পুতিয়া প্রচার করে যে, ইহা অমুক বুঝগ্রের হাত বা পদচিহ্ন সম্পর্কিত বরকতময় পাথর। ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ সেই পাথর যিয়ারত করার জন্য বহু দূর দূরান্ত হইতে আসে এবং সেখানে নয়র নিয়ায় করিয়া মনোবঙ্গ পূর্ণ হওয়ার জন্য নিবেদন পেশ করে। নিঃসন্দেহে ইহা বিদ্যাত ও সুন্নাতের বরখেলাফ। শরীয়ত মৌতাবেক যখন এই সমস্ত বক্ষগুলি যিয়ারত করা এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা সুন্নাতের পরিপন্থী তখন উহার নিকট দোআ করা, কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করা এবং মনোবঙ্গ পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা কোনমতেই তো জায়েয হইতে পারে না।

^{১৩০} ইবনু ওয়াদ্দাহ, আল-বিদাউ, ৪১-৪২, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৫৬৯, শাতেবী, ইতিসাম ১/৪৪৮-৪৪৯।

বরং ইহা পরকালে মুক্তির ও নাজাতের পথকে বক্ষ করিয়া দেয়।

উল্লেখিত বন্ধসমূহ এবং উহা ছাড়া ইবাদতের আশায় সেখানে যাহা কিছু স্থাপিত করা হয়, উহা ভাঙিয়া (ফেলা) ও উহার মূলোৎপাটন করা প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য।”^{২৩৪}

তিনি আরো বলেন: “আমাদের বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত ও বিগলিত না হইয়া পারে না। আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশিত সহজ সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত গোমরাহীর পথে চলিতেছি। যে সমস্ত পাথের ও স্থানসমূহ বুর্যগগণের সাথে সম্পর্কিত উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাযীম তাকরীমে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। শিরক ও বিদ্যাতে লিঙ্গ হইতে আমাদের অন্তর কোন সময় ভয়ভীতি অনুভব করে না। এই সমস্ত স্থান ও বন্ধসমূহকে নিজেদের কিবলাহ, মাকসুদ ও মনের আশা আকাঞ্চা পূর্ণ হওয়ার একমাত্র উৎস মনে করিয়া বহুদূর দূরান্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সেইখানে আসিয়া লোকজন উপস্থিত হয়। নয়র নেওয়া দিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, সুগন্ধি ছড়াইয়া, আলো জ্বালাইয়া বুর্যগদের আত্মার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। তেমনিভাবে এই সমস্ত লোক বুর্যগদের তাসবীহ, লাঠি, পাদুকা এবং অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসকেও ঐ বুর্যগের স্থলাভিষিষ্ঠ মনে করে।

এই যুগে যদি কোন পীরের লাঠি, পাগড়ী, পাদুকা বা জামা কাপড় কিছু পায় তবে উহা অতি সম্মানের সাথে কোন উচ্চাপনে সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানটিকে যিয়ারত করার জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়া উহাকে দরগাহ শরীফে পরিণত করে। এই সমস্ত বন্ধ সমস্কে কোন কোন লোক প্রপাগাণ্ডা করিয়া বলিয়া থাকে, আমি অমুক বুর্যগের ব্যবহৃত পাদুকা দ্বারা এমন উপকার পাইয়াছি যাহা বর্তমান যুগের জীবিত বুর্যগদের নিকটও পাওয়া যায় না।

এই কপটতা এমন এক স্তরে দাঁড়ায় যে, বুর্যগগণ যখন তাহাকে এই জাতীয় শরীয়ত বিরোধী অন্যায় কাজ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন তখন তাহারা নানা প্রকার ওয়র-আপত্তি, টাল-বাহান ও বুর্যগদের প্রতি মহৱত পোষণের বাহানা অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া থাকে- এই জাতীয় কথা আমরা তাহাদের প্রতি মহৱতের দরকনই বলিয়া থাকি। পরে যখন এই কপটতার রোগ সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন এই জাতীয় লোকেরা প্রকাশ্য শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। যাহারা তাহাদের এই সমস্ত কাজে তাহাদিগকে বাধাদান করে তখন তাহারা বাধাদানকারীদের বিরক্তে অপপ্রচার করিয়া বলিতে থাকে- ইহারা আল্লাহর অলীদের মত ও পথের বিরোধী তাহাদের কাশফ কেরামত

^{২৩৪} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগ্ত মুবীন, পৃ. ৩২-৩৩।

অস্বীকার করে। যেমন ইহুদীগণ হ্যরত ঈসা (আ)-কে হ্যরত ওয়ায়ের (আ)-এর অস্বীকারকারী ও বিরোধী এবং মুসলমানদেরকে হ্যরত ঈসা (আ)-এর শক্তি ও বিরোধী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। এই পথভৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হ্যরত ঈসা (আ) এতটা অপরাধীই ছিলেন যে, তিনি হ্যরত ওয়ায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। মুসলমানদের অপরাধ-তাহারা হ্যরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর সন্তান বলিয়া মানে না।

মোট কথা প্রতিটি গোমরাহ সম্প্রদায়ই হিদায়তের প্রাণ্ডি শরীয়তের অনুসারী লোকদিগকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। এই প্রকার অপমান করার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে জন সমাজে বলিয়া বেড়ায় যে, এই সমস্ত লোক অমুক অলীর বিরোধী ও শক্তি, তাহার যত ও পথকে ইহারা বিশ্বাস করে না। যক্ষার মুশারিকগণও ভয়ের (﴿﴾) এবং সাহাবা কিরামদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিত। তাহারা নবীবরকে (﴿﴾) সাবী অর্থাৎ বেদীন এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধী ও শক্তি বলিয়া লোক সমাজে বলিয়া বেড়াইত।”^{২৩৫}

শাহ ওয়ালি উল্লাহ আরো বলেন: “শয়তান আদম সন্তানদের আদিম ও অকৃত্রিম শক্তি। সে প্রতি যুগে প্রতি স্থানে প্রথমে কোন আল্লাহর বন্ধুর কবরকে ভঙ্গি-শৃঙ্খা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া লয়। তারপর একমাত্র উপাস্য আল্লাহকে বাদ দিয়া পূজা-পার্বনের জন্য ঐ কবরটিকে প্রতিমা বা মূর্তিতে পরিণত করে। ইহার পর শয়তান তাহার সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের মধ্যে জোর গলায় প্রচার করিতে আরম্ভ করে যে, যাহারা এই কবরের পূজা পার্বন, উহার পাশে ওরস ও মেলা করিতে বারণ করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে এই বুয়র্গের শক্তি। তাহারা এই বুয়র্গকে অসম্মান করার এবং তাহার প্রাপ্য হক তাহাকে না দেওয়ার জন্যই এইরূপ করিতেছে। শয়তানের এই অপপ্রচারে উত্তেজিত হইয়া একদল অজ্ঞ ও ইলম বিবর্জিত লোক এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। এমনকি তাহাকে হত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহাদের প্রতি কুফরী ফতওয়া দেয়, তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে বন্ধপরিকর হয়। বাধা প্রদানকারীদের দোষ কি? তাহাদের দোষ হইল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যে কাজ করার নির্দেশ দিয়াচেন তাহারা জন সাধারণকে সেই কাজ করার জন্য আহ্বান করেন। আর যে কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন- উহা করা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন।”^{২৩৬}

^{২৩৫} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৩৭-৪০।

^{২৩৬} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৪৩।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হৃদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের বাইয়াত গ্রহণ করেন, যে বৃক্ষের কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে^{২৩৭}। এ বৃক্ষ প্রসঙ্গে ইবনু উমর (রা) বলেন: হৃদাইবিয়ার সন্ধির বাইয়াতে রেদওয়ানের পরের বৎসর আমরা যখন উমরা পালনের জন্য আবার ফিরে আসলাম তখন আমাদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবীও এ গাছটির নিচে একত্রিত হয়নি। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ছিল।^{২৩৮}

অন্য হাদীসে নাফে' (রাহ) বলেন: কিছু মানুষ হৃদাইবিয়ায় ‘বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ’ নামে কথিত গাছটির নিকট আসত এবং সেখানে সালাত আদায় করত। খলীফা উমর (রা) এ কথা জানতে পারেন। তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শান্তির ভয় দেখান। পরে তিনি এ গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মতো গাছটি কেটে ফেলা হয়।^{২৩৯}

এ হাদীসটি উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: “ভবিষ্যতে যাহাতে শিরকের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় তজ্জন্যই হ্যরত ওমর সেই গাছটি কাটিয়া ফেলার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষটির ন্যায় যাহা কিছু মৃতি ও প্রতীমার শ্রেণীভূক্ত যাহার কারণে অসংখ্য ফেতনা ফাসাদ এবং বিদ্বাতের প্রচলন হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার দরুন কঠিনতম বিপদাপদ প্রকাশ লাভ করিয়াছে উহার বেলায় হুকুম কি হইতে পারে?”

হ্যরত ওমর (রা)-এর কাজের তুলনায় অন্যতম কৃতিপূর্ণ কাজ হইল হ্যুরে আকরাম (ﷺ)-এর মসজিদে দেরার, যে মসজিদ আল্লাহর ইবনু উবাই ইসলামের ক্ষতি সাধন করার পরামর্শ গৃহরূপে নির্মান করিয়াছিল- উহা জুলাইয়া দেওয়া। তিনি শিরক ও বিদ্বাতের পথ রুদ্ধ করার মানসেই এই কাজ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত মসজিদ, মন্দির কবরের উপরে তৈয়ার করা হয় অথবা স্মৃতিসৌধরূপে নির্মাণ করা হয় এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অহরহ শিরক ও বিদ্বাতের স্ন্যাত বহিয়া চলিতেছে উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া মসজিদে দেরার ধ্বংসের তুলনায় কোন অংশেই কম পুণ্যের কাজ নহে। ইসলাম এই সমস্ত মাটির সাথে মিশাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে।

যে সমস্ত মিনার ও গমুজ মৃত বা শহীদ লোকের কবরের উপর স্থাপিত তাহা ও ধ্বংস করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে উয়াজিব। কারণ হ্যুর (ﷺ)-এর বিরোধিতা ও ইসলামের নাফরমানী করার উপর ভিত্তি করিয়াই উহার অস্তিত্ব এইগুলিতে বিরাজ করিতেছে। এই সৌধসমূহ ধুলিস্যাত করিয় দেওয়ার

^{২৩৭} সূরা (৪৮) ফাতহ: ১৮ আয়াত।

^{২৩৮} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৬/১১৭-১১৮।

^{২৩৯} ইবনু সান্দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ২/৭৬, ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৭/৪৪৮।

অকাট্য প্রমাণ হইল হ্যুর (ﷺ)-এর পবিত্র বাণী। তিনি কবরের উপর সৌধ বা গম্বজ নির্মাণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এই সমস্ত করে তাহাদের প্রতি লানত বর্ষণ করিয়াছেন। যে সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতি হ্যুর (ﷺ) নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন এবং যাহাদের নির্মাতাকে তিনি অভিশপ্ত বলিয়াছেন- উহা বিধাহীন চিত্তে যত শীঘ্ৰ সম্ভু খৎস করিয়া ফেলাই মুসলমানদের এক অপরিহার্য কর্তব্য। আবার যাহারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়, আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে, ঝাড় বাতি লটকায়, সুগন্ধি ছিটায়, আগরবাতি জ্বালায়- তাহাদের প্রতিও নবীয়ে আকরাম (ﷺ) অভিসম্পত্ত করিয়াছেন।

অতএব যে কাজ করায় হ্যুর (ﷺ) অসম্ভৃত হইয়া লানত করিয়াছেন উহা কবীরা গোনাহ। ইহার উপর কেয়াস করিয়াই ওলামায়ে কিরাম ফতওয়া দিয়াছেন কবরের জন্য মোমবাতি বা প্রদীপের তৈল মানত করাও হারাম। কারণ এই জাতীয় মানত করাই পাপের কাজে মানত করা। কেহ যদি এই জাতীয় মানত করিয়া আদায় না করে তবে তাহার পাপ হইবে না। এই জাতীয় কবরের জন্য ওয়াকফ করাও জায়েয় নহে। শরীয়ত মতে এতদপ্রকার মানত করা না জায়েয়। এই সমস্ত বস্তুকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং উহার প্রচলন জারি রাখাও শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ হিসেবে গণ্য।”^{২৪০}

৫. ৫. ২. ৬. তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর ‘অলৌকিকভাবে’ নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা শিরক। এ জাতীয় শিরক এখনো এদেশের অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক। যেমন কোনো কর্ম শুরু করার সময়, যাত্রার সময় বা নৌকা চালানোর সময় আল্লাহর নামের সাথে গাজী পীর, চাচী পীর, পাঁচ পীর, খোয়াজ খিয়ির, বদর পীর বা অনুরূপ কোনো সত্য বা কল্পিত পীর বা ওলীর নাম নেওয়া। অনুরূপভাবে মা, বাবা, খাজা বাবা, পাক পাঞ্জাতন বা অন্য কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, বা যাত্রার শুরুতে বা কোনো কাজের শুরুতে এরূপ কারো নাম স্মরণ করে কপালে হাত দিয়ে সালাম করে বা মাথা নুইয়ে তার প্রতি সালাম জানিয়ে কাজ শুরু করা, কাজের শুরুতে যন্ত্র, কাস্তে বা অন্য কিছুকে কপালে ঠেকানো বা সালাম করা, ফাতিমা (রা)-কে বরকতের মালিক মনে করে ওয়ন করার সময় তাঁর নাম নিয়ে বা ‘মা বরকত’ নাম নিয়ে শুরু করা, প্রথম ফল, ফসল, দুধ ইত্যাদি মানিক পীর বা কারো নামে ফেলে দেওয়া এবং এভাবে তাদের সাহায্যের আশা করা..... ইত্যাদি অগণিত শিরকী কর্ম ও বিশ্বাস সমাজের আনাচে কানাচে এখনো বিদ্যমান। বক্ষত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অভাব, পূর্ববর্তী ও পার্শ্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, মানবীয় দুর্বলতা, আলিমগণের অসতর্কতা,

^{২৪০} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৩৪-৩৫।

স্বার্থাবেষীদের লোভ ও অপপ্রচার, শয়তানের প্রতারণা ইত্যাদি কারণে এভাবে সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলিমগণ শিরকের মধ্যে নিপত্তি হচ্ছেন।

আনুগত্য বিষয়ক শিরক প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রক্ষ-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে” এ আয়াত উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী তাঁর ‘আল-বালাগুল মুবীন’ গ্রন্থে বলেন: “উল্লেখিত আয়াতে শিরককে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সত্ত্বেও অন্য কোনো সম্প্রদায় ঐ সমস্ত কাজ করিলে তাহাদের জন্যও উহা শিরক হইবে এবং তাহারা মুশরিক নামে পরিচিত হইবে। বর্তমান যুগে কাঞ্জানহীন কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক বলিয়া বেড়ায়, পীর-ফকীরগণ যাহা আদেশ করে উহা বিনাদ্বিধায় মানিয়া চলা ওয়াজিব। তাহাদের আদেশ নিষেধ যদি শরীয়ত বিরোধীও হয় এবং শরীয়ত যদি উহা প্রত্যাখ্যানও করে তথাপি আমাদের পক্ষে উহা পালন করা কর্তব্য। তাহাদের উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে হাফেয় সিরাজীর একটি রূপক কবিতা প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করায়। হাফেয় সিরাজী বলিয়াছেন: ‘পৌরে কামেল যদি তোমার জায়নামায়কে শরাব দিয়া রঙিন করার আদেশ দেন তবে তোমার পক্ষে উহা কার্যকরী করা প্রয়োজন। কারণ পথ প্রদর্শক কথনও পথ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন না।’ ফলে ইহুরাও ‘আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে মানুষ সাব্যস্তকারীদের ন্যায় শিরকে তমসায় তমসাচাহিদিত।।”^{২৪১}

শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ) আরো বলেন: “সাধারণ কোনো মানুষ যদি কোনো একজন ফকীহকে একথা ভেবে তাকলীদ বা অনুসরণ করে যে, তাঁর মত মানুষের কোনো ভূল হতে পারে না এবং তিনি যা বলবেন তা অবশ্যই সঠিক এবং তার মনের মধ্যে এরূপ চিন্তা করে যে, উক্ত আলিমের মতের বিরক্তে দলিল প্রকাশ পেলেও তার অনুসরণ ত্যাগ করব না, তবে তা হবে পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে রাক্ষ-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করা। ... কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথাকেই একমাত্র দীন মনে করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা হালাল বা হারাম করেন তা ছাড়া অন্য কিছুকেই হালাল বা হারাম বলে মনে করে না, তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাণী ও শিক্ষা সম্পর্কে তার জ্ঞানের কমতির কারণে কারো তাকলীদ-অনুসরণ করে এবং বাহ্যিকভাবে সুন্নাতে নববীর অনুসরণ করতে থাকে এবং কোনো বিষয়ে তার কর্ম সুন্নাতের খেলাফ হলে কোনো বিতর্ক-আপত্তি না করেই তা বাদ দিয়ে সুন্নাত গ্রহণ করে তবে তা কখনোই আপত্তিকর নয়।”^{২৪২}

^{২৪১} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ২৭।

^{২৪২} শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৪৪৬-৪৪৭।

মুশরিকদের ভালবাসার শিরক সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: “একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিত্তঞ্চায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লিখিত হয়।”^{২৪৩}

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলসী বলেন: “মহান আল্লাহ এখানে মুশরিকদের যে বিশেষ উল্লেখ করেছেন আমরা অনেক মানুষকে সে অবস্থায় দেখতে পাই। এ সকল মানুষ যে সকল মৃতব্যক্তির নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করে ও সাহায্য চায় তাদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা উৎফুল্ল উল্লিখিত হয়। তাদের নামে যিষ্ঠা কাহিনীগুলি শুনলে তারা উল্লাসে উদ্বেলিত হয়। এসকল কাহিনী তাদের মর্যাদা ও পছন্দ মত হয় এবং তাদের আকীদার পক্ষে হয় বলেই তারা এরূপ উল্লিখিত হয়। যারা এরূপ কাহিনী বর্ণনা করে তাদেরকে তারা খুবই মর্যাদা দেয় এবং ভঙ্গি করে। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কথা উল্লেখ করে, একমাত্র তিনিই সকল কার্য পরিচালন করেন এবং সকল ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করে এবং তাঁর মহত্ব ও মর্যাদার পরিচায়ক প্রমাণগুলি উল্লেখ করে তার প্রতি তারা বিত্তঞ্চা বোধ করে। এরূপ কার্য যে করে তার প্রতি তারা অন্যস্ত বিরক্ত হয় এবং তার থেকে দূরে অবস্থান করে। তাকে তারা অপছন্দনীয় দল-মতের অনুসারী বলে অভিযোগ করে। একব্যক্তি একদিন কঠিন বিপদে পড়ে কোনো কোনো মৃতমানুষের নিকট ত্রাণ ও সাহায্য প্রার্থনা করছিল এবং বলছিল, হে বাবা অমুক, আমাকে রক্ষা কর। আমি তাকে বললাম, তুমি আল্লাহকে ডাক, বল: হে আল্লাহ; কারণ মহাপবিত্র আল্লাহ বলেছেন: ‘আমার বাদ্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।’^{২৪৪} আমার একথায় ঐ ব্যক্তি ক্রোধিত হয়। পরে আমি শুনেছি যে, সে আমার বিষয়ে বলেছে: অমুক ওলীগণের মর্যাদা অস্থীকার করে। আমি শুনেছি যে, তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহর চেয়েও ওলীরা দ্রুত ডাকে সাড়া দেন। এই কথা যে কত বড় কুফরী তা সহজেই বুঝা যায়। আমরা দু'আ করি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করেন।”^{২৪৫}

৫. ৩. শিরকের সেকাল ও একাল

শিরক বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের শিরকের সাথে মুসলিম সমাজের শীঘ্ৰাগণ ও তাদের দ্বারা প্রত্বিত বা অজ্ঞতা,

^{২৪৩} সূরা (৩৯) যুমার: ৪৫ আয়াত।

^{২৪৪} সূরা (২) বাকারাঃ: ১৮৬ আয়াত।

^{২৪৫} আলসী, রহুল মা'আনী ১৭/৮৪৬-৮৪৭।

পূর্ববর্তী বা পার্শ্ববর্তী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত শিরকে লিঙ্গ মানুষদের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মের মধ্যে আমরা অঙ্গুৎ মিল দেখতে পাই।

(১) সকলেই আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করেন। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো ক্ষমতা নেই বলে স্বীকার করেন।

(২) সকলেই শিরকের ভিত্তি এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তাঁদেরকে কিছু অলৌকিক মঙ্গল-অঙ্গলের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাদের সুপারিশ তিনি ফেলেন না। এরূপ বান্দাদের ডাকলে তাঁরা তা শুনতে ও জানতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতায় বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ডাকলে এরা বান্দাকে আল্লাহ বেলায়াত বা নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়।

(৩) আল্লাহর ‘প্রিয় বান্দা’ নির্ধারণও সকলের ক্ষেত্রে একইরূপ: ওহীর মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কিছু সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দার পাশাপাশি অনেক ক঳িত ব্যক্তিত্বকে এরা ‘আল্লাহর প্রিয়’ বলে দাবি করে।

(৪) সকলেই দলীল দু'আ ও শাফা'আত বিষয়ক ওহীর নির্দেশনার বিকৃতি, মুজিয়া বিষয়ক ভূল ধারণা, কিছু যুক্তি, ক঳িনা, দাবি এবং লোকাচার।

(৫) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় কুরআনের যে সকল যুক্তি ও বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি তা সবই পূর্ববর্তী মুশরিকদের মত একইভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যমান শিরকে লিঙ্গ মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে আমরা শুধু একটি আয়াত পর্যালোচনা করব।

(৬) আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন: “বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।”^{২৪৬}

(৭) সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর স্তুষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, নবীগণ, ফিরিশতাগণ, সত্যিকার বা কাল্পনিক ওলীগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে যৌক্তিকতা বা দলিল কি? এদের মধ্যে যারা ফিরিশতা, নবী বা সত্যিকার নেককার মানুষ তাঁদেরকে

^{২৪৬} সূরা ফাতির: ৪০ আয়াত।

ভালবাসতে হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে ডাকতে হবে কেন? তাদের নামে মানত করতে হবে কেন? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? সকলেই একবাক্যে স্থীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্থীকার করবেন যে, মহান আল্লাহই যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন।

মুসলিম সমাজের যাদের ইবাদত করা হয় বা বিপদে আপদে যাদের ডাকা হয় যেমন আলী (রা), ফাতিমা (রা), পাক-পাঞ্জাবী, আলী বংশের ইমামগণ, 'গাওস', 'কুতুব' বা অন্যান্য নামে পরিচিত বিভিন্ন ওলী-আল্লাহগণ এদের বিষয়েও একই প্রশ্ন এবং উত্তরও একই।

(৭) এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। যুক্তি ও বিবেকের দাবি যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে। তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বের ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট তোমাদের আন্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার, মানত করার বা সাজ্দা করার বৈধতা প্রমাণিত হতো। কিন্তু কখনোই মুশারিকগণ এরূপ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন নি। কুরআনে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বারংবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে শিরক করো না, যে বিষয়ে তিনি কোনো 'সুলতান' বা সুস্পষ্ট প্রমাণ নাফিল করেন নি।^{২৪৭} আর আল্লাহর সাথে শিরক করার মত যুক্তি, বিবেক ও ওহী বিরুদ্ধ কাজ ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া করার অর্থ আল্লাহর নির্দেশের সাথে কুফরী করা।

(৮) মুসলিম সমাজের যে সকল মানুষে শিরকে লিঙ্ঘ তাদের অবস্থাও একই। তারা কখনোই কুরআন-হাদীস থেকে একটি নির্দেশনাও দেখাতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকতে, সাহায্য চাইতে, সাজ্দা করতে, অন্য কারো নামে মানত, উৎসর্গ করতে বা অন্য কাউকে ইবাদত করতে কোনোরূপ নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন। কিছু বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, যুক্তি, কল্পনা বা গল্পকাহিনী তাদের সম্বল।

^{২৪৭} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৫১; সূরা (৬) আন'আম: ৮১; সূরা (৭) আ'রাফ: ৩৩; সূরা (২২) হজ্জ: ৭১।

(৯) উপরের আয়াতে সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। বক্তৃত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা ভিত্তিক প্রসূত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে। তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আর্খিরাতে মৃক্ষি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিক্রিয়া তাদের একমাত্র সম্ভল। এর পাশাপাশি জিন ও মানুষ শয়তানের প্রচারিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী: ‘অমুক বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।’ এগুলিই মুশরিকদের সম্ভল।

(১০) মুসলিম কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকবেন? মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন, শুনেন। তিনি দয়াময় এবং তিনি বান্দাকে তার মায়ের চেয়েও তালিবাসেন। তিনি প্রদান করলে কেউ ঠেকাতে পারে না এবং তিনি ঠেকালে কেউ দিতে পারে না। তাঁকে ডাকলে এবং তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন এবং এবং সাড়া দেন। তাহলে আমি কেন তাকে ছেড়ে অন্যকে ডাকব? আমরা প্রতিদিন বারংবার ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা 'স্লিম' (بِيَاكَ نَعْبُدُ وَبِيَاكَ نَسْتَعِينَ) বলে ঘোষণা করি যে: একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য চাই। তবে কেন আমরা অন্যকে ডাকব? মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন একমাত্র তাঁকেই ডাকতে। এর বিপরীতে কোথাও তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে অনুমতি দেন নি। এরপরও আমরা কেন অন্যকে ডাকব বা অন্যের কাছে ত্রাণ চাইব?

(১১) তাবিল-ব্যাখ্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ অমান্য করা হলো ইবলিসের প্রতারণার মূল সূত্র। মহান আল্লাহ বলেন:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُنْذِي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَ أَهْمَاءٍ وَقَالَ
مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مُلْكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
وَقَاسِمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمَنِ النَّاصِحِينَ

“অতঃপর শয়তান তাদের গোপনকৃত লজ্জাহান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে কুম্ভগা দিল এবং বলল, ‘পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই শুধু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলে যে, আমি অবশ্যই তোমাদের একজন হিতাকাংশী।’^{২৪৮}

এখানে শয়তান আদম ও হাওআ (আ)-কে এ কথা বলে নি যে, আল্লাহর আদেশ মানার দরকার নেই। বরং সে বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ অবশ্যই

^{২৪৮} সূরা (৭) আ'রাফ: ২০-২১।

মানতে হবে, তবে আল্লাহর আদেশের ‘ইল্লাত’ কারণ, হেকমত ও রহস্যটা জানতে হবে এবং সে অনুসারে কাজ করতে হবে। এখানে আল্লাহ তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ী থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে পার। পাশাপাশি সে আল্লাহর কসম করে বলে যে, কেবলমাত্র তাদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে....।

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করছে। মহান আল্লাহ সকল বিপদে আপনে একমাত্র তাঁকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে ছাড় অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এখন শয়তান বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলছে, অমুক তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। শিরকের পথ রোধ করতে কবর পাকা করতে, কবরে উপর ঘর বা গম্বুজ বানাতে, কবর উচু করতে, কবরে কিছু লিখতে কবরের নিকট মসজিদ বানাতে, কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এর বিপরীতে কখনোই এরূপ কোনো কাজ করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি। এখন শয়তান বলছে, অমুক বা তমুক কারণে তা নিষেধ এবং অমুক বা তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। সকল শিরক, কুফর ও বিদ্যাতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই। এ বিষয়ে মুমিনকে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নির্বিধায় আক্ষরিকভাবে পালনই নাজাতের পথ।

৫. ৬. কুফর বনাম তাকফীর

৫. ৬. ১. তাকফীর বা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা

উপরের আলোচনায় আমরা কুফর ও শিরকের পরিচয় জানতে পেরেছি। আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল কুফর বা শিরক অনেক মুসলিম নামধারী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। সমাজের অনেক মানুষই নিজেকে মুমিন ও তাওহীদে বিশ্বাসী বলে দাবি করার পরেও উপরে আলোচিত বিভিন্ন প্রকার শিরক বা কুফরের মধ্যে লিঙ্গ থাকেন। এদের এ সকল কর্ম শিরক বা কুফর বলে আমরা নিশ্চিত জানার পরেও এদেরকে কাফির বা মুশরিক বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ইসলামের নির্দেশ। কোনো কর্মকে কুফর বা শিরক বলা এবং কোনো ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ক মূলনীতি এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করব। এছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিভাগে মুসলিম ফিরকাকে কাফির বলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি আমরা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাকফীর অর্থ কাউকে কাফির বলা বা কাফির বলে অভিযুক্ত করা। (seduction to infidelity, charge of unbelief)। অর্থাৎ ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম

বলে দাবিকারী কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা করা। কাউকে কাফির বলার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যেমন কবীরা গোনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে কাফির বলা, সুস্পষ্ট কুফরী কর্মের কারণে কাফির বলা, অস্পষ্ট কুফরীর কারণে কাফির বলা, কাল্লানিক কুফরীর কারণে কাফির বলা ইত্যাদি।

৫. ২. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্যাতকে সতর্ক করেছেন। আদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقْدَ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)

“যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্তিই কাফির না হয় তবে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।”^{২৪৯}

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقْدَ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

“যদি কেউ তার ভাইকে বলে, হে কাফির, তবে তাদের দুজনের একজনের উপর এই কুফরীর দায়ভার বর্তাবে।”^{২৫০}

আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ دَعَ عَارِجًا بِالْكُفَرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

“যদি কেউ কোনো মানুষকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা তাকে বলে ‘হে আল্লাহর শক্তি’ আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তৃত উপর বর্তাবে।”^{২৫১}

আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَفَرَ بِكُفَيْرِهِ

“যে কোনো মানুষ যদি অন্য কাউকে কাফির বলে গণ্য করে তবে দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে। যদি সে কাফির হয় তবে ভাল, নইলে তাকে কাফির ঘোষণা করার কারণে কাফির ঘোষণাকারীই কাফির হয়ে যাবে।”^{২৫২}

সাবিত ইবনু দাহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

^{২৪৯} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৩-২২৬৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৯।

^{২৫০} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৪।

^{২৫১} মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৯।

^{২৫২} ইবনু হিরান, আস-সহীহ ১/৪৮৩।

مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَفُولٌ

“যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার যতই অপরাধ হবে।”^{২৫০}

এই অর্থে অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একই অর্থে ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হওয়া প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে রাসূলগ্লাহ ﷺ প্রায়শই তাঁর সাহাবীগণকে সতর্ক করতেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূলগ্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন্ দিকে রাওয়ানা দিবেন বা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন করবেন তা কিছুই বলেন না। তার উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব কম রক্তপাতে পৰিব্র মক্কা বিজয় সম্পন্ন করা। সাহাবী হাতিব ইবনু আবী বালতা‘আ বুঝতে পারেন যে, রাসূলগ্লাহ ﷺ মক্কা অভিযুক্তে রাওয়ানা দিবেন। তিনি মক্কার কাফিরদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেন। এ বিষয়ে আলী (রা) বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ আমি, যুবাইর ও মিকদাদ-তিনজনকে বললেন, দ্রুত রাওদা খাখ-এ চলে যাও। সেখানে একজন মহিলা যাত্রী পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা পত্রটি নিয়ে আসবে। আমরা তথায় যেয়ে মহিলাকে পেলাম। তাকে বললাম চিঠিটি দাও। সে বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললাম, তুমি যদি চিঠিটি না দাও তবে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী করব। তখন মেয়েটি তার খোপার ভিতর থেকে চিঠিটি বের করে দিল। চিঠিটি ছিল হাতিবের পক্ষ থেকে মক্কার কাফিরদেরকে লিখা। রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেন, হাতিব, এ কী? হাতিব বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। আমি কুরাইশ বংশের লোক নই, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মক্কায় ছিলাম। মক্কা থেকে হিজরত করে আসলেও আমার পরিজন তথায় বাস করছে। আপনার কুরাইশ সাহাবীগণের কাফির আজ্ঞায়স্বজনেরা তাদের ধনসম্পদ ও পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কিন্তু আমার কেউ নেই। আমি চেয়েছিলাম এই খবর প্রদানের মাধ্যমে মক্কার কাফিরদের একটু উপকার করতে, যেন তারা আমার পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখে। আমি কুফরীর কারণে, ধর্মত্যাগ করতে বা কাফিরদের কুফরীতে সন্তুষ্টির কারণে আমি এ কাজ করিনি। তখন রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেন, হাতিব তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে। তখন উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি। তিনি বলেন, হাতিব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আর সম্ভবত আল্লাহ বদরবাসীদের প্রতি দষ্টিপাত করে

^{২৫০} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৪৭, ২২৬৪।

বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি।”^{২৫৪}

এখানে হাতিবের কাজ বাহ্যত ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের বিজয়ের জন্য ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিশ্বাঘাতকতা এবং কুফর। এজন্যই উমার তাকে মুনাফিক বলেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না দিয়ে তার কাছে এ কাজের ব্যাখ্যা চেয়েছেন এবং তার ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بْنَهُ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَخْرُقُونِي نَمْأُ لِدْرُونِي فِي الرَّبِيعِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لِنَّ قَدْرَ عَلَيِّ رَبِّي لِيَعْذِنَنِي عَذَابًا مَا عَنِّي بِهِ أَحَدًا قَالَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدْيِي مَا أَحْدَثَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَيْيَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ حَشِيْتَ يَا رَبَّ أَوْ قَالَ مَحَافِنَكَ فَفَرَّ لَهُ بِذَلِكَ

“একব্যক্তি জীবনভর সীমালজ্বন ও পাপে লিঙ্গ থাকে। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলে: আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াবে। এরপর আমাকে বিচুর্ণ করবে। এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমৃদ্ধের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি। তার সন্তানগণ তার ওসিয়ত অনুসারে কর্ম করে। তখন আল্লাহ যামিনকে নির্দেশ দেন যে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে। তৎক্ষণাত্ লোকটি পুনর্জীবিত হয়ে তার সামনে দণ্ডযামান হয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে বলেন: তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে: হে আমার প্রতিপালক: আপনার ভয়ে। তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।”^{২৫৫}

এখানে আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমৃদ্ধে ছাড়িয়ে দিলে মহান আল্লাহ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না এবং শাস্তি ও দিতে পারবেন না। বাহ্যত তার এরূপ ধারণা ছিল অজ্ঞতা প্রসূত। এজন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ-ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আমরা দেখি যে, একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফরী হলেও উক্ত বিশ্বাসে লিঙ্গ ব্যক্তি কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

^{২৫৪} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৪১।

^{২৫৫} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৮৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১১০।

৫. ৬. ৩. তাকফীরের মূলনীতি

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহারীগণ এবং তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ ঈমানের দাবিদার কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মূলনীতি হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক, পাপ ও ইসলাম বিরোধী চিত্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মুমিনকে কাফির বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা অনেক অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে ‘অমুসলিম’, কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি সৃষ্টিভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লজ্জনকারী, বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে ‘অমুসলিম’ বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন বা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দ্রৱ্যবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানে দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সৃষ্টি কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিঙ্গ হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওয়র আছে কিনা তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের দাষ্টিতে এ হলো ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وَلَا نَكْفُرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَلِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحْلِهَا، وَلَا نَزِيلُ

عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمناً حقيقةً ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافراً.

“আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ হয়, যতক্ষণ না সে সে পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের ‘ঈমান’-এর নাম অপসারণ করি না। বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না মরে একজন পাপী মুমিন হতে পারে।”^{২৫৬}

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: “আমাদের কিবলাপছাদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্থীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করবে। ... যেসব বিষয় ঈমানের অঙ্গভূক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্থীকার না করলে, সে ঈমানের গতি হতে বের হয় না।”^{২৫৭}

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, ‘আহলু কিবলা’ বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্থীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে ‘আহলু কিবলা’ বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর রূবুবিয়্যাত অস্থীকার করা, তাওহীদুল উল্হিয়্যাত অস্থীকার করা, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্থীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তাঁর শরীয়তের উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্থীকার করা ইত্যাদি। এরূপ অবিশ্বাসে লিঙ্গ ব্যক্তি যদি আজীবন কাৰ্যা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবে তাকে ‘আহলু কিবলা’ বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখি হওয়া বাতিল ও অথচীন।

এছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুমিন মুসলিম যদি এমন কোনো কর্মে লিঙ্গ হয় বা কথা বলে যা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ অনুসারে কুফ্র বা শিরক বলে গণ্য তবে তার কর্মকে অবশ্যই শিরক বা কুফ্র বলা হবে, তবে ‘ব্যক্তিগতভাবে’ উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বুঝা বা এজাতীয় কোনো ওয়র তার আছে কিনা।^{২৫৮}

^{২৫৬} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১১৭।

^{২৫৭} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৪।

^{২৫৮} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৭-২৬২।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

বিদ'আত ও বিভক্তি

আকীদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভাস্ত ফিরকাসমূহের বিভাস্তির কারণ ও স্বরূপ না জানলে এরপ বিভাস্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর বিভক্তি ও ফিরকার আলোচনার পূর্বে বিদ'আতের আলোচনা অত্যাবশ্যক, কারণ বিদ'আতই বিভক্তির একমাত্র কারণ। এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ'আতের পরিচিতি, প্রকারভেদ, উৎপত্তি, কারণ ও কর্মবিষয়ক বিদ'আতগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। এখানে প্রসঙ্গে বিদ'আতের পরিচয় আলোচনার পরে আকীদা বিষয়ক বিদ'আত প্রসঙ্গে আলোচনা সীমিত রাখার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক ও করুণিয়ত প্রাথনা করছি।

৬. ১. বিদ'আতের পরিচয়

৬. ১. ১. অভিধানে বিদ'আত

বিদ'আত শব্দটি আরবী 'বাদা'আ' (بَدَأَ) ক্রিয়া থেকে গৃহীত ইসম। বাদা'আ অর্থ নব-উদ্ভাবন বা অনাস্তিত থেকে অস্তিত্ব প্রদান (Innovation)। বিদ'আত অর্থ নব-উদ্ভাবিত বিষয়।^১ ৪ৰ্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু দুরাইদ (৩২১ হি) বলেন, 'বাদা'আ অর্থ কোনো কিছু শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 'বাদী', অর্থাৎ উদ্ভাবক ও অনাস্তিত থেকে অস্তিত্ব-দাতা বা সৃষ্টিকর্তা। যে ব্যক্তি কোনো বিষয় নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সে তার বিদ'আত-কারী বা উদ্ভাবক। ইসম 'বিদ'আত'।'^২

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেন:

وَالْبِدْعَةُ: الْحَدِثُ فِي الدِّينِ بَعْدِ الْإِكْمَالِ.

"আল-বিদ'আত অর্থ পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন।"^৩

ফাইরোয়-আবাদী (৮১৭ হি) বলেন:

وَالْبِدْعَةُ بِالْكَسْرِ: الْحَدِثُ فِي الدِّينِ بَعْدِ الْإِكْمَالِ، أَوْ مَا إسْتَخْدِثُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ
من الأهواء والأعمال

^১ ইবনু ফারিস, মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাত ১/২০৭, ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ৮/৬, আল-ফাইউয়ী, আল-মিসবাহুল মুনীর ১/৩৮।

^২ ইবনু দুরাইদ, জামহারাতুল লুগাত ১/১২৭।

^৩ জাওহারী, আস-সিহাহ ৩/১১৮৪।

‘বিদ’আত: পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উত্তোবন, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে যে মতবাদ বা কর্ম উত্তোবিত হয়েছে।’^৪ ইবনু মানয়ুরও অনুরূপ বলেছেন।^৫

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৭৯০ হি) আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলেন:

الْبِدْعَةُ وَهِيَ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ أَسْمَ مِنْ ابْتَدَأَ الْأَمْرُ إِذَا ابْتَدَأَ وَاحْدَتُهُ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَىٰ مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ نَقْصَانٌ مِنْهُ. وَعَرَفَهَا الشَّمْنَى بِأَنَّهَا مَا أَخْتَرَ عَلَىٰ خَلْفِ الْحَقِّ الْمُتَلَقِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ حَالٍ بِنْوَاعِ شُبْهَةٍ وَاسْتِخْسَانٍ وَجَعْلِ دِينًا قَوِيمًا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

“আল-মুগরিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘বিদ’আত শব্দটি ‘ইবাদ’আ’ ফিল থেকে গৃহীত ইসম। ফিলটির অর্থ শুরু করা বা উত্তোবন করা। অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ’আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে।’ শুধুমানী বিদ’আতের সংজ্ঞায় বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং ভাল মনে করে উত্তোবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ’আত।’”^৬

আল্লামা ইবরাহীম ইবনু মুসা আশ-শাতিবী (৭৯০ হি) বলেন:

فَالْبِدْعَةُ إِذَا عَبَارَةٌ عَنْ طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضاهِي الشَّرْعَيْةَ، يَقْصَدُ بِالسَّلْوَكِ عَلَيْهَا الْبِمَالَغَةُ فِي التَّعْبُدِ لِلَّهِ سَبَحَانَهُ

“বিদ’আত বলতে বুঝায় দীনের মধ্যে শরীয়তের পদ্ধতির তুল্য কোনো নব-আবিষ্কৃত- উত্তোবিত তরীকা বা পদ্ধতি মহান আল্লাহর অতিরিক্ত ইবাদতের আশায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।”^৭

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুর্বল মুখ্যতার গ্রন্থে বিদ’আতের পরিচয়ে বলেন:

وَهِيَ اعْقَادٌ خَلَفَ الْمَعْرُوفَ عَنْ الرَّسُولِ لَا بِمُعَايِدَةٍ بِلِ بِنْوَاعِ شُبْهَةٍ

“বিদ’আত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যতিক্রম কোনো বিশ্বাস, যে ব্যতিক্রমের কারণ ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝাতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা।”^৮

^৪ ফাইরোয়াবাদী, আল-কামুসুল মুহীত ২/২৫২।

^৫ ইবনু মানয়ুর, লিসানুল আরব ৮/৬।

^৬ ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক শারহ কান্যুদ-দাকাইক ১/৬১।

^৭ শাতিবী, আল-ইতিসাম ১/৫০।

^৮ ইবনু আবেদীন, রাদুল মুহতার ১/৫৬।

৬. ১. ২. কুরআন কারীমে বিদ'আত

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে একটি কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেন নি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উত্তোলন করে। আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উত্তোলন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। কারণ কোন কর্ম কর্তৃক মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি সেভাবেই বিধান দেন। ধার্মিক মানুষ ধর্মের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে আরো বেশি ভাল কাজ করার আগ্রহে কিছু নতুন কর্ম বা রীতি বানিয়ে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে পারেন না। মহান আল্লাহ খুস্টানদের বিষয়ে বলেন:

وَرَبِّنَايَةٌ أَبْنَادُهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
حَقٌّ رِّغَابِهَا

“কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- এতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তোলন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।”^১

খুস্টধর্মে ও অন্যান্য সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ, লালসা ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে আধিরাত্মুখি হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ভোগবিলাস বাদ দিতে বলেছেন, তবে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। আবার খুস্টধর্মে সন্ন্যাসী হতে বা বিবাহশাদি না করে সংসার-বিরাগী হতে কোনো নিষেধও ছিল না। ধার্মিক খুস্টানগণ অনুভব করেন যে, বিবাহ ও ঘর সংসার করে দুনিয়া মুখিতা ও ভোগবিলাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য তারা বেশি আখেরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য তারা ‘রাহবানিয়াহ’ বা সন্ন্যাসবাদ (monasticism, to become a monk) রীতি উত্তোলন করে। তবে তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য মানবীয় বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে রীতি আবিষ্কার করা। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে। মধ্যযুগের খুস্টান মঠগুলির ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে পারি।

৬. ১. ৩. হাদীসে নববীতে বিদ'আত

আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক অর্থে বিদ'আত অর্থ খারাপ কিছু নয়; নব-উত্তোলিত বিষয় ভাল বা খারাপ হতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ধর্মের বিষয়ে নব-উত্তোলন বা বিদ'আত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন।

^১ সূরা (৫৭) হাদীদ: ২৭ আয়াত।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মানবীয় বিবেক, বৃদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমেই মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। কিন্তু শুধু মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মহান স্রষ্টার কর্ম ও বিশেষণের প্রকৃতি, তাঁর সম্মতির পথ, তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এজন্য এ সকল বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করতে হয়। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব প্রদান করেন। আল্লাহর সম্মতির জন্য ওহীর বাইরে কোনো ধর্মীয় মতামত তৈরি করা, ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা কর্ম উন্নাবন করা ধার্মিক মানুষের জন্য শয়তানের প্রবন্ধনার দরজা খুলে দেয়। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে বিদ'আত থেকে সতর্ক করেছেন।

ইতোপূর্বে একাধিক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন এবং তা ধর্মসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ অর্থে আল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে দেখেছি যে, আল্লাহ ইবনু আমর (রা) দুটি নেককর্মে পদ্ধতিগতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিক্রম করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মাসের কিছু দিনে সিয়াম পালন করতেন, পক্ষান্তরে আল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় করতেন। বিষয়টির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপচন্দ করল আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাট্টা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধৰ্মস্পান্ত হবে।”

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি:

(১) তাহাজ্জুদ ও নফল সিয়াম ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বিভিন্ন হাদীসে এ ইবাদত বেশি বেশি পালন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ ইবাদত যত বেশি পালন করা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে। কাজেই অর্ধেক রাতের চেয়ে সারারাত তাহাজ্জুদে সাওয়াব বেশি হওয়ার কথা। অনুরূপভাবে মাসের কয়েকদিন সিয়াম পালনের চেয়ে পুরো মাস সিয়াম পালনে বেশি সাওয়াব হওয়ার কথা।

(২) সারারাত তাহাজ্জুদ বা নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালন মূলত নিষিদ্ধ নয়। তবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতির বাইরে।

(৩) এরূপ করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সুন্নাত বা পদ্ধতি অপচন্দ করার

নামাঞ্জুর বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

(৪) তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো আবিদ যদি কর্মের উদ্দীপনায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা ধ্বংসাত্মক নয়। তবে তার স্থিতি যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক হবে।

(৫) তিনি তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম ইবাদতকে বিদ'আত বলেছেন।

অন্যান্য অনেক হাদীসে এভাবে বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'নব-উজ্জ্বান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহারীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব আলোচনাকালে এ অর্থের অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাঁরা অনেক মতবিরোধ ও দলাদলি দেখতে পাবে। কাজেই তোমার দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর খবরদার! নব উজ্জ্বাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উজ্জ্বাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" এবং সকল "বিদ'আত"-ই পথভৃষ্টতা বা গোমরাহী।"

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

إِنَّ أَصْنَافَ الْحَدِيثِ كَيْلَبُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَذَنِي هَذِئِي مُحَمَّدٌ وَسَرُّ الْأَمْوَارِ
مُخْتَاتِهَا وَكُلُّ مُخْتَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ.

"সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদের (ﷺ) আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উজ্জ্বাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উজ্জ্বাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" আর প্রতিটি "বিদ'আত"-ই পথভৃষ্টতা এবং সকল পথভৃষ্টতা জাহানামের মধ্যে।"^{১০}

আল্লাহর ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا هُمَا الشَّتَانُ الْكَلَامُ وَالْهَذَنِي فَلَا خَسْنَ الْكَلَامُ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَذَنِي
هَذِئِي مُحَمَّدٌ لَا وَإِلَّا كُمْ وَمُخْتَثَاتِ الْأَمْوَارِ فَإِنَّ شَرَّ الْأَمْوَارِ مُخْتَاتِهَا وَكُلُّ مُخْتَثَةٍ
بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"বিষয় শুধুমাত্র দুটি : বাণী ও আদর্শ। সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ ও পথ হলো মুহম্মদ ﷺ-এর আদর্শ ও পথ। সাবধান! তোমরা নব উজ্জ্বাবিত বিষয়াবলী থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে; কারণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবউজ্জ্বাবিত বিষয়। আর সকল নবউজ্জ্বাবিত

^{১০} নাসাই, আস-সুনান ৩/১৮৮। মূল হাদীসটি সহীহ মুসলিমে ২/৫৯২-৫৯৩ রয়েছে।

বিষয়ই “বিদ'আত” এবং সকল “বিদ'আত”ই বিভাস্তি বা পথভ্রষ্টতা।”^{১১}

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَنْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“আমাদের (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর যুগের মুসলমানদের: সাহাবীদের) একাজের (ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের) মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।”

সহীহ মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ عَمَلَ عَمَلاً لَنْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَا فَهُوَ رَدٌّ

“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।”^{১২}

তাবেয়ী হাসান বসরী (রাহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سَنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بَدْعَةٍ وَمَنْ اسْتَكَبَ بِيْ فَهُوَ مِنِّيْ
وَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُئْتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

“সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উত্তম, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপচন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”^{১৩}

বিদ'আত বিষয়ক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি দেখতে পাই:

(১) অভিধানিকভাবে সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কেই বিদ'আত বলা হয়, তবে হাদীসে নববীতে ‘আমাদের কর্মের মধ্যে’ বা ‘দীনের মধ্যে’ ‘নব উদ্ভাবিত বিষয়’-কে বিদ'আত বলা হয়েছে।

(২) বিদ'আতকে ‘সুন্নাতের’ বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকওয়া, আল্লাহর ভয় ও ইবাদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকেই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো মত, কথা, কর্ম বা রীতিকে

^{১১} ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/১৮।

^{১২} বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৬৩।

^{১৩}আবুর রাজজাক সানআনী, আল-মুসান্নাফ ১১/২৯১, নং ২০৫৬৮। হাসান বসরী পর্যন্ত হাদীসটির সনদ মুরসালজুপে সহীহ। এ ছাড়া বিভিন্ন সনদের আলোকে মুতাসিল হিসাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। দেখুন: শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/১০৮।

তাকওয়া, বুজুর্গী বা ইবাদত বলে গণ্য করাই বিদ'আত ।

(৩) বিদ'আত মূলত বর্জনের সুন্নাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট । রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি বা বলেন নি, অর্থাৎ তিনি যা করা বা বলা বর্জন করেছেন তা ইবাদতের উদ্দীপনায় করা বা বলা বা তাকে ইবাদত, কামালাত বা বুজুর্গি মনে করাকে বিদ'আত বলা হয়েছে ।

(৪) ইবাদতের উদ্দীপনাতেই বিদ'আতের উৎপত্তি । ইবাদতের উদ্দীপনায় নেককার ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতি, প্রকার বা রীতিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয় ।

(৫) কবুলিয়াত বা সাওয়াবের আশাতেই বিদ'আত করা হয়, এজন্য বিদ'আত কবুল হবে না বলে বারংবার হাদীসে বলা হয়েছে এবং বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প ইবাদত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

(৬) আভিধানিকভাবে বিদ'আত নিদ্দনীয় নয়, বরং তা ভাল বা মন্দ হতে পারে । তবে হাদীসে নববীতে বিদ'আত সর্বদা নিদ্দনীয় এবং সকল বিদ'আতই পথবর্ষষ্টতা । এর কারণ যেখানে অপূর্ণতা আছে সেখানে নতুনত্ব প্রশংসনীয় । আর যেখানে পরিপূর্ণ পূর্ণতা বিদ্যমান সেখানে পূর্ণতার অতিরিক্ত কোনো সংযোজনীয় প্রয়োজন আছে মনে করার অর্থই পূর্ণকে অপূর্ণ মনে করা ।

৬. ১. ৪. সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে বিদ'আত

তাবিয়ী আদুর রাহমান ইবনু আব্দুল আলকারী বলেন:

خَرَجَتْ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِلَّيْلَةِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا
النَّاسُ أُوزِعُونَ مُقْرَفُونَ يُصْلَى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصْلَى الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ
الرَّهَطُ قَالَ عُمَرُ أَنِّي أَرَى لَوْ جَمِيعَ هُؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ
عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ لِلَّيْلَةِ أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصْلَوْنَ
بِصَلَاتِهِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نَعَمُ الْبَذْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَمُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي
يَقُولُونَ يُرِيدُ آخِرُ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ أَوْلَاهُ.

“একদিন আমি উমার ইবনুল খাতাব (রা.)-এর সাথে রম্যান মাসে মসজিদে গেলাম । সেখানে দেখলাম মানুষেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত । কোথাও একব্যক্তি একা (তারাবীহ বা রাতের) সালাত আদায় করছে । কোথাও কয়েকজনে মিলে ছোট একটি জামাতে সালাত আদায় করছে । এ দেখে উমার বললেন: আমার মনে হয় এ সকল মানুষের জন্য একজন ঈমাম নিয়ুক্ত করে দেওয়া ভালো হবে । এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন । তিনি

উবাই ইবনু কা'বকে ইমাম নিযুক্ত করে একত্রে (তারবীহের) সালাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর অন্য এক রাতে যখন আমি তাঁর সাথে বের হয়েছি তখন আমরা দেখলাম সকল মানুষ একত্রে ইমামের পিছে জামাতে সালাত (তারাবীহ) আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে উমার বললেন: এটি একটি ভালো বিদ'আত, তবে যা থেকে এরা ঘূমিয়ে থাকে তা বেশি উভ্রম। তিনি বুঝালেন যে, এ সকল মানুষ প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করছে, শেষ রাতে ঘূমিয়ে পড়ছে, কিন্তু শেষ রাতে তারাবীহ পড়লে তা বেশি ভালো হতো।”^{১৪}

কিয়ামুল্লাইল অর্থাৎ রাতের সালাত বা তারাবীহের নিয়মিত জামাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে না থাকতে উমার তাকে ‘বিদ’আত’ বলেছেন। স্বভাবতই একান্তই আভিধানিক অর্থে তা ‘বিদ’আত’ বা নতুন বিষয়, কারণ দীনের মধ্যে তা নতুন নয়। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিঃ

- (১) রামাদানের রাত্রিতে কিয়ামুল্লাইল শুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত।
- (২) কিয়ামুল্লাইলে কুরআন পাঠ ও খতম সুন্নাত-সম্মত ইবাদত।

(৩) এ জন্য জামা’আত সুন্নাত-সম্মত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকবার জামা’আতে তা আদায় করেছেন। তবে ফরয হওয়ার আশংকায় নিয়মিত জামাতে আদায় করেন নি।

(৪) রামাদানের কিয়ামুল্লাইল, কিয়ামুল্লাইলে কুরআন খতম ও মাঝে মাঝে জামাতে আদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। তা নিয়মিত জামাতে আদায়ের রীতি তাঁর সময়ে ছিল না। এজন্য উমার (রা) একে বিদ’আত বলেছেন। তিনি একে ভাল বিদ’আত বলেছেন।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বিদ’আতকে বিভাগিত বললেন, অর্থ উমার কিভাবে একটি বিদ’আতকে ভাল বিদ’আত বললেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আভিধানিক অর্থেই এ কর্মকে বিদ’আত বলেছেন এবং সে অর্থে একে ভাল বিদ’আত বলেছেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক ব্যক্তিক্রমের অধিকার রাসূলুল্লাহ ﷺ খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণকে দিয়েছেন এবং এরপ কর্মকে তাঁদের সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। কোন্ কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ কারণে করেন নি, তবে তাঁর পরে করা যেতে পারে, তাও তাঁরা সঠিকভাবে বুঝতেন। এ জ্ঞানের আলোকেই উমার (রা) নিয়মিত কিয়ামুল্লাইলের জামা’আতকে ‘ভাল বিদ’আত’ বলেছেন।

সুন্নাতের আলোকে খুলাফায়ে রাশেদীনের এরূপ কর্ম এবং জাগতিক,

^{১৪} বুখারী, আস-সহীহ ২/৭০৭; মালিক, আল-মুআত্তা ১/১১৪।

সাংসারিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছাড়া ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে সাহাবীগণ সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে বিদ'আত বলে নিন্দা করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল প্রকার ইবাদত, বন্দেগি, নেককর্ম, মতামত, বিশ্বাস সবই বিদ'আত। তাঁরা সর্বদা 'সুন্নাতে'র বিপরীতে 'বিদ'আত' এবং 'ইত্তিবা' বা অনুসরণের বিপরীতে 'ইবতিদা' বা উজ্জ্বাবন উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে এ অর্থে কয়েকটি হাদীস আমরা দেখেছি। এক হাদীসে ইবনু মাসউদ (রা) বলেন :

فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِنَّكُمْ وَالْتَّبَعُ وَلَيَأْكُمْ وَالْتَّعْقُ وَعَلَيْكُمْ بِالْعِتْقِ

“তোমরা অবশ্যই ইল্ম শিক্ষা করবে। আর খবরদার! তোমর কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিঙ্গ হবে না, খবরদার! তোমরা বাড়ুবাড়িতে লিঙ্গ হবে না। খবরদার! তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।”^{১৫}

তিনি আরো বলেন :

أَتْبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كَفَيْتُمْ

“তোমরা অনুসরণ কর, উজ্জ্বাবন করো না, কারণ দীনের মধ্যে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।”^{১৬}

অন্য হাদীসে তিনি বলেন :

الْأَفْتَصَادُ فِي السُّنْنَةِ أَحْسَنُ مِنَ الْاجْتِهَادِ فِي الْبَذْعَةِ

“বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুন্নাতের উপর অল্প আমল করা উচ্চম।”^{১৭}

উসমান বিন হাদির বলেন: আমি ইবনু আকবাস (রা)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে বলি: আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন:

نَعَمْ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِسْتِقْمَاهِ، اتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ

“হাঁ, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, ইসলামের বিধিবিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে। তুমি অনুসরণ বা ইত্তিবা করবে, বিদ'আত উজ্জ্বাবন করবে না।”^{১৮}

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আকবাস (রা) বলেন:

^{১৫} দারিমী, আস-সুনান ১/৬৬।

^{১৬} দারিমী, আস-সুনান ১/৮০

^{১৭} হাকিম, আল-মুসতাদারাক ১/১৮৪। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

^{১৮} দারিমী, আস-সুনান ১/৬৫।

مَا أَتَى عَلَى النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَخْذَتُهُ فِيهِ بِدْعَةٌ وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبِدْعُ وَتَمُوتُ السُّنَّةُ

“প্রতি বৎসরই মানুষ কিছু বিদ'আত উত্তীবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেঁচে থাকবে আর সুন্নাতসমূহ বিলীন হয়ে যাবে।”^{১৯}

ইমাম সুযুতী (রাহ) বর্ণনা করেছেন, হ্যাইফা (রা) বলেন:

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِهَا أَصْنَابُ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا تَتَعَبَّدُوا بِهَا؛ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعُ لِلآخرِ مَقَالًا، فَأَتَقْوَا اللَّهَ يَا مَعْشِرَ الْفَرَاءِ، خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ فَلَكُمْ

“সাহাবায়ে কেরামগণ যে ইবাদত করেননি, তোমরা কখনো সে ইবাদত করবে না। কারণ পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কথা বলার (কোনো নতুন কথা বলার বা নতুন কর্ম উত্তীবন করার) কোনো সুযোগ রেখে যাননি। হে আল্লাহর পথের পথিকগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন করে চল।”^{২০}

হ্যাইফাহ (রা.) দুটি পাথের নিয়ে একটিকে অপরটির উপরে রাখেন এবং সহচর তাবেয়ীগণকে প্রশ্ন করেন: তোমরা কি দুটি পাথেরের মাঝখানে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছ? তাঁরা বলেন: খুব সামান্য আলোই পাথের দুটির মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، لِتَظْهَرَنَ الْبِدْعُ، حَتَّى لا يُرَى مِنَ الْحَقِّ إِلَّا قَذْرٌ مَا بَيْنَ هَذِينَ الْحَجَرَيْنِ مِنَ التُّوزِ، وَاللَّهُ لِفَشْوَنَ الْبِدْعَ حَتَّى إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالُوا: تَرِكَتِ السُّنَّةُ

“যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি: বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মত এই দুটি পাথেরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোনো বিদ'আত বর্জন করা হয়, তাহলে সবাই বলবে: সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই সুন্নী হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে)।”^{২১}

^{১৯} হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৮৮, ইবনু ওয়াদ্দাহ, আল-বিদাউ ৩৮-৩৯।

^{২০} সুযুতী, আল-আমরু বিল ইত্বিলা, ১৭ পৃ।

^{২১} ইবনু ওয়াদ্দাহ আল কুরতুবী, আল-বিদাউ ওয়ান নাহইউ আনহা, পৃ: ৫৮।

গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা) বলেন:

بَعَثَ إِلَيْهِ عَنْدُ الْمَالِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا أَسْفَاءَ إِنَّا قَدْ أَجْعَنَا النَّاسَ
عَلَى أَمْرِنَا قَالَ وَمَا هُمَّا قَالَ رَفِعَ الْأَيْدِي عَلَى الْمَتَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْقَصْصَ
بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. فَقَالَ أَمَا إِنْهُمَا أَمْلَأُ بِذِعْنَتُكُمْ عَنْدِي وَلَسْنَتُ مُجِيبَكَ إِلَيْهِ
شَيْءٌ مِّنْهُمَا. قَالَ لِمَ؟ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدَثَ قَوْمًا بِذِعْنَةٍ إِلَّا رَفَعَ مِثْلَهَا
مِنَ السُّنْنَةِ فَتَمَسَّكَ بِسُنْنَةِ خَيْرٍ مِّنْ إِحْدَاثِ بِذِعْنَةٍ

“উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান (খিলাফাত ৬৫-৮৬
হি./ ৬৮৪-৭০৩ খ্রি.) আমার কাছে দৃত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং
বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুটি বিষয়ের উপর মানুষদেরকে সমবেত
করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ বললেন: বিষয় দুটি
কী কী? খলীফা বললেন: বিষয় দুটি হলো: (১). শুক্রবারের দিন (জুমআর
খুত্বার মধ্যে) মিস্বরে ইমামের খুৎবা প্রদানের সময় হাত তুলে দু'আ করা
এবং (২). ফজর এবং আসরের সালাতের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ
করা। তখন গুদাইফ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুটি বিষয় আমার মতে
তোমাদের বিদ'আতগুলির মধ্য থেকে সবথেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি
এ দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে
অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করব না। খলীফা বললেন: কেন আপনি আমার
কথা রাখবেন না? গুদাইফ বলেন: কারণ নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন:
“যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উত্তাবন ঘটায় তখনই সেই
পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়ে
ধরে থাকা একটি বিদ'আত উত্তাবন করার থেকে উত্তম।”^{২২}

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দুটি বিষয় গুদাইফ বিদ'আত বলেছেন দুটি
বিষয়ই শরীয়ত-সম্মত। জুমআর খুৎবা প্রদানের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ
করতেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দু'আর সময় দু হাত তুলার
কথা ও প্রমাণিত। খুৎবা চলাকালীন সময়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে তিনি দুহাত
উঠিয়েছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যে কোনো যুক্তি তর্কে
আমরা বলতে পারি খুৎবার সময় দু'আ করা জায়েয়, দু'আর সময় দু'হাত
তোলাও জায়েয় এবং খুৎবা চলাকালীন সময়ে সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দু'আ

^{২২} আহমদ ইবনু হাস্মাল, আল-মুসলাদ ৪/১০৫; ইবনু হাজার, ফতহল বারী ১৩/১৫৩-১৫৪,
ইবনু হাজার বলেছেন: হাদীসটির সনদ শক্তিশালী, তবে হায়সামী মাজমাউয় যাওয়ায়িদ
১/১৮৮ হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

করাও জায়েয়। কিন্তু সাহাবী একে বিদ'আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দু'আ ছাড়া খুৎবার মধ্যে অন্য কোনো দু'আতে তিনি দুহাত উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙুলের ইশারা করে দু'আ করতেন। আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা ইশারা করতেন, সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন। তিনি যতটুকু করেছেন তাঁর একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না।

মুয়ায় ইবনু জাবাল (রা.) একদিন বলেন:

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فَتَّا يَكْتُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيَفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّىٰ يَأْخُذَهُ
الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالمرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، فَيُوْشِكُ
قَاتِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَبَعُونِي وَقَدْ قَرَأُتُ الْقُرْآنَ، مَا هُمْ بِمُتَبَعِيٍّ حَتَّىٰ
أَبْنَدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِنَّكُمْ وَمَا ابْنَدْعُ إِنَّ مَا ابْنَدْعُ ضَلَالٌ.

“তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন শিক্ষার পথ খুলে যাবে। মুমিন-মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুরআন শিখবে। তখন হয়ত কোনো ব্যক্তি বলবে : মানুষের কী হলো, আমি কুরআন শিক্ষা করলাম অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না? কুরআন ছাড়া কোনো নতুন মত বা কাজ উজ্জ্বাল না করলে মানুষেরা আমার অনুসরণ করবে না। (আমি এত আলেম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। কাজেই, মানুষের মধ্যে আমার সঠিক মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোনো মতামত বা পদ্ধতি উজ্জ্বাল করা) খবরদার! তোমরা বিদ'আতের কাছেও যাবে না। নিঃসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথব্রহ্মতা।”^{২৩}

এ হাদীসের আলোচনায় আল্লামা শাতিবী উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতের উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদতে আধিক্য অর্জন। বিদ'আতী আল্লাহর ইবাদতের দিকেই মূল দৃষ্টি নিবন্ধ করেন, ইবাদতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা জরুরী মনে করেন না। এছাড়া মানবীয় প্রকৃতি পুরাতন ও নিয়মিত কর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নতুন নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা লাভ করা যায় যা পুরাতনের মধ্যে থাকে না। এজন্য বলা হয় ‘প্রত্যেক নতুনের মধ্যেই মজা’। বিদ'আতীদের তত্ত্ব এই যে, মানুষের মধ্যে অপরাধ বেড়ে গেলে যেমন অপরাধ ধরা ও বিচার করার জন্য পদ্ধতিও বেড়ে যায়, অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে ইবাদতে অবহেলা

^{২৩} আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২০২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫০৭। হাদীসটি সহীহ।

প্রসার লাভ করলে তাদের অবহেলা কাটাতে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। মু'আয় (রা) এ বিষয়েই সাবধান করেছেন। শাতিবী বলেন, এদারা বুঝা যায় যে, ইবাদতের বাইরে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলে গণ্য নয়।^{২৪}

৬. ১. ৫. বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারছি। আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদেরকে বারংবার সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং বিদ'আত, উদ্ভাবন বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। সুন্নাত পদ্ধতিতে অন্ন ইবাদত বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলে জানাচ্ছেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে দীনের বিষয়ে উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ'আতের উৎপত্তি হয়। সাহাবীদের সাহচর্য বঞ্চিত আবেগী ধার্মিক মানুষেরা দীন পালনের বা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মত, বিশ্বাস বা কর্মের মধ্যে নিপতিত হতে থাকে। সাহাবীগণ এ সকল ব্যতিক্রম প্রতিরোধে সচেষ্ট ছিলেন। এরপরও ক্রমান্বয়ে বিদ'আত প্রসার লাভ করতে থাকে।

এ সকল বিদ'আত দু ভাগে বিভক্ত: (১) আকীদা বা বিশ্বাসের বিদ'আত (البدعة العقائدية) এবং কর্মের বিদ'আত (البدعة العملية)। আমাদের আলোচনা আকীদার বিদ'আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, কারণ ইফতিরাক মূলত আকীদার বিদ'আতকে কেন্দ্র করে। কর্ম বিষয়ক বিদ'আত সম্পর্কে আমি 'এহইয়েস সুনান' এছে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ৩০-৩৫ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ও তার অনুসারীগণ নবী-বংশের ভালবাসা ও ভক্তির নামে বিভিন্ন বিদ'আতী আকীদা প্রচলন করে, যা কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। তাদের এ সকল বিদ'আতী বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে:

(১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে আলীর (রা) রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং ইসলামী আকীদার মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(২) আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ যা'সুম বা নিষ্পাপ।

(৩) আলী (রা) তাঁর মৃত্যুর পরে আবার ফিরে আসবেন।

^{২৪} শাতিবী, আল-ইতিসাম ১/৫৪-৫৬।

(৪) রাস্তুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বিশেষ কিছু গোপন ইলম দান করেছেন এবং আলীর (রা) নিকট গুপ্ত ইলমের ভাগার রয়েছে।

(৫) আলী (রা)-এর মধ্যে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, সম্পর্ক বা বিশেষত্ব রয়েছে বা তিনি অবতার।

(৬) সাহাবীগণের প্রতি কৃধারণা পোষণ করা, তাঁদেরকে ধর্মচ্যুত বা মুরতাদ মনে করা ও তাঁদের সকলকে বা অধিকাংশকে গালি দেওয়া।

প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে এ সকল বিদ'আতের উৎপত্তি ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা কিছু মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে। আলী (রা) নিজে এদের বিভাস্তি দূর করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যারা তাঁর উল্লিখিয়াত বা 'আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক' দাবি করত বা তাকে সাজদা করত তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সর্বশেষ যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে তাদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

আলী (রা)-এর সময় থেকে (৩৫-৪০হি) খারিজীগণের বিদ'আতী আকীদার উন্নেষ্ট ঘটে। তাদের বিদ'আতী আকীদার মধ্যে রয়েছে:

(১) কবীরা গোনাহে লিঙ্গ মুসলিম কাফির বলে গণ্য।

(২) পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের ইমামত অবৈধ এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।

প্রথম হিজরীর শেষভাগ থেকে কাদারীয়াদের বিদ'আতের উন্নেষ্ট ঘটে। এসময়ে ক্রমান্বয়ে মুরজিয়া, জাবারিয়া, মুতাযিলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আকীদাগত বিদ'আতসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আমরা এদের বিদ'আতী আকীদাগুলি ফিরকাসমূহের আলোচনার সময় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ১. ৬. সুন্নাত ও বিদ'আত: তৃলনা ও পার্থক্য

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকা নিজেদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রকৃত অনুসারী এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুধাবনকারী বলে দাবি করেছে। প্রত্যেকেই নিজেদেরকে একমাত্র নাজাত-প্রাপ্ত ফিরকা বলে দাবি করেছে। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে তাদের মতের পক্ষে অনেক 'অকাট্য (!) দলীল প্রদান করেছে। এ সকল দাবির যথার্থতা বুঝতে হলে সুন্নাতের সঠিক পরিচয় বুঝতে হবে। আমরা দেখব যে, কথায় ও কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর বা ওহীর হৃবহু অনুসরণই সুন্নাত। এখানে একটি উদাহরণ পেশ করছি সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য অনুধাবনের জন্য।

সাহাবীগণ সম্পর্কে শীঘ্ৰ আকীদা ও নাসিবী আকীদা

শীঘ্ৰগণের একটি বিদ'আতী মত এই যে, হাতে গোনা অল্প কয়েকজন সাহাবী ছাড়া আবু বাকর (রা), উমার (রা), উসমান (র) ও অন্যান্য সকল সাহাবী (ﷺ) ধর্মত্যাগ করেছিলেন বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (নাউয়ু

বিল্লাহ!)। এর বিপরীতে 'নাসিবাহ' (الناصبة) সম্প্রদায়ের বিদ'আতী আকীদা এই যে, আলী (রা) সত্য-বিচ্যুত ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর আজ্ঞায়তার সম্পর্ককে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেন এবং তিনি ক্ষমতার লোভে হাজার হাজার মানুষের রক্তপাতের ব্যবস্থা করেন। তার সময়ের সকল গৃহযন্দের জন্য তিনি দায়ী। (নাউয় বিল্লাহ!)

এরা কয়েকটি হাদীসকে তাদের মতের পক্ষে অকাট্য (!) দলীল হিসেবে পেশ করেন। ইবনু আবুস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَوْلَىٰ مَنْ يَكْسِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِيِّ يُؤْخَذُ بِهِمْ
ذَاتَ الشَّمَاءِ فَأَقُولُ أَصْحَابِيِّ أَصْحَابِيِّ فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَرُوا مُرْتَدِينَ عَلَىٰ
أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقُتُهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ الصَّالِحُ وَكَنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ
فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"কিয়া মতের দিন প্রথম কাপড় পরানো হবে ইবরাহীম (আ)-কে। আমার সাহাবীদের কিছু মানুষকে ধরে বামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, আমার সাহাবীগণ! আমার সাহাবীগণ! তখন তিনি বলবেন: আপনি এদেরকে ছেড়ে চলে আসার পর থেকে তারা অবিরত পিছিয়ে যেতেই (ধর্মত্যাগ করতেই) থেকেছে। তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা (ইসা আ.) যে কথা কলেছেন সে কথাই বরব, আমি বলব": 'আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে ফেরত নিলেন তখন থেকে আপনিই তাদের পর্যবেক্ষক, আর আপনি তো সর্ব-বিষয়ে সাক্ষী।'"^{২৫}

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন:

أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْخَوْضِ وَلَا نَازِ عَنْ أَفْوَاماً ثُمَّ لَا غَلَبَنَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا
رَبُّ أَصْحَابِيِّ أَصْحَابِيِّ فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَنْزِي مَا أَحْدَثْتُو بَعْدَكَ

"আমি হাউয়ের নিকট তোমাদের অগ্রবর্তী থাকব। কিছু মানুষের বিষয়ে আমি বিতর্ক করে শেষ পর্যন্ত পরাভূত হব। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক, আমার সাহাবীগণ, আমার সাহাবীগণ! তখন বলা হবে: 'আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন বা পরিবর্তন করেছে তা আপনি জানেন না।'"^{২৬}

^{২৫} সূরা (৫) মায়দা: ১১৭ আয়াত।

^{২৬} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২২৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৩-১৮০০।

^{২৭} বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৯১, ১৭৬৬, ৫/২৩৯১, ২৪০৪, ২৪০৬, ৬/২৫৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৭, ৪/১৭৯৩-১৮০০, ২১৯৪।

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেন:
 لَيْرَدَنْ عَلَيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ حَتَّى عَرَفُتُهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي
 فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَنْزِي مَا أَخْتَلَوْا بَعْدَكَ

“আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ হাউয়ে আমার নিকট আগমন করবে। আমি যখন তাদের চিনতে পারব তখন তাদেরকে আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি তখন বলব: আমার সাহাবীগণ! তখন তিনি বলবেন: ‘আপনার পরে এরা কি নব-উত্তাবন বা পরিবর্তন করেছে তা আপনি জানেন না।’”^{২৮}

উভয় সম্প্রদায় দাবি করে যে, এ সকল হাদীস তাদের মতের অকাট্য (!) দলিল। নাসিরীদের মতে এ সকল হাদীস আলী (রা) ও তাঁর অনুসারীদের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর শীয়াগণ দাবি করেন যে, এগুলি আলী (রা) ও তাঁর একান্ত সঙ্গী কতিপয় সাহাবী বাদে সকল সাহাবীর বিষয়ে বলা হয়েছে। তাদের মতে এ সকল হাদীস প্রমাণ করে, যে রাসূলগ্লাহ ﷺ-এর পরে আলী (রা)-কে ক্ষমতা প্রদান না করে সকল সাহাবী মুরতাদ হয়ে যান (নাউয়ু বিল্লাহ!)

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে,

(১) কুরআনে অনেক স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা ও তাঁদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক স্থানে স্পষ্টত তাদের জাল্লাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(২) বিশেষ করে প্রথম অংগৃহীত মুহাজির ও আনসারগণের জন্য মহান আল্লাহ জাল্লাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জাল্লাতের পথ বলে জানানো হয়েছে।

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জাল্লাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জাল্লাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) কুরআনে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার সমাজে কিছু মুনাফিক বাস করত, তারা রাসূলগ্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যেই মিশে থাকত এবং বাহ্যত তাঁদের অভর্তুক ছিল। এরা সংখ্যায় অল্প ছিল। এদের অধিকাংশই তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি। এদের বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে:

^{২৮} বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৬, ৬/২৫৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৩-১৮০০।

وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَغْرِبَ مُنَافِقُونَ وَمَنْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى
النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَتُعذِّبُهُمْ مَرَّيْئِنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

“মরুবাসীদের মধ্যে যারা তাদের আশে-পাশে আছে তাদের মধ্যে
কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায়
সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে
দুবার শান্তি দিব ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহা-শান্তির দিকে।”^{২৯}

(৬) এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরে
তাঁর কাছে ইসলামগ্রহণকারী কিছু মানুষ ও আরবের অন্যান্য অনেক মানুষ
ইসলাম পরিত্যাগ করে। কেউ ভগুনবীদের অনুসারী হয়ে যায় এবং কেউ
যাকাত অস্বীকার করে।

এ সকল দ্ব্যুর্থীন আয়াত ও হাদীসের বিপরীতে দ্ব্যুর্থবোধক কয়েকটি
হাদীসকে তারা তাদের মতের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ সকল হাদীসে
কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি, অধিকাংশ সাহাবীর কথাও বলা হয়
নি, বরং বলা হয়েছে যে, সাহাবী বলে পরিচিত কতিপয় মানুষ। শীয়াগণ ও
নাসিরীগণ এ সকল হাদীসের শান্তিক বক্তব্যকে গ্রহণ করে তার মধ্যে নিজেদের
আকীদা সীমাবদ্ধ রাখে নি। এ হাদীসকে তাদের ‘বাহন’ হিসেবে ব্যবহার
করেছে। তারা নিজেদের মর্জি, পছন্দ ও অভিকৃতি মত একটি মত বা আকীদা
উত্তোলন করেছে যা তারা যেভাবে বলে সেভাবে কথনোই কুরআন কারীমে বা
হাদীসে পাওয়া যায় না। এখানেই বিদ্যাত ও সুন্নাতের পার্থক্য।

কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত আকীদা: সকল সাহাবীর মর্যাদা, মক্কা বিজয়ের
পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা, তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের
বিশেষ মর্যাদা, বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা এবং
সর্বোপরি প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারদের সর্বোচ্চ মর্যাদা। তাঁদের মধ্যে
জাল্লাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা। পাশাপাশি এ বিশ্বাস যে,
সাহাবী নামধারী বা সাহাবী বলে পরিচিত কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ
বা পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে সাহাবীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। তাঁরা
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমকালীন মদীনার বা আশেপাশে অবস্থানরত মুনাফিকগণ,
যাদের কথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, অথবা তাঁর ওফাতের পরে ভগুনবীদের
কারণে বা যাকাত অস্বীকার করার কারণে যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হন।

বিদ্যাতী আকীদা: প্রায় সকল সাহাবীই সুপথ থেকে বিচ্যুত হন

^{২৯} সূরা (৯) তাওবা, ১০১ আয়াত।

(নাউয়ু বিল্লাহ!) কেবলমাত্র কয়েকজন সুপথে ছিলেন। তাঁদের মর্যাদার মাপকাঠি আলী (রা) ইমামতের পক্ষে কথা বলা।

বিভীষ্ম বিদ'আতী আকীদা: আলী (রা) ও তাঁর সাথী সাহাবীগণ সুপথ থেকে বিচ্যুত ছিলেন।

উভয় সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে উপরের হাদীসগুলির মত আরো অনেক সাধারণ অর্থবোধক আয়াত বা হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন এবং এর বিপরীতে সাহাবীগণের মর্যাদা বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন।

এখানে আমরা সুন্নাতপঙ্খী ও বিদ'আতপঙ্খীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে পারছি। সুন্নাতপঙ্খীগণ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত সকল বিষয় সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করেন। কোনোরূপ বৈপরীত্য সন্দান করেন না। বাহ্যিক কোনো বৈপরীত্য দেখা গেলে তা কুরআন ও হাদীসের আলোকেই সমাধান করেন।

এখানে কুরআনের অনেক আয়াতে সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণিত। এর বিপরীতে কুরআনের একটি আয়াতেও সাহাবীগণের বিচ্যুতির বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। অগণিত হাদীসে সাধারণভাবে এবং নাম উল্লেখ করে সাহাবীগণের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির বিপরীতে কোনো একটি হাদীসেও সাহাবীগণের অর্থমর্যাদা বা বিচ্যুতির কথা বলা হয় নি। এখানে কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সাহাবী হিসেবে পরিচিত কতিপয় ব্যক্তিকে হাউয় থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদের বিষয়ে বলা হবে যে, এরা আপনার পরে পচাদপসরণ করেছিল বা নব-উত্তোলন করেছিল।

মূলত এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আর কোনো বৈপরীত্য থাকলে তাও সুন্নাতের আলোকে সমাধান করতে হবে। কুরআনের নির্দেশনা, মুতাওয়াতির হাদীসের নির্দেশনা অগ্রবর্তী থাকবে। এছাড়া অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক আয়াত বা হাদীসের কারণে সুস্পষ্ট, দ্যর্থহীন, সুনির্দিষ্ট নাম বা বৈশিষ্ট্যসহ মর্যাদা প্রকাশক হাদীসগুলি ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক আয়াত বা হাদীসকে সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসের বিপরীতে ব্যাখ্যা করতে হবে। কোনো তাফসীর, ব্যাখ্যা বা ব্যক্তিগত মতামতকে ওহীর বিপরীতে দাঁড় করানো যায় না বা এরপ কিছুর ভিত্তিতে ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যাখ্যা করা যায় না। কেউ এর বিপরীত করলে বুঝতে হবে যে, সে নিজের মতকে ওহীর অনুসারী ও অনুগামী করতে রায় নয়, বরং সে ওহীকে তার মতের অনুগামী ও অনুসারী বানতে ইচ্ছুক। পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় আমরা দেখব যে, সকল বিদ'আতী আকীদা ও সুন্নী আকীদা একইরূপ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝতে পারি। সুন্নাত হলো ওহীর বা কুরআন-হাদীসের হৃবহু অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যতটুক যেভাবে বলেছেন তা ততটুক সেভাবেই বলা এবং যা বলেন নি তা বলা না বলা। কুরআন ও হাদীসের বজ্বের মধ্যে ঈমান-আকীদা সীমাবদ্ধ রাখা। কুরআন বা হাদীসের সাথে নিজেদের ব্যাখ্যা, মতামত বা যুক্তি যোগ করে তা আকীদার অংশ না বানান। কুরআন ও হাদীসের সকল কথা সমানভাবে বিশ্বাস করা। কোনো কথা গ্রহণ ও বাকি কথা বাতিল না করা। ব্যাখ্যা করে কোনো ওহী বাতিল না করা, বরং ব্যাখ্যা করে সকল ওহী গ্রহণ করা।

পক্ষান্তরে বিদ'আত অর্থ ওহীর সাথে কোনো কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতীক্রম করে তা বিশ্বাস বা আকীদার অংশে পরিণত করা। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বলেন নি তা বলা, অথবা ব্যাখ্যা বা সমন্বয়ের নামে ওহীর অতিরিক্ত কিছু আকীদার মধ্যে সংযোজন করা অথবা ওহীর কিছু অংশ ব্যাখ্যার নামে বাদ দেওয়া। বিদ'আতপর্যীগণ সুন্নাতের অনুসরণ দাবি করেন। কিন্তু তাদের আকীদা বা বিশ্বাসগুলি হৃবহু সুন্নাতের মধ্যে নেই। বরং তাদের আকীদা বা বিশ্বাস সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন।

৬. ২. ইফতিরাক ও ইখতিলাফ

ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভাজন ইসলামী আকীদার অন্যতম বিষয়। সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিদ'আতের উদ্ভাবনই ইফতিরাকের মূল কারণ। ইফতিরাক বা বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর।

৬. ২. ১. ইফতিরাক

ইফতিরাক (الافتراق) শব্দটি আরবী 'ফারক', 'ফারাক' শব্দ থেকে গ়ৃহীত। এর অর্থ পার্থক্য করা, বিভক্ত করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। ইফতিরাক (الافتراق) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা, বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। ফিরকা (الفرق) অর্থ দল, সংগঠন।

ইফতিরাক শব্দটি 'ইজতিমা' (الاجتماع) শব্দটির বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রাজ্ঞি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"^{৩০}

^{৩০} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১০৩ আয়াত।

এখানে আল্লাহ জামা'আত (الجماعـة) বা ইজতিমা (إجـتمـاع)-এর বিপরীতে 'ইফতিরাক' ও 'তাফাররুক' উল্লেখ করেছেন। ইজতিমা অর্থ ঐক্যবন্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া, দলবিহীন হওয়া ইত্যাদি।

৬. ২. ২. ইফতিরাক বলাম ইখতিলাফ

ইফতিরাকের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ 'ইখতিলাফ'। ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। আর ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা। ইফতিরাক ও ইখতিলাফ-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ বা মতবিরোধিতা সাধারণভাবে বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি নয়। মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র 'ইক্ষ' ও অন্যমতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্যমতের অনুসারীদের 'অন্যদল' মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা 'বিচ্ছিন্নতা'-য় পরিণত হয়।

'ইখতিলাফ' ও 'ইফতিরাক'-এর পাথরকের মধ্যে রয়েছে:

(১) ইফতিরাক বা ফিরকাবাজি ইখতিলাফ বা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়।

(২) সকল ইফতিরাকই (দলাদলি) ইখতিলাফ (মতভেদ), তবে সকল ইখতিলাফ (মতভেদ) ইফতিরাক (দলাদলি) নয়। ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না।

(২) ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম ও আলিমদের মধ্যে 'মতভেদ' বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না।

(৩) শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর নয়, বরং অনেক সময় তা প্রশংসিতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

(৪) ইখতিলাফকারী আলিম নিষিদ্ধ নয়, বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরুষার-প্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরুষার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দুটি পুরুষার লাভ করেন।

(৫) ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ ও ইখলাসের অনুপস্থিতি। ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুন্দ বলে মনে করলেও অন্য মতটিকে বিভাস্তি ও অন্যমতের

আলিমকে ‘বিভ্রান্ত’ বলে মনে করেন না, বরং তার দলিলকে দুর্বল বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলিম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন।

(৬) ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভাস্তবোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলির সাথে ‘ইফতিরাক’ থাকতে পারে না। কেবলমাত্র এগুলির অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।

(৭) ইখতিলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত, পক্ষান্তরে ইফতিরাক সকল ক্ষেত্রেই আঘাত ও ধৰ্মস।

৬. ত. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইফতিরাক

৬. ৩. ১. পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে ইফতিরাক

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে আসমানী হেদায়াত প্রাণ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দলাদলি ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি দেখা দেবে বলে জানিয়েছেন। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিভক্তি ও দলাদলির মূল কারণ ছিল ওহীর শিক্ষার ব্যক্তিক্রম করা বা ওহীর কিছু শিক্ষা ভুলে যাওয়া, ব্যক্তিগত বিদ্যে, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হওয়া, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করা, অতিভক্তি, পূর্ববর্তী গুরুদের অঙ্গভক্তি ও অনুকরণ ইত্যাদি।

ইহুদী-খ্স্টানদের বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخْدَنَا مِنَافِهِمْ فَنَسُوا حَطَّاً مَمَّا ذَكَرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا^১
بِتِئْمَهُمُ الْعَدَاؤَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يَتَبَشَّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“যারা বলে ‘আমরা খ্স্টান’ তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তার ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্যে জাগরুক রেখেছি। তারা যা করত আল্লাহর তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন।”^{১১}

এ আয়াতে আমরা দেখেছি যে, খ্স্টানদের বিভক্তির মূল কারণ ছিল তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বা তাদের উপর নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ ভুলে যাওয়া। আমরা দেখেছি যে, তাদের এ ভুলে যাওয়ার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। তারা আল্লাহর কিতাব সাধারণ মানুষদের পড়তে দিত না, অনেক অবহেলা ও অযন্ত্রে কিতাবের অনেক অংশ হারিয়ে ফেলে, অনেক কিছু পরিবর্তন

^{১১} সূরা (৫) মায়দা: ১৪-১৫ আয়াত।

করে এবং মনগড়া কথা রচনা করে তা দিয়ে মূল কিতাবের শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়।

অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মীয় ভাত্তের অভাব, মতভেদকে শক্তার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, নিজের মতকে চূড়ান্ত সত্য মনে করে পরিত্নক ও আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি ছিল পূর্ববর্তী উম্মাতদের ইফতিরাকের কারণ ও প্রকাশ। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّمَا أُقْدُوا نَارًا لِّلْحَرَبِ
أطْفَاهَا اللَّهُ

“তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শক্তা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন।”^{৩২}

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, ইফতিরাক ও দলাদলির কারণ অঙ্গতা ছিল না, বরং জ্ঞান আসার পরেও জিদ, হিংসা, উদ্ধৃত্য, নিজ মত পরিত্যাগকে অপমান বলে গণ্য করা এবং সর্বোপরি ইখলাস ও তাকওয়ার অনুপস্থিতিই ছিল ইফতিরাক বা দলাদলির কারণ। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ

“তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা নিজদের মধ্যে বিভেদ-দলাদলি করে।”^{৩৩}

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَانْتَقُونِ فَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدِيهِمْ فَرِحُونَ

“এবং তোমাদের এ জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা নিজদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।”^{৩৪}

আহলু কিতাবের বিভাগের অন্যতম কারণ অতিভক্তির কারণে ওহীর অতিরিক্ত মতামত উত্তোলন। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

^{৩২} সূরা (৫) মায়দিঃ ৬৪ আয়াত।

^{৩৩} সূরা (৪২) শূরা: ১৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (২) বাকারা ২১৩ আয়াত, সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৯ আয়াত, সূরা (৪৫) জাসিয়াহ: ১৭ আয়াত।

^{৩৪} সূরা (২৩) মুমিনুন: ৫২-৫৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা (৩০) রূম: ৩২ আয়াত।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَقٌّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلْمَةُ اللَّهِ أَقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَأَمْنَوْا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ

“হে কিতাবীগণ, দীনের বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সমক্ষে সত্য ব্যক্তিত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আজ্ঞা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে উপর ঈমান আন এবং বলিও না ‘তিন’...”^{৩৪}

আমরা দেখেছি যে, খৃস্টানগণ ওহীর শব্দগুলির অভিভিত্তিমূলক ব্যাখ্যা করে এরূপ ব্যাখ্যার উপর আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে। খৃস্টধর্মের ইতিহাসের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, ঈসা (আ) কেন্দ্রিক বাড়াবাড়িই তাদের মধ্যকার সকল দলাদলি ও ফিরকাবাজির মূল বিষয় ছিল। ত্রিতুবাদ নামক মনগড়া মতবাদ এবং ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা নিয়েই তাদের যত ফিরকাবাজি।

বিশ্বাসের মধ্যে ওহীর সাথে ব্যাখ্যার নামে মানবীয় মতামত, দর্শন ইত্যাদি যোগ করে তাকে ধর্মে বা ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করাকে কুরআন কারীমে ‘হাওয়া’ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইহুদী-খৃস্টানগণের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরেকটি দিক ছিল কতিপয় ‘পশ্চিতের’ প্রতি পরবর্তীদের অঙ্গ ভক্তি ও তাদের মনগড়া মতামতের অঙ্গ অনুকরণ। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُو أَهْوَاءَ قَوْمٍ
فَذَضَّلُوا مِنْ قَبْلِ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের ‘হাওয়া’ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, মনগড়া মত বা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।”^{৩৫}

৬. ৩. ২. মুসলিম উম্মাহর ইফতিহার

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার এ উম্মাতকে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন। যারা ধর্মকে বিভক্ত করে তাদের নিন্দা

^{৩৪} সূরা : ৪ নিসা, ১৭১ আয়াত।

^{৩৫} সূরা (৫) মায়দা: ৭৭ আয়াত।

করেছেন এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্ক থাকবে না বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ক একটি আয়াত এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখেছি। যে আয়াতে মহান আল্লাহর বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না বা দলাদলি করো না।” অন্য আয়াতে মহান আল্লাহর বলেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَقُوا وَأَخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।”^{৩৭}

অন্য আয়াতে আল্লাহর বলেন:

فَاقْمِ وَجْهَكُلَّدِينِ حَتَّىٰ فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْنِي لَهُ خَلْقَ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مُنْبِينَ إِلَيْهِ وَأَنْقُوهُ وَأَقِمُوهُ
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ
حِزْبٍ بِمَا لَدُنْهُمْ فَرِحُونَ

“তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধচিত্তে তার অভিমুখী হয়ে তাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্ত ভূক্ত হয়ো না মুশৰিকদের, যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎসুক।”^{৩৮}

অন্য আয়াতে আল্লাহর বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ
ثُمَّ يَنْبَغِي لَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।”^{৩৯}

^{৩৭} সূরা (৩) আল-ইমরান: ১০৫ আয়াত।

^{৩৮} সূরা (৩০) রুম: ৩০-৩২ আয়াত।

^{৩৯} সূরা (৬) আন'আম: ১৫৯ আয়াত।

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
نَّلَّكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ

“এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ
অনুসরণ করো না, করলে সেগুলি তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে।
এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।”^{৪০}

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, যেভাবে পূর্ববর্তী
উম্মাতগুলির মধ্যে বিভক্তি এসেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁর উম্মাতের মধ্যেও
বিভক্তি ও দলাদলি প্রবেশ করবে। ‘যাতু আনওয়াত’ বৃক্ষ বিষয়ক হাদীসটি
আমরা ‘তাবার্রুক বিষয়ক শিরকের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আমরা
দেখেছি যে, এ হাদীসে “রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যাঁর হাতে আমার জীবন
তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।”

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَتَتَّبَعُنَّ سَيِّنَ مِنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَنِرَاعًا بِنِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَّكُوا جَحَرَ
ضَبْ لَسْكَمُوَةَ قَلَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ؟

“তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি)
পদে পদে অনুসরণ করবে: বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে। এমনকি তারা
যদি কোনো শুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ
করবে।” আমরা বললাম: পূর্ববর্তীগণ বলতে কি ইহুদী-খ্রিস্টানরা?” তিনি
বলেন: ‘তবে আর কারা?’^{৪১}

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ أَمْئَى بِأَخْذِ الْقَرْوَنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَنِرَاعًا
بِنِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسُ وَالرُّومُ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ

“কিয়ামত আগমনের আগেই আমার উম্মাত পূর্ববর্তী জাতিগুলি রীতি
গ্রহণ করবে, বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে। তখন বলা হলো, ‘হে
আল্লাহর রাসূল, পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের মত?’ তিনি বলেন:
‘তাদেরকে বাদ দিলে আর মানুষ কারা?’^{৪২}

^{৪০} সূরা (৬) আন-আম: ১৫৩ আয়াত।

^{৪১} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭৪, ৬/২৬৬৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫৪।

^{৪২} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৬৯।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যাধির কারণে বিভক্তি ঘটে তা উল্লেখ করেছেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

نَبِيُّكُمْ دَاءُ الْأَمْمَ قَبْلُكُمُ الْحَسْدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالَةُ لَا أَقُولُ تَحْلُقُ
الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلُقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا
تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ...

“পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, সে ব্যাধি হলো হিংসা ও বিদ্রোহ। বিদ্রোহ মুগ্নকারী। আমি বলি না যে, তা মাথার চুল মুগ্ন করে, বরং তা দীন মুগ্ন করে।”^{৪৩}

প্রথম অধ্যায়ে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নাত ও সুপর্খপ্রাণ খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোন প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভাসি ও পথব্রহ্মিতা।”

এ হাদীসে তিনি বিভক্তি থেকে আত্মরক্ষার পথ জানিয়েছেন, তা হলো, তাঁর ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অটল থাকা। অন্য হাদীসে তিনি বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের প্রকৃতি ও বিভক্তির সময় উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعْدَهُ اللَّهُ فِي أَمَّةٍ قَبْلَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أَمْمَهُ حَوَارِيُّونَ
وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنْنَتِهِ وَيَقْتُلُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَقُولُونَ
مَا لَا يَقْعُلُونَ وَيَقْعُلُونَ مَا لَا يُؤْمِنُونَ فَمَنْ جَاهَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَهُمْ
بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَهُمْ بِقُلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ
حَبَّةُ خَرْنَقٍ

“আমার পূর্বে যে উম্মাতের মধ্যেই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীরই উম্মাতের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সাহাবী ছিলেন, তাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতেন। অতঃপর তাদের পরে

^{৪৩} তিরমিয়ী, আস-সুনান 8/৬৬৪।

এমন একদল উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটে যারা যা বলে তা করে না এবং যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা তারা করে। কাজেই যে ব্যক্তি এদের সাথে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি এদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন। এর পরে আর শরিষ্ঠা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকে না।”^{৪৪}

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণের পরের যুগে বিভক্তি আসবে। এছাড়া তিনি সাহাবীগণের দুটি বৈশিষ্ট্য ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক হাদীসে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেছেন।

আলী এবং ইবনু মাসউদ (رضي الله عنهما) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَأْتِي فِي أَخْرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَّثُوا (أَخْدَاثُ الْأَسْنَانِ) سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ يَقُولُونَ
مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِّيَّةِ (يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ) (يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ)
يَمْرَقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ (مِنَ الْحَقِّ) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمَيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانَهُمْ
حَنَاجِرِهِمْ فَإِنَّمَا لَقِيَتُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ قَتَلْتُهُمْ أَجْزَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্তা, বোকামি ও প্রগতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কঠনালী অতিক্রম করবে না। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরক্ষার থাকবে।”^{৪৫}

এই অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্ছুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সর্বজনীন এবং সকল

^{৪৪} মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

^{৪৫} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪৬; তিরমিয়ী, আস-সুনান ৪/৮১; নাসাই, আস-সুনানুল কুরবা ৫/১৬১।

যুগেই একপ মানুমের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বানীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।^{৪৬}

উপরের সহীহ হাদীসগুলি সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এসকল হাদীস থেকে আমরা উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি ও বিভক্তির কারণ সম্পর্কে জানতে পারি। অনুরূপভাবে বিভক্তি ও মতভেদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথও আমরা জানতে পারি। অন্য কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানিয়েছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تَفَرَّقَ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ تِنْتَيْنِ وَسَبْعِينِ فِرْقَةً وَالنَّصَارَىٰ
مِثْلُ ذَلِكَ وَتَفَرَّقُ أَمْمَىٰ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينِ فِرْقَةً

“ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খৃস্টানগণও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে”^{৪৭}

অন্য হাদীসে মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبَّلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الْكَتَابِينِ) افْتَرَقُوا عَلَىٰ شَتَّىٰ نِعَمٍ وَسَبْعِينَ
مَلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمَلَّةَ سَتَفْتَرَقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينِ شِتَّانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ
وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

“তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে এবং একটি দলই জান্নাতে। এ দলটি হলো জামা'আত।”^{৪৮}

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُتْ عَلَىٰ شَتَّىٰ نِعَمٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً وَتَفَرَّقُ أَمْمَىٰ عَلَىٰ
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةٌ قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَأَصْحَابِي

^{৪৬} ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৯৩-৪১১।

^{৪৭} তিরায়িয়ী, আস-সুনান ৫/২৫। তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪৮} আবু দাউদ ৪/১৯৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/৪০৪-৪১৪।

“ইসরায়েল সন্তানগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, একটিমাত্র দল বাদে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন: ‘আমি এবং আমার সাহাবীগণ এখন যার উপর আছি।’”^{৪৯}

এভাবে আমরা দেখছি যে, মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা একত্রিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর দীন ও হেদায়াত লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক ও জাগতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এরূপ বিভক্তি আসবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, বিভক্তিদের দল-উপদল অনেক হলেও অনুসারী কম। কারণ আমরা দেখব যে, বিভক্তির মূল কারণ আকীদার উৎস হিসেবে ওহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ওহীর সাথে মানবীয় যুক্তি বিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করা। আর এ পথ খুলেই বিভক্তির পথ খুলে যায়। এজন্য ফিরকাণ্ডলির মধ্যে আভ্যন্তরীন বিভক্তি খুবই বেশি। এতে ফিরকার সংখ্যা বাড়লেও অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, উপরের কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভক্ত ৭৩ দলের ৭২ দলই জাহান্নামী। এর অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির বা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী। বরং এরা বিশ্বাসগত পাপের কারণে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ্র্যাতে লিঙ্গ হওয়ার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাহাবীগণ এবং তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত আকীদাগত বিভ্রান্ত ফিরকাণ্ডলিকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। তাদেরকে বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিতে নিপত্তিত মুসলিম বলে গণ্য করেছেন। তবে বিভ্রান্ত দল ও সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ছাড়া সকলকেই কফির বলে গণ্য করত ও করে।

৬. ৩. ৩. ইফতিরাকের কারণ

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী উম্মাত এবং এ উম্মাতের মধ্যে ইফতিরাক বা বিভক্তির কারণগুলি নিম্নরূপ:

৬. ৩. ৩. ১. ওহী ভুলে যাওয়া

কুরআন কারীমে আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মাতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত ওহীর একটি অংশ ভুলে গিয়েছিল, ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শক্রতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা একটু আগে দেখেছি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

^{৪৯} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/২৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। অন্যান্য মুহান্দিস হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

فِيمَا نَقْضُهُمْ مِنْ أَقْهَمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ

“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হন্দয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে।”^{১০}

ওহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। অবহেলার মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বিলুপ্ত হওয়া, ব্যাখ্যার নামে মূল ওহী বাদ দিয়ে ব্যাখ্যাকেই ওহীর স্থলাভিষিক্ত করা, আহবার-রুহবানদের মাসূম বা নিষ্পাপ-নির্ভুল বলে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকে ওহীর সমতৃল্য বলে গণ্য করা, ওহীর নামে বানোয়াট বা মিথ্যা কথা প্রচার করা, দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বাদ দেওয়া, জাগতিক শার্থের কারণে ওহীর নির্দেশনা বিকৃত করা ইত্যাদি। পূর্ববর্তী জাতিগুলির ন্যায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি মূল কারণ। বিভিন্নভাবে এরা ওহী ভুলেছে বা ভুলাতে চেষ্টা করেছে। যেমন:

(ক) ওহী বা কুরআন ও হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যার অধিকার কারো নেই বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে সরিয়ে রাখা। বিশেষ করে শীয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদাগুলির এটি অন্যতম।

(খ) ওহীর ব্যাখ্যায় কোনো আলিম, মা'সূম ইমামের বা অন্য কারো বিশেষ অধিকার আছে বলে দাবি করে তার ‘ইলম লাদুন্নী’, কাশফ, ব্যাখ্যা বা মতামতকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া। এটিও শীয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম।

(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে অন্য কোনো মানুষের নিষ্পাপত্ব বা নির্ভুলত্বে বা তাঁর ইলম লাদুন্নী, কাশফ বা ইলহামের অভ্যন্তরায় বিশ্বাস করে তার মতামতকে ওহীর সমতৃল্য বা ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা। এতে মূল ওহীর আর কোনোই মূল্য থাকে না। কেবলমাত্র ওহীর ব্যাখ্যা নামে কথিত ইমামের মতামতই আকীদার একমাত্র ভিত্তি হয়ে যায়। এটিও শীয়াদের বিভ্রান্তির মৌলিক দিক।

(ঘ) ওহীর পাশাপাশি দর্শন, বৃক্ষিবৃক্ষিক যুক্তি ইত্যাদিকে ওহীর মতই আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। সকল বিভ্রান্ত দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) ওহীর তাফসীর বা ব্যাখ্যার নামে নিজেদের বা কোনো আলিম বা বুজুর্গের মতামতকে ওহীর সাথে আকীদার অংশ বানিয়ে দেওয়া। সকল

^{১০} সূরা (৫) মায়দা: ১৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা মায়দা ৪১ আয়াত।

বিভাস্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

(চ) তাবীল-ব্যাখ্যার নামে ওহীর কিছু বিষয় বাতিল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আকীদার মধ্যে গণ্য করা। এতে ওহীর মূল ভাষা আকীদা থেকে ‘ভুলে যাওয়া’ হয়। সকল বিভাস্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ছ) বানোয়াট কথা বানিয়ে ওহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরি করা বা জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার উপরে আকীদার ভিত্তি স্থাপন করা। এটি শীয়া ও অন্যান্য অনেক ফিরকার বৈশিষ্ট্য।

৬. ৩. ২. হাওয়া (হৃত্তে) বা মনগড়া মতামতের অনুসরণ

হা, ওয়াও ও ইয়া তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত শব্দটির মূল অর্থ শূন্য হওয়া, খালি হওয়া বা নিপত্তি হওয়া। এ ক্রিয়ামূল থেকে দু প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়: বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাওয়া-ইয়াহীবী (ضرب بضرب) এবং এক্ষেত্রে অর্থ হয় নিপত্তি হওয়া। এ ক্রিয়ার মাসদার: হুবিয়ান (سمع يسمع) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাবিয়া-ইয়াহীবা (هُوَ يَهْوِي) অর্থাৎ ভালবাসা, প্রেম করা, পছন্দ করা, ইত্যাদি। এ ক্রিয়ার মাসদার ‘হাওয়ান’ (হোই)। এভাবে আমরা দেখছি যে, হাওয়া (হুওয়ি) শব্দের অর্থ প্রেম, ভাললাগা, পছন্দ করা (love, passion, wish, desire, pleasure) ইত্যাদি। বহু বচন: আহওয়া (الْأَهْوَاء)।^{১০৩}

কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘হাওয়ান নাফস’ (হোই) বা ব্যক্তি মনের পছন্দ-অপছন্দ অনুসরণ করা বিভাস্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে ‘আহওয়া’ (আহোয়া) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মু’আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَىٰ تِنْتِينِ وَسَبْعِينِ مَلَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ سَفَرَتْ فِي ثَلَاثٍ وَسَبْعِينِ مَلَةً يَعْنِي الْأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أَمْتَى أَفْوَامِ تِجَارَىٰ بِهِمْ تِلْكَ الْأَفْوَاءُ كَمَا يَنْجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عَرْقٌ وَلَا مَقْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ

“তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদী ও খ্স্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তারা পছন্দ বা মনগড়া মতের (আহোয়া) অনুসরণ করবে। এরা সকলেই জাহাননামী, কেবলমাত্র একটি দল বাদে, যারা ‘আল-জামা’আত’। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দল বের

^{১০৩} ইবনু ফারিস, মু’জামু মাকাজিসিল লুগাহ ৬/১৫; ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু’জামুল ওয়াসীত ২/১০০১।

হবে যাদের মধ্যে মনগড়া মত বা পছন্দের অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমনভাবে জলাতঙ্গ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তার রোগ প্রবেশ করে। তার দেহের সকল শিরা, উপশিরা ও অন্তিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে।”^{৫২}

এভাবে আমরা দেখেছি যে, বিভাসি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ ‘ইন্ডিবাউল হাওয়া’ বা পছন্দের অনুসরণ বা মনগড়া মতের অনুসরণ। বস্তুত ধর্ম ও বিশ্বাসের মূল হলো ওহীর নিকট আত্মসমর্পণ। এর স্বরূপ হলো কোনো শিক্ষা বা নির্দেশনা ওহী বলে প্রমাণিত হলে নিজের মত বা পছন্দ-অপছন্দকে তার অধীন করে দেওয়া। প্রয়োজনে নিজের মত বা নিজের মনোনীত ব্যক্তির মত ব্যাখ্যা করে বাদ দিয়ে ওহীর মত ব্যাখ্যাতীতভাবে গ্রহণ করা।

এর বিপরীত হলো ইন্ডিবাউল হাওয়া বা নিজের মনমর্যি বা পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা। এর স্বরূপ হলো, একটি মত বা কর্ম মানুষের কোনো কারণে ভাল লাগবে বা সঠিক বলে মনে হবে। এরপর সে এই মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। ওহীর যে বিষয়টি তার মতের পক্ষে থাকবে সেটি সে গ্রহণ করবে। আর যে বিষয়টি তার মতের বিরুদ্ধে যাবে তা সে প্রত্যাখ্যান করবে বা ব্যাখ্যা করবে।

আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ পূর্ববর্তী ধর্ম, প্রচলিত দর্শন, সামাজিক রীতি বা বিশ্বাসের প্রভাবে বা পূর্বপুরুষদের মতামতের প্রভাবে একটি বিশ্বাস বা কর্মকে ভালবেসে ফেলেন। এরপর তার কাছে ওহীর বিষয় প্রমাণিত হলেও তা গ্রহণ করতে পারেন না। বরং ওহীর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বা না করে উড়িয়ে দেন এবং পছন্দনীয় মতটিই ধরে থাকেন। ইহুদী-খ্রস্টানগণ এবং আরবের কাফিরদের বিভাসি ও বিভক্তির এটি ছিল অন্যতম কারণ। মুসলিম উম্মাহর বিভাসি ও বিভক্ত দলগুলিরও এটি মূল বৈশিষ্ট্য।

৬. ৩. ৩. ৩. হিংসা-বিদ্যে

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিংসা, বিদ্যে, জিদ ও উগ্রতা বিভক্তি বা ইফতিরাকের অন্যতম কারণ। বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের মধ্যে অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ হতেই পারে। দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায় অথবা মতভেদসহ-ই অবিচ্ছিন্ন থাকা যায়: (১) ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং (২) পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভাত্তুবোধ।

^{৫২} আবু দাউদ ৪/১৯৮; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১০২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/৪০৪-৪১৪।

ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন মতভেদ নিরসন করে বা মতভেদের গুরুত্ব কমিয়ে আনে। মতভেদকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গ যদি ওহীর মাধ্যমে যা জানা যায় সেটুকু মূল ধরে ওহীর অতিরিক্ত বিষয়কে অমৌলিক সহযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেন তবে মতভেদের তীব্রতা কমে যায়। পাশাপাশি আন্তরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের অপরের মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে।

মতভেদীয় সকল বিষয়কেই এখানে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়। সাহাবীগণের সকলের মর্যাদার সীকারোক্তিসহ তাঁদের পারম্পরিক তারতম্য নির্ধারণের বিষয়ে, ঈমানের প্রকৃতি ও কবীরা গোনাহকারী বিধানের বিষয়ে, তাকদীর ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়ে, আল্লাহর বিশেষণসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার জন্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি সকলে এ বিষয়ে একমত হতেন যে, ওহীর মাধ্যমে বা কুরআন ও হাদীস থেকে যতটুক জানা যায় তা আমরা গ্রহণ করব। বাকি সমস্যার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে যা বলব তা ওহীর মত চূড়ান্ত বলে গণ্য করব না। বরং এগুলিকে ইজতিহাদী ব্যাখ্যা কাজেই এগুলির সমাধান না হলেও আমরা একে অপরের মত সহ্য করব। কারণ আমরা সকলেই একই ধর্মের অনুসারী ও পরম্পরে ভ্রাতৃত্বের কঠিন বক্ষনে আবদ্ধ।

আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাব সাহাবীগণের মধ্যে এদুটি বিষয়ে প্রগাঢ় বিদ্যমানতার কারণে তাঁদের মতভেদে কখনো বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিম ও ইমামগণও এদুটি বিষয়ের গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে একদিকে তাঁরা তাঁদের আভ্যন্তরীন মতভেদগুলি সহজভাবে নিয়েছেন এবং তাঁদের মতভেদে বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয় নি। অপরদিকে তারা বিচ্ছিন্ন ফিরকাসমূহের মতভেদে ও বিচ্ছিন্নতাও যথাসম্ভব সহজ করে দেখেছেন। তাদেরকে ভুলের মধ্যে নিপত্তি ও বিভাসির শিকার বললেও ওহীর কোনো বিষয় সুস্পষ্ট অস্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁরা তাদেরকে কাফির বলেন নি। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুর্রুল মুখ্যতার গ্রন্থে বিদ'আতী ও বিভাসি সম্প্রদায়ের বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন:

لَا يَكْفِرُ بِهَا حَتَّىٰ الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحْلُونَ بِمَاعِنَا وَأَمْوَالِنَا وَسَبَّ الرَّسُولَ، وَيَنْكِرُونَ صَفَاتَهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ رُؤْبَتِهِ عَنْ تَأْوِيلِ وَشَبَّهَةِ بِدَلِيلٍ قَبْوُلٍ شَهَادَتِهِمْ ، إِلَّا الْخَطَّابِيَّةُ ... وَإِنْ أَكَرَ بَعْضُ مَا عَلِمْ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةٌ كُفْرٌ بِهَا

“এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গালি প্রদান করে, মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ

অস্থীকার করে এবং আখিরাতে তাঁর দর্শন অস্থীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় না। কারণ তাদের এ সকল মতামতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা। এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের আভ্যন্তরীন মামলা-মুকাদ্মামায় তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়। তবে খাতাবিয়াহ^{৩৩} ফিরকাকে কাফির বলা হয়েছে। আর কোনো ফিরকা যদি দীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজন অবজ্ঞাত বিশ্বাস অস্থীকার করে তবে এরপ বিদ'আতের কারণে সে কাফির বলে গণ্য হবে।”^{৩৪}

৬. ৩. ৩. ৪. সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্নি

আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ক্ষেত্রে ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ‘সুন্নাত’ এবং সাহাবীগণের ‘সুন্নাত’ অনুসরণ করাকে নাজাত, সফলতা ও হিদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্নাত শব্দের অর্থ, ও সুন্নাত অনুসরণের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব। বস্তুত সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন সকল বিভাগির দরজা খুলে দেয়। ইসলামের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি খারিজী ফিরকার ইতিহাসে আমরা তা ভালভাবে দেখতে পাই। খারিজীগণ কুরআনের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর ও দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করত এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাদের বুঝের বাইরে মতপ্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করত।”^{৩৫}

এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্থীকার করে। তারা হাদীস অস্থীকার করত না। সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তারা হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করত ও প্রশ্ন করত। কিন্তু তারা ‘সুন্নাত’-এর গুরুত্ব অস্থীকার করত। অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক, বিভাসি ও বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন তার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা জরুরী মনে করত না। বরং কুরআন বা হাদীস থেকে

^{৩৩} খাতাবিয়াহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইয়ামগণ আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়পাত্ৰ, তাদের মধ্যে ‘উল্লিখিয়াত’ বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে ইলাহ হওয়ার বেশিষ্ট বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট শিরক করার কারণে এদেরকে মুসলিম উম্মাহর ইয়ামগণ একবাক্সে কাফির বলে ঘোষণা করেন। দেখুন: বাগদাদী, আব্দুল কাহির, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৪৭।

^{৩৪} ইবনু আবেদীন, রাম্দুল মুহতার ১/৫৬১।

^{৩৫} ইবনুল জাওয়ী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৮১-৮৭।

সাধারণভাবে তারা যা বুঝেছে সেটিকেই চূড়ান্ত মনে করত।^{৫৬}

বস্তুত সুন্নাত-ই মুমিনের মুক্তির পথ। যতক্ষণ মুমিন সুন্নাতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে ততক্ষণ তার কোনো ভয় থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যেভাবে যতটুকু বলেছেন মুমিন যদি তা ততটুকু সেভাবেই বলেন এবং তিনি যা বলেন নি মুমিন যদি তা বলা বর্জন করে তবে তার কোনো ভয় থাকে না। সুন্নাতের বাইরে গেলেই বিচ্যুতির সম্ভাবনা খুলে যায়। কারণ সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে যে সংযোজন বা বিয়োজন সে করে তা সঠিক না ভুল না নিশ্চিত জানার কোনো উপায় তার নেই। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি বা বলা বর্জন করেছেন তা না বললে দীনের কোনো ক্ষতি হবে সে চিন্তা করাও ভাল নয়।

৬. ৩. ৩. ৫. যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা করা

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ‘যা করতে বলা হয় নি তা তারা করবে।’ অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে যে সকল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় নি, ওহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা মুক্তির মাধ্যমে সে সকল কাজকে দীনের বা আকীদার অংশ বানিয়ে নেওয়া।

যেমন, ওহীর মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অসৎকাজে লিঙ্গকে হত্যা করতে, শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি বা রাষ্ট্রদ্বাহিতার নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু খারিজীগণ ওহীর অনুসরণের নামে তা করেছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার নামে আলী (রা)-কে সাজ্দা করতে, তাঁর বিশেষ গাইবী জ্ঞান আছে বলে মনে করতে, তাকে নিষ্পাপ বলে দাবি করতে বা অন্যান্য সাহাবীকে ঘৃণা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু শীয়াগণ তা করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশধরদেরকে ভালবাসা, তাঁদের আনন্দে আনন্দে আনন্দিত হওয়া ও তাদের বেদনায় ব্যথিত হওয়া ইসলামের নির্দেশ। কিন্তু বেদনায় ব্যথিত হওয়ার নামে মাতম বা তাড়িয়া বের করা, শোক-সমাবেশ করা, নিজেকে আঘাত করে রক্ষাক করা ইত্যাদি ইসলামের নির্দেশ নয়। অনুরূপভাবে তাঁদের জন্মদিনে বা অন্য কোনো দিনে তাঁদের ভালবাসা বা আনন্দের নামে যিছিল, উৎসব ইত্যাদি করাও ইসলামের নির্দেশ নয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এবং বিভিন্ন জাল দলিল তৈরি করে শীয়াগণ এরূপ করে থাকে।

সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ই এরূপ করেছে। ওহীর ব্যাখ্যার নামে তারা

^{৫৬} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৪৪-১৪৪৬; হাকিম নাইসাপুরী, আল-মুসতাদরাক ২/৪০৪, ৪৪০, ৪৪৫, ৪/৬১৭; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহসুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬।

এমন কথা বলেছে বা এমন কাজ করেছে যা করতে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

৬. ৩. ৬. অন্যান্য জাতি ধারা প্রভাবিত হওয়া

উপরের বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অনুসরণ করবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন। এর একটি নমুনা দেখেছি যে, মুশরিকদের 'যাতু আনওয়াত' দেখে কেউ কেউ অনুরূপ কিছু নিজেদের মধ্যেও প্রচলন করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাবাজির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমর দেখি যে, এ বিষয়টি ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন, সমাজের পদ্ধতিদের বক্তব্য ইত্যাদির কারণেই বিভিন্ন বিদ'আতের মধ্যে নিপত্তি হয়।

৬. ৩. ৭. মৃহকাম রেখে মুতাশাবিহ অনুসরণ

কুরআন ও হাদীসে বিভান্তি ও বিভক্তির আরো কিছু বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ওহীর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দ্ব্যর্থবোধক বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় বক্তব্যকে গ্রহণ করা বা আকীদার ভিত্তি বানানো। মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيَّاتٌ مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَمَنِ اتَّبَعَهُنَّ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغَفَ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْنًا بِهِ كُلُّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি দ্ব্যর্থবোধক-একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময়-। যাদের অন্তরে সত্য-লজ্জন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থবোধক বিষয়গুলির অনুসরণ করে।" ৭৭

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, খ্স্টানদের বিভান্তি ও বিভক্তির এটি একটি দিক ছিল। তাদের নিকট বিদ্যমান 'কিতাবে' আল্লাহর একত্ব, ঈসা (আ)-এর মানবত্ব, রাসূলত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। পাশাপাশি 'আল্লাহর রহ', 'আল্লাহর কালিমা' ইত্যাদি কিছু বিশেষণ তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থও পরিষ্কার, তবে তা একাধিক অর্থে

^{৭৭} সূরা (৩) আল-ইমরান: ৭ আয়াত।

সম্ভাবনা রাখে। এ সকল দ্যৰ্থবোধক শব্দগুলিকে তারা একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যাকে তারা তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর ভিত্তিতে দ্যৰ্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলি ব্যাখ্যা করে বাতিল করে।

মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিরও একই অবস্থা। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এ জাতীয় অনেক নমুনা দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ৩. ৮. কর্মহীন তাদ্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরীত্য সঙ্কান

ওহীর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করা। মুমিনের দায়িত্ব ওহীর নির্দেশ মত নিজের বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনা কর। ওহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়, ওহী নিয়ে বিতর্ক নয়। কিন্তু সাধারণত মানবীয় প্রকৃতি কর্মের চেয়ে কর্মহীন বিতর্ককে ভালবাসে। আর এরূপ বিতর্ক বিভ্রান্তির উৎস। কারণ ওহী মূলত গাইবী বিষয়, এ বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভর বিতর্ক কোনো চূড়ান্ত সমাধান আনতে পারে না। এজন্য হাদীস শরীফে ওহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, জ্ঞানবৃত্তিক আলোচনা জ্ঞানের পথ সুগম করে। মতবিভিন্নের মাধ্যমে আলোচকদের অঙ্গতা বা ভুল দূর হয় এবং নতুন অনেক বিষয় জানা যায়। কিন্তু বিতর্ক তা নয়। বিতর্কের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি মত গঠন করে এবং যে কোনো ভাবে তার মতটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। নিজ মতের দুর্বলতা ধরা পড়লেও তা স্বীকার করতে রায় হয় না, কারণ তা তার পরাজয় বলে গণ্য হয়। এজন্য হাদীস শরীফে কুরআন নিয়ে আলোচনা ও পারম্পরিক পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিতর্ক করতে নিমেধ করা হয়েছে। আল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْنَوَاتٍ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي
آيَةِ فَخْرَاجٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الغَضْبُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مَنْ
كَانَ قَلْبُكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ

“আমি একদিন দুপুরের আগে আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি। তিনি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ ও বিতর্কে রত দুব্যক্তির কঠস্বর শুনতে পান। তখন তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে ক্রোধ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।”^{১৮}

^{১৮} মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫৩।

আসুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

إِنَّ نَفْرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا
وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ كَانِمًا فَقَوَى
فِي وَجْهِهِ حَبَّ الرُّمَّانَ قَالَ بَهْدًا أَمْرَتُمْ أَنْ تَصْرِفُوا كِتَابَ اللَّهِ بِعَصْنَهُ بِعَصْنَ
إِنَّمَا ضَلَّتِ الْأُمَّةُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مَعًا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ انْظُرُوا إِلَيْ
أَمْرِنِّي بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ وَالَّذِي نَهِيْتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“কিছু মানুষ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় বসে ছিলেন। তাদের কেউ বলেন, আল্লাহ কি একথা বলেন নি? আবার কেউ বলেন: আল্লাহ কি একথা বলেন নি? রাসুলুল্লাহ ﷺ একথা শুনতে পান। তিনি বেরিয়ে আসেন। তাঁর পরিত্র মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যায়, যেন তাঁর মুখমণ্ডলে বেদানার রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে দাঁড় করাবে? তোমাদের পূর্ববর্তী উস্মাতগুলি এরূপ করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমাদের কাজ এটি নয়। তোমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখ এবং তা পালন কর। যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন কর।”^{১৯}

অন্য হাদীসে আবু উমামা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُذِيِّ كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَنَاحَ

“কোনো জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা হলো তারা বিতর্কের লিঙ্গ হয়।”^{২০}

৬. ৪. বিভক্তির স্বরূপ ও বিভ্রান্তির বিষয়াদি

৬. ৪. ১. ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে ইফতিরাকের উল্লেখ ঘটে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছেন কোনোরূপ দ্বিধা, প্রশ্ন, স্বরূপ নির্ণয় বা প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে তা সবই সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছেন।

ইসলামের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ইরান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এদের অনেকেই সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করতে পারেন নি। ফলে ইসলামের মূল প্রেরণা ও

^{১৯} আহমদ, আল-যুসনাদ ২/১৯৫।

^{২০} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৩৭৮। তিরমিয়ী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে। এছাড়া তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের বিভিন্ন মতামত, বিতর্ক ও তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন যুক্তি, দার্শনিক মতামত ইত্যাদি তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এগুলির ভিত্তিতেই তারা ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক ও পর্যালোচনা শুরু করেন এবং নতুন নতুন মতামত প্রকাশ করতে থাকেন।

এগুলির পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদও ইফতিরাকের একটি প্রেক্ষাপট রচনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে আরব দেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আরবের মানুষের বংশতান্ত্রিক কবীলা প্রথার অধীনে বসবাস কর। তিনিই প্রথম তথায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্বের ও জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা ঐক্যমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরে আবু বাকর (রা)-এর খলীফা নির্বাচন, উমরের (রা) নির্বাচন, উসমানের (রা) নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর ঐক্যমতের মাধ্যমে সমাধান হয়। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখব যে, আলী (রা)-এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা ‘ইফতিরাক’ বা বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি।

কিন্তু সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের জন্য এ সকল মতভেদ বিভক্তির অন্যতম কারণ ছিল। অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এ সকল রাজনৈতিক মতভেদে ইফতিরাক বা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, নতুন প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, প্রচলিত দর্শন বা আচার-আচরণের প্রভাব, রাজনৈতিক মতভেদ, অপপ্রচার ইত্যাদি ইফতিরাক বা ফিরকা ও দলাদলির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফিরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল একুপ বিভক্তির ও বিভাস্তির শুরু করে (১) খারজীগণ এবং (২) শীয়াগণ। সময়ের আবর্তনে ক্রমাগতে এদের বিভাস্তি ও বিভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে।

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভাস্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। কাদারীয়া, জাহামিয়াহ, মুরজিয়া, জাবারিয়া, মুতাফিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

৬. ৪. ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের ভালবাসা ও মর্যাদা

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম বিষয় ‘আহল বাইত’ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের বিষয়ে উম্মাতের দায়িত্ব ও বিশ্বাসের পরিধি নিয়ে। আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রিসালাতের বিশ্বাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলু বাইত ও সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা দেখেছি। এ সকল নির্দেশের আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়াগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের মানুষদের সম্মান করেছেন, ভালবেসেছেন ও ডক্টি করেছেন। পাশাপাশি দীন বুরো ও পালনের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সুন্নাতের নববীর উপর নির্ভর করেছেন। নবী-বংশের জন্য কোনো বিশেষ ‘পৰিত্রাতা’ বা অধিকার প্রদান করেন নি। নবী-বংশের মানুষেরাও কখনোই এরপ কিছু দাবি করেন নি।

উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগ্নি প্রচারিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উসমান (রা)-এর খিলাফাতকালে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক একজন ইহুদী ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ও উসমান ইবনু আফফান (রা)-এর নিম্নায় অগণিত কথা বলতে থাকে। এ সব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলতো যুক্তিকর্তৃর মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকারে-ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামেও বানিয়ে বলতো থাকে।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ, মুহাম্মদিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) ৩৫ হিজরীর ঘটনা আলোচনা কালে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ইয়ামানের ইহুদী ছিল। উসমান (রা) এর সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর বিভিন্ন শহরে ও জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগিতামূলক কথা প্রচার করতে থাকে। হিজাজ, বসরা, কূফা ও সিরিয়ায় তেমন সুবিধা করতে পারে না। তখন সে মিশরে গমন করে। সে প্রচার করতে থাকে: অবাক লাগে তার কথা ভাবতে যে ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে, অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে না। হাজারো নবী চলে গিয়েছেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের একজনকে ওসীয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রদত্ত ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি আলী ইবনু আবী তালিব। ... মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী এবং আলী শেষ ওসীয়ত প্রাপ্ত দায়িত্বশীল।... যে

ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রদানকে মেনে নিল না, বরং নিজেই ক্ষমতা নিয়ে নিল, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে। ...^{৬১}

এ সকল মিথ্যাচারের ভিত্তিতে 'আহলু বাইত'-এর ভালবাসা ও অধিকারের নামে শীয়াগণের বিভক্তি প্রকাশ পায়। তারা দাবি করে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনক্ষমতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর হিসেবে আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের পাওনা এবং তাঁদের ক্ষমতা ও অধিকারে বিশ্বাস, তাঁদের নিষ্পাপত্তি বিশ্বাস, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা, গাইবী জ্ঞান ও অপার্থিব অধিকারে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার অংশ।

৬. ৪. ৩. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান

আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন আলোচনা থেকে দেখেছি যে, কুরআনে পাপ, জুলম, কুফর ইত্যাদি শব্দ কঠিন নিদা ও বিভাগিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে কাফির বলা হয়েছে। পাপীদের অনন্ত জাহানাম বাসের কথা বলা হয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যেতে পারে যে, পাপ, ফিস্ক, জুলম ও কুফরের একই পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহানাম বাস। এ থেকে কেউ দাবি করতে পারেন যে, কর্ম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বাস যতই ঠিক থাক, যদি কর্মের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি দেখা দেয় তবে তা ঈমানের ঘাটতি বলে বিবেচিত হবে এবং এরপ ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, শিরক ছাড়া সকল পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেন। কঠিন কবীরা গোনাহে লিঙ্গ মানুষদেরকে কুরআনে 'মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অগণিত সহীহ হাদীসে পাপী মুমিনের শান্তিভোগের পরে জান্নাতে গমনের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা আতের কারণে কবীরা গোনাহকারী মুমিন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, আমল বা কর্মের সাথে ঈমান বা বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক থাকলে কবীরা গোনাহে লিঙ্গ ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে।

সাহাবীগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের নির্দেশ সর্বান্তরণে মেনে নিয়েছেন ও বিশ্বাস করেছেন। উভয় প্রকারের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে যে কোনোরূপ বৈপরীত্য আছে সে কথা তাঁরা কখনো কল্পনা করেন নি। এ বিষয়ে তাঁরা কোনো প্রশ্নও করেন নি। কারণ উভয় অর্থের মধ্যে সরাসরি কোনো সংঘর্ষ নেই এবং উভয় অর্থই মানবিক বৃদ্ধি ও জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য। কাজেই এ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন না করে মুমিন নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

^{৬১} তাবারী, মুহাম্মদ ইবনু জারীর, তারীখুল উমামি ওয়াল মূলক ২/৬৪৭।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম প্রশ্ন ছিল এটি। প্রাথমিক শীয়াগণের পরে মুসলিম উম্মাহর প্রথম ফিরকা খারিজীগণ কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে লিঙ্গ হলে সে কাফির বা ঈমান হারা হয়ে যায়। তাদের মতে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে ঈমানহারা বা কাফিরে পরিণত হয়। ঈমান ও কুফরের মাঝে আর কোনো মধ্যম অবস্থা নেই। কাজেই যার ঈমানের পূর্ণতা নষ্ট হবে সে কাফিরে পরিণত হবে।^{৬২}

আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৭ হিজরী সাল থেকে খারিজী বিভাস্তি ও বিভক্তির উন্নয়ন ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও খারিজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে।

এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উক্তব হয়, তারা দাবি করে যে, ঈমান ও ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। ঈমান বা বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে তাহলে কোনো গোনাহের কারণেই কোনো অসুবিধা হবে না। ইসলামের অনুশাসন মানুক অথবা নাই মানুক, সকল মুমিনই সরাসরি জান্মাতী হবে।

৬. ৪. ৪. রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইমামত

খারিজীদের মতামতের একটি বিশেষ দিক ছিল ‘রাষ্ট্র ব্যবস্থা’ ও রাষ্ট্র প্রধান। ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ‘ইমামত’ বা নেতৃত্ব একসূত্রে বাঁধা। রাষ্ট্রপ্রধানই সালাতের ইমামতি করেন, ইমাম নির্ধারণ করেন এবং জিহাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। যেহেতু পাপী ব্যক্তি মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্র-প্রধানও হতে পারে না। এ কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাকে অপসারণ ও সে জন্য যুদ্ধ ও অন্তর্ধারণ করাকে ঈমানী দায়িত্ব বলে গণ্য করে। এ দায়িত্বে অবহেলা করা বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা কুফরী বলে গণ্য করে।

শীয়াগণও খারিজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ তাকওয়া সম্পন্ন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বৎশের ইমামদেরকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকীদার অংশ মনে করে। সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

^{৬২} বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ৭২-৭৪; ইবনু আবিল ইয়্য, শারছুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩১৬-৩২৫; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬৩-৬৫; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ.

৬. ৪. ৫. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

ইসলামের তাকদীরে বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞনী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয়না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন। কুরআন কারীমে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান ‘কিতাবে মুবীন’ (সুন্ম্পট কিতাব) বা ‘লাওহে মাহফুজে’ (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন। কুরআন কারীম বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মহান ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না।

আবার কুরআন থেকে আমরা মানুষের নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধতার কথা জানতে পারি। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিই যে, মানুষ তাঁর নিজের কর্মফলের জন্য দায়ী। মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না। বরং প্রত্যেককে তাঁর কর্মের পুরস্কার ও শান্তি প্রদান করবেন।

সাহারীগণ এ সকল আয়াত ও এ বিষয়ক সকল হাদীস সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছেন। এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তাঁরা কল্পনা করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে কিছু মানুষ এ বিষয়ে বৈপরীত্য কল্পনা করতে শুরু করে। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে কিছু মানুষ বলতে শুরু করে যে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী বা নির্ধারণ বলে কিছু নেই। তাদের মতে তাকদীরের বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী। ক্রমান্বয়ে এ মতাটি একটি ‘দল’ বা ফিরকায় পরিণত হয়। এদের ‘কাদরীয়া’ বলা হয়। পরবর্তীকালে মুতাফিলাগণও অনুরূপ মত গ্রহণ করে।

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। কলের পুতুলের মতই সে কর্ম করে। এদের ‘জাবারিয়াহ’ বলা হয়।

৬. ৪. ৬. আল্লাহর বিশেষণ: বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা

ইফতিরাকের অন্যতম বিষয় ছিল মহান আল্লাহর সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণ। প্রাচীন কাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং সৃষ্টি ও প্রতিপালক হিসেবে তাঁর একত্ব বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় একমত। প্রায় সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি-অনন্ত সত্ত্ব হিসেবে আল্লাহই একমাত্র সত্ত্ব এবং এ বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টি ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ। কিন্তু তাঁর সত্ত্বার প্রকৃতি, তাঁর কর্ম, তাঁর

বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এ সকল মতের অনুসারীগণ স্বীকার করেছেন যে, মানুষ তার মানবীয় জ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, দর্শন ও যুক্তি দিয়ে মহান আল্লাহর অঙ্গিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। মানুষ বুঝতে পারে যে, নিখুত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে সৃষ্টি, পরিচালিত, পরিবর্তিত ও ক্ষয়শীল এ বিশ্বের একজন মহাজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক মহাক্ষমতাশীল সৃষ্টি আছেন। মানুষ এও বুঝতে পারে যে, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্বরূপ, কর্ম, বিশেষণ মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অগম্য, কারণ মানুষ যা কোনোভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেন বা যার তুলনায় কিছুই তার ইন্দ্রিয় বা কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করে নি তা সে ইন্দ্রিয় লক্ষ জ্ঞান বা কল্পনায় ধারণ করতে পারে না। এরপরও মহান সৃষ্টির প্রকৃতি, কর্ম ও বিশেষণাদি সম্পর্কে মানুষ দর্শন, কল্পনা ও যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে চেষ্টা করেছে এবং এ বিষয়ে অনেকেই অনেক বিতর্ক ও মতামত প্রকাশ করেছে। এ সকল মতামত সবই ‘অঙ্গের হস্তি দর্শন’-এর মতই। এগুলি অঙ্গহীন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারে নি। কারণ কার্য মতটি সঠিক তা ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞানের গম্য কোনো বিষয় দিয়ে কোনোভাবে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। কুরআন কারীমে আল্লাহর আসমা ও সিফাত বা নাম ও বিশেষণ সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের এ জাতীয় কিছু বিভাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

ওহীর সাথে মানবীয় ‘আকল’, জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির সম্পর্ক ও সমন্বয় বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আকীদার উৎস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণের কথা ওহীর মাধ্যমে জানা যায় তা মানবীয় জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, অবোধ্য নয় বা অসম্ভব নয়। যেমন মহান সৃষ্টি মানুষকে তার পাপের জন্য শাস্তি দিবেন বা ক্ষমা করবেন। দুটি বিষয়ই মানবীয় বিবেক ও বুদ্ধিতে সম্ভব। তবে কোনুটি কিভাবে তিনি করবেন সে বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। একজন হয়ত বলবেন, মহান আল্লাহ দয়াময়, কাজেই তিনি তার প্রিয় সৃষ্টিকে শাস্তি দিতে পারে না, তিনি কাউকে কোনো শাস্তি দিবেন না। অন্য ব্যক্তি হয়ত বলবেন, মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তিনি যদি কোনো পাপীকে শাস্তি না দেন তবে তা তাঁর ন্যায় বিচারের র্যাদার ক্ষেত্র করে। তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহর প্রতিটি বুদ্ধিগম্য সিফাত বা কর্ম নিয়ে একেপ বিতর্ক করা যায়। যেহেতু মহান আল্লাহর সিফাতগুলি গাইবী জগতের বিষয় সেহেতু সকল বিতর্কই অঙ্গহীন, চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত কোনো ফলাফলে পৌছানো সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে সাহাবীগণের রীতি ও পদ্ধতি ছিল এ সকল বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সর্বান্তকরণে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা এবং এর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা না করা। আমরা দেখেছি যে, গাইবী বিষয়ে যুক্তি, তর্ক বা দর্শন কোনো সমাধান দিতে পারে না।

প্রথম হিজরী শতকের শেষাংশ থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মে নও-মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়ক পুরাতন দার্শনিক ও ধর্মীয় বিতর্ক ও বিভাস্তি প্রবেশ করে। কেউ কেউ বলতে থাকে মহান আল্লাহর কোনো কর্ম বা বিশেষণ থাকতে পারে না। কারণ তাতে অমুক বা তমুক দিক থেকে তার অনাদিত্ব নষ্ট হয় বা সৃষ্টির সাথে তার তুলনা হয়ে যায়। কেউ বা অন্য দর্শন বা যুক্তি দিয়ে তাদের এমতের বিরোধিতা করেন। প্রত্যেকে তার মতের পক্ষে ও বিরোধী মতের বিপক্ষে অনেক 'যুক্তি' পেশ করতে থাকে। এভাবে মহান আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ স্বীকার, অস্বীকার, ব্যাখ্যা, সৃষ্টির কর্ম ও বিশেষণের সাথে তুলনা ইত্যাদি নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক বিভিন্ন ও বিভাস্তি জন্ম নেয়।

আমরা দেখেছি প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই 'কাদারিয়া' ফিরকার মানুষেরা তাকদীর অস্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিত্ব অস্বীকার করে। এ সময় থেকে কেউ কেউ মহান আল্লাহ কালাম বা কথা বলার বিশেষণ অস্বীকার করেন। কারণ কথা বলা সৃষ্টির কর্ম। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এ বিশেষণ আরোপ করলে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। কাজেই তাঁর ক্ষেত্রে এ বিশেষণ আরোপ করা যায় না। বরং আল্লাহ কথা বলেছেন মর্মে যে সকল আয়াত কুরআনে রয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তিনি এই অর্থের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে প্রদান করেছেন, অথবা তিনি কিছু কথা সৃষ্টি করে উক্ত ব্যক্তিকে শুনিয়েছেন ... ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহ্ম ইবনু সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি ভারতীয়, গ্রীক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে সকল প্রকার সিফাত বা বিশেষণ থেকে বিমুক্ত বা 'নির্ণৰ্ণ' বলে দাবি করে। পরবর্তীকালে মু'তায়িলীগণও মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে।

৬. ৪. ৭. বিভাস্তি ফিরকাসমূহের বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে সকল বিভাস্তি ফিরকার মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশি বিদ্যমান:

(১) আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্য ওহীর অতিরিক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করা। যেমন দর্শন, যুক্তি, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত, তাফসীর, ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

(২) ওহীর ব্যাখ্যা বা ওহীর অর্থ নির্ণয়ে নিজেদের মতামতকেই ওহী
বলে মনে করা এবং তাকে আকীদার ভিত্তি বানানো।

(৩) আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে গুরুত্ব না দেওয়া।

(৪) আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামত ও শিক্ষার গুরুত্ব
না দেওয়া।

(৫) কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের বক্তব্যের মধ্যে যে সকল বিষয়
পাওয়া যায় না সেগুলিকেও আকীদার বিষয়বস্তু বানানো। সাহাবীগণ যে কথা
বলেন নি, বা যে আকীদা পোষণ করেন নি বা যে বিষয়ে কোনো কথাই
বলেন নি সে সকল বিষয়কে আকীদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৬) মানবীয় বুদ্ধি, যুক্তি বা পছন্দের ভিত্তিতে ওহীর মধ্যে যাচাই
বাছাই করার চেষ্টা করা। ওহীর যে বিষয়গুলি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক
বলে মনে হয় সেগুলির উপর ভিত্তি করে ওহীর অন্যান্য শিক্ষা ব্যাখ্যা করে
বাতিল করা।

(৭) নিজেদের মত সমর্থন করতে ওহীর নামে মিথ্যা কথা বানানো।

(৮) উগ্রতা, নিজের মতকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করা ও অন্য মতের
প্রতি অশ্রদ্ধা।

(৯) মতবিরোধিতার কারণে অন্যদেরকে ‘কাফির’ বলা। সকল বিভ্রান্ত
ফিরকার মধ্যেই মতবিরোধীয় বিষয়াদির কারণে মুসলিমকে কাফির বলার
ক্ষেত্রে অতি আগ্রহ ও ব্যক্ততা লক্ষ্য করা যায়। সকলেই চেষ্টা করেন কিভাবে
ব্যাখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে বিরোধীদেরকে কাফির বলে প্রমাণ করা যায়।

৬. ৫. আহলুস সুন্নাত শুয়াল জামা‘আতের পরিচয়

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের
মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির উন্মেষ ঘটে। তবে এদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।
সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। বিশেষ করে
সাহাবীগণের সাহার্য লাভকারী তাবিয়ীগণ সুদৃঢ়ভাবে সাহাবীগণের পথ
অনুসরণ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে
সাহাবীগণের মতামতকে তারা সত্যের মাপকাঠি বলে গণ্য করতেন।
সাহাবীগণ যা বলেন নি বা করেন নি তা বলা বা করা তাঁরা অন্যায় মনে
করতেন। তাঁরা এ সকল বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদেরকে ‘আহলুস
বিদ’আত’ বা ‘বিদ’আত পত্রী’ বলে অভিহিত করতেন।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (মৃত্যু ১১০হি) বলেন:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمِعْوَا لَنَا رِجَالُكُمْ فَيُنَظِّرُ
إِلَى أَهْلِ السُّنْنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنَظِّرُ إِلَى أَهْلِ الْبَدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

“তাঁরা (সাহাবীগণ) হাদীসের সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৫-৪০ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তাঁরা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত পঞ্চিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদ'আত বা বিদ'আত পঞ্চিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।”^{৬০}

ইবনু সিরীন প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক সাহাবীর সাহচার্য লাভ করেন। এখানে আমরা দেখছি যে, এ সময় থেকেই সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ধারা দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথম ধারা ‘আহলুস সুন্নাত’ ও দ্বিতীয় ধারা ‘আহলুল বিদ'আত’। মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি বৃদ্ধতে হলে এ পরিভাষাগুলি আমাদের বৃদ্ধতে হবে। আমরা এখানে বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

৬. ৫. ১. আহল

আহল (لـأهـل) অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী (relatives, folks, people, members, followers) ইত্যাদি। এভাবে আমরা দেখছি যে আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং আহলুল বিদ'আত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা বিদ'আতের অনুসারী।

৬. ৫. ২. সুন্নাত

৬. ৫. ২. ১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয়

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক ভাবে ‘সুন্নাহ’ বা ‘সুন্নাত’ শব্দের অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলে আকরাম (ﷺ) -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।

৬. ৫. ২. ২. ইতিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব

ইফতিরাক বিষয়ক হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, নাজাত, মুক্তি, জান্নাত ও সত্যের মাপকাঠি ও একমাত্র পথ ‘সুন্নাতের অনুসরণ’। আন্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও হাওয়ারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (১) নবীর (ﷺ) সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও (২) তাঁর

^{৬০} মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫।

নির্দেশ অনুসরণ করা। এ হাদীসে তিনি বিভাগদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (১) মুখের দাবির সাথে কর্মের অমিল এবং (২) অনির্দেশিত কর্ম। অন্য হাদীসে তিনি তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের মত ও পথের উপর থাককেই নাজাতের মানদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে রিসালাতের ঈমান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের গুরুত্ব ও অনুকরণের ব্যতিক্রমের ভয়াবহতা বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি এবং ইতিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব জানতে পেরেছি। এ অধ্যায়ে বিদ'আত প্রসঙ্গেও আমরা ইতিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব জানতে পেরেছি।

৬. ৫. ৩. সুন্নাতুস সাহাবা

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করাকে জান্নাত ও সফলতার পথ বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্ম ও মতের উপর থাকাকে হাদীসে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভক্তি ও মতভেদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে আরো অনেক নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে রয়েছে। এক হাদীসে উত্তর ইবনু গায়ওয়ান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ، لِلْمُتَمْسِكِ فِيهِنَّ بِوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ
خَصْسِينَ مِنْكُمْ. قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ مِنْكُمْ

“তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি তোমাদের এ পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?”^{৬৪} তিনি বলেন, “না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।”^{৬৫}

৬. ৫. ৪. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত

‘আহলুস সুন্নাত’-এর পরিচয় বুঝতে হলে হাদীসে নববীতে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘সুন্নাত’ বলতে কী বুঝানো হয় তা জানতে হবে। এ বিষয়ে ‘এহইয়াউস সুন্নান’ প্রস্তুত আমি বিভাগিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবহ অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কথা যেতাবে যতটুকু বলেছেন তা

^{৬৪} মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ায়ী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৪; তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাৰীৰ ১০/১৮২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২৮২; আলবানী, সাহীহাহ ১/৮৯২-৮৯৩।

সেভাবে ততটুকুই বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কথা বলেন নি তা না বলা এবং যে কাজ করেন নি তা না করাই সুন্নাত।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের ব্যতিক্রম করার ভয়াবহতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে তিনি বলেন: "...রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন রোয়া রাখ? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো রোয়াও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্তুদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।..." এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাট্টা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ্র্হাতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধৰ্মস্পাণ্ড হবে।"

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো 'কর্ম' অনুসরণ পরিয়ত্যাগ করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সিয়াম পালন করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর অনুসরণে নফল সিয়াম পালন করতেন। কেবলমাত্র পদ্ধতিগত সামান্য ব্যতিক্রম ছিল, তা হলো, তিনি এ দুটি নেক কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় বর্জন করতেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ তা করতেন। মূল কর্ম সুন্নাত-সম্বত নেককর্ম হওয়া সত্ত্বেও কর্মের পাশাপাশি বর্জনের ক্ষেত্রে বা পালনে ও বর্জনে হ্বহ অনুসরণ না করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ (রা)-এর কর্মে আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিনি জন সাহাবী ইবাদতের আবেগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নফল ইবাদত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন: "তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আগ্রাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে নফল রোয়া রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোয়া রাখি পরিয়ত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময়

ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, স্বীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপচন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”

এ হাদীসেও এ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করেন।

তাবিয়ী আবু উয়ায়িল বলেন, আমি পরিত্র কাবা গৃহের খিদমত ও সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী শাইবা ইবনু উসমান (রা)-এর নিকট বসেছিলাম। তিনি বলেন,

جلسَ إِلَيْهِ عُمَرُ فِي مَجَلسِكَ هَذَا قَالَ: لَقَدْ هَمِّشْتَ أَنْ لَا أَذْعُغْ فِيهَا
صَفَرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قَلْتُ لَمْ
يَعْلَمْ صَاحِبَكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءُ إِنْ يُقْنَدَى بِهِمَا

“তুমি যেখানে বসেছ, উমার (রা) তথায় বসে বললেন: ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কাবা ঘরের মধ্যে যুগ্ম ধরে সংরক্ষিত যত স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে তা কোনো কিছুই আমি রাখব না, বরং তা সবই আমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেব।’ আমি বললাম, ‘আপনি তা করতে পারেন না।’ তিনি বললেন: ‘কেন?’ আমি বললাম, ‘কারণ আপনার সঙ্গীদ্বয় (রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বাকর ﷺ) তা করেন নি।’ তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ, তাঁরাই সে দুই মানুষ যাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে।’”^{৬৫}

এখানে উমার (রা) অনুসরণ-অনুকরণ করা বলতে ‘না-করা’-য় বা ‘বর্জন করা’-য় অনুসরণ অনুকরণ করা বুঝাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গীদ্বয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বাকর ﷺ-কিছুই করেন নি। কাবা ঘরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মানুষের দান, মানত ইত্যাদির স্বর্ণ-রৌপ্য সংরক্ষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলির বিষয়ে কিছুই করেন নি। যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছেন। তিনি এগুলি বণ্টন করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি। এ বিষয়ে তিনি কোনো কিছু করা থেকে বিরত থেকেছেন। আবু বাকর ﷺ-ও একইভাবে চলে গিয়েছেন। উমার (রা)-এর অধিকার ছিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। তিনি এ বিষয়ে কিছু করার চেয়ে কোনো কিছু করা বর্জন করে তাঁদের ‘অনুসরণ’ বা ইতিবা ও ইকতিদা করা উভয় বলে মনে করেছেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কর্ম এবং বর্জন উভয়ই সুন্নাত। কর্মের ক্ষেত্রে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হ্বত্ত অনুকরণ করা সুন্নাত, তেমনি

^{৬৫} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৩/৪৫৬।

বর্জনের ক্ষেত্রেও তাঁর অনুকরণ করাই সুন্নাত। এমনকি যে বিষয়ে তিনি কোনে আপন্তি বা নিষেধ করেন নি, শুধু বর্জন করেছেন সে বিষয়েও অনুকরণ বলতে বর্জন করাই বুঝায়। তিনি যা করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা করা অবেধ নাও হতে পারে, তবে তা করলে অনুকরণ করা হয় না।

তাবিয়ী নাফি' (রাহ) বলেন :

إِنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أُقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَكِنَّ لَنِسَ هَكَذَا عَلِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِمْنَا (إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا) أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

“এক ব্যক্তি ইবনু উমরের (রা) পাশে বসে হাঁচি দেয় এবং বলে: ‘আল-হামদু লিল্লাহ, ও আস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ (প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাম)।’ তখন ইবনু উমর (রা) বলেন, আমিও বলি: ‘আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ’, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (হাঁচি দিলে) এভাবে দোয়া পড়তে শেখাননি, তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা হাঁচি দিলে বলব: “আলহামদু লিল্লাহ আলা কুণ্ডি হাল (সকল অবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)।”^{৬৬}

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত (দরুন) ও সালাম পাঠ করা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইহলৌকিত বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি ও মর্যাদার জন্য তা অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়ে অনেক হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম সদা সর্বদা সালাত ও সালাম পাঠ করতে ভালবাসতেন। তাঁরা একাত্তে, সমাবেশে সর্বদা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো সালাত ও সালাম পড়তেন। সালাত ও সালাম পাঠের এত বেশি মর্যাদা ও সাওয়াব এবং এত বেশি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সাহাবী ইবনু উমর কেন হাঁচির পরে সালাম পাঠ অনুমোদন করছেন না? তাহলে কি কোনো কোনো সময়ে সালাত ও সালাম পাঠ নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ? তাহলে কি হাঁচির পরে দরুন বা সালাম পাঠ নিষিদ্ধ? তা কখনোই নয়। এখানে ইবনু উমার (রা) সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ বা কর্ম ও বর্জনে হ্বহু অনুসরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আল্লাহর হামদ পাঠ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাম পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিন সর্বদা তা পালন করবেন। তবে হাঁচির দু'আ হিসেবে

^{৬৬} তিরমিয়ী, আস-সুনান ৫/৮১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ৪/২৬৫-২৬৬। হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম পাঠ শেখান নি। তিনি এ সময়ে সালাম পাঠ বর্জন করেছেন। কাজেই এ দু'আর মধ্যে তা বর্জন করাই সুন্নাত।

তাবিয়ী মুজাহিদ (রাহ) বলেন: আমি আবুল্লাহ ইবনু উমরের (রা) সঙ্গে ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি যোহুর বা আসরের সালাতের জন্য ডাকাডাকি করল। তখন তিনি বললেন :

اَخْرُجْ بِنَا فَإِنْ هَذِهِ بِذَعَةٍ

“এখান থেকে বেরিয়ে চল, কারণ এটি একটি বিদ'আত।”^{৬৭}

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে সালাতের জন্য শুধু আযান প্রদান করা হতো। এতেই সকল মুসলমান মসজিদে এসে উপস্থিত হতেন। পরবর্তী কিছু বছর পরে দেখা গেল অনেক এলাকায় মানুষেরা সালাতে আসতে অবহেলা করছে। তখন অনেক আঁগহী মুয়াজ্ঞিন আযানের কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকাডাকি করতেন বা জামাতের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করতেন। আযানের পরে ডাকাডাকি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেন নি। তবে তিনি তা বর্জন করেছেন। হয়ত অনেক যুক্তি দিয়ে বলা যেত, তিনি অযুক্ত কারণে তা বর্জন করেছেন, বর্তমানে অযুক্ত কারণে তা করা প্রয়োজন। কিন্তু সাহাবীগণ এ সকল যুক্তির ভিতরে না যেয়ে কর্ম ও বর্জনে তাঁর হ্বহ্ব অনুকরণ পছন্দ করতেন এবং অতিরিক্ত কর্মকে বিদ'আত বলে ঘৃণা করতেন। সাহাবীদের কাছে বড় হলো রাসূলে আকরাম ﷺ -এর রীতি। তাঁর বাইরে তাঁরা একটুও যেতে রাজি ছিলেন না।

আবুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْأَمْوَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْبِدَعُ، وَإِنَّ مِنْ الْبِدَعِ الْأَعْكَافُ
فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّورِ

“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো বিদ'আত। আর এ সকল বিদ'আতের মধ্যে একটি হলো বাড়ির মধ্যে যে সালাতের স্থান বা ঘরোয়া মসজিদ থাকে সেখানে এতেকাফ করা।”^{৬৮}

ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ী বা মহল্লার ঘরোয়া মসজিদে ইতিকাফ নিষেধ করেন নি। এর স্বপক্ষে অনেক কথা বলা যায়। তবে তিনি তা বর্জন করেছেন। এজন্য সাহাবী তা বিদ'আত বলে অভিহিত করেছেন।

^{৬৭} আবু দাউদ, আস-সুনান ১/১৪৮।

^{৬৮} সুযুক্তী, আল-আমরু বিল ইতিবা, ১৭ পঃ।

৬. ৫. ২. ৫. হ্বহ অনুকরণ

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ফল যা করেছেন তা করা যেমন সুন্নাত, তেমনি তিনি যা বজন করেছেন তা বর্জন করাও সুন্নাত। আর 'কর্ম' ও 'বর্জন' হ্বহ ও অবিকল হলেই তা সুন্নাত হবে, সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করে পালন বা বর্জন করেলে তা ইতিবায়ে সুন্নাত বলে গণ্য হবে না। এখানে আল্লামা ইবনু সীরীনেরই একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। প্রথ্যাত তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ ১৮১ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন :

دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار
صوف وعمامه صوف [فنظر إليه محمد نظرة كراهة] فاشمأز عنه محمد وقال إن
أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقد حدثي من لا أتهم أن
النبي ﷺ قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع

“সাল্ত ইবনু রাশিদ নামক একজন্য তাবি-তাবিয়ী দরবেশ পশমী জুবুরা, পশমী ইয়ার ও পশমী পাগড়ি পরিধান করে মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের নিকট প্রবেশ করেন। ইবনু সিরীন তাঁর পোশাক দেখে বিরক্ত হন। তিনি বিরক্তির সাথে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন: কিছু মানুষ (সর্বদা) পশমি পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা বলেন যে, ঈসা (আ) পশমি পোশাক পরিধান করতেন। অথচ যাদের বর্ণনা আমি সন্দেহাত্তীতভাবে গ্রহণ করি সে সব মানুষেরা (সাহাবীগণ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ফল কাতান, পশমি ও সূতি কাপড় পরিধান করেছেন। আর আমাদের নবীর সুন্নাত অনুকরণ করাই আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় ও বেশি উচিত।”^{৬৫}

ইয়াম ইবনু সিরীন দরবেশগণের 'সুফী' বা 'পশমি' পোশাক পরিধানের বিষয়ে আপত্তি করে বলেছেন যে, ঈসা নবীর সুন্নাতের চেয়ে আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। আবার তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ফল পশমি পোশাক পরিধান করতেন। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, এসকল দরবেশ রাসূলুল্লাহ ফল-এর সুন্নাতই অনুসরণ করছেন। তাহলে তাঁর আপত্তিটা কি?

আপত্তি অনুকরণের 'হ্বহত্তে'। রাসূলুল্লাহ ফল-এর সামাজিক কর্ম ও বর্জনের সমষ্টিই তাঁর সুন্নাত। তিনি যে কাজ যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে

^{৬৫} ইবনুল মুবারাক, আয়-যুহদ, পৃ ৬৪; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৩৭; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/১১০। বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

করেছেন এবং যতটুকু ও যে শুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন সেই কাজ ততটুকুই করা ও বর্জন করাই সুন্নাত। কর্মে, বর্জনে বা শুরুত্বে তাঁর কাজের বিপরীত করার অর্থ তাঁর সুন্নাত বর্জন করা ও সুন্নাতের বিরোধিতা করা। ইবনু সিরীন এ কথাই বলেছেন।

তাঁর কথার অর্থ, কিছু মানুষ সর্বদা পশমী পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুতি পোশাক পরিধান বর্জন করে পশমি পরিধান উত্তম। এজন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় সুতি পরিধান থেকে বিরত থাকেন এবং এ বর্জনকে তাকওয়া, দরবেশি বা বুজুর্গির পথ বলে মনে করেন। অথচ আমাদের নবীর সুন্নাত ছিল সুবিধা ও সুযোগমত সুতি বা পশমি পোশাক ব্যবহার করা। সুযোগ থাকলেও সুতি পোশাক বর্জন করে পশমি ব্যবহারের অর্থ রাস্তুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বর্জন করা এবং তাঁর সুন্নাতকে দরবেশির জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করা। এজন্যই ইবনু সিরীন বলেছেন যে, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উত্তম ও উচিত। আর তাঁর সুন্নাত সর্বদা পশমি পোশাক না পরা।

প্রখ্যাত তাবিয়ী আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয় (৮৩ হি.) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে নামায শেষ করার পরে জোরে বলেন: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার”। তখন তাবিয়ী-শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ ফকীহ আবীদাহ ইবনু আমরু-আস-সালমানী (৭০ হি.), যিনি মসজিদে ছিলেন, বলেন:

فَلَمَّا نَعَرَ بِالْبَدْنِ

“আল্লাহ একে ধ্রংস করুন! বিদ'আতের জয়ধরনি দিছে।”^{১০}

সালাতের সালাম ফেরানো পরে একপ যিক্রি, তাসবীহ ইত্যাদি সুন্নাত সম্মত ইবাদত। এ ব্যক্তি সুন্নাত সম্মত যিকরের বাক্য সুন্নাত সম্মত সময়ে পাঠ করে একটি সুন্নাত সম্মত ইবাদত পালন করেছেন। শুধু উচ্চস্থরে তা পালন করে যিকরটি পালনের পদ্ধতিতে সামান্য ব্যতিক্রম করেছে। একপ ব্যতিক্রমও তাঁরা গ্রহণ করতেন না। বরং একে বিদ'আত বলে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন।

৬. ৫. ৩. আল-জামা'আত

৬. ৫. ৩. ১. অর্থ ও পরিচিতি

বিভক্তি বিষয়ক একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাস্তুল্লাহ ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত দলের পরিচিতি হিসেবে বলেছেন: তারা জামা'আত। জামা'আত শব্দটি আরবী 'জাম' (الجمع) থেকে গৃহীত, যার অর্থ একত্রিত

^{১০} ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/২৭০।

করা, জমায়েত করা, এক্যবন্ধ করা (To gather, collect, unite, bring together, join) ইত্যাদি। ‘জামা’আত’ (جماعة) অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠী, বা সমাজ (community, society).

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে ‘জামা’আত’ এবং ‘ইজতিমা’-কে ‘ফিরকা’ ও ‘ইফতিরাক’-এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফিরকা অর্থ দল, গ্রুপ ইত্যাদি। এ অর্থে আরবীতে হিয়ব, কাউম, জামইয়্যাহ (ইত্যাদি) শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর জামা’আত অর্থ দলবিহীন সমিলিত জনগোষ্ঠী বা সমাজ। যে কোনো স্থানে অবস্থানরত সকল মানুষকে ‘জামা’আত’ বলা হয়। জামা’আতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথক হলে তাকে ফিরকা বা দল বলা হয়।

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লী বসে আছেন। এরা মসজিদের জামা’আত। এদের মধ্যে কম বা বেশি সংখ্যক মুসল্লী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাউম বা হিয়ব, অর্থ দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা’আত বলে গণ্য নয়। যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক কোনে পৃথক হয়ে বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন। এখন আমরা ইফতিরাক ও জামা’আতের রূপ চিন্তা করি। মূলত মসজিদের জামা’আত ভেঙে ইফতিরাক এসেছে। তিনটি ফিরকা মূল জামা’আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাকি যারা কোনো ‘দল’ বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে ‘জামা’আত’ বলতে পারেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের অবস্থা এরূপই। এটি মূলত কোনো দল বা ফিরকা নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণের অনুসরণে যারা মূল ধারার উপর অবস্থান করছেন এবং কোনো দল বা ফিরকা তৈরি করেন নি তারাই ‘আল-জামা’আত’।

৬. ৫. ৩. ২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এক্য অর্থে আল-জামা’আত

কুরআন ও হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের বক্তব্যের আলোকে আমরা ‘জামা’আত’ (جماعة) শব্দের তিনটি প্রয়োগ দেখতে পাই: (১) এক্যবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজ; অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, (২) সাহাবীগণ ও (৩) সাহাবীগণের অনুসারী তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল ধারার আক্রিয় ও ইমামগণ।^{১০}

^{১০} শাত্রীবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা, আল-ইতিসাম ২/২৫৮-২৬৫।

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে 'জামা'আত'বন্ধ বা দলাদলিমুক্তভবে এক্যবন্ধ থাকতে এবং দল, ফিরকা তৈরি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসেও অনুরূপভাবে 'জামা'আত'-বন্ধ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এক্য বুঝানো হয়েছে, ইমাম বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে এবং 'বাইয়াত' বলতে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের শপথ বুঝানো হয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاغِيَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلَةً

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"^{১২}

মু'আবিয়া (রাঃ) তার জীবদ্ধায় তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগ দান করেন এবং তার আনুগত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ তার জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হ্সাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসংগত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) মদীনার অধিবাসীগণের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি'র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَيِ اللَّهُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلَةً

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী

^{১২} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৬-১৪৭৭ নং ১৮৪৮।

মৃত্যু বরণ করল।”^{১৩}

অন্য বর্ণনায় আদুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
 مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِيمَامٍ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ جَاءَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ

“যে ব্যক্তি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া (রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য ছাড়া) মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে এবং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না।”^{১৪}

মু’আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
 مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ [عَلَيْهِ] إِيمَامٌ [بِغَيْرِ إِيمَامٍ]، وَلَيْسَ فِي عَنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ

مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে তার কোন ইমাম নেই (কোন রাষ্ট্র প্রধান ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সে অধীন নয়), অন্য বর্ণনায়: যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তাঁর গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।”^{১৫}

এভাবে হাদীস শরীফে সর্বদা জামা ‘আত বলতে দলাদলিবিহীন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে। ফিরকা অর্থাৎ দল বা গ্রুপকে ‘জামা ‘আত’ অর্থাৎ ঐক্য বা ঐক্যবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে হ্যাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি তাঁকে খারাপ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, এই ভয়ে যে, কি জানি আমি কোনো খারাপের মধ্যে নিপত্তি হয়ে যায় কিনা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলিয়াত ও খারাপির মধ্যে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ এনে দিলেন। এর পরে কি আবার কোনো অকল্যাণ আসবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে কিছু জঙ্গল-ময়লা থাকবে। আমি বললাম,

^{১৩} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৮, নং ১৮৫১।

^{১৪} আবু দাউদ তায়ালিসী, আল-মুসনাদ ১/২৫৯, নং ১৯১৩, আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৩/২২৪। আবু নুআইম বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ।

^{১৫} আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪/৯৬, আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আল-মুসনাদ ১৩/৩৬৬, ইবনু হি�রান, আস-সহীহ ১০/৩৩৪, তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ১৯/৩৮৮, হাইসাফী, মাজমাউয় যাওয়াইদ ৫/২১৮, ২২৫। হাদীসটির সনদ যথীক।

সেই জঙ্গল-ময়লা কি? তিনি বলেন, কিছু মানুষ যারা আমার আদর্শ ও নীতি ছেড়ে অন্য আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করবে। তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দেখতে পাবে। আমি বললাম, এই ভাল অবস্থার পরে কি আবার খারাপ অবস্থা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে আহ্বানকারীগণ (আবির্ভূত হবে), যারা তাদের ভাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চামড়ার মানুষ-আমাদেরই স্বজাতি, আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এই অবস্থায় পড়ে যায় তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন, তিনি বলেন:

تَلِزُمْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ
قَالَ فَاعْتَرَلَ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُنْزِكَ الْمَوْتُ
وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

“তুমি মুসলিমদের জামা’আত (সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোনো জামা’আত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশ্বাল অবস্থায় থাকে), তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল (ফিরকা) সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে। যদি তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে। এভাবে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায়।”^{১৬}

এসকল হাদীসে সুস্পষ্ট যে, জামা’আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এক্য বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে বুঝানো হয়েছে। এ সকল নির্দেশের অর্থ হলো, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বসবাস করবেন, সেই সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্তাদির সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সেই সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত, তার দল বা গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।^{১৭}

৬. ৫. ৩. সাহাবীগণই মূল জামা’আত

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনোরূপ ইফতিরাক বা বিভক্তি ছিল না। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কিছু মতভেদ ছিল, তবে কখনোই ইফতিরাক-এর পর্যায়ে যায় নি। তাঁদের ইথিতিলাফ বা মতভেদ ছিল মূলত ব্যবহারিক ও

^{১৬} বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩১৯, ৬/২৫৫৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৫।

^{১৭} দেখুন: ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৭, শাওকানী, নাইলুল আউতার ৭/৩৫৬-৩৫৭।

ইজতিহাদী বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতি বিষয়ে, যেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ নিষ্পত্তি হয়েছে। আলী (রা)-এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা ‘ইফতিরাক’ পর্যায়ে যায় নি। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত: অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও তাঁর বিরোধিতায় আয়েশা (রা), মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবীর রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। তাঁরা আলী (রা)-এর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতেন। তবে মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশ নেন নি। প্রসিদ্ধ তাবিয়া আমির ইবনু শারাহীল শাবী (১০৪ হি) বলেন, জামাল বা উল্ট্রের যুদ্ধে সাহাবীগণের মধ্য থেকে ৪ জন ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেন নি: আলী, আম্বার, তালহা এবং যুবাইর (^{যুবাইর})।^{১৮}

প্রসিদ্ধ তাবিয়া মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, “যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।”^{১৯}

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যার এক্রপ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা সর্বদা একে রাষ্ট্রীয় ও ইজতিহাদী বিষয় বলেই গণ্য করেছেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাঁদেরকে পৃথক ‘দল’ বা ধর্মচ্যুত বলে গণ্য করেন নি। এ বিষয়ে আলী (রা), আম্বার (রা) প্রমুখ সাহাবীর সুস্পষ্ট মতামত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। সিফুর্রিনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়বাড়িমূলক কথা বললে আলী (রা) বলেন, এক্রপ বলো না, তাঁরা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তাঁরা বিদ্রোহী। আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি। আম্বার ইবনু ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি।^{২০}

এমনকি খারিজী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সন্ত্রেও আলী (রা) ও সাহাবীগণ তাঁদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ^স এদের

^{১৮} আল-খাদ্রাল, আস-সুন্নাত ২/৪৬৬।

^{১৯} ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।

^{২০} মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ায়ী, তাফীয়ু কাদরিস সালাত ২/৫৪৪-৫৪৬।

সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইয়ামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।^{৮১}

এভাবে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা কখনোই বিভক্তি বা ইফতিরাকের পর্যায়ে যায় নি। মহান আল্লাহ কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসে সাহাবীগণকে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতির ভিস্তিতেই তাবিয়ীগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল প্রজন্মের সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর ‘জামা’আত’ বলতে সাহাবীগণের পথ ও তৎপরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের পথ বুঝানো হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আত’ অর্থ ‘সুন্নাত ও জামা’আতের অনুসারীগণ’। সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত বুঝানো হয় এবং সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতু সাহাবাহ এর অন্তর্ভুক্ত। আর ‘আল-জামাত’আত’ বলতে মূলত সাহাবীগণের মত ও পথ বুঝানো হয় এবং পরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত বুঝানো হয়, যারা সাহাবীগণের মত ও পথের উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৬. ৫. ৪. মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি

৬. ৫. ৪. ১. ইফতিরাক ও বিভক্তির বিষয়াদি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের আকীদার মূলনীতি বুঝাতে হলো আমাদেরকে আহলুস বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাকের আকীদার মূলনীতি জানা দরকার। কারণ বিদ'আতীদের বিদ'আতের বিপরীতেরই তাঁরা সুন্নাত-সম্মত আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। উপরের বক্তব্য ও পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানের আরকানসমূহের মধ্যে কিছু বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি হয় নি বা বিভক্তি মেনে নেওয়া হয়নি এবং কিছু বিষয়ে বিভক্তি হয়েছে।

^{৮১} তিরিয়ী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/৭৪, ১৪৬; ইবনু হিব্রান, আস-সহীহ ১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, প. ৪৭-৫৬।

(১) আকীদার উৎস: এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। বিভাস্ত ফিরকাগুলি কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি যুক্তি, দর্শন, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে আকীদার উৎসর ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নিকট দর্শন, যুক্তি ইত্যাদিই আকীদার মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়। শীয়া সম্প্রদায়ের নিকট ইমামগণ বা ইমামগণের প্রতিনিধিদের ব্যাখ্যায় আকীদার মূল উৎসরূপে স্বীকৃত। কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়াও কাশফ, ইলহাম, ইলকা বা 'সরাসরি বিশেষ জ্ঞানকে তারা আকীদার উৎসরূপে গ্রহণ করে। এ সকল ফিরকার অনুসারীদের নিকট মূলত এ সকল অতিরিক্ত বিষয়ই আকীদার মূল উৎস হিসেবে পরিণত হয়। এগুলির ভিত্তিতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য গ্রহণ করে বা ব্যাখ্যা করে বর্জন করে।

(২) তাওহীদুর রূবুবিয়াহ: এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মতভেদ নেই। কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করলে বা রূবুবিয়াতের কোনো বিষয় অঙ্গীকার বা অবিশ্বাস করলে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে।

(৩) তাওহীদুল উল্হিয়াহ বা তাওহীদুল ইবাদাত। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ হয় নি। কেউ আল্লাহর ইবাদতের তাওহীদ অঙ্গীকার করলে বা এ বিষয়ে কাউকে শরীক করলে তাকে কাফির বা মুশরিক বলে গণ্য করা হয়েছে। তাকে আর বিভাস্ত মুসলিম ফিরকা বলে গণ্য করা হয় নি, বরং অমুসলিম কাফির ফিরকা বলে গণ্য করা হয়েছে।

(৪) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। মূলত মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভক্তি ও ফিরকাবাজি এ বিষয়টি নিয়েই। আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, রেখামন্দি, লিখনি, ক্ষমা, ক্ষমতা, শান্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কাদারিয়াহ, জাবারিয়াহ, খারিজী, মু'তাফিলী, জাহমিয়াহ ইত্যাদি সকল ফিরকার উন্নত। তাকদীর, পাপী মুমিনের বিধান ইত্যাদি সবই এ বিষয় কেন্দ্রিক।

(৫) রিসালাতের বিশ্বাস। এ বিষয়ে কিছু বিভাসির উন্নেষ ঘটে। কোনো কোনো সীমালজ্ঞনকারী শীয়া সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুরুওয়াতের সর্বজনীনতা, তাঁর আদর্শের অলজ্ঞনীয়তা, তাঁর খাতমুন নুরুওয়াত ইত্যাদি বিষয় অঙ্গীকার করার কারণে তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে শীয়া মতবাদের মধ্যে রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ভালবাসার দাবি যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে যাদের বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরকে এবং যারা আনুগত্যে-অনুকরণে অগ্রগামী তাদেরকেও ভালবাসতে হবে। শীয়াগণ এক্ষেত্রে সীমালজ্ঞন ও বিভাসির মধ্যে নিপত্তি হয়। সাধারণভাবে ওলীগণের বিষয়ে এবং বিশেষত আলী-

বৎশের ইমামগণের বিষয়ে ভজিতে বাড়াবাড়ি করে তারা তাদেরকে রিসালাতের কিছু মর্যাদা দিয়েছে এবং এভাবে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করেছে। শীয়া মতবাদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে 'ইমাম' হিসেবে অথবা ইমামগণের 'খলীফা' হিসেবে অনেক মানুষের ইসমাত বা নিষ্পাপত্তি ও অপ্রাপ্ততায় বিশ্বাস করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকার কল্পনা করা হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রদত্ত কুরআন ও সুন্নাতের গুরুত্ব মূলত বিনষ্ট হয়েছে। এ বিশ্বাস অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর অবস্থা মূলত তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য গ্রন্থের মত হয়ে যায়। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা কিছুই থাক না কেন তা ইমামগণ বা বা গুলীগণ কর্তৃক কাশফ, ইলহাম বা 'ইলমু লাদুন্নী'-র ভিত্তিতে দেওয়া ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে সব কিছু বাতিল বলে গণ্য হবে। মু'তাফিলা ও অন্যান্য বিভাগ সম্প্রদায় মিরাজ বা অনুরূপ কিছু মুজিয়া অস্থীকার বা ব্যাখ্যা করেছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ ও নবীবৎশের মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। আমরা দেখছি যে, শীয়াগণের এ বিভাগ মূলত আকীদার উৎস কেন্দ্রিক।

(৫) মালাইকা ও গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভক্তি দেখা দেয় নি। তবে গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসের একটি দিক আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত। আর আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণটির প্রকৃতি নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি হয়েছে বলে আমরা দেখেছি ও দেখব।

(৬) আখিরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে তার অন্যতম আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, শাফা'আত ও জালান্তে আল্লাহর দর্শনের বিষয়। এগুলির মধ্যে শাফা'আত ও আল্লাহর দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক মতভেদ।

(৭) তাকদ্দীরের বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের কেন্দ্রিক। মহান আল্লাহর ইলম, ন্যায়বিচার, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করেই এ বিষয়ক মতভেদ।

(৮) পাপী মুঘিনের বিধান বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহান আল্লাহর ক্ষমা, ক্ষমতা, দয়া, প্রতিশ্রুতি ও ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নেয়।

(৯) রাষ্ট্র ও মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক বিষয়ে বিভক্তি ঘটেছে। পাপী মুঘিনের বিধান বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত এ বিষয়ক বিভক্তি জন্ম নেয়।

৬. ৫. ৪. ২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি

আহলুস সুন্নাতের নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের মূলনীতি, তা হলো সুন্নাত ও জামা'আত। আকীদার বিষয়ে হবহু সুন্নাতের অনুসরণ করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা, আল-জামা'আত বা সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়া-তাবি-তাবিয়ীগণের অনুসরণ করা ও উম্মাতের এক্ষে বজায় রাখার চেষ্টা করা। এ বিষয় দুটি আমরা উপরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। নিম্নের অনুচ্ছেদগুলিতে মতভেদীয় বিষয়গুলিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি।

৬. ৫. ৪. ১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূলনীতি

উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আকীদার উৎস নির্ধারণে মতভেদই সকল মতভেদের উৎস। বিদ'আতী ফিরকাণ্ডলি কুরআন ও হাদীসকে সরাসরি অঙ্গীকার করে নি। তারা কুরআন-সুন্নাহ আকীদার উৎস বলে স্বীকার করে। তবে আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত উৎসগুলিই তাদের মূল ভিত্তি। কেউ আকল, যুক্তি বা দর্শনের নামে এবং কেউ নবী-বংশের ইমামগণ, ওলীগণ বা তাদের প্রতিনিধিগনের কাশফ, ইলকা, ইলহাম, ইলম লাদুনী, মতামত বা ব্যাখ্যার নামে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমত গ্রহণ করেছে বা ব্যাখ্যা করে পরিত্যাগ করেছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাতের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকীদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যে কোনো বিষয়ে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সকল নির্দেশনা সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী তাবিয়া-তাবি-তাবিয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনের বিষয়ে তাদের মতামতের উপর নির্ভর করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, গৃহীত নির্ণয় ইত্যাদির অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয় নি সে বিষয় আকীদার অত্যুক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যান্য ইমামের কিছু বক্তব্য প্রথম অধ্যায়ে আকীদার উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। মোল্লা আলী কারী লিখেছেন:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرِهُ الْجَدْلَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ، حَتَّى رُوِيَ عَنْ أَبِي بَوْسَفِ أَنَّهُ قَالَ: كَنَا جَلُوسًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فِي أَبِيِّهِمْ رَجْلًا، فَقَالُوا: إِنْ

أحد هذين يقول: القرآن مخلوق، وهذا ينazuعه ويقول: هو غير مخلوق. قال: لا تصلوا خلفهما. فقلت: أما الأول فنعم، فإنه لا يقول بقدم القرآن. وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ فقال: إنهم يتنازعون في الدين، والمنازعة في الدين بدعة

“আবু হানীফা (রাহ) সত্যের পথেও বিবাদ-বিতর্ক অপছন্দ করতেন। ইমান আবু ইউসুফ (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা আবু হানীফার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ দুব্যজিকে নিয়ে তথায় আগমন করে বলেন: এ দুজনের একজন বলছে, কুরআন সৃষ্টি এবং অন্য ব্যক্তি তার সাথে বিতর্ক করছে ও বলছে, কুরআন সৃষ্টি নয়। তিনি বলেন: এদের উভয়ের কারো পিছনে সালাত আদায় করবেন না। আমি বললাম, প্রথম ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করব না একথা ঠিক, কারণ সে কুরআনের অনাদিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা হবে না কেন? তিনি বলেন, কারণ তারা দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক করছে আর দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক বিদ'আত।”^{৮২}

ইমাম তাহাবী বলেন:

وَلَا نخوض في الله. وَلَا نماري في دين الله. وَلَا نجادل في القرآن

“আমরা আল্লাহর বিষয়ে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইনা। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হইনা।”^{৮৩}

ইমাম তাহাবী বলেন,

وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْبَيِانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

“শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য।”^{৮৪}

এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবিল ইয়্যাহানাফী বলেন: “প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকার মূলনীতি এই যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদ'আতের মানদণ্ডে অথবা যাকে তারা ‘আকলী’ বা ‘বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল’ ও ‘যুক্তি’ বলে কল্পনা করে তার মানদণ্ডে বিচার করে। যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা ‘যুক্তি’র সাথে মিল যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে ‘মুহকাম’ বা দ্ব্যুর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবি করে, তা গ্রহণ করে

^{৮২} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৭।

^{৮৩} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৩।

^{৮৪} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৪।

এবং তাকে দলীল হিসেবে পেশ করে। আর কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য তাদের বিদ‘আত বা ‘যুক্তি’-র সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা ‘মুতাশাবিহ’ বা দ্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানকে তারা ‘তাফবীয়’ বা অর্থ-বিচার আল্লাহর কাছে হেড়ে দেওয়া বলে আখ্যায়িত করে। অথবা তারা এরূপ বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা ‘ব্যাখ্যা’ বলে আখ্যায়িত করে। এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কঠিনভাবে তাদের এসকল কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। আহলুস সুন্নাতের রীতি এই যে, কোনোভাবেই তারা সহীহ ‘নাস্স’ অর্থাৎ কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোনো বক্তব্য পরিত্যাগ করেন না বা তার বাইরে যান না। কুরআন বা সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় কোনো ‘আকলী দলীল’ বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্য তারা পেশ করেন না। ইমাম তাহবী এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।^{৮৫}

আকীদার উৎস বিষয়ক মূলনীতিই আহলুস সুন্নাতের সকল আকীদার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে।

৬. ৫. ৪. ২. আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ে মূলনীতি

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি এই যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে তুলনা করা পরিহার করা এবং সাথেসাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে ঝুঁক অর্থে ব্যাখ্যা করা বর্জন করা। যেমন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। আবার পাশাপাশি মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কঠোপকথন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, সম্মত হওয়া ইত্যাদি বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুজাস্সিমা বা মুশাবিহা ফিরকা আল্লাহর এ সকল বিশেষণ সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে কল্পনা করেছে। পক্ষান্তরে মু’তায়লী, জাহমী, কাদারী ও অন্যান্য বিভাত ফিরকা মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন যুক্তিতে মহান আল্লাহর অন্যান্য সকল বিশেষণ ও কর্ম অস্বীকার করেছে। তারা বলে, মহান আল্লাহকে শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, কথা বলা ইত্যাদি বিশেষণ বা কর্মে বিশেষিত করার অর্থই হলো তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। কারণ

^{৮৫} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

সৃষ্টি শ্রবণ করে, কথা বলে, সমাজীন হয়, সৃষ্টির হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে....। কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে, যহান আল্লাহ এ সকল বিশেষণের অধিকারী। বরং তিনি এ সকল বিশেষণ থেকে পবিত্র। কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত এ সকল বিশেষণকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন তাঁর হস্ত অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা করুণা, আরশের উপর সমাজীন হওয়ার অর্থ আধিপত্য লাভ করা। ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করা, ইত্যাদি।

আহলুস সন্ন্যাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে ওহীর নিকট পূর্ণ আভাসমর্পন করেন। তাঁরা সকল সিফাত বা বিশেষণ তাঁর প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করেন এবং বিশেষণের ধরণ ও প্রকৃতির বিষয় মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। সাথে সাথে তাঁরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, তাঁর এ সকল সিফাত বা বিশেষণ কোনোভাবেই সৃষ্টির বিশেষণের মত নয়। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

لَا يُشَبِّهُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مَنْ خَلَقَهُ، وَلَا يُشَبِّهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ。 لَمْ يَرِزِّلْ وَلَا
يَرِزِّالْ بِأَسْمَاهُ وَصَفَاتِهِ الْذَّاتِيَّةِ وَالْفَعْلِيَّةِ。 أَمَا الْذَّاتِيَّةُ فَالْحِيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ
وَالْسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ، وَأَمَا الْفَعْلِيَّةُ فَالْتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ
وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صَفَاتِ الْفَعْلِ。 لَمْ يَرِزِّلْ وَلَمْ يَرِزِّالْ بِصَفَاتِهِ وَأَسْمَاهُ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ
صَفَةٌ وَلَا اسْمٌ... وَصَفَاتِهِ كُلُّهَا بِخَلْفِ صَفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ。 يَعْلَمُ لَا كُلُّمَا نَا... وَلَهُ يَدُ وَوَجْهٌ
كَفِرْتَنَا، وَبِرِّي لَا كَرْؤِيَّتَنَا، وَيَكْلُمُ لَا كَلَامَنَا، وَيَسْمَعُ لَا كَسْمَعَنَا... وَلَهُ يَدُ وَوَجْهٌ
وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ。 فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذَكْرِ الْوَجْهِ
وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صَفَاتٌ بِلَا كِيفٍ。 وَلَا يَقُولُ: إِنْ يَدِهُ قَدْرُهُ أَوْ نَعْمَتْهُ؛ لَأَنْ فِيهِ
إِبْطَالَ الصَّفَةِ。 وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقُدْرَةِ وَالْإِعْتِزَالِ، وَلَكِنْ يَدِهُ صَفَتَهُ بِلَا كِيفٍ، وَغَضْبُهُ
وَرَضَاهُ صَفَاتَهُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا كِيفٍ.

“তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নয়। তিনি অনন্দি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সন্তার সাথে সংশ্লিষ্ট) ও ফিলী (কর্মমূলক) সিফাতসমূহ-সহ। তাঁর যাতী বা সন্তাগত সিফাতসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম' (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা)। আর তাঁর ফিলী বা কর্মবাচক সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিয়্ক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর শুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ তিনি অনন্দি-অনন্তরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। ... তাঁর

সকল বিশেষণই মাখলুকদের বা সৃষ্টিপ্রাণীদের বিশেষণের বিপরীত বা ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তাঁর কথা বলা আমাদের কথার মত নয়। তিনি শুনেন, তবে তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত নয়। ... তাঁর ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সন্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলি উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তার বিশেষণ কোনোরূপ ‘স্বরূপ’, কিরণ, প্রকৃতি বা কিভাবে তা নির্ণয় ব্যক্তিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারীয়া ও মু'তায়লা সম্প্রদায়ের মানুষদের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর বিশেষণ (সিফাত), কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যক্তিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ (সিফাত), আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনোরূপ কিরণ, কিভাবে বা কেমন করে প্রশ্ন করা ছাড়াই।^{১৬}

মোল্লা আলী কারী বলেন:

وقال الإمام الأعظم رحمة الله في كتابه الوصيية: "نَقْرَ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتُو، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَاسْتَقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ، فَلَوْ كَانَ مَحْتَاجًا إِلَيْهِ لَمَا قَدِرَ عَلَى إِيجَادِ الْعَالَمِ وَتَبِيرِهِ كَالْمُخْلُوقَ، وَلَوْ صَارَ مَحْتَاجًا إِلَى الْجِلْوَسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَينَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَهُوَ مَنْزَهٌ عَنِ ذَلِكَ عَلَوَّا كَبِيرًا"، انتهى. ونعم ما قال الإمام مالك رحمة الله حيث سئل عن ذلك الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب

“ইমাম আব্দুল্লাহ (রাহ) তাঁর ‘ওসীয়াত’ নামক পুস্তকে বলেছেন: “আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন, আরশের প্রতি তাঁর কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যক্তিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতার প্রয়োজন ব্যক্তিরেকে। তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না, বরং তিনি মাখলুকের মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতেন। আর যদি তাঁর আরশের উপরে উপবেশন করার বা স্থির হওয়ার

^{১৬} ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার (মুহাম্মাদ খামিসের শারহ সহ), প. ২১-৩৭।

প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক উর্ধ্বে।”

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) খুবই ভাল কথা বলেছেন। তাঁকে আল্লাহর আরশের উপরে সমাসীন হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: “সমাসীন হওয়ার বিষয়টি পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী।”^{৮৭}

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন,

وتعالى عن الحدود والغوايات، الأركان والأعضاء الأدوات، لا تحويه الجهات السَّت كسائر المبدعات.. والعرش والكرسي حق. وهو مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.

“আল্লাহ সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধ্বে। যাবতীয় উন্নতিত সৃষ্টি বস্ত্র ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহর আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য। প্রতিটি বস্ত্র তাঁর পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।”^{৮৮}

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইফতিরাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতভেদীয় বিষয়ই মহান আল্লাহর তাওহীদুল আসমা ও সিফাত বিষয়ক। আর এ জাতীয় সকল বিষয়েই তাঁরা এ মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

৬. ৫. ৪. ২. ৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূলনীতি

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কোনো ব্যক্তির নিষ্পাপত্তি, অভ্যন্তর বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তাঁরা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলিকে ব্যক্তি মুয়িনের জন্য ‘কারামত’ বা মর্যাদা ও নিয়মামত বলে গণ্য করেন। কিন্তু এগুলিকে আকীদার উৎস হিসেবে বা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। আলিম বা বজুর্গ ব্যক্তি যতই বড় হোন, তিনি কখনোই ইসমাত বা অভ্যন্তরার পদমর্যাদা পাবেন না। তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং সুনিচিত। এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) বলেন:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتَرَكُ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^{৮৭} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৭০।

^{৮৮} আবু জাফর তাহাবী, মাতৃসূল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১০, ১৩।

“প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু মত গ্রহণ করা হয় এবং কিছু মত বাদ দেওয়া হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম এ কবরে যিনি শায়িত আছেন তিনিই, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ।”^{১৯}

এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না। কুরআন ও সুন্নাতের মানদণ্ডে যাচাই করেই সকল কথা গ্রহণ করতে হবে। কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাত বিচার করা যায় না, বরং কুরআন ও সুন্নাত দিয়ে প্রত্যেকের কথা যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। অন্যক বলেছেন কাজেই তা দীনের প্রমাণ বা আকীদার দলীল এরূপ চিন্তা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি.) তাঁর “আল-আকাইদ আন নাসাফিয়াহ” ও অষ্টম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী ইমাম আল্লামা সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনু উমর আত-তাফতায়ানী (৭৯১ হি) তাঁর “শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়াহ” -তে লিখেছেন:

الإِلَهَامُ الْمُفْسِرُ بِالْقَاءِ مَعْنَى فِي الْقَلْبِ بِطَرِيقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ
بِصَحةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ

“হক্কপক্ষীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।”^{২০}

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত সাহাবীগণ, নবী-বংশ এবং ঈকান্তকার মানুষদের ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁরা মধ্যপদ্ধা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নেককার মানুষদেরকে ভালবাসেন, কিন্তু কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করেন না। তাঁরা সকল মুমিনকে আল্লাহর ওলী বলে গণ্য করেন, যার তাকওয়া ও কুরআন-সুন্নাতের আনুগত্য যত বেশি সে তত বেশি কামিল ওলী বলে বিশ্বাস করেন। তবে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে যাদের বিষয়ে জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কাউকে সুনিশ্চিত ‘ওলী’ বলা তো দূরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না। বরং তাদের বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের জান্নাতের আশা করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو التورين ثم علي بن أبي طالب

^{১৯} যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালাহ ৮/৯৩।

^{২০} সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী, শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়াহ, পৃ: ২২।

المرتضي رضوان الله تعالى أجمعين، عابدين ثابتين على الحق ومع الحق، نتولامه جميعاً ولا نذكر أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ إلا بخير.

“নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বাকর সিদ্দীক, তাঁর পরে উমার ইবনুল খাতুব আল-ফারুক, তাঁর পরে যুনুরাইন উসমান ইবনু আফ্ফান, তাঁর পরে আলী ইবনু আবী তালিব আল-মুরতায়া, রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁর আজীবন আল্লাহর ইবাদতের থেকেছেন এবং সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না।”^{১১}

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

نحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكر هم إلا بخير. ... وإن العشرة الذين سماهم رسول الله ﷺ وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله ﷺ وقوله الحق ... ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ﷺ، وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برأ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير الأثر، وأهل الفقه والنظر، لا ينكرون إلا بالجمل، ومن ذكرهم بسوء فهو على السبيل.

“আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্রে করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাদের উল্লেখ করে আমারা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। ... রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। ... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পুত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নেফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের সালকে সালেহীন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী পরবর্তীকালের আলেমগণ যারা হলেন কল্যাণ ও ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্ম জ্ঞানে পারদর্শী চিন্তাবিদ, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের

^{১১} মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৯-১১৬।

সাথে তাঁদের উল্লেখ করতে হয়। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে অন্ত পথের অনুসারী।”^{১২}

চতুর্থ অধ্যায়ে কারামাতুল আউলিয়া প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, উম্মাতের ওলীগণের পরিচয়ে ইমাম তাহাবী বলেছেন: “সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সমানিত।” আমরা আরো দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখ ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, ঈমান ও মারিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান, কাজেই বেলায়াতের ক্ষমবেশি তাকওয়া ও আনুগত্য অনুসরণের ভিত্তিতেই হয়, কোনো ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক, বংশ, ইত্যাদির কারণে নয়।

মুমিনদের বিষয়ে ও ওলীগণের বিষয়ে এ হলো আহলুস সুন্নাতের সাধারণ আকীদা। শীয়া বা অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত তাঁরা ওলীগণের মর্যাদা বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীসকে পুঁজি করে নির্দিষ্ট কাউকে ওলী বলে নিশ্চিত করেন না বা তাকে অভ্রান্ত বলে দাবি করে তার মতামতকে কুরআন বা হাদীসের একমাত্র ব্যাখ্যা বা আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র কুরআন বা হাদীসে যাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাঁদেরকেই জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেন। আর তাঁদের জান্নাত ও বিলায়াতের সাক্ষ্যকে তাঁরা অভ্রান্ততার সাক্ষ্য বলে গণ্য করেন না। বরং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কাউকে মা’সূম বা নিষ্পাপ, নিভূল বা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন না। ইমাম তাহাবী বলেন:

ونرجو للمسندين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا
نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستفرق لمسئلهم، ونخاف عليهم، ولا نقطفهم

“নেককার বা ইহসান অর্জনকারী মুমিনদের বিষয়ে আমরা আশা পোষণ করি যে, মহান আল্লাহ দয়া করে তাদের ক্ষমা করবেন এবং জান্নাত প্রদান করবেন, তবে আমরা তাদের বিষয়ে নিশ্চিত নিরাপত্তা অনুভব করি না এবং তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি না। আর আমার পাপী মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতি অনুভব করি। তবে তাদেরকে নিরাশ করি না।”^{১৩}

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: “বিষয়টি যেহেতু একপ সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ যার বিষয়ে জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি

^{১২} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৮-১৯।

^{১৩} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৪।

ছাড়া উস্মাতের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে তাকে জান্নাতী বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, বরং আমরা নেককার বা ইহসানের পর্যায়ে পৌছানো মুমিনদের জন্য আশাবোধ করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতিও বোধ করি।”^{১৪}

ইমাম তাহাবী অন্যত্র বলেন:

وَلَا تَنْزِلْ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا

“আমরা মুমিনদের কাউকে জান্নাতে বা জাহানামে অবতরণ কারাই না।”^{১৫}

এর ব্যাখ্যায় ইবনু আবিল ইয্য বলেন: “ইমাম তাহাবী বলছেন যে, আমরা আহল কিলার মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহানামী। কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ যার বিষয়ে জান্নাতী বলে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকেই আমরা জান্নাতী বলি, যেমন আশারায়ে মুবাশ্শারা। আমরা যদিও বলি যে, করীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিনদের যাকে চান আল্লাহ জাহানামে প্রবেশ করাবেন এবং এরপর শাফা‘আতকারীদের শাফা‘আতে তাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন, তবে আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিষয়ে নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকি। ওহীর জ্ঞান ছাড়া আমরা তার জান্নাতের সাক্ষ দেই না, জাহানামের সাক্ষও দেই না। কারণ প্রকৃত বিষয় তো গুণ রয়েছে। কে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তার কি অবস্থা ছিল তা আমরা কেউ জানি না। তবে আমরা নেককার বা ইহসান অর্জনকারীদের সম্পর্কে ভাল আশা করি এবং পাপীদের বিষয়ে ভয় পোষণ করি।”^{১৬}

৬. ৫. ৪. ২. ৪. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাকফীর বিষয়ক মূলনীতি আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, পাপী মুসলিমের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত মধ্যপত্তা অবলম্বন করেছেন। তাদেরকে সুনিশ্চিত জাহানামী বা জান্নাতী বলেন নি। বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তি পূর্বক ক্ষমার পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে ইমামগণের বক্তব্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি।

৬. ৫. ৪. ২. ৫. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মূলনীতি

ইসলামের প্রথম দুটি ফিরকা: শীয়া ও খারজী ফিরকার উপ্পুব ও উন্নেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে। বিশেষত খারজীগণ এ বিষয়ে দুটি আকীদার

^{১৪} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩২৫-৩৩০।

^{১৫} আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৫-১৬।

^{১৬} ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩৭৮।

উত্তীবন করে: (১) পাপী ব্যক্তির ইমামতের অবৈধতা এবং (২) পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যিকতা। তাদের দাবি ছিল যে, পাপী ব্যক্তি কাফির, আর কাফির ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না। বরং মুমিনের জন্য ফরয যে, এরূপ ইমামের বিরুদ্ধে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অংশ হিসেবে বিদ্রোহ করবে এবং জিহাদ করে একে অপসারণ করবে।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশনা গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে আলিমগণ মধ্যপছ্তা অবলম্বন করেছেন। তাদের মতে অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের কারণে তাকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ না সুনিশ্চিত কুফরী বা শিরকে সে নিপত্তি হয়। পাপী শাসক-প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, তেমানি তার পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নষ্ট বা বিদ্রোহ করা যাবে না। মধ্যপছ্তা অবলম্বন করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় এক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। ইবনু আবুস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْ أُمَّيْرٍ شَيْئًا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ فَارِقَ الْجَمَاعَةِ
(وفي لفظ: خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ) شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের) বাইরে, দ্বিতীয় বর্ণনায়: রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।”^{১৭}

উম্ম সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْفَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ قَتْعَرْفُونَ وَتَنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقْدَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقْدَ سَلِمَ وَلَكِنَّ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَالْأَوْلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَفَّاثَتُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَوَا

“অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অস্ত্রাণ্তি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)” সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, “না, যতক্ষণ তারা

^{১৭} বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬১২; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১৪৭৭।

সালাত আদায় করবে।”^{৯৮}

আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
 أَلَا مَنْ وَلَيَ عَلَيْهِ وَالْفَرَأَةُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَيَكْرَهَ مَا يَأْتِي
 مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزَعُ عَنْ يَدِهِ مِنْ طَاعَةٍ

“তোমরা ছশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-
 প্রশাসক নিযুক্ত হয় এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর
 অবাধ্যতার কোনো কাজে লিঙ্গ হচ্ছে, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত
 কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।”^{৯৯}

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন:

وَالصَّلَاةُ خَلْفُ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَائِزَةً.

“এবং সকল নেককার ও বদকার মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ।”^{১০০}

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:

وَنَرِي الصَّلَاةُ خَلْفُ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٌ مِنَ أَهْلِ الْقَبْلَةِ ... وَلَا نَرِي الْخَرْوَجَ عَلَى
 أَنْتَنَا وَوَلَا أَمْرُنَا وَلَا جَارُوَا، وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ. وَنَرِي
 طَاعَتِهِمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّالِحَاتِ
 وَالْمَعْفَافَةِ ... وَنَحْبُ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنَبْغَضُ أَهْلَ الْجُورِ وَالْخَيْانَةِ. وَالْحَجَّ
 وَالْجَهَادُ مَا ضَرَبَنَا مَعَ أُولَى الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَهْ وَفَاجِرَهُمْ، إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا
 بِيَطْلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقَضُهُمَا.

“আমরা কিবলাপন্থী প্রত্যেক নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত
 কায়েম করা ... বৈধ মনে করি। ... আমাদের ইমাম বা শাসকবর্গ অত্যাচার
 করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদেরকে অভিশাপ
 প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের প্রতি
 আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না
 তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের
 জন্য দু'আ করি। আমরা ন্যায়বিচারক ও দায়িত্বান-আমানত আদায়কারী
 শাসকদের ভালবাসি এবং জালিম, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্বে খিয়ানতকারীদের ঘৃণা
 করি। মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক-

^{৯৮} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮০, ১৪৮১।

^{৯৯} মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮২।

^{১০০} মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১২৩।

হচ্ছ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দৃষ্টিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না।”^{১০১}

৬. ৫. ৪. ২. ৬. ঐক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূলনীতি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অন্যতম মূলনীতি ‘ঐক্য ও সংহতি’। বিভাস্ত দলগুলির সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, আকীদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাতের আলিমগণের আভ্যন্তরীন মতভেদ সীমিত এবং ব্যাখ্যা বা পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে বিভাস্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভাস্ত দলগুলির আকীদার উৎস অনেক হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তি ও খুবই বেশি। মানবীয় বৃক্ষ, আকল, যুক্তি ইত্যাদির মতপার্থক্যই স্বাভাবিক। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কাউকে ‘মা’স্ম’ ‘অভাস্ত’ বা কারো মতকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করলেও এরূপ অভ্যন্তরে একজনের মতের সাথে অন্যজনের মতের মিল হয় না। আর এ সকল বিষয় যেহেতু তাদের মতে আকীদার মূল সেহেতু তারা একে অপরকে কাফির বা বিভাস্ত বলে ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণ সকল মুমিনকে যথাসম্ভব মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। এমনকি সুস্পষ্ট বিভাস্তিতে লিখ ফিরকাণ্ডিকেও তাঁরা কাফির বলে গণ্য না করে বিভাস্ত মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে বিভাস্ত সম্প্রদায়গুলি একমাত্র নিজেদেরকে ছাড়া অন্য সকলকেই ইসলামের গতি থেকে বের করে দেন। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি কুরআন বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কথা বলেছে বা বিশ্বাস পোষণ করেছে তার কথার ওয়র খোঁজার চেষ্টা করা। আর আহলুল বিদ‘আতের মূলনীতি হলো তাদের মতের বিরোধী ব্যক্তি যা বলেছে তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী না হলেও তার মধ্যে বিরোধিতা সন্দান করা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার বক্তব্যকে আকীদা বিরোধী বলে প্রমাণ করা এবং এরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাকে কাফির বা বিভাস্ত বলা।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বিশ্বাস করেন যে, আধিরাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন, তবে এ দেখার অর্থ কোনো মাখলুকের দেখার মত নয়, সৃষ্টির সাথে সকল তুলনার উক্তে এ দর্শনের প্রকৃতি মহান আল্লাহই জানেন। এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত এবং কোনো বক্তব্যেই সরাসরি বিপরীত নয়। তবে মুতাফিলী ও সমমনা ফিরকাণ্ডি আহলুস সুন্নাতের এ আকীদাকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন ‘কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয়

^{১০১} আবৃ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৫-১৬।

নয়'। আহলুস সুন্নাতের আকীদা এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ আল্লাহকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। কাজেই কুরআন অস্থীকার করার কারণে 'আহলুস সুন্নাত' কাফির!!

পক্ষান্তরে মুতায়লীদের আকীদা সুম্পষ্টভাবেই কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ মুতায়লীদের এ আকীদার কঠিন প্রতিবাদ করলেও এজন্য তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি; কারণ তারা সরাসরি আয়াত ও হাদীস অস্থীকার করে না, বরং ব্যাখ্যা করে।

শীয়াগণ নবী-বংশের ভালবাসার নামে সাহাবীগণকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে মুরতাদ বলে গণ্য করে। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের অনেক আয়াত ও অগণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তা সত্ত্বেও আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ তাদের এ বিশ্বাসের যথাসাধ্য ওজর খৌজার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ সাহাবীগণ ও নবী-বংশকে সমানভাবে ভালবাসেন। তাদের এ আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও শীয়াগণ প্রায়শ তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন এ যুক্তিতে যে তাঁরা নবী-বংশকে ভালবাসেন না।

এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন বক্তব্য আমরা উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে ও তাকফীর অধ্যায়ে দেখেছি। ইমাম তাহাবী বলেন:

وَنَرِى الْجَمَاعَةَ حَقًا وَصَوَابًا، وَالْفَرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا

"আমরা দলাদলিমুক্ত বা ঐক্যবন্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং বিভক্তি ও দলাদলিকে বিভ্রান্তি ও শাস্তি বলে মনে করি।"^{১০২}

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলু কিতাব বা ইহুদী-নাসারাদের সাথেও উত্তমভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে, শুধু তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের সাথে ছাড়া।"^{১০৩} তাহলে আহলু কিবলার সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে? আহলু কিবলা তে অন্তত আহলু কিতাবের চেয়ে উত্তম। কাজেই তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তারা ছাড়া কারো সাথে উত্তম পছ্টা ছাড়া বিতর্ক করা যাবে না। এরপ কেউ ভুল করলে বলা যাবে না যে, সে কাফির। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে বিধান প্রদান করেছেন তা সে পরিত্যাগ করেছে বলে সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত করার পরে তার কুফরীর বিধান দেওয়া যায়। মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ভাস্তি ক্ষমা করেছেন।"^{১০৪}

^{১০২} ইবনু আবিল ইয্য, শারহল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৫১২।

^{১০৩} সূরা (২৯) আনকাবৃতের ৪৬ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

^{১০৪} ইবনু আবিল ইয্য, শারহল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩১৫।

৬. ৫. ৫. আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ

উপরে আমরা মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা দলাদলি ও ফিরকা-বিভক্তির কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি জানতে পেরেছি। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলিয় ও ইমামগণ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে এবং সঠিক আকীদা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট থাকেন। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার প্রসিদ্ধ ৪ মুজতাহিদ ইমাম বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, আকীদার মূলনীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। এতে তাঁদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবু হানীফার (রাহ) তাঁর ফিকহল আকবারে যে আকীদা লিখেছেন এবং ইমাম আবুহানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ)-এর আকীদা বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রাহ) যা লিখেছেন তাই ৪ ইমামের আকীদা। আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু-একটি বিষয়ে খুটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শান্তিক পার্থক্য ছাড়া তাদের আকীদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সকল বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন খগড়হস্ত। বিশেষত আকীদাগত বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। তাঁদের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্নভাবে আকীদার বিষয় আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, ৪ ইমামের মধ্যে ইমাম আয়ম আবু হানীফা (রাহ) ও ইমাম আহমদ ইবনু হাস্বাল (রাহ) আকীদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও ফিকহ-এর বিষয়ে নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তাঁর ছাত্রদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে জানতে পরি। কিন্তু তিনি আকীদার বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'আল-ফিকহল আকবার' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

চতুর্থত, ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাহাবী ২৩৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলম শিক্ষা, প্রচার ও ব্যাপক খিদমাত ও প্রসিদ্ধির পরে ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত' পুস্তিকাটি আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত ও পঠিত বই। এ পুস্তকের প্রথমে তিনি বলেন:

هذا نكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين

“এ হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের আকীদার বর্ণনা, যা মিল্লাতের ফকীহগণ: ইমাম আবু হানীফা নু’মান বিন সাবিত কৃকী (১৫০হি), আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম আল-আনসারী (১৮২হি) ও আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি)-এর মাযহাবের ভিত্তিতে রচিত। তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। তাঁরা দীনের উস্ল বা মূলনীতির বিষয়ে যে আকীদা পোষণ করতেন এবং যে নীতিতে তাঁরা রাখুল আ’লামীনের আনুগত্য করে গেলেন তারই অনুসরণে রচিত।”^{১০০}

হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবিল ইয্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) রচিত ‘শরাহ্ল আকীদাহ আত-তাহবিয়াহ’ পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের আকীদা ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক।

পঞ্চমত, আকীদার বিষয়ে ৪ মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ আকীদার উৎসের বিষয়ে তাঁদের ঐক্যমত। আমরা দেখেছি যে, আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভাগিত মূল কারণ আকীদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভাগিতি। উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না। যারা আকীদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়গণের ইজমা বা জামা’আতকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে মূলত সামান্য শার্দিক বা ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ছাড়া কোনো মৌলিক মতভেদ নেই। কারণ মূল উৎস এক এবং তা বহুমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে যারা ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদিকে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মতভেদ ব্যাপক এবং মতভেদের সমাধান অসম্ভব। কারণ উৎস বহুমুখি এবং সেগুলির একমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। মানবীয় ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্য জনের অধিল হবেই। যুগ, দেশ, পরিবেশ ও ব্যক্তির কারণে এগুলি ভিন্নতা দেখ দেবেই। কাজেই আকীদার ক্ষেত্রেও বিভাজন, বিভক্তি ও দলাদলি আবশ্যিক।

^{১০০} আবু জাফর তাহবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহবিয়াহ, প. ৭।

ইজতিহাদ, বৃদ্ধি, আকল বা কিয়াস-এর প্রয়োজন হয় ফিকহের ক্ষেত্রে। কারণ যুগের পরিবর্তনে কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ অনেক নতুন বিষয় মুসলিমের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সে বিষয়ে বিধান দিতে হয় ফিকহের ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয় তা নয়। কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ কোনো বিষয় মুসলিমের আকীদার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আকীদার সম্পর্ক গাইবী জগতের সাথে এবং আল্লাহ, ফিরিশতা, নবীগণ, কিতাব, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদির সাথে। এসকল বিষয়ে কোনো কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না কিন্তু পরে যুমিনের আকীদা বা বিশ্বাসের সাথে সংযোজিত না হলে তার আকীদার ক্রিতি হতে পারে এরূপ বাতুল চিন্তা কোনো মুসলিম করেন না। এ বিষয়ে ৫ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনু আব্দুল বারুর ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) বলেন:

لَا خِلَفَ بَيْنَ قُهَّاءِ الْأَمْصَارِ وَسَائِرِ أَهْلِ السَّنَةِ ، وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ
فِي نَفْيِ الْقِيَاسِ فِي التَّوْحِيدِ وَإِبَانَتِهِ فِي الْأَحْكَامِ

“সকল দেশের ফকীহগণ এবং আহলুস সুন্নাতের সকল ইমাম, যারা হাদীস ও ফিকহের ইমাম তাঁরা সকলেই একমত যে, ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস নিষিদ্ধ এবং ফিকহী আহকামের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রযোজ্য।”^{১০৬}

এভাবে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার মুসলিম উম্মাহ বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত একমত যে, বিশ্বাসের একমাত্র উৎস ওহীর জ্ঞান এবং ওহীর জ্ঞান অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্য অর্থাৎ তাঁদের ইজমা বা জামা‘আতের উপর নির্ভর করতে হবে।

এজন্য ৪ ইমাম একমত যে, আকীদার উৎস মূলত দৃটি: (১) কুরআন কারীম এবং (২) সহীহ হাদীস। আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ইজমা বা জামা‘আত হলো তাঁদের মানদণ্ড। তাঁরা একমত যে, কুরআন-হাদীসে যা যেভাবে আছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকীদার অস্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না এবং সে বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের সকল বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ছাড়া গ্রহণ করার জন্য সমন্বয় মূলক কিছু কথা বলা যেতে পারে। এরূপ কথাও ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য এবং আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ মেনে নেওয়া হয়েছে।

^{১০৬} ইবনু আব্দুল বারুর, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, পৃ. ৭৪।

আমরা ইতোপূর্বে ধর্মীয় ব্যাপারে, এবং বিশেষত গাইবী বিষয়ে ইজতিহাদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং ওহীর কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখের বক্তব্য দেখেছি।

৬. ৫. ৬. শাইখ আদুল কাদির জীলানীর নসীহত

আহলুস সুন্নাত ও আহলুল বিদ'আত বিষয়ে শাইখ আদুল কাদির জীলানী রাহ. (৪৭১-৫৬১ হি) তাঁর শুনিয়াতৃত তালিবীন গ্রহে নিম্নরূপ নসীহত করেছেন: “সতর্ক ও জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তির উচিত আল্লাহর বাণী আর রাসূলে খোদা (সা)-এর হাদিস সমূহের সাধারণ ও বাহ্যিক অর্থ অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমল অর্থাৎ কাজ করা ও অনুগত থাকা। এ ব্যাপারে নতুন কথা প্রচার করা, মনগড়া কোন কিছু বলা, কথা কথবেশী করা ও নিজ ইচ্ছা মোতাবেক ব্যাখ্যা দেয়া নিতান্তই অনুচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, শরীআতে বেদআতের প্রচলন ও পথভ্রষ্টতার কোন অবকাশ না থাকে; কারণ এ পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে। ...”

সুন্নাত ও জমাত: মূলত প্রত্যেক মু'মিন লোকের উপরে সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ ওয়াজিব। সুন্নাত বলতে সেই পথ বুবায়, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) যে পথে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। আর জামা'ত বলতে চার খলিফা (রض)-এর প্রদর্শিত পথ; তাদের খেলাফত কালে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্তবলী। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই ছিলেন সরল সঠিক পথের সন্ধানদাতা, এ কাজে তাঁদের যোগ্যতা প্রশ়্নাতীত; কারণ তাঁদের পথের সন্ধান দেয়া হয়েছিল, (আল্লাহ তায়া'লা দিয়েছিলেন)।

আহলে বেদাত: ভাল হয় বেদাতী লোকজনের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া; তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিঙ্গ না হওয়া; তাদের সালাম না করা। আমাদের ইমাম আহমদ বিন হাস্বল বলেন, বেদাতবকারীকে সালাম করলে বুবা যায়, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। কেননা রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেন, ‘তোমরা পরম্পর সালাম দেয়ার প্রথা চালু কর, যাতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় তোমাদের মধ্যে।’

বেদাতীদের চিহ্ন ও পরিচয়: কতিপয় চিহ্ন ও বৈশিষ্ট বিদ্যমান, যা দ্বারা আহলে বিদাতী মানুষকে চেনা সহজ। বেদাতী মানুষ হাদিসকে অবজ্ঞা করে। বেদাতী জেন্দিক গোত্র আহলে হাদিস (আহলুস সুন্নাহ) অর্থাৎ হাদিস অনুসারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়। কাদরিয়া ফেরকা আখ্যা দেয় মুজাবিরাহ। হাদিস অনুসারীদের মুশাবিহাহ বলে জাহমিয়াহ গোত্র আর রাফেজিরা বলে নামেবাহ। এ ধরণের অবজ্ঞা-সূচক নামকরণের কারণ হল, ঐ সকল বেদাতী দল হাদিস অনুসারীদের প্রতি শক্রতা ও ঈর্ষা পোষণ করে থাকে। মূলত আহলে

সুন্নাত তথা হাদিস অনুগামী ব্যক্তিদের পরিচয় একটা মাত্র নামেই, তা হল, আহলে হাদিস (অর্থাৎ আহলু সুন্নাহ)। এ ছাড়া অন্য নামে তারা আখ্যায়িত নন। বক্তৃত বেদাতী মানুষ নিজেদের জন্য যে উপাধি (আহলে সুন্নাত) গ্রহণ করে থাকে তা ভিত্তিহীন, কেননা তাদের জীবন এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। ...

মুক্তিপ্রাপ্ত দল: উল্লেখিত তেহাতের শ্রেণীর কথা রাসূলে মাকবুল (ﷺ) বলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে মাত্র একটা শ্রেণী নাজাত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করবে। এবং সেই দল হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত। এ দলকে কাদরিয়া ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোক মুজাবিরা নামে অভিহিত করে থাকে। কারণ হিসেবে বলে, এ দল মনে করে সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারাই উদ্ভৃত। মুরজিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে শাককিয়া নাম দেয়; কারণ তারা ঈমানে হাস-বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলে, ইনশাল্লাহ আমি একজন মু'মিন। রাফেজী শ্রেণী বলে, এ দল নাছাবিয়া, কেননা এ দলের নিয়ম দলের সমস্ত লোকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে তারা ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) মনোনীত করে থাকে। বাতেনিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে বলে হাশাবিয়া। কারণ উক্ত দলের লোকজন রাসূলে করিম (ﷺ)-এর হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবন অনুসরন করে থাকে। এ ভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী দলকে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা যেমন খুশী তেমন নাম দিয়েছে, অথচ তাদের প্রদত্ত কোন নামই এ দলের উপযুক্ত নয়, প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এ দলের যথার্থ ও সঠিক নাম আহলে সুন্নাত এবং আসহাবে হাদিস। তারা হাদিসের অনুসারী, রাসূলের অনুসারী হিসেবেই এ নাম পাওয়ার যোগ্য।^{১০৭}

৬. বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ

আমরা উপরে দেখেছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে আহলুল বিদ'আত উল্লেখ করছেন। আর জামা'আতের বিপরীতে রয়েছে 'ইফতিরাক বা 'তাফার্কুক' যার অর্থ বিছ্রিতা বা দলাদলি। এজন্য আহলুল বিদ'আতকে আহলুল বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাক বলা হয়। এছাড়া সাহাবী-তাবিয়ীগণ এদেরকে আহলুল আহওয়া (أهـل الـأـهـوـاء) বা প্রবৃত্তির অনুসারীগণ বলে আখ্যায়িত করতেন। বিদ'আত (البـعـد) ও হাওয়া (الـهـوـى) শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহার আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। এখানে আমরা এ সকল ফিরকার পরিচয়, ইতিহাস ও মতাদর্শ আলোচনা করব।

^{১০৭} শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, গুরিয়াতুত তালেবীন, বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক: নুরুল আলম রইসী, পৃ. ১৯৭-১৯৯, ২১১। অনুবাদের বানানে সামান্য পরিবর্তন ও সাধু রীতির স্থলে চলতি রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. ৬. ১. ফিরকার সংখ্যা ও ৭৩ ফিরকা

উপরের কোনো কোনো হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহের সংখ্যা ৭৩ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই অনেক আলিম মুসলিম উম্মাহর ৭৩ ফিরকার নাম নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আলিম ইমাম আবুল্ফাহ ইবনু মুবারাক (১৮০হি) বলেন: “মুসলিম উম্মাহর ফিরকাণ্ডলির মূল ৪টি ফিরকাঃ শীয়া, হারারিয়াহ (খরিজী), কাদারিয়াহ ও মুরজিয়াহ। শিয়াগণ ২২ ফিরকায় বিভক্ত হয়, খরিজীগণ ২১ ফিরকায় বিভক্ত হয়, কাদারিয়াহ ফিরকা ১৬ ফিরকায় বিভক্ত হয় এবং মুরজিয়াগণ ১৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়।”^{১০৮}

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাম্মদ আবু হাতিম রায়ী (২৭৭ হি) বলেন: ‘‘আলিমগণ বলেছেন যে, এ উম্মাতের ইফতিরাক বা বিভক্তির শুরু হয়েছি যিন্দীকগণ, কাদারিয়াহ, মুরজিয়াহ, রাফিয়ী (শীয়া) ও হারারিয়াহ (খরিজী) এ দলগুলির মাধ্যমে। এরাই হলো সকল ফিরকার মূল। এরপর প্রত্যেক ফিরকা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তারা একে অপরকে কাফির বলেছে এবং একে অপরকে জাহিল বলেছে। যিন্দীকগণ ১১ ফিরকা, খরিজীগণ ১৮ ফিরকা, রাফিয়ীগণ (শীয়াগণ) ১৩ ফিরকা, কাদারিয়াহগণ ১৬ ফিরকা, মুরজিয়াহগণ ১৪ ফিরকায় বিভক্ত। মোট ৭২ ফিরকা।’’^{১০৯}

শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) (৫৬১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ৭৩ ফিরকা মূলত ১০ ফিরকার অঙ্গভূক্ত। এ দশ দল হল আহলু সুন্নাত, খরিজী, শীয়া, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, মোশাবিয়া, জাহমিয়া, জাবারিয়া, নাজারিয়া এবং কালাবিয়া। অন্যান্য ফিরকা এ দশ ফিরকার মধ্যে শামিল।^{১১০}

অনেক আলিম মনে করেন যে, ৭৩ ফিরকা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতের বিষয়ে এ ভবিষ্যত্বাণী করেছে এবং উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কাজেই কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ফিরকার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলা মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

যারা ইসলামের মূল তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ইমানে বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন, এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করেন বলে দাবি না করেন, ইসলামের সর্বজন-পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় অস্বীকার করেন না অথচ তাদের নিজেদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকীদার

^{১০৮} ইবনু বাতাহ, আল-ইবানাহ ১/২৯৭।

^{১০৯} ইবনু বাতাহ, আল-ইবানাহ ১/২৯৭।

^{১১০} শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ২১০।

মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা কুরআন-হাদীসে নেই বা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ও সাহাবীগণ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিশাসের ব্যতিক্রম, তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফিরকা বলে গণ্য করতে হবে ।

আর যারা তাদের বিশ্বাস- আকীদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হৃবহু অনুসরণ করেন, তাঁরা যা বলেছেন তা বলেন এবং তাঁরা যা বলেন নি তা আকীদার মধ্যে সংযোগ করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাদেরকে ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আত বলে গণ্য করতে হবে ।

৬. ৬. ২. প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ

আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মূল প্রসিদ্ধ ফিরকা ছিল ৪টি: (১) শীয়া, (২) খারিজী, (৩) কাদারিয়্যাহ ও (৪) মুরজিয়্যাহ । ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ফিরকা ৯টিতে পরিণত হয়: (১) খারিজী (২) মুতাফিলা (৩) মুরজিয়া (৪) শিয়া (৫) জাহ্মিয়্যাহ (৬) নাজারিয়া (৭) জাবারিয়া (৮) কালাবিয়া (৯) মুশাবিহা ।

এদের অধিকাংশ ফিরকাই ক্রমাগতে বিলুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক নতুন ফিরকার উন্নত ঘটেছে । এ সকল প্রাচীন ফিরকার মধ্যে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় এখনো বিদ্যমান । এছাড়া অন্যান্য ফিরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকীদা বর্তমান যুগে পাওয়া যায় । এখানে সংক্ষেপে মূল ফিরকাগুলির বর্ণনা প্রদান করছি ।

৬. ৬. ৩. শীয়া ফিরকা^{১১১}

৬. ৬. ৩. ১.উৎপত্তি ও মূলনীতি

শীয়া ও খারিজী: মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এন্দুটি ফিরকার উন্নত ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে । শীয়া(الشيعة) শব্দের অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি । পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে শীয়াতু আলী(شیعہ علی) ।

^{১১১} শীয়া ফিরকা বিষয়ক তথ্যাবলির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২২-২৪, ২৯-৭২; শাহরাত্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৪৬-১৯৮; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জালী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ১৫১-৩৫৬; আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ'আতুল মুয়াস্সারাহ, পৃ. ৪৩-৫২, ২২১-২২৮, ২৫৫-২৬২, ২৯৭-৩০৬, ৩৯৩-৩৯৮, ৫০৯-৫১৮; মুহাম্মাদ আল-বুন্দারী, আত-তাশাইউ'; মুহিবুদ্দীন আল-খাতীব, আল-খুতুতুল আরীয়াহ; মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার আত-তোনসাবী, বৃত্তানু আকায়িদিশ শীয়াহ; ড. মুসা আল-মুসাবী, আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ; আহমদ আল-ফওয়ান, আদওয়া আলাল আকীদাতিদ দুরয়িয়্যাহ ।

বা আলীর (রা) দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীঘ্ৰ ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা) তাঁৰ বংশধরদেৱ জন্য রাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বেৱ দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্ৰ কৰে অগণিত আকীদা তাদেৱ মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

ৰাসূলুল্লাহ ﷺ-এৱে আগমনেৱ সময় আৱবে কোনো রাষ্ট্ৰে অস্তিত্ব না থাকলেও পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্ৰ বিদ্যমান ছিল। যদিও গ্ৰীসে এক সময় 'ডেমোক্ৰাসী' বা 'গণতন্ত্ৰ' বলে কিছু চালু হয়েছিল তবে তা ঢিকে থাকে নি। ৰাসূলুল্লাহ ﷺ-এৱে আগমনেৱ সময়ে বিশ্বে সৰ্বত্র রাষ্ট্ৰ ব্যবস্থা ছিল বংশতাত্ত্বিক বা রাজসম্পর্ক ভিত্তিক। রাষ্ট্ৰে মালিক রাজা। তাৰ অন্যান্য সম্পদেৱ মতই রাষ্ট্ৰেৱ মালিকানাও লাভ কৰবে তাৰ সভানগণ বা বংশেৱ মানুষেৱ। রাজ্যেৱ সকল সম্পদ-এৱে মত জনগণও রাজাৰ মালিকানাধীন। রাজা নিৰ্বাচন বা রাজ্যপৰিচালনা বিশ্বে তাদেৱ কোনো মতামত প্ৰকাশেৱ সুযোগ বা অধিকাৰ নেই। রাজা তাৰ রাজ্যেৱ সম্পদ ও জনগণকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহাৰ কৰতে পাৱেন।

এছাড়া অধিকাংশ ধৰ্মও ছিল বংশতাত্ত্বিক। ইহুদী ধৰ্ম, পাৰস্যেৱ মাজুস ধৰ্ম, মিসিৱেৱ প্ৰাচীন ধৰ্ম ও অন্যান্য অনেক ধৰ্মবিশ্বাসেৱ মধ্যেই রাজসম্পর্কেৱ বিশ্বে ধৰ্মীয় মৰ্যাদা ও অলৌকিকত্বেৱ বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এ সময়ে আৱবে রাষ্ট্ৰব্যবস্থাৰ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আৱবৱা রাষ্ট্ৰীয় আনুগত্য বুঝতো না। তাৱা বুঝতো কৰিলা বা গোত্র প্ৰধানেৱ আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাৱে ছোট বা বড় গোত্রেৱ অধীনে তাৱা বাস কৰত। গোত্রেৱ বাইৱে কাৰো আনুগত্য বা অধীনতাকে তাৱা অবমাননাকৰ বলে মনে কৰত। এছাড়া ব্যক্তি সাতস্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেৱকে নিজেৱ মতেৱ বাইৱে অন্যেৱ মত গ্ৰহণ কৰতে বাধা দিত।

ৰাসূলুল্লাহ ﷺ সৰ্পথথম আৱবে একটি আধুনিক জনগণতাত্ত্বিক পৱামৰ্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্ৰব্যবস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰেন। এ ব্যবস্থাৰ দুটি বিশেষ দিক ছিল: (১) রাজা ও প্ৰজাৰ সম্পর্ক মালিক ও অধীনতস্থেৱ নয়, বৱং মালিক ও ম্যানেজারেৱ। তবে মালিক রাজা নন। রাষ্ট্ৰে মালিক জনগণ। রাজা তাদেৱ খলীফা বা প্ৰতিনিধি বা ম্যানেজাৰ হিসেবে তা পৱিচালনা কৰবেন। জনগণই তাকে মনোনিত কৰবেন এবং জনগণ তাকে সংশোধন বা অপসারন কৰবেন। (২) রাষ্ট্ৰপ্ৰধান নিৰ্ধাৰণ কৰা একটি জাগতিক কৰ্ম এবং তা জনগণেৱ কৰ্ম। জনগণেৱ পৱামৰ্শেৱ ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে। পৱামৰ্শেৱ ধৰন নিৰ্ধাৰিত নয়। যুগ, দেশ ও জাতি অবস্থা অনুসাৱে তা পৱিবৰ্তিত হতে পাৱে। যোগ্যতাৰ মাপকাঠি রাজসম্পর্ক নয়, বৱং তাকওয়া। কুৱাআন ও হাদীসে এ বিশ্বে অনেক নিৰ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাহাবীগণ কুৱাআন ও সুন্নাহৰ নিৰ্দেশনাৰ আলোকে এভাৱেই বুঝেছিলেন। তাৱা রাষ্ট্ৰপ্ৰধান নিৰ্বাচনেৱ ক্ষেত্ৰে মতভেদ কৰেছেন, তবে

বিত্ত হন নি। রাসূলগ্লাহ ﷺ-এর উফাতের পরে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের কেউ কেউ আশা করতেন যে, হয়ত আলীকেই (রা) নির্বাচন করা হবে। আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন। শেষপর্যন্ত আবু বাক্র (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং আলী (রা)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত হয়ে যান।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুধাবনে অক্ষম, পূর্ববর্তী ধর্ম বা দেশীয় ব্যবস্থার প্রভাব বা ইসলামের বিরুদ্ধে বড়্যন্ত্রের আঘাতে উসমান (রা)-এর সময় থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক নয়, বরং বংশতান্ত্রিক। ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের পাওনা। তাঁদের বাদে যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তাঁরা এবং তাদের অনুসারীগণ জালিয় ও ওহী অমান্যকারী। সর্বোপরি তারা দাবি করে যে, আলী-বংশের রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রূপকলন। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের তৃতীয় রূপকলন হলো আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেওয়া।

এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরো অনেক বিশ্বাস জন্ম নেয়, যেমন আলী (রা) তাঁর বংশধরদের নিষ্পাপত্তি, নির্ভূলত্ব, উল্লিঙ্গ্যাত, গাইবী জ্ঞান, রাসূলগ্লাহ ﷺ ও আলী (রা)-এর পুনরাগমন, সাহাবীগণের বিচুতি ইত্যাদি। ইতোপূর্বে আমরা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি।

ইমামতের এ ‘আকীদা’ কুরআন কারীমে কোনোভাবেই বিদ্যমান নেই। সাহাবীগণ কেউ তা জানেন নি। স্বয়ং আলী (রা)ও তা কখনো দাবি করেন নি। কোনো হাদীসেও তা স্পষ্টত নেই। কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পথে অবলম্বন করে:

প্রথমত, তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা কুরআনের কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিজের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করত। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অগণিত মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের মত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কখনো শানে মুয়ুলের কাহিনী, কখনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্য এবং কখনো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তারা পেশ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মুতাওয়াতির বিষয়ের সাথে একক বর্ণনা, ব্যক্তিগত ঘটনা বা আভিধানিক ব্যাখ্যা সংযোজন করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যুক্তির পথ। আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা যুক্তি পেশ করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী (আ) স্থলাভিষিক্ত রেখে গিয়েছেন, কাজেই মুহাম্মাদ

(ঝঙ্ক) স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না । পরবর্তী শীয়াগণ একুপ অনেক যুক্তি পেশ করেন । এসকল উন্নট যুক্তির মাধ্যমে ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া বিষয়কে তারা আকীদার অংশ বানিয়ে নেন ।

তৃতীয়ত, কুরআন বিকৃতির দাবি । শীয়াগণ যে আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে কুরআন কারীমে কোথাও তা নেই । বিষয়টি তাদেরকে সর্বদা পরাজিত করে । এজন্য তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মূল কুরআনে আলী (রা) তার বংশধরের ইমামতের বিষয়টি ছিল । তিন খলীফা ও সাধারণ সাহাবীগণ তা বিকৃত করেছেন । কুরআন মুখস্থ করা, খতম করা, নিয়মিত তাহাজ্জুদে ও তারাবীহের সালাতে খতম করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনিও অনুভব করেন যে, একান্তই মুর্খ না হলে কেউ একুপ বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না ।

চতুর্থত, সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবি । রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবন সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণকে কুরআন কারীমে নাজাত ও সফলতার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে এ সকল উন্নট আকীদার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । এজন্য শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত ও ধর্মবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে । আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি ।

পঞ্চমত, সাহাবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অস্বীকার । যেহেতু শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে, সেহেতু তারা তাঁদের মাধ্যমে বর্ণিত কোনো হাদীস সঠিক বলে স্বীকার করে না । বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের ইমামগণের থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলিকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাদের সংকলিত এ সকল ‘হাদীসের’ সনদের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যা যাচাই তাদের মধ্যে খুবই নগণ্য ।

ষষ্ঠত, ‘তাকিয়া’ বা ‘আত্মরক্ষার’ তত্ত্ব আবিক্ষার । শীয়াগণ যাদেরকে ঈমাম বলে দাবি করেন তারা মুসলিম সমাজের মূলধারার সাথে বাস করেছেন । আলী (রা) তিন খলীফার বিলাফত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন । তাদের প্রশংসা করেছেন । অনুরূপভাবে তাঁর বংশধরগণ । এগুলিকে বাতিল করার জন্য শীয়াগণ ‘তাকিয়া’ বা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব আবিক্ষার করেন । তারা দাবি করেন যে, আলী (রা) ও ইমামগণ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতেন ।

সপ্তমত, ব্যক্তির নিভূলত্ব ও বিশেষ জ্ঞান দাবির পথ । শীয়া বিভাস্তির অন্যতম দিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে অন্য অনেক মানুষের নির্ভূলত্ব এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের আকীদা প্রচার করে । তারা প্রচার করে যে, কুরআন-হাদীসে সবকিছু নেই । এছাড়া কুরআন-

হাদীসে যা আছে তা বুঝতেও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। আর এরপ জ্ঞান রয়েছে শীয়া ইমামগণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই গুহীর জ্ঞান বলে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি। এভাবে অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয়।

অষ্টমত, জালিয়াতির পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা করা এবং সেগুলির মাধ্যমে নিজেদের উন্নত ও মনগড়া ‘আকীদা’গুলি প্রমাণ করা শীয়াগণের অতি-পরিচিত বৈশিষ্ট্য।

৬. ৬. ৩. ২. দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীয়াগণ

শীয়া সম্প্রদায় অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে যান। বর্তমানে বিদ্যমান শীয়াগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল দ্বাদশ ইমামপন্থী বা ইমামী শীয়াগণ। ইরান, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শীয়া এ দলের। এদের আকীদাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(১) ইমামতের বিশ্বাস। তাদের মতে আলী (রা) ও তাঁর বংশের বার জনের ইমামতে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে ইমামত নস্স বা সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, এখানে ইজতিহাদ, শুরা বা পরামর্শের কোনো সূযোগ নেই। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ১২ ইমাম:

- (১) আলী (২৩-৪০ হি),
- (২) হাসান ইবনু আলী (৩-৫০ হি),
- (৩) হুসাইন ইবনু আলী (৪-৬১ হি),
- (৪) যাইনুল আবেদীন আলী ইবনু হুসাইন (৩৮-৯৫হি),
- (৫) মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু যাইনুল আবেদীন (৫৭-১১৪ হি),
- (৬) জা'ফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির (৮৩-১৪৮ হি)
- (৭) মুসা কায়িম ইবনু জাফর সাদিক (১২৮-১৮৩ হি)
- (৮) আলী রিয়া ইবনু মুসা কায়িম (১৪৮-২০৩হি)
- (৯) মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনু আলী রিয়া (১৯৫-২২০ হি)
- (১০) আলী হাদী ইবনু মুহাম্মাদ জাওয়াদ (২১২-২৫৪ হি)
- (১১) হাসান আসকারী ইবনু আলী হাদী (২৩২-২৬০)
- (১২) মুহাম্মাদ মাহদী ইবনু হাসান আসকারী (২৫৬-???)
- (১৩) ইসমাতের বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম সকল পাপ ও ভুল-প্রাপ্তি থেকে নিষ্পাপ ও সংরক্ষিত।

(৩) ইলম-এর বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে ‘ছিনায় ছিনায়’ ইমাম-পরম্পরায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলম লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গাইবী জ্ঞান প্রাপ্ত।

(৪) ইমামগণের মুজিয়ায় বিশ্বাস। তার বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত। তারা অলৌকিক কর্ম করতে পারেন এবং করেন। এগুলিকে তারা মুজিয়া বলে।

(৫) গাইবাহ (الغيبة) বা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

(৬) রাজ'আত (الرجعة) বা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ মাহদী শেষ যামানায় ইমাম মাহদীরপে ফিরে আসবেন।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, শীয়াগণের ১১শ ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে নিঃসন্তান ভাবে ইস্তেকাল করেন। তাঁর ইনতেকালের পরে তাঁর এক দাসী দাবী করেন যে, তিনি তাঁর সন্তান ধারণ করেছেন। হাসানের ভাই জাফর এ নিয়ে তৎকালীন সরকারের কাছে কেস করেন এবং প্রমাণিত করেন যে, তাঁর ভাইয়ের কোন সন্তান নেই। কেসে জয়লাভ করে তিনি ভাইয়ের সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন।^{১১২}

কিন্তু শীয়াগুণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ দাবী করেন যে, হাসান আসকারীর একটি ছেলে ছিল যাকে তিনি গোপন রেখেছিলেন। তার নাম ছিল মুহাম্মদ। তিনি ২৫৬ হিজরীতে, পিতার মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ছেট বয়সে তিনি তার বাড়ীর নীচের ছেট কুঠুরীতে (cellar/basement) প্রবেশ করেন। তাঁর আমা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি আর বের হন নি।

কত বৎসর বয়সে এই ঘটনা ঘটে তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ৯ বৎসর বয়সে ২৬৫ হিজরীতে। কেউ বলেন: ১৭ বৎসর বয়সে। কেউ বলেন ২৭৫ হিজরীতে ১৯ বৎসর বয়সে।

সর্বাবস্থায় শীয়াগণ গত প্রায় ১২০০ বৎসর যাবৎ বিশ্বাস করে আসছেন যে, এই মুহাম্মদই হলেন যামানার ইমাম। তিনিই মাহদী। তিনি গোপনে আছেন। গোপনে থেকেই জগত পরিচালনা করছেন। তিনি অচিরেই মাহদী রূপে আত্মপ্রকাশ করে সারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। গত অনেক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের অভ্যাস ছিল যে, তারা প্রতিদিন দলখরে

^{১১২} যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/১১৯-১২২।

বাগদাদের একটি কাল্পনিক ঘরের কাছে যেয়ে তাকে ডাকতেন এবং বেরিয়ে এসে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করতেন।^{১১০}

(৭) তাকিয়াহ (القُبَّة)-র বিশ্বাস। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাস। তাকিয়াহকে তারা দীনের দশভাগের নয়ভাগ বলে মনে করেন। তাকিয়াহ পরিত্যাগ করা সালাত পরিত্যাগ করার মতই কঠিনতম পাপ। যে তাকিয়াহর নামে মিথ্যা না বলে সত্য বলে সে তাকিয়াহ ত্যাগ করার কারণে কঠিন পাপে পাপী বলে বিবেচিত।

(৮) কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাস। অধিকাংশ ইমামী শীয়া বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত কুরআন বিকৃত। অবিকৃত মূল কুরআন আলীর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন। তার বংশের ইমামদের নিকট তা গোপন রয়েছে।

(৯) সাহাবীগণের বিচ্যুতির বিশ্বাস। বার-ইমামপন্থী ইমামী শীয়াগণ অন্যান্য অধিকাংশ শীয়া ফিরকার ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, তিনি খলীফা সহ সকল সাহাবী মুনাফিক, মুরতাদ ও জালিয়া ছিলেন।

(১০) বারাআতের (البر) বা সম্পর্কছন্তা ঘোষণার বিশ্বাস। তারা সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়াকে ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস করে।

(১১) সন্নাত ও হাদীস অঙ্গীকার। ইমামী শীয়াগণ সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অঙ্গীকার করেন। বরং তারা সাহাবীগণকে জালিয়াত বলে গণ্য করেন (নাউয়ু বিল্লাহ!)।

(১২) ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ক বিশ্বাস। ইমামী শীয়াগণ অন্য শীয়াদের মতই একমাত্র আলী (রা)-এর খিলাফত ও পরবর্তী যুগে শীয়াগণের রাজত্ব ছাড়া খিলাফতে রাশিদা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকারকে অনেসলামিক ও তাগুত্তি রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস করেন।

৬. ৬. ৩. ইসমাইলীয়া বাতিলীয়াহ শীয়াগণ

শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ইসমাইলিয়াহ সম্প্রদায়। আমরা দেখেছি যে, ১২ ইমাম পন্থী ইমামী শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, আলী-বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুসা কায়িম (১৪৩ হি) ইমামতি লাভ করেন। কিন্তু ইসমাইলিয়া শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, জাফর সাদিকের পরে ৭ম ইমাম জাফর সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাইল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এই ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাইলিয়া বাতিলীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

^{১১০} ইবনুল কাইয়েম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃ: ১৫২।

তৃতীয় হিজরী শতকে উবাইদুল্লাহ (২৫৯-৩২২হি) নামক এক ব্যক্তি উন্নত পঞ্চম আফ্রিকায় প্রচার করেন যে, তিনিই ৭ম ইমাম ইসমাইলের বংশধর ও ইমাম মাহদী। এক পর্যায়ে ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনুসের কাইরোয়ানে ফাতিমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার সভানগণ মিসর ও অন্যান্য এলাকা দখল করেন। প্রায় তিনি শতাব্দী পরে ৫৬৭ হিজরীতে সালাহ উদীন আইযুবীর হাতে ফাতিমী শীয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।^{১১৪} এরাই মূলত ইসামস্টোলীয় বাতিনী মতবাদের প্রবক্তা।

বাতিনীয়া শীয়াগণও অন্যান্য শীয়া ফিরকার মতই আলী বংশের ইমামত, ইমামগণের ইসমাত, গাইবী ক্ষমতা, গাইবী ইলম, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশেষ বিশ্বাসের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে:

(১) ইমামগণ এবং ইমামগণের মনোনীত বলে দাবিদারদের উল্লিখ্যাত-এ বিশ্বাস। তারা এদেরকে অবতার বা আল্লাহর দেহধারী রূপ বা আল্লাহর বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তি ও ইবাদত বা সর্বোচ্চ ভক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। কুরআন, হাদীস ইত্যাদি তাদের কাছে মূল্যহীন। ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি বলে দাবিকারীর বক্তব্যই একাম্র দীন।

(২) ইসলামের নির্দেশের গোপন বা বাতিনী অর্থের নামে ইসলামের সকল বিধিবিধান ও হালাল-হারাম বাতিল করে দেওয়া।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে ইসলামের নির্দেশাবলীর দুইটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ, যা সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণই জানেন। আর এই গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের মূল নির্দেশনা। শুধু সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ অর্থাৎ ইলমে বাতিন ও হাকীকত বুঝে সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের 'ইলম লাদুন্নি', 'বাতিনী ইলম' ও হাকীকতের জ্ঞান (!) দ্বারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাদের

^{১১৪} বিস্তারিত দেখুন: মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ ‘কারামিয়া’, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীর অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিয়ারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাইলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিয়ার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুকায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। এদের মাধ্যমে তিনি উন্নত পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় ‘আল-মাওত’ নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত ‘ধর্মীয়-রাজনৈতিক’ আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শক্ত মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মাভাবী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উঘির নিয়ামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শ্ববর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাইদের পরবর্তী টাগেটি কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দুর্গ থেকে ফিদাইদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪

হিজরীতে (১২৫৬ খ্র.) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।^{১১৫}

বর্তমান যুগে আগাখানী শীয়া, ভারতীয় বুহরা শীয়া ইত্যাদি দল বাতিনী শীয়াগণের উত্তরপূরুষ। এছাড়া বর্তমান সিরিয়ার শাসক নুসাইরী বা আলাবী শীয়াগণ এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের দূরুৎ সম্প্রদায়ও বাতিনী শীয়াগণের বিভিন্ন শাখা। এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ পথক আকীদা রয়েছে। তবে বাতিনী সম্প্রদায়ের মূল বিশ্বাস অর্থাৎ ইমামগণের 'উল্হিয়্যাত' ও ইসলামী আহকামের অকার্যকারতায় এরা সকলেই বিশ্বাসী।

৬. ৬. ৩. ৪. যাইদিয়াহ (الزبيدة) শীয়াগণ

শীয়াগণের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবচেয়ে নিকটবর্তী ফিরকা যাইদী শীয়াগণ (الزبيدة)। বর্তমান ইয়ামানের সংখ্যগরিষ্ঠ জনগণ এ মতের অনুসারী।

যাইদী শীয়াগণ নিজদেরকে ইমাম যাইদের (৭৯-১২২ খ্র.) অনুসারী বলে দাবি করেন। যাইদ ছিলেন ১২ ইমামপন্থী শীয়াগণের তৃতীয় ইমাম যাইনুল আবিদীনের পুত্র ও ৪৪ ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের ভাই। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন এবং বিশ্বাসে ও কর্মে আহলুস সুন্নাতের অস্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী তাকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ১২২ হিজরীতে তিনি শহীদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। তবে তার অনুসারিগণ তাদের বিরোধিতা চালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ইয়ামানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যাইদী শীয়াগণের আকীদার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার ফাতিমার (রা) বংশধরদের।

(২) ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য ওহীর বা পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন নেই। বরং ফাতিমার (রা) বংশের যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি যোগ্যতা থাকে এবং জনগণ তাকে নির্বাচিত করে তবে তিনিই ইমাম।

(৩) ফাতিমার বংশের যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য বংশের মানুষ বা কম যোগ্য মানুষ খলীফা হলে তা বৈধ হবে।

(৪) প্রথম দু খলীফা আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর মর্যাদায় বিশ্বাস।

(৫) তৃতীয় খলীফা উসামন ইবনু আফ্ফানের (রা) খলাফতে বিশ্বাস।

^{১১৫} আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আলিল ফিরাক, পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৯৮।

তবে তাদের অনেকে তাঁর কিছু ভুলভাস্তির কথা বলে।

(৪) সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে ভাল বলা ও তদের গালি না দেওয়া।
বিশেষত আলী (রা) যাদের হাতে বাইয়াত হয়েছেন তাদেরকে ভালবাসা।

(৫) তারা আকিয়্যাহ-তে বিশ্বাস করেন না।

(৬) তাদের মতে ইয়াম গুপ্ত বা লুক্ষিত থাকতে পারেন না।

(৭) তারা ইমামগণের ইসমাত বিশ্বাস করেন না। তবে কেউ কেউ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা) এ চারজনের ইসমাতে বিশ্বাস করেন।

(৮) ফিকহী বিষয়ে যাইদী ফিকহ হানাফী ফিকহের সাথে মিল রাখে।

৬. ৬. ৪. খারিজী ফিরকা^{১৬}

৬. ৬. ৪. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস

৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, এক্যবন্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার প্রয়োজন করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের এক্যবন্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে ঝুঁকে রূপান্তরিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে ‘খারিজী’ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন

^{১৬} খারিজী ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০, ৭২-১১৪; শাহরাখানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১১৪-১৩৯; আবু মুহাম্মদ আল-ইয়ামনী, আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকাহ ১/১৮-৪২; ড. আহমদ মুহাম্মদ জালী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ২১-১৪৯; আন-মাদওয়াতুল আলামিয়াহ লিশ শাবাৰ আল-ইসলামী, আল-মাউসূ'আতুল মুয়াস্সারাহ, পৃ. ১৩-২০; ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা; আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখ; মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা।

ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্ডোকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুরবা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হস্ত ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ হলো অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ طَائِقْتُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَقْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا
عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ.

"যুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিঙ্গ হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"^{১১৭}

এখানে সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালানর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

إِنِّيْ حَكْمٌ إِلَّا لِلَّهِ

'কর্তৃত শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা "বিধান শুধু আল্লাহরই"^{১১৮}

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লজ্জন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা নায়িল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"^{১১৯}

তারা দাবি করে যে, আল্লাহর নায়িল করা বিধান অমান্য করার কারণে আলী, মু'আবিয়া ও তাঁদের অনুগামিগণ সকলেই কাফির। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তারা তাদের মতের পক্ষে

^{১১৭} সূরা হজুরাত, ৯ আয়াত।

^{১১৮} সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসূফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

^{১১৯} সূরা মায়দা, ৪৮ আয়াত।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ভৃত করতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্রাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উপর্যুক্ত ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোসকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।^{১২০}

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।^{১২১}

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জ্যবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাষার।^{১২২} এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।^{১২৩} কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহশ হয়ে যেত। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঞ্চক। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।^{১২৪}

^{১২০} নাসাই, আস-সুন্নাল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৪৭-৪৮।

^{১২১} ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/৩৮০-৪৩০; মতিউর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৫৯।

^{১২২} বিস্তারিত দেখুন, মুবারিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল।

^{১২৩} ইবনুল জাওয়ী, তালীবীসু ইবলিস, পৃ. ৮৩-৮৪।

^{১২৪} আল-আজুরুরী, আশ-শারী‘আহ, পৃ. ৩৭।

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সজ্ঞাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আয়ীয় তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে তাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছেন। এছাড়া মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের ঘনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আয়ীয় তাদের এ দাবী না মানাতে শাস্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।^{১২৫}

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ‘পিউরিটান’ ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় এবং এইরূপ “কাফিরদের” বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠা’ করা এবং পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দীনের সবচেয়ে বড় ফরয।^{১২৬}

এদের বিদ্রোহের পরে আলী (রা) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধৰ্মসংজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জয়ায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা) মুসলিম উদ্যাহকে খোদাদোহিতার মধ্যে নিয়মিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এই পক্ষিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম

^{১২৫} ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

^{১২৬} আহমদ ইবনু হাসাল, আল-মুসনাদ ৫/১১০, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে তাঁর উভেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব!^{১২৭}

আলীকে (রা) এভাবে হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিতান (মৃত্যু ৮৪ হি) বলেন: “কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুসাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সম্মতি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।”^{১২৮}

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরকে উপ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের ‘ব্রান্ডের’ ইসলাম বা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিঙ্গ। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপত্তি হয়ে অঙ্গ ও বধির হয়ে গিয়েছে।^{১২৯}

৬. ৬. ৪. ২. আকীদা ও মূলনীতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খারিজীগণের আকীদা বুঝতে পেরেছি। বস্তুত তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে নিজের বুঝ বা মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে মনে করত। এতে কিছু দিনের মধ্যেই তারা কয়েক ডজন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে সকল উপদল মোটামুটিভাবে নিম্নের বিষয়গুলিতে একমত ছিল:

(১) কর্বীরা গোনাহে লিঙ্গ ব্যক্তি কাফির।

^{১২৭} মুবারিদ, আল-কামিল ৩/১১২০।

^{১২৮} মুবারিদ, আল-কামিল ৩/১০৮৫।

^{১২৯} ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২/১৪৯।

(২) উসমান, আলী, উল্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মু'আবিয়া, সিফ্ফীনের যুদ্ধের দুই সালিস আমর ইবনু আস, আবু মৃসা আশ'আরী (৫৫) এবং তাদের দুজনের বাইকজনের বিচারকে যে ব্যক্তি সঠিক বলে মনে করে তার সকলেই কাফির।

(৩) জালিম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং জিহাদ করা ফরয, উপরভূত জিহাদ আরকানে ইসলামের মতই ফরয আইন এবং সবচেয়ে বড় ফরয।

এছাড়া তাদের অনেক মতামত রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভক্তি রয়েছে।

৬. ৬. ৪. ৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ

(১) ইবায়ী সম্প্রদায়

খারিজী ফিরকার অধিকাংশ উপদলের বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান যুগে উপসাগরীয় দেশ ওমানে এবং উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, মোরিতানিয়া ও অন্যান্য দেশে ইবায়িয়াহ (إِبْلَاضِيَّة) নামক খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষের বিদ্যমান। এরা আদুল্লাহ ইবনু ইবায (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِبْلَاضِي) নামক এক ব্যক্তির অনুসারী। মূল খারিজী বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে। তবে সময়ের আবর্তনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। মূল খারিজী আকীদার পাশাপাশি আল্লাহর সিফাত, আল্লাহর কালাম ইত্যাদি বিষয়ে তার মু'তাফিলীদের আকীদা পোষণ করে।

(২) আধুনিক খারিজীগণ

উপনিবেশোভূত মুসলিম দেশগুলিতে, বিশেষত মিসরে আধুনিক ইসলামী জাগরণের প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন ইসলামী সংগঠন প্রাচীন খারিজী সম্প্রদায়ের আকীদা গ্রহণ করেছে। গবেষকগণ এদেরকে নব্য-খারিজী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অনেকেই খারিজীগণের উপর্যুক্ত তিনটি মূলনীতি সঠিক বলে স্পষ্টত স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতুল মুসলিমীন' বা জামা'আতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ।

শুকরী আহমদ মুসতফা ১৯৪২ সালে আসইযুতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসযৃত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক 'বৈপ্লাবিক' চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এই বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ নামে একটি দল গঠন করেন। এরা এক পর্যায়ে তাদের দলভূক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এইরূপ কাফির-মুরতাদেরকে গুণ্ঠ হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভাস্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভাস্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুণ্ঠ হত্যা করতে শুরু করে।

এদের কর্মকাণ্ডের ওজুহাতে মিসরীয় সরকার অগণিত আলিম ও ধার্মিক যুবককে কারাগারে নিষ্কেপ করে। এছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলি এদের কর্মকাণ্ডকে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক মানুষ ও ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৭৮ সালে এদের অধিকাংশকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বাকি অনেককে দীর্ঘ যেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এরপর এ দলের ব্যাখ্যিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে তারা তাদের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড দাবি করে। এছাড়া তাদের চিন্তাচেতনা পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে।^{১০০}

তাদের মূলনীতিগুলি মধ্যে ছিল:

(১) কুরআন বুঝার জন্য বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ট বলে দাবি করা

এদের নেতা শুকরী দাবি করেন যে, কুরআন বুঝার জন্য কোনো মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করাও কুফরী; কারণ এতে মানুষের কথাকে আল্লাহর কথার উপরে স্থান দেওয়া হয়। এই যুক্তিতে তারা কুরআনের আয়াতগুলি নিজেদের বুঝ ও আবেগ অনুসারে ব্যাখ্যা করত। সাহাবীগণ বা অন্য কারো মতের এক্ষেত্রে কোনো মূল্য আছে বলে স্বীকার করত না।

(২) সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী সকল মুসলিম প্রজন্মকে ঘৃণা করা

সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচৃত্য বলে মনে করত। কারণ তারা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্বারী তাঙ্গতি রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করে চলেছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও প্ররবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করত না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে

^{১০০} মুহাম্মাদ সুরুর বিন নাইফ, আল-হক্ম বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ, পৃ. ৯-১১।

তারা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকল ও বিবেকই ইসলামের মূল উৎস।^{১০১}

(৩) অভীত-বর্তমান সকল আলিমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

শুকরী ও তার অনুসারিগণ অভীত ও বর্তমান সকল যুগের সকল আলিমের প্রতি কঠিন অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্খ, স্বার্থপুর, আপোসকামি, ‘তাণ্ডত’-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।^{১০২}

(৪) অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থার সরকারকে কাফির বলা

খারিজীদের মতই এরা দাবি করে যে, মুসলিম দাবিদার যদি ইসলামের কোনো অনুসারণ লজ্জন করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা মূলত রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলঘীকেই কাফির বলেন। তারা নিজেরাই ছোট ফরয ও বড় ফরয তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেক প্রকার পাপে লিঙ্গ হন, যেগুলি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতই পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় চাকরী করা, রাষ্ট্রের আনুগত্য করা, তাদের দলে যোগ না দেওয়া, ‘তাদের কথিত জিহাদ সমর্থন না করা’, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বা ‘গণতান্ত্রিক’ কোনো দলকে সমর্থন করা ইত্যাদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ পাপের কারণে তারা অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির ঘোষণা করে তাদের হত্যা করেছে।

(৫) ‘আনুগত্যের’ কারণে সাধারণ নাগরিকদেরকে কাফির বলা

খারিজীগণ যেমন মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মালের সম্পদে শাসকের যথেচ্ছ অধিকার প্রদান ইত্যাদি ‘মানব রচিত’ আইন প্রচলনের কারণে আলী (রা), মু’আবিয়া (রা) ও পরবর্তী শাসকরদেরকে কাফির বলেছে, তেমনিভাবে এরা উপনিবেশ-উন্নত মুসলিম দেশগুলির, এবং বিশেষত মিসরের শাসকদেরকে ‘ইসলাম-বিরোধী’ আইন প্রচলনের জন্য কাফির বলে ঘোষণা করে। তারা দাবি করে যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জালিম শাসকগণ যেহেতু ‘ইসলামী’ আইনে বিচার করেন না বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। আর এ সকল সরকারের আনুগত্যের কারণে দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাফির বলা।

^{১০১} মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হক্ম ১২৩।

^{১০২} মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হক্ম, পৃ. ৫৬।

(৬) জামা'আত ও বাই'আতের তত্ত্ব প্রদান করা

তারা দাবি করে যে, শুধুমাত্র 'জামা'আত' ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে। এই দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা'আত বিষয়ক নির্দেশাবলীকে দলিল হিসেবে পেশ করে। তাদের এই দাবি মূর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা'আতকে ঈমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। সর্বোপরি তারা এই পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি।

(৭) বড় ফরয ও ছোট ফরয়ের তত্ত্ব প্রদান

খারিজীগণের মত তার পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয আইন বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তারা দাবি করেন যে, ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় ও প্রথম ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা। এই ফরয পালন করতে যেয়ে যদি অন্যান্য ফরয ইবাদত বাদ দিতে হয় তবে তা দিতে হবে। যেমন এজন্য প্রয়োজনে সালাত বাদ দেওয়া যাবে বা সালাতের মধ্যকার ফরয কর্ম বাদ দেওয়া যাবে।

এটিও তাদের মনগড়া একটি মতামত ছিল। কোনো ফরযকে বড় বলতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি কর্ম কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত ফরয ইবাদত বটে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কখনোই এগুলিকে সবচেয়ে বড় ফরয বলা হয় নি। বরং কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, এ সকল ইবাদত বড় ফরয হওয়া তো দূরের কথা ফরয আইনও নয়, বরং তা মূলত ফরয কিফায়া। কুরআনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওয়র ছাড়াও যারা জিহাদ না করে বসে থাকেন তবে তাদের মর্যাদা কিছু কমলেও কোনো পাপ হবে না। হাদীস শরীফে পিতামাতার খেদমতের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের আবেগ এবং কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মধারা সম্পর্কে অঙ্গতা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে।

৬. ৬. ৫. অন্যান্য ফিরকা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাচীন ফিরকাণ্ডলির মধ্য থেকে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় বাহ্যত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে তাদের মতামতের কিছু দিক বিক্ষিণ্ডভাবে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

৬. ৬. ৫. ১. মুরজিয়াহ^{৩০}

মুরজিয়াহ (المرجنة) আরবী 'আরজাআ' (أرجأ) ফিল থেকে গৃহীত 'ইসমু ফাইল'। মূল শব্দ বা ধাতুমূল রা, জীম ও হাময়া: 'রাজাআ' (رجأ)। আরজাআ (أرجأ) অর্থ বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেওয়া, স্থগিত রাখা (To postpone, adjourn, defer, put off) ইত্যাদি। মুরজিউন (مرجىع) অর্থ বিলম্বিতকারী বা স্থগিতকারী। বহুবচন বা ফিরকা অথে মুরজিয়াহ বলা হয়, অর্থাৎ বিলম্বিতকারীগণ বা স্থগিতকারীগণ।

আমরা দেখেছি যে, খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির এবং অনন্ত কাল জাহানামী বলে বিশ্বাস করে। তাদের মতে ইসলামের বিধান পালন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্মের ঘাটতি মানেই ঈমানের ঘাটতি। আর ঈমানের ঘাটতি অর্থই কুফ্র। এর বিপরীতে আরেক দলের উত্তর হয়। তারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান বা বিশ্বাস থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ট। ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আর এরপ ঈমানদার ব্যক্তির কর্বীরা গোনাহ তার কোনো ক্ষতি করে না। যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী হবে। এদের মূলনীতি হলো,

لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَا يَفْعُلُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ

“ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না, যেমন কুফ্র থাকলে কোনো পুন্যই কাজে লাগে না।”

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করে। এদেরকে মুরজিয়া কেন বলা হলো সে বিষয়ে দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইবনুল আসীর বলেন, এরা যেহেতু বিশ্বাস করে যে, কর্বীরা গোনাহে লিঙ্গ ব্যক্তিকে আন্দ্রাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন সেহেতু তাদেরকে মুরজিয়াহ বলা হয়। আর আদ্দুল কাহির বাগদাদী বলেন, এরা যেহেতু আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।^{৩৪}

^{৩০} মুরজিয়াহ ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৫, ২০২-২০৭; শাহরাত্ননী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৩৯-১৪৬; আবু মুহাম্মাদ আল-ইয়ামনী, আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবস্তো ফিরকাহ ১/২৭১-২৯৫; ড. নাসির ইবনু আদ্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিয়াত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা; আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখ; মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা।

^{৩৪} ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ১/৯৮; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০২।

খারিজীগণ যেরূপ কুরআন ও হাদীসে কিছু বক্তব্য নিজেদের মতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এর বিপরীতে অন্য বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করেছে, বা বাতিল করেছে, অনুরূপভাবে মুরজিয়াগণও তাদের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের ক্ষমা বিষয়ক ও তাওহীদের ফয়েলত বিষয়ক বক্তব্যগুলিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বাকি আয়াত ও হাদীসগুলি ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করেছে। সমস্বয় বা উভয় প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা সচেষ্ট হয় নি।

এখানে লক্ষণীয় যে, খারিজী, মুতায়িলী এবং তাদের সংগে একমত বিভিন্ন ফিরকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকেও মুরজিয়াহ বলে আখ্যায়িত করে। কারণ এ সকল ফিরকা করীরা গোনাহে লিঙ্গ মুসলিমের বিধান তাৎক্ষণিক বলে দেয় যে, সে অনন্তকাল জাহান্নামে বাস করবে। আর আহলুস সুন্নাত করীরা গোনাহে লিঙ্গ ব্যক্তিকে অনন্ত জাহান্নামবাসী না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন। এভাবে তাঁরা পাপী মুসলিমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি পিছিয়ে দেন।

৬. ৬. ৫. ২. কাদারিয়্যাহ^{১০২}

কাদারিয়্যাহ (*القدرية*) শব্দটি 'কাদার' (*القدر*) শব্দ থেকে গৃহীত। 'কাদার' অর্থ নির্ধারণ। ইসলামের পরিভাষায় 'কাদার' অর্থ আল্লাহর নির্ধারণ, পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর। 'কাদারী' অর্থ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত। দল বা ফিরকা অর্থে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। অর্থাৎ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত দল বা তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ। যারা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অঙ্গীকার করেন তাদেরকে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে এ মতের উত্তর হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রসার লাভ করে।

আমরা দেখেছি যে, তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর অনাদি-অনন্ত সর্বব্যাপী ইলম বা জ্ঞানে বিশ্বাস। অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে, অনাদি কাল থেকে মহান আল্লাহ বিশ্বের কে, কখন, কোথায়, কিভাবে কি করবে, কি ঘটবে সবই জানেন। তাকদীরে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞানেও অবিশ্বাস করতে হয়। এজন্য কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ পূর্ব থেকে কিছু জানেন না, বরং যখন যা ঘটে তখন তিনি তা জানেন।

উল্লেখ্য যে, মুতায়িলাগণ কাদারিয়্যাহ ফিরকার সকল মূলনীতি গ্রহণ করে। এজন্য অনেকেই মুতায়িলা ও কাদারিয়্যাহ এক ফিরকা বলেই গণ্য করেছেন। পরে আমরা মুতায়িলাদের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

^{১০২} কাদারিয়্যাহ ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১১৪-২০২; শাহরাত্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৩৯-১৪৬।

৬. ৬. ৫. ৩. জাবারিয়াহ^{১৩৬}

জাবার (الجبر) শব্দের অর্থ 'জবরদস্তি', বাধ্য করা, ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি। জাবারিয়াহ সম্প্রদায় কাদারিয়াহ সম্প্রদায়ের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। এরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলে কিছুই নেই। মানুষ যা করে তা করতে সে বাধ্য। মানুষ চাবি দেওয়া কলের পুতুলের মতই। কাদারিয়াহগণ বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য বলে কিছুই নেই, কর্মই সব। আর জাবারিয়াহগণ বিশ্বাস করে যে, কর্ম বলে কিছু নেই ভাগ্যই সব। আমরা দেখেছি যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল শিক্ষা সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ভাগ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কর্ম। আল্লাহ যেহেতু দুটি বিষয়েই উল্লেখ করেছেন সেহেতু দুটি বিষয়ই সত্য। এদুটির সমন্বয়ে আশা ও ভয়ের মধ্যে ঈমান। জাহমিয়াহ সম্প্রদায়ের শুরু জাহমই জাবারিয়া আকীদার প্রথম প্রবক্ত বলে গণ্য।

৬. ৬. ৫. ৪. জাহমিয়াহ^{১৩৭}

জাহমিয়াহ অর্থ 'জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনু সাফওয়ান (মৃত্যু ১২৮ হি.) পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু চুকিয়ে দেয়। সে একদিকে 'জাবারিয়া' মতে প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল। সে প্রচার করত যে, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মত চলমান। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের প্রচারক ছিল। সে বলত যে, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারিফাতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফ্র। সে আরো প্রচার করত যে, জান্নাত ও জাহন্নম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এছাড়া সে আল্লাহর বিশেষণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত। সে বলত, যে বিশেষণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষিত করা যায় সে বিশেষণ আমি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে রায়ি নই। কাজেই আল্লাহকে বিদ্যমান, জ্ঞানী, ইচ্ছাকারী ইত্যাদি কিছুই বলা যাবে না। তবে যে বিশেষণগুলি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা... ইত্যাদি। সে আল্লাহর কালাম বা কথার অনন্দিত্ব অস্বীকার করত। সে দাবি করত যে, আল্লাহর কালাম আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই কথনোই বলা যাবে না যে আল্লাহ বলেছেন বা কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন। এরপ সকল প্রকারের বিভাস্তি

^{১৩৬} দেখুন, শাহরাজানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/৮৫-৯২।

^{১৩৭} দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২১১-২১৫।

সে একত্রিত করে। সে এত বেশি সুস্পষ্টভাবে যুক্তির নামে কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত যে, তেমন কোনো ব্যাখ্যারও ধার ধারত না। এজন্য ইমাম আবৃ হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য অনেক ইমাম জাহম ও তার অনুসারীদেরকে সুস্পষ্টরূপে কাফির বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা জাহমিয়াদেরকে ‘মুসলিম ফিরকা’ বলে গণ্য না করে ‘অমুসলিম’ বলে গণ্য করেছেন।^{১৩৮}

পরবর্তীকালে আল্লাহর বিশেষণকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে সাধারণভাবে ‘জাহমিয়া’ মতবাদ বলে গণ্য করা হয়।^{১৩৯} উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে জাহমী মতবাদের অনুসারী।

৬. ৬. ৫. মু'তাযিলা^{১৪০}

মু'তাযিলা (المعتزلي) শব্দটি ‘ই'তাযালা’ (اعتزل) ফি'ল থেকে গৃহীত। ই'তিযাল (اعتزال) অর্থ বিছিন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া, একাকী হওয়া ইত্যাদি। প্রথম হিজরীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে মু'তাযিলা মতবাদের সৃষ্টি হয়।

এদেরকে মু'তাযিলা বলা হলো কেন সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত এই যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বাসরীর (১১০ হি) একজন ছাত্র ছিলেন ওয়াসিল ইবনু আতা (৮০-১৩১ হি)। তৎকালীন একটি বিশেষ বিতর্কিত বিষয় ছিল পাপী মুসলিমের বিষয়। আমরা দেখেছি খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত এবং আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করত। মুরাজিয়াহ সম্প্রদায় তাকে পরিপূর্ণ মুমিন এবং অনন্ত জান্নাতী বলে বিশ্বাস করত। সাহবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূল ধারার তাবিয়ীগণ একপ মুসলিমকে পাপী মুমিন ও আখিরাতে শাস্তিভোগের পর নাজাত লাভ করবে বলে বিশ্বাস করতেন। ওয়াসিল ইবনু আতা দাবি করেন যে, একপ ব্যক্তিকে মুমিনও বলা যাবে না এবং কাফিরও বলা যাবে না। বরং সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান রত। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে অনন্ত জাহান্নামী হবে, কারণ সে ঈমানহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। হাসান বসরী (রাহ) তার এ মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তার মাজলিসে আসতে নিষেধ করেন। ওয়াসিল হাসান বসরীর মাজলিস ত্যাগ করে বসরার মসজিদের অন্য কোণে বিছিন্ন হয়ে বসতে শুরু করে। এজন্য তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে ‘মু'তাযিলা’ বলা হয়।

সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় হিজরী শতকে এ মতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ

^{১৩৮} ড. মুহাম্মাদ আল-খুমাইস, উস্লুমীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফাহ, পৃ. ১৮৬-১৯২।

^{১৩৯} বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২১১-২১২।

^{১৪০} মু'তাযিলা ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.

১১৪-২০২; শাহরাতুনী, আল-মিলালু ওয়ান নিহল ১/৪৩-৮৫; আবৃ মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী, আকাইদাস সালাসি ওয়াস সাবউনা ফিরকা ১/৩২৫-৪২১।

করে। এ মতের অনুসারীগণ গ্রীক, মিসরীয়, পারসীয় ও ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লেখাপড়া করার ফলে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষিত ও সংক্ষিতিবান মানুষদের আকর্ষিত করেন। কয়েকজন আক্রাসী খলীফা, বিশেষত খলীফ মামুন (খিলাফত: ১৯৮-২১৮ ই/৮১৪-৮৩৩খ) ও খলীফা মু'তাসিম (২১৮-২২৭ ই/৮৩৩-৮৪২খ) তাদের যুক্তি, তর্ক, দর্শনশাস্ত্রে পাইত্য ইত্যাদিতে মুঞ্চ হয়ে তাদের মত গ্রহণ করেন এবং এ মতটিকেই রাষ্ট্রীয় ধর্মত হিসেবে গ্রহণ করে সকল আলিমকে এমত গ্রহণে বাধ্য করতে শুর করেন। তবে মূলধারার আলিমগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ক্রমান্বয়ে এ মতের অনুসারী কর্মতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যা।

আহলুস সুন্নাতের সাথে মুতাফিলী সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য ছিল বিশ্বাসের বিষয়ে মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেক (sense, reason, rationality, intellect, intelligence) ও ওহী (Scripture)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান। মু'তাফিলী আকীদার মূল বিষয় ছিল মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেককে ওহীর বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের মতে আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য। আকল বা মানবীয় বুদ্ধির বিচারে ওহীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা গেলে বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ওহীর ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে। কুরআনের বক্তব্যকে তারা 'রূপক', অস্পষ্ট ইত্যাদি যুক্তিতে বাতিল করত এবং হাদীসের বক্তব্যকে তারা 'খাবারে ওয়াহিদ' বা মুতাওয়াতির নয়, কাজেই অর্থগত বর্ণনার সম্ভাবনা আছে যুক্তিতে বাতিল করত। এ বিষয়ে সাহাবীগণের অনুসরণে মূলধারার তাবিয়া ও পরবর্তী আলিমগণ বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের আকীদার মূলনীতি আমরা ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে ব্যাখ্যা করেছি।

মু'তাফিলাগণ তাদের মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক আকীদার উত্তাবন করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কাদারিয়াহ ও জাহমিয়াহ ফিরকাদ্বয়ের মূলনীতি সমূহ সবই মু'তাফিলাগণ গ্রহণ করে। তারা নিজদেরকে আহলুল আদলি ওয়াত তাওহীদ (أَهْلُ الْعِدْلِ وَالْتَّوْحِيدِ) অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও একত্বের অনুসারী বলতেন। তাদের দাবি মত তাদের মূলনীতি পাঁচটি (১) আদল (العدل) বা ন্যায়বিচার, (২) তাওহীদ (التَّوْحِيد) বা একত্ব, (৩) ইনফাযুল ওসেদ (إِنفَادٌ) বা শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন, (৪) আল-মানফিলাতু বাইনাল মানফিলাতাইনি (الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ) বা দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং (৫) আল-আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহউ আনিল মুনকার (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ) বা সংক্রমে আদেশ ও অসংকর্ম থেকে নিরেধ।^{১৪১}

এগুলির ভিত্তিতে তাদের উত্তাবিত আকীদার মধ্যে রয়েছে:

^{১৪১} ইবনু আলি ইয়্য, শারহল আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৫২০-৫২৮।

(১) আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্থীকার করা। তাদের মতে, মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সন্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। এতে আল্লাহর একত্ব নষ্ট হয়। একারণে তারা নিজেদেরকে একত্ববাদী বলে দাবি করত। এ ছাড়া সৃষ্টির সাথে তুলনা হবে এ যুক্তিতে তারা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মগুলি অস্থীকার করত এবং সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করত।

(২) মহান আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে না।

(৩) আল্লাহর কথা তাঁর অনাদি বিশেষণ নয় বরং তা তাঁর সৃষ্টি বস্তু মাত্র।

(৪) তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই। মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন, মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে। তাকদীরের অস্থীকারকেই তারা ‘ন্যায়বিচারের বিশ্বাস’ বলে আখ্যায়িত করত।

(৫) পাপী মুসলিম কাফিরও নয় মুমিনও নয়। আখিরাতে সে অন্ত জাহান্নামী। এ বিশ্বাসকে তারা ‘শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন’ বলে আখ্যায়িত করত। কারণ আল্লাহ পাপীদের শাস্তির অঙ্গিকার করেছেন। এরপর যদি তিনি ক্ষমা করেন তবে তা ন্যায়বিচার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের পরিপন্থী হয়। আল্লাহর ন্যায়বিচারের যুক্তিতে তারা ‘শাফা‘আত’ বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সকল নির্দেশনা অস্থীকার করত।

(৬) অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরী ও ফারয আইন। রাষ্ট্রিও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। এমতের ভিত্তিতে তারা নিজেদের এ সকল আকীদা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালান।

মু’তাফিলাগণের মধ্যে অনেক উপদলের উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব আকীদা ও মতামত রয়েছে।

৬. ৬. ৫. ৬. মুশাকিহ^{১৪২}

মুশাকিহ (المُشَبِّهُ) শব্দটি ‘তাশবীহ’ (الْتَّشْبِيهُ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। তাশবীহ অর্থ তুলনা করা, উপমা দেওয়া, সমান বানানো (To make equal or similar, to compare) ইত্যাদি। মুশাকিহ অর্থ তুলনাকারীগণ। যারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে ‘মুশাকিহ’ বা তুলনাকারী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

^{১৪২} বাগদাদী, আল-ফারকু, পৃ. ২২৫-২৩০; ইবনু আলি ইয্য, শারহ আকীদা আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৫২০-৫২২।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কোনো তুলনা দিও না এবং কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহকে মানবাকৃতির বলে কল্পনা করেছে, অথবা আল্লাহর সকল বা কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মত তুলনীয় বলে মনে করেছে।

শেষ কথা

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদা বিষয়ক আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। আলোচ্য বিষয়গুলি পাঠককে কতটুকু বুঝাতে পেরেছি তা জানি না। নিজের দুর্বলতার কারণেই মনে হয়, মূল কথাটি হয়ত বুঝাতে পারলাম না। এজন্য পুরাতন কথাটি শেষবারের মত পাঠককে বলতে চাই। মুমিন জীবনের সকল বিষয়ের ন্যায় বিশ্বাস বা আকীদার বিষয়েও সুন্নাতের হ্বহ অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ। মুমিন নিজের ঈমানকে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বিশুদ্ধতম রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন, কারণ তাঁর সফলতা ও নাজাতের এটিই একমাত্র ভিত্তি। শির্ক, কুফ্র, নিফাক, বিদ্রোহ ও বিভক্তির প্রতি হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘৃণা ও আপত্তি বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক, তবে এগুলিতে লিখ ঈমানের দাবিদারদের কুফরী নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুমিন বলে গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাতের মধ্যকার বিভ্রান্তদের জন্য আমাদের দায়িত্ব দর্শা ও নসীহত; হিংসা ও গালি নয়। হিংসার ওজুহাত না খুঁজে ভালবাসার ওজুহাত খুঁজুন, যার মধ্যে যতটুকু ঈমান, ইসলাম ও সুন্নাত আছে ততটুকুকেই ভালবাসার ওজুহাত বানিয়ে তাঁকে ভালবাসুন এবং তার হেদয়াতের জন্য দু'আ করুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আকীদা ও আমলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার এবং জামাআত বা একেয়ের পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমিন!

আমার মত একজন নগণ্য মানুষকে মহান আল্লাহ আকীদার বিষয়ে কিছু লেখার তাওফীক দিয়েছেন বলে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর মধ্যে যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর বিষয় রয়েছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের কারণে। আর যা কিছু ভুলভাস্তি রয়েছে সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে। আমি আল্লাহর দরবারে সকল ভুল ও অন্যায় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর মহান দরবারে দু'আ করি, তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন এবং পাঠক-পাঠিকাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য এবং তাঁর সাহাবী ও পরিজনদের জন্য সালাত ও সালাম। প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত।

ଶ୍ରୀପଣ୍ଡି

ଏ ଶ୍ରୀ ରଚନାଯ ଯେ ସକଳ ଗ୍ରହେ ଉତ୍ସୁତି ଦେଓଯା ହେଁଛେ ମେ ସକଳ ଗ୍ରହେ ଏକଟି ମୋଟାଯୁଟି ତାଲିକା ନିମ୍ନେ ପ୍ରଦାନ କରା ହିଲେ । ପାଠକ ଓ ଗବେଷକଙ୍କରେ ସୁବିଧାରେ ଏହାକାରଗଣେର ଯୁତ୍ୟତାରିଖେ ଭିନ୍ନିତେ ଐତିହାସିକ ତ୍ରୟ ଅନୁସାରେ ସାଜାନୋ ହିଲେ । ଯହାନ ଆଜ୍ଞାହ ମୁସଲିମ ଉତ୍ସାହର ଇମାମ, ଆଲିଯ ଓ ଏହାକାରଗଣକେ ଅଫୁରନ୍ତ ରହମତ, ମାଗଫିରାତ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରନ, ଯାଦେର ରେବେ ସାଓଯା ଜାନ-ସମ୍ବୂଦ ଥେକେ ସାମାନ୍ୟ କିଛୁ ନୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଯେ ଏ ଗ୍ରହେ ସାଜିଯେଛି ।

୧. ଆଲ-କୁରାନୁଲ କାରୀମ ।
୨. ଆବୁ ହାନୀଫା, ଇମାମ, ନୁମାନ ଇବନ୍ ସାବିତ (୧୫୦ ହି), ଆଲ-ଫିକହଲ ଆକବାର, ମୁହାସଦ ଖୁମାଇୟିସେର-ଏର ଶାରହ-ସହ, (ରିଯାଦ, ଦାରଲ ମୁସଲିମ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୪)
୩. ଆବୁ ହାନୀଫା, ଇମାମ, ନୁ'ମାନ ଇବନ୍ ସାବିତ, ଆଲ-ଫିକହଲ ଆକବାର, ମୋଜ୍ରା ଆଲୀ କାରୀର ଶାରହ-ସହ, (ବୈରକୃତ, ଦାରଲ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ ୧୯୮୪)
୪. ମା'ମାର ଇବନ୍ ରାଶିଦ (୧୫୧ ହି), ଆଲ-ଜାମିଯ (ବୈରକୃତ, ଆଲ-ମାକତାବୁଲ ଇସଲାମୀ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୪୦୩ ହି)
୫. ଖାଲිଲ ଇବନୁ ଆହମାଦ ଫାରାହିଦୀ (୧୭୦ ହି), କିତାବୁଲ ଆଇନ (ଆଲ-ମାକତାବା ଆଶ-ଶାମିଲାହ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, <http://www.alwartaq.com>)
୬. ମାଲିକ ଇବନୁ ଆନାସ (୧୭୯ ହି), ଆଲ-ମୁଆନ୍ତା (ମିଶର, ଦାରୁ ଏହଇୟାଯିତ ତୁରାସ ଆଲ-ଆରାବୀ)
୭. ଇବନୁଲ ମୁବାରାକ, ଆଦୁଲ୍ଲାହ (୧୮୧ ହି), ଆୟ-ୟୁହଦ (ବୈରକୃତ, ଲେବାନନ, ଦାରଲ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯାହ)
୮. ଆବୁ ଦାଉଁ ତାୟାଲିସୀ, ସୁଲାଇମାନ ଇବନୁ ଦାଉଁ (୨୦୪ ହି), ଆଲ-ମୁସନାଦ (ବୈରକୃତ, ଦାରଲ ମା'ରିଫାହ)
୯. ଆଦୁର ରାୟାକ ସାନ'ଆନୀ (୨୧୧ ହି), ଆଲ-ମୁସାନ୍ନାଫ (ବୈରକୃତ, ଆଲ-ମାକତାବୁଲ ଇସଲାମୀ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୪୦୩ ହି)
୧୦. ଇବନେ ହିଶାମ (୨୧୩ହି.), ଆସ-ସୀରାତୁନ ନାବାବୀଯାହ (ମିଶର, କାଇରୋ, ଦାରୁର ରାଇୟାନ, ୧ମ ଥ. ୧୯୭୮)
୧୧. ଇବନୁ ସା'ଦ, ମୁହାୟାଦ (୨୩୦ ହି) ଆତ-ତାବାକାତୁଲ କୁବରା (ବୈରକୃତ, ଦାରୁ ସାଦିର)
୧୨. ଇବନୁ ସା'ଦ, ଆତ-ତାବାକାତୁଲ କୁବରା, ଆଲ-କିସମୁଲ ମୁତାୟିମ (ମଦୀନା ମୁନାୟାରା, ମାକତାବାତୁଲ ଉଲ୍‌ମ ଓସାଲ ହିକାମ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୪୦୮)
୧୩. ଇବନୁ ଆବୀ ଶାଇବା, ଆବୁ ବାକର ଆଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନୁ ମୁହାୟାଦ (୨୩୫ ହି), ଆଲ-ମୁସାନ୍ନାଫ (ରିଯାଦ, ସୌଦି ଆରବ, ମାକତାବାତୁର ରକ୍ଷଣ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୪୦୯ ହି)
୧୪. ଆହମଦ ଇବନୁ ହାସଲ (୨୪୧ହି), ଆଲ-ମୁସନାଦ (କାଇରୋ, ମିଶର, ମୁଆସସାସାତ୍ କୁର୍ତ୍ବାହ, ଓ ଦାରଲ ମା'ରିଫ, ୧୯୫୮)
୧୫. ଆବଦ ଇବନୁ ହମାଇଦ (୨୪୯ ହି), ଆଲ-ମୁସନାଦ (କାଇରୋ, ମାକତାବାତୁସ ସୁନାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୮୮)
୧୬. ଦାରିମୀ, ଆଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନୁ ଆଦୁର ରାହମାନ (୨୫୫ ହି), ଆସ-ସୁନାନ (ବୈରକୃତ, ଦାରଲ କିତାବ ଆଲ-ଆରାବୀ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୪୦୭ହି)

১৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরূত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া)
১৯. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরূত, লেবানন, দারুল ফিকর)
২০. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরূত, লেবানন, দারুল ফিকর)
২১. তিরমিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরূত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী)
২২. তিরমিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আল-শায়াইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (মক্কা মুকারাবাহ, আল-মাকতাবাহ আল-তজারিয়্যাহ, ৪৮ মুদুন, ১৯৯৬)
২৩. মুবারুরিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল (বৈরূত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)।
২৪. ইবনু আবি আসিম, আবু বাকর আমর (২৮৭ হি), কিতাবুস সুন্নাহ (বৈরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৩য় মুদুন, ১৯৯৩)
২৫. ইবনে ওয়াদ্দাহ (মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াদ্দাহ) আল-কুরতুবী (২৮৬হি.), আল-বিদা'উ ওয়ান নাহয়ু আনহা (বৈরূত, দারুল রায়েদ আল-আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২ প্রি.)
২৬. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ায়ী (২৯৪হি:), তা'য়িমু কাদরিস সালাত (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি:)
২৭. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ায়ী (২৯৪ হি), আস-সুন্নাহ (বৈরূত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি)
২৮. নাসাই, আহমদ ইবনু খ'আইব (৩০৩ হি) আস-সুনানুল কুবরা (বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
২৯. নাসাই, আহমদ ইবনু খ'আইব, আস-সুনান (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতব'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬)
৩০. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনু আলী (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ (দামেশক, দারুল যামুন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৩১. ইবনুল জাকুদ, আবুল্ফুল ইবনু আলী (৩০৭ হি.) আল-মুনতাকা, বৈরূত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮।
৩২. তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীর: জামিউল বায়ান (বৈরূত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি)
৩৩. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তারীখ তাবারী: তারীখুল উমায়ি ওয়াল মুলুক (বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
৩৪. ইবনু খুয়াইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরূত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০)
৩৫. খালাল, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি), আস-সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুল রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)

৩৬. তাহারী, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহ মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)
৩৭. তাহারী, ইয়াম, আবু জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি), আল-আকীদা আত-তাহারীয়াহ: মুহাম্মাদ খুমাইয়িসের শারহ-সহ, (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি)
৩৮. আবু জাফর তাহারী, মাতৃনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাহেমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৩৯. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি.) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়াহ, ১৩৪৫ হি.)
৪০. ইবনু হিবান, আবু হাতিম মুহাম্মাদ (৩৫৪ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৪১. ইবনু হিবান, আস-সৌরাতুন নাবাবিয়াহ (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতল কৃতুবিল সাকাফিয়াহ, ১ম সংক্রণ ১৯৮৭)
৪২. তাবারানী, সুলাইয়ান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.) আল-মু'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মসজিদগালুয়া, ১৯৮৫)
৪৩. তাবারানী, সুলাইয়ান ইবনু আহমদ, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৪৪. তাবারানী, সুলাইয়ান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়ান (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৪৫. আজ্জুরী, মুহাম্মাদ ইবনুল হসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২)
৪৬. ইবনু বাস্তাহ, উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (৩৮৭হি), আল-ইবানাহ (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১৯৯৪-১৯৯৭)
৪৭. আল-জাওহারী, ইসমাইল ইবনে হামাদ (৩৯৩ হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাইন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৪৮. ইবনু মানদাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৯৫ হি), আত-ভাওহীদ ও ইসবাতু সিফাতির রাবু (আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়াহ, মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪০৯ হি)
৪৯. ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকাহীসুল লুগাহ (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)
৫০. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৫১. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
৫২. আবু নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪ৰ্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি)
৫৩. আবু নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

৫৪. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হসাইন (৪৫৮ হি), শ'আবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
৫৫. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনাতুল কুবরা (মাঝা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল দারিল বায, ১৯৯৪)
৫৬. বাইহাকী, দালাইলুন নুরওয়াহ, (কাইরো, দারুল রাইয়ান, ১৪০৮ হি)
৫৭. বাইহাকী, হায়াতুল আমবিয়া, (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রূশদ, ১ম প্রকাশ)
৫৮. ইবনে আব্দুল বার, ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩হি.) আল-ইনতিকা' ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ)
৫৯. ইবনু আব্দুল বাবুর, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফায়লিহী (কাইরো, মাতবাআ ফান্নিয়াহ, ১৪০৩ হি)
৬০. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৮৯)
৬১. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উল্মিমদীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৬২. রাগিব ইসপাহানী (৫০৭), আল-মুফরাদাত (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, তা. বি.)
৬৩. দায়লামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
৬৪. শাহরাত্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম (৫৪৮ হি), আল-মিলালু ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৮০)
৬৫. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), শুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঙ্গসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংকরণ, ১৯৭২)
৬৬. কাসানী, আলাউদ্দীন(৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ)
৬৭. ইবনুল জাওয়ী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউজ্যাত (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৬৮. ইবনুল জাওয়ী, আবুল ফারাজ, তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৬৯. আবু মুহাম্মাদ ইয়ামানী (আনু ৬৯৯ হি), আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবজ্ঞা ফিরকাহ (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় মুদ্রণ, ২০০১)
৭০. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উস্লু (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
৭১. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ, আন-নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৯)
৭২. মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হি)
৭৩. মুনয়িরী, আব্দুল আয়ীম ইবনু আব্দুল কারী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি)
৭৪. যাইনুদ্দীন রায়ী, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাক্র (আনু ৬৬৬ হি), মুখতারুস সিহাহ (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, <http://www.alwarraq.com>)

৭৫. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি) তাফসীর: আল-জামিয় লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুল উ'আব, ১৩৭২ হি)
৭৬. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহ সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খ্রি.)
৭৭. নববী, আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, <http://www.alwarraq.com>)
৭৮. ইবনু মানযুব, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরীকী (৭১১হি.) লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭৯. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮হি), মাজ্মুউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)
৮০. আলাউদ্দীন বুখারী (৭৩০হি.) কাশফুল আসরার আন উসুলিল বাযদাবী (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.)
৮১. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মূদ্রণ, ১৪১৩ হি)
৮২. যাইলায়ি, উসমান ইবনু আলী (৭৪৩ হি) তাবয়ীনুল হাকায়িক শারহ কানযিদ দাকাইক (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, <http://www.al-islam.com>)
৮৩. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), আল মানার আল মুনীফ (সিরিয়া, হলব, মাকতাব আল মাতব্যাত আল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০),
৮৪. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, যাদুল মা'আদ (সিরিয়া ও বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
৮৫. ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মুআইয়িদ)
৮৬. ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন)
৮৭. ইবনু কাসীর, ইসমাইল ইবনু উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আবীম (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০১)
৮৮. ইবনু কাসীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৮৯. শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০ হি), আল-ই'তিসাম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৫)
৯০. সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী (৭৯১ হি), শারহল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ঢাকা, ইমদাদিয়া লাইব্রেরি)
৯১. ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি), শারহল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৯২. ইবনে রাজাৰ, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ (মাঙ্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিয়ার মুসতাফা বাষ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯৩. ইবনে রাজাৰ, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উল্ম ওয়াল হিকায় (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি)

୯୪. ଇରାକୀ, ଯାଇନ୍‌ଦ୍ଵୀନ ଆନ୍ଦୁର ରାହୀମ ଇବନୁଲ ହସାଇନ (୮୦୬ହି), ଆତ-ତାକଯିଦ ଓୟାଲ ସୈଦାହ (ବୈରୁତ, ଲେବାନନ, ମୁଆସସାସାତୁଲ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯାହ, ୫ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୭)
୯୫. ଇରାକୀ, ଯାଇନ୍‌ଦ୍ଵୀନ ଆନ୍ଦୁର ରାହୀମ ଇବନୁଲ ହସାଇନ (୮୦୬ହି), ଫାତହଲ ମୁଗିସ (କାଇରୋ, ଯିଶର, ମାକତାବାତୁସ ସୁନ୍ନାହ, ୧୯୯୦)
୯୬. ହାଇସାରୀ, ନୂରଦ୍ଵୀନ ଆଲୀ ଇବନୁ ଆବୀ ବାକର (୮୦୭ହି.) ମାଜଯାଉ୍ୟ ଯାଓୟାଇଦ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କିତାବିଲ ଆରାବୀ, ୩ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୮୨)
୯୭. ହାଇସାରୀ, ନୂରଦ୍ଵୀନ ଆଲୀ ଇବନୁ ଆବୀ ବାକର (୮୦୭ହି.) ମାଜଯାଉ୍ୟ ଯାଓୟାଇଦ (ଦାମେଶକ, ଦାରଳସ ସାକାଫାହ ଆଲ-ଆରାବିଯାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୨)
୯୮. ଜୁରଜାନୀ, ଆଲୀ ଇବନୁ ମୁହାୟାଦ (୮୧୬ହି) ଆତ-ତାରିଫାତ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କିତାବ ଆଲ-ଆରାବୀ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୦୫ ହି)
୯୯. ଫାଇରୋଯାବାଦୀ, ମୁହାୟାଦ ଇବନେ ଇୟାକୁବ (୮୧୭ହି.), ଆଲ-କାମୁସଲ ମୁହିତ (ବୈରୁତ, ମୁଆସସାସାତୁର ରିସାଲାହ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୮୭)
୧୦୦. ସାନାନାନୀ, ମୁହାୟାଦ ଇବନୁ ଇସମାଇଲ (୮୫୨ ହି), ସୁବୁଲୁସ ସାଲାମ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ ଇହଇୟାଯିତ ତୁରାସିଲ ଆରାବୀ, ୪୰୍ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୩୭୯ ହି)
୧୦୧. ଇବନୁ ହାଜାର ଆସକାଲାନୀ, ଆହମଦ ଇବନୁ ଆଲୀ (୮୫୨ ହି), ଫାତହଲ ବାରୀ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ ମାରିଫାହ, ୧୩୭୯ ହି)
୧୦୨. ଇବନୁ ହାଜାର ଆସକାଲାନୀ, ଲିସାନୁଲ ମିଯାନ (ବୈରୁତ, ମୁଆସସାସାତୁଲ ଆଲାମୀ, ୩ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୯୮୬)
୧୦୩. ୯୦୨ ସାଖାବୀ, ମୁହାୟାଦ ଇବନୁ ଆନ୍ଦୁର ରାହମାନ (୯୦୨ହି), ଫାତହଲ ମୁଗିସ (କାଇରୋ, ମାକତାବାତୁସ ସୁନ୍ନାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ ୧୯୯୫)
୧୦୪. ସାଖାବୀ, ଆଲ-କାଓଲୁଲ ବାଦୀ' (ମଦୀନା ମୁନାଓୟାର, ଆଲ-ମାକତାବା ଆଲ-ଇଲମିଯାହ, ୩ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୭୭ ହି)
୧୦୫. ସୁଯୁତୀ, ଜାଲାଲୁଦ୍ଦୀନ, ଆଲ-ଲାଆଲୀ ଆଲ-ମାସନ୍‌ଆହ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ ମାରିଫାହ)
୧୦୬. ସୁଯୁତୀ ଆଲ-ଆମର ବିଲ ଇତିବା (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୮୮ ହି.)
୧୦୭. ସୁଯୁତୀ, ଜାଲାଲ ଉଦ୍ଦୀନ, ଆଲ-ହାବୀ ଲିଲ-ଫାତାଓୟା (ବୈରୁତ, ଦାରଳ ଫିକର, ୧୯୯୪)
୧୦୮. ୯୧୧ ସୁଯୁତୀ, ଜାଲାଲୁଦ୍ଦୀନ ଆନ୍ଦୁର ରାହମାନ ଇବନୁ ଆବୀ ବକର (୯୧୧ହି), ତାଦରୀବୁର ରାବୀ (ରିୟାଦ, ସୌଦି ଆରବ, ମାକତାବାତୁର ରିୟାଦ ଆଲ-ହାଦୀସାହ)
୧୦୯. ଆଲ-କାସତାଲାନୀ, ଆହମଦ ବିଲ ମୁହାୟାଦ (୯୨୩ହି.), ଆଲ-ମାଓୟାହିବୁଲ ଲାଦୁନ୍ନିୟା (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କୁତୁବ ଆଲ-ଇଲମିଯା, ୧ମ ସଂକରଣ ୧୯୯୬)
୧୧୦. ମୁହାୟାଦ ଇବନେ ଇଉସ୍କୁ ଆଶ ଶାମୀ (୯୪୨ହି.), ସୀରାହ ଶାମୀଯାହ: ସୁବୁଲୁ ହଦା ଓୟାର ରାଶାଦ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କୁତୁବ ଲାଦୁନ୍ନିୟା, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୩ ହି.)
୧୧୧. କାସତାଲାନୀ, ଆହମଦ ବିଲ ମୁହାୟାଦ (୯୨୩ହି.), ଆଲ-ମାଓୟାହିବୁଲ ଲାଦୁନ୍ନିୟା (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କୁତୁବ ଆଲ-ଇଲମିଯା, ୧ମ ସଂକରଣ ୧୯୯୬)
୧୧୨. ଇବନୁ ଇରାକ, ଆଲୀ ଇବନୁ ମୁହାୟାଦ (୯୬୩ ହି), ତାନୀଛିଶ ଶାରୀଯାହ ଆଲ-ମାରଫ୍‌ଆହ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯାହ, ୨ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୯୮୧)
୧୧୩. ଇବନୁ ନୁଜାଇୟ (୯୭୦ହି.), ଆଲ-ବାହର ରାଯେକ ଶାରଙ୍ଗ କାନ୍ୟୁଦ ଦାକାଇକ (ବୈରୁତ, ଦାରଳ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ ୧୯୯୧ ହି.)

১১৪. যোজ্বা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফু'আহ (বৈরুত, দারুল কৃত্তিবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১১৫. যোজ্বা আলী কারী (১০১৪হি.) শরাহ শারহি নুখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম)
১১৬. যোজ্বা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফু'আহ (বৈরুত, দারুল কৃত্তিবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১১৭. যোজ্বা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, (বৈরুত, দারুল কৃত্তিবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
১১৮. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহ জামিয়স-সাগীর (ঘির, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি)
১১৯. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি) শারহল মুআত্তা (বৈরুত, দারুল কৃত্তিবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১)
১২০. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী, শরহল মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া (বৈরুত, দারুল কৃত্তুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১২১. মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন তুরী (১১৩৮ হি), তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক (বৈরুত, দারুল কৃত্তিবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২২. শাহ ওয়ালি উজ্জ্বাহ মুহাম্মদিস দেহলবী, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬ হি), হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িল উল্যম, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯২)
১২৩. শাহ ওয়ালিউজ্জ্বাহ দেহলবী, আল-বালগুল মুবীন, বঙ্গানুবাদ মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (চাকা, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯)
১২৪. শাহ ওয়ালি উজ্জ্বাহ, আল-ফাওয়ুল কাবীর ফী উস্লিত তাফসীর (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১২৫. যাবীদী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মুরতায় যাবিদী (১২০৫), তাজুল আরস (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, (<http://www.alwarraq.com>, <http://www.ahlalhdeeth.com>)
১২৬. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫০ হি), নাইলুল আউতার (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
১২৭. শাওকানী, আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমু'আ (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতু মুসতাফা নিশার আল-বায)
১২৮. শাওকানী, তুহফাতুয যাকিনীন বি উদ্দাতি হিসনিল হাসীন, (বৈরুত, দারু সাদির)
১২৯. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আয়ীন (১২৫৬ হি), হাশিয়াতু রান্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)
১৩০. আলুসী, শিহাব উদ্দীন মাহমুদ ইবনু আব্দুল্লাহ (১২৭০ হি), রহল মা'আলী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানী (আল-মাকতাবাতুল শামিলা, ২য় প্রকাশ, <http://www.altafsir.com>)
১৩১. দরবেশ হৃত, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ (১২৭৬ হি), আসনাল মাতালিব (সিরিয়া, হালাব, আল-মাকতাবা আল-আদবিয়াহ)

୧୩୨. ଆଦୁଳ ହାଇ ଲାଖନବୀ (୧୩୦୪ହି.), ଆଲ-ଆସାରଙ୍ଗ ମାରଫ୍ତ୍ୟା ଫୀଲ ଆଖବାରିଲ ମାଉୟା (ବୈରୁତ, ଦାରଙ୍ଗ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯ୍ୟାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ ୧୯୮୪ ପ୍ରି.)
୧୩୩. ଆଦୁଳ ହାଇ ଲାଖନବୀ (୧୩୦୪ହି.), ଆଲ-ଆଜଇବାତୁଲ ଫାଯିଲା ଲିଲ ଆସଇଲାହ ଆଲ-ଆସାରାତିଲ କାମିଲା (ସିରିଆ, ହାଲାବ, ମାକତାବୁଲ ମାତ୍ରବୁଆତ ଆଲ-ଇସଲାମିଯ୍ୟାହ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୮୪ ପ୍ରି.)
୧୩୪. ସିଙ୍ଗୀକ ହାସାନ କାନ୍ଜୂଜୀ (୧୩୦୭ ହି), ଆଲ-ହିତାହ ଫୀ ଯିକରିସ ସିହାହିସ ସିତାହ (ବୈରୁତ, ଦାରଙ୍ଗ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯ୍ୟାହ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୮୫)
୧୩୫. ରାହମାତୁଲ୍ଲାହ କିରାନବୀ (୧୩୦୮ ହି), ଇୟହାରଙ୍ଗ ହଙ୍କ (ରିଯାଦ, ଆର-ରିଯାସାତୁଲ ଆସାହ: ଦାରଙ୍ଗ ଇଫତା, ୧୯୮୯)
୧୩୬. ମୁବାରକପୂରୀ, ମୁହାସାଦ ଆଦୁଳ ରାହମାନ (୧୩୫୦ହି), ତୁହଫାତୁଲ ଆହୋୟାହି (ବୈରୁତ, ଦାରଙ୍ଗ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯ୍ୟାହ)
୧୩୭. ଅସୀଯାବାଦୀ, ଶାମସୁଲ ହକ, ଆଉନୁଲ ମା'ବୁଦ (ବୈରୁତ, ଦାରଙ୍ଗ କୁତୁବିଲ ଇଲମିଯ୍ୟାହ, ୨ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୪୧୫ହି)
୧୩୮. ମୁହିରୁଦ୍ଦୀନ ଆଲ-ଖାତୀବ, ଆଲ-ଖୁତୁତୁଲ ଆରୀଯାହ ଲିଲ ଉସ୍-ସିଲ ଲାତି କାମା ଆଲାଇହା ଦୀନୁଶ ଶୌଆତିଲ ଇମାମିଯ୍ୟାହ (୧୦ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୪୧୦ ହି, ପ୍ରକାଶକେର ତଥ୍ୟ ବିଶେଷ)
୧୩୯. ଆହୟଦ ଶାକିର, ମୁସନାଦ ଆହୟଦ (ମିଶର, ଦାରଙ୍ଗ ମା'ଆରିଫ, ୧୯୭୫)
୧୪୦. ଆଲବାନୀ, ମୁହାସାଦ ନାସିରଦ୍ଦୀନ, ଯାୟିଫଲ ଜାମିୟିସ ସାଗୀର (ବୈରୁତ, ଆଲ-ମାକତାବୁଲ ଇସଲାମୀ, ୩ୟ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୦)
୧୪୧. ଆଲବାନୀ, ମୁଖତାସାରକ ଶାମାଇଲ ଆଲ-ମୁହାସାଦିଯ୍ୟାହ (ଜର୍ଡାନ, ଆସାନ, ଆଲ-ମାକତାବୁଲ ଇସଲାମୀଯ୍ୟାହ, ୨ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୪୦୬)
୧୪୨. ଆଲବାନୀ, ମୁହାସାଦ ନାସିରଦ୍ଦୀନ, ସହିତ୍ତ ଜାମିୟିସ ସାଗୀର (ବୈରୁତ, ଆଲ-ମାକତାବୁଲ ଇସଲାମୀ, ୩ୟ ସଂକ୍ଷରଣ, ୧୯୮୮)
୧୪୩. ଆଲବାନୀ, ମୁହାସାଦ ନାସିରଦ୍ଦୀନ, ସହିତ୍ତ ତାରଗୀବ (ରିଯାଦ, ମାକତାବୁଲ ମା'ଆରିଫ, ୩ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୯୮୮)
୧୪୪. ଆଲବାନୀ, ଯଗୀକୁ ସୁନାନି ଇବନି ମାଜାହ (ସୌଦି ଆରବ, ରିଯାଦ, ମାକତାବୁଲ ମା'ଆରିଫ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୧)
୧୪୫. ଆଲବାନୀ, ସହିତ୍ତ ସୁନାନି ଇବନି ମାଜାହ (ରିଯାଦ, ମାକତାବୁଲ ମା'ଆରିଫ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୧) ୩/୧୯୮୯
୧୪୬. ଆଲବାନୀ, ସିଲସିଲାତୁଲ ଆହାଦୀସିୟ ଯାୟିଫାହ (ରିଯାଦ, ମାକତାବୁଲ ମା'ଆରିଫ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୨)
୧୪୭. ଆଲବାନୀ, ସିଲସିଲାତୁଲ ଆହାଦୀସିୟ ସାହିହାହ (ରିଯାଦ, ମାକତାବୁଲ ମା'ଆରିଫ, ୧ମ ପ୍ରକାଶ, ୧୯୯୨)
୧୪୮. ଉସାଇଶୀନ, ମୁହାସାଦ ଇବନୁ ସାଲିହ, ଆଲ-କାଓଲୁଲ ମୁଫୀଦ ଆଲା କିତାବିତ ତାଓହୀଦ (ଦାସାବ, ସୌଦି ଆରବ, ଦାରଙ୍ଗ ଇବନିଲ ଜାଓୟୀ, ୧ମ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୯୯୭)
୧୪୯. ଡ. ଇବରାହିମ ଆନୀସ ଓ ସଙ୍ଗୀଗ, ଆଲ-ମୁଜାମ ଆଲ ଓସାମୀତ (ବୈରୁତ, ଦାରଙ୍ଗ ଫିକର)
୧୫୦. ଡ. ଆହୟଦ ମୁହାସାଦ ଜଲି, ଦିନାସାତୁନ ଆନିଲ ଫିରାକ (ରିଯାଦ, ମାରକାୟୁଲ ମାଲିକ ଫାୟସାଲ, ୨ୟ ମୁଦ୍ରଣ, ୧୯୮୮)

১৫১. ড. মাহমুদ তাহহান, তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৫২. ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৭ হি)
১৫৩. ড. আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪ৰ্থ সংস্করণ ১৯৯৩)
১৫৪. ড. মাহদী রিয়কুল্লাহ আহমদ, সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম প্র. ১৯৯২)
১৫৫. মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫)
১৫৬. ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রাহমান আ'যামী, মু'জামু মুসতালাহাতিল হাদীস, (রিয়াদ, মাকতাবাতু আদওয়ারিস সলাফ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯)
১৫৭. আহমদ আল-ফওয়ান, আদওয়া আলাল আকীদাতিদ দুরয়িয়্যাহ (প্রকাশকের তথ্য বিহীন ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩)
১৫৮. অন-নাদওয়াতুল আলায়িয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ'আতুল মুয়্যাস্সারাহ, (রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯)
১৫৯. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬০. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখিল ইসলাম (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬১. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬২. ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ: আওআলুল ফিরাকি ফী তারীখিল ইসলাম (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭)
১৬৩. ড. মূসা আল-মুসাবী, আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ, (লস এঞ্জেলস, ১৯৮৭)
১৬৪. ড. মুহাম্মাদ আল-খুমাইস, উস্লুলুন্নীন ইনদাল ইয়াম আবী হানীফাহ (রিয়াদ, দারুস সুয়াইয়ী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
১৬৫. ড. যাকারিয়া, আবু বাকর মুহাম্মাদ, আশ-শিরক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
১৬৬. মুহাম্মাদ আল-বুনদারী, আত-তাশাইউ' বাইনা মাফতুহিল আয়িম্মাহ ওয়াল মাফতুহিল ফারিসী, (জর্জন, আম্মান, দারু আম্মার, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৮)
১৬৭. মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার আত-তোনসাবী, বুতলানু আকারিদিশ শীয়াহ (মাক্কা মুকার্রামা, আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়াহ, ১৪০৮)
১৬৮. মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান (চাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭)
১৬৯. মৃত্যিব ইবনু মুকবিল আশ-শাস্সান, খাতমুন নুবুওয়াত ওয়ার রাদি আলাল বাহায়িয়তি ওয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ (রিয়াদ, দারু আতলাস আল-খাদরা, ১ম প্রকাশ, ২০০৬)

১৭০. মুহাম্মদ সুরুর বিন নাইফ, আল-হকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ, (যুক্তরাজ্য, বামিংহাম, দারেল আরকাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৭১. মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম আল-হায়দ, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ (রিয়াদ, দারেল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬)
১৭২. খোদকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২ সংকরণ, ২০০৩)
১৭৩. ড. খোদকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঘিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংকরণ, ২০০৬)
১৭৪. ড. খোদকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা (ঘিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬)
১৭৫. ড. খোদকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত; রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্ৰ-ওয়ীফা (ঘিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংকরণ ২০০৬)
176. The Holy Bible, authorized Version/King James Version, (reprinted and published by Bible Society of South Africa, 1988) & Bangla Cary Version
177. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, 1980)
178. Ahmed Deedat, The Choice, Volume 2 (Jeddah, Abul Qasim Publications, 1st print, 1994)
179. C. Jouco Bleeker And Geo Widengren, Historia Religionum: Handbook For The History Of Religions, Leiden 1969.
180. Encyclopedia of Religion and Ethics, Edition by James Hestings, New York.
181. Geoffrey Parrinder, Jesus in the Quran, (London, Sheldon Press, 1965)
182. The New Encyclopedia Britannica (knowledge in depth) 15th edition

গ্রন্থাকার রচিত কয়েকটি বই

- ১। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আর্কীনা
- ২। এহইয়াউস সুন্নান: সুন্নাতের পুনরজীবন ও বিদ্যাতের বিসর্জন
- ৩। হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
- ৪। রাহে বেলাজাত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ধিক্র-ওয়ীফা
- ৫। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্ণা ও দেহ-সজ্ঞা
- ৬। শুভত্বাতুল ইসলাম: জুন্নাব শুভবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
- ৭। ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউয়াত
- ৮। বাংলাদেশে উশৰ বা ফসলের ঘাকাত: উরাত্ত ও হায়োগ
- ৯। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফরীদত ও আমল
- ১০। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
- ১১। মুসলমানী সেসাব
- ১২। মুনাজাত ও নামায
- ১৩। সহীহ মাসনূন ওয়ীফা
- ১৪। আল্লাহর পথে দাওয়াত
- ১৫। সালাতুল ইন্দের অতিরিক্ত তাকবীর
- ১৬। তাুহুরাত, যাবুর, ইঙ্গিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীছুল্লাহ
- ১৭। ইমাম আবু হানিফ (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও বাচ্যা
- ১৮। কিতাবুল মোকাদ্দাস, ইঙ্গিল শরীফ ও ইসলামী ধর্ম
- ১৯। কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে ইস্লামীহের মর্যাদা
- ২০। কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে পাপ ও মুক্তি
- ২১। বাইবেল ও কুরআন
- ২২। بحوث في علوم الحجّت (বৃহসুন ফী উলুমুল হাদীস)
- ২৩। A Woman From Desert
- ২৪। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
- ২৫। মুসলান আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আধিক)
- ২৬। ইয়হুরুল ইক (আল্লামা রাহমানুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
- ২৭। ফিকহস সুন্নানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ



আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন

বাস টার্মিনাল, বিনাইসহ, বাংলাদেশ

০১৭১১১২৯৫৪, ০১৭১৫৪০০৬৮০

০১৯২২১৩৭৯২১, ০১৯৮৬২৯০১৪৭

www.assunnahtrust.com

www.assunnahpublications.com

www.pathagar.com